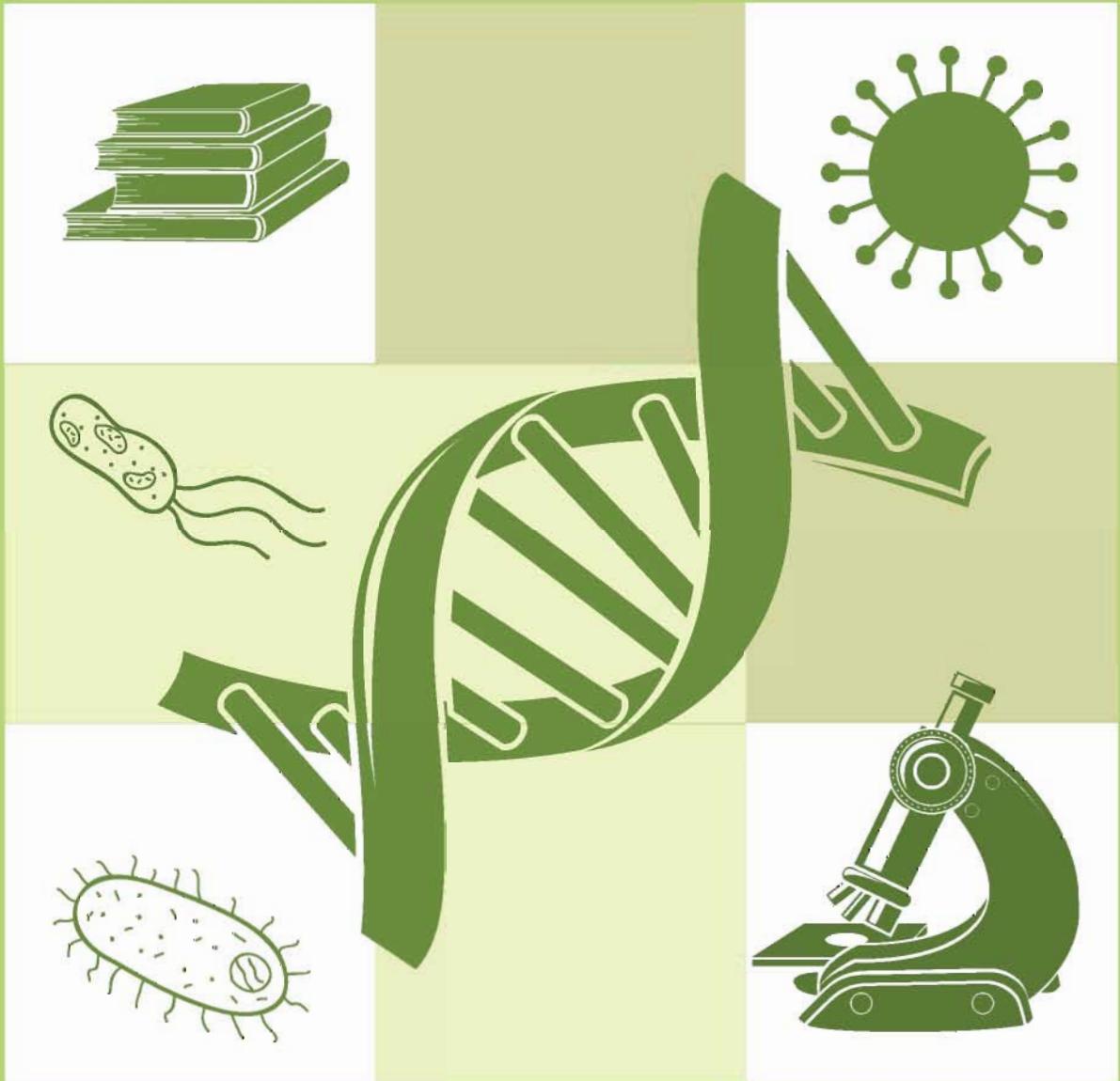


জীববিজ্ঞান

দাখিল
নবম-দশম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে
দাখিল নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

জীববিজ্ঞান

দাখিল

নবম-দশম শ্রেণি

সহজপাঠ্য, আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য করার জন্য পরিমার্জিত সংস্করণে
প্রয়োজনীয় সংযোজন, পরিবর্ধন, পুনর্লিখন ও সম্পাদনা

ড. সৌমিত্র চক্রবর্তী
ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল
ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ

পূর্ববর্তী সংস্করণ রচনা

এস. এম. হায়দার
ড. এম. নিয়ামুল নাসের
গুল আনার আহমেদ
মোঃ ইদ্রিস হাওলাদার

পূর্ববর্তী সংস্করণ সম্পাদনা

ড. সৈয়দ মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির
ড. মোঃ ইমদাদুল হক

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর, ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ: সেপ্টেম্বর, ২০১৭

পুনর্মুদ্রণ: , ২০১৯

প্রচ্ছদ: মেহেদী হক

চিত্রাঙ্কন: নাসরীন সুলতানা মিতু, মেহেদী হক

আলোকচিত্র: সাস্ট SUPA ও সংগৃহিত

ফন্ট প্রণয়ন: মো. তানবিন ইসলাম সিরাম

বুক ডিজাইন: মেহেদী হক, নাসরীন সুলতানা মিতু

পেইজ মেকাপ: মাহবুবুর রহমান খান

সমন্বয় ও সার্বিক সহযোগিতা: (পরিমার্জিত সংস্করণ) মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণ:

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলা ও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমর্প্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

জীববিজ্ঞান শিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে জীবন ও তার পরিবেশ সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক শিক্ষা গ্রহণ। জীববিজ্ঞানকে বোঝার জন্য বৈজ্ঞানিক ধারণা ও তত্ত্বের পাশাপাশি জীবনভিত্তিক প্রায়োগিক ক্ষেত্রের উপর গুরুত্ব দেওয়ায় জীববিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ এবং ব্যক্তি, সমাজ ও মানব কল্যাণে অবদান রাখতে দক্ষতা অর্জন করবে। সেই সাথে জীবনের প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ববোধ তৈরি হবে এবং তারা জীব সংরক্ষণে উদ্বৃদ্ধ হবে। জীববিজ্ঞানের প্রতিটি অধ্যায়ে বিভিন্ন ধরনের কাজ রাখা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে কাজ করার মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত পাঠটি সহজেই বুঝতে পারে। হাতে কলমে কাজ করার ফলে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠবে এবং চিন্তন দক্ষতা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। বিষয়টি শিক্ষার্থীদের কাছে সহজপাঠ্য, আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য করার জন্য ২০১৭ সালে পাঠ্যপুস্তকটিতে পরিমার্জন, সংযোজন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে।

২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে মাধ্যমিক স্তরে প্রবর্তিত পাঠ্যপুস্তক মাদ্রাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য উপযোগী করে দাখিল স্তরের পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রবর্তন করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিরাঙ্গন, নমুনা প্রশান্তি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

চেয়ারম্যান

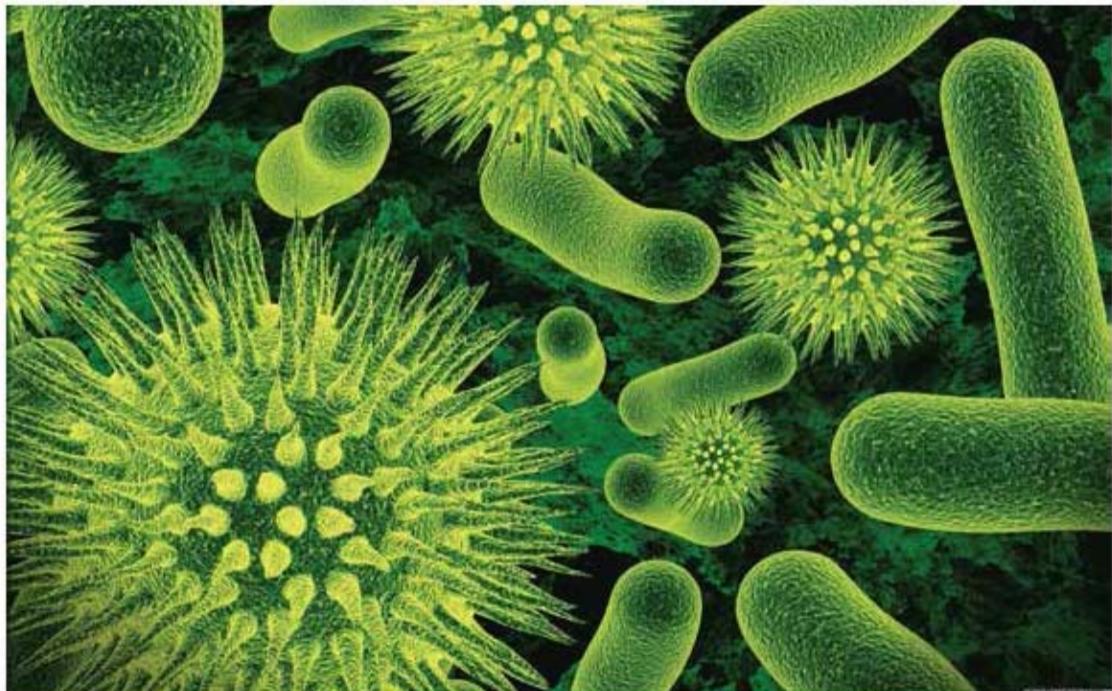
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	জীবন পাঠ	১-১৬
দ্বিতীয়	জীবকোষ ও টিস্যু	১৭-৪৯
তৃতীয়	কোষ বিভাজন	৫০-৬৩
চতুর্থ	জীবনীশক্তি	৬৪-৮৩
পঞ্চম	খাদ্য, পুষ্টি এবং পরিপাক	৮৪-১২৪
ষষ্ঠ	জীবে পরিবহন	১২৫-১৫৯
সপ্তম	গ্যাসীয় বিনিময়	১৬০-১৭৭
অষ্টম	রেচন প্রক্রিয়া	১৭৮-১৮৯
নবম	দৃঢ়তা প্রদান ও চলন	১৯০-২০৩
দশম	সমন্বয়	২০৪-২৩০
একাদশ	জীবের প্রজনন	২৩১-২৫৩
দ্বাদশ	জীবের বংশগতি ও বিবর্তন	২৫৪-২৭৮
ত্রয়োদশ	জীবের পরিবেশ	২৭৯-৩০১
চতুর্দশ	জীবপ্রযুক্তি	৩০২-৩১৬

প্রথম অধ্যায়

জীবন পাঠ



মানবসভ্যতা বিকাশে বর্তমান শতকের চালেছে হচ্ছে খাদ্য উৎপাদন, চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নয়ন এবং বিজ্ঞান পরিবেশে জীবলের অস্তিত্ব রক্ষণ। এসব ক্ষেত্রে জীববিজ্ঞানের ভূমিকা অগ্রগামী। এই অধ্যায়ে জীববিজ্ঞানের সংজ্ঞা, শারীরসমূহের নাম এবং জীবের নামকরণের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।



এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- জীববিজ্ঞানের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জীববিজ্ঞানের প্রধান শাখাগুলো বর্ণনা করতে পারব।
- জীবের প্রেগিবিল্যাসের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জীবের প্রেগিবিল্যাসকরণ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।
- ছিপদ নামকরণের ধারণা ও পুরুষ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাস্তবজীবনে জীবের প্রেগিবিল্যাসের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হব।

1.1 জীববিজ্ঞানের ধারণা

আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি যে যাদের জীবন আছে তারা জীব, আর যেসব জিনিসের জীবন নেই সেগুলো জড়। মোটা দাগে বোঝার জন্য বিশ্বের সব পদার্থকে এরকম দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম বিচারে কোথায় জড়-অচেতনের শেষ আর কোথায় জীবনের শুরু, তা অনেক সময়ই বলা মুশকিল। আসলে, জীবনের ভিত্তিমূলে কাজ করে পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়নের সেই একই নিয়ম, যা কিনা জড় জগৎকেও নিয়ন্ত্রণ করে। তাই জীবজগৎকে বুবাতে হলে ভৌতবিজ্ঞান, তথা পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের জ্ঞান জরুরি। কিন্তু এটা ভাবলে ভুল হবে যে ভৌতবিজ্ঞান জানলে আলাদা করে জীববিজ্ঞান পাঠ নিষ্ঠায়োজন। বরং জীবনকে ভাবা যেতে পারে অনেকগুলো জড়ের এমন এক জটিল সমাবেশ হিসেবে, যেখানে ঐ জটিলতার কারণে নতুন কিছু গুণের উত্তর ঘটেছে। ঠিক যেমন হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের নির্দিষ্ট আনুপাতিক সংযোগে পানি তৈরি হয়, যার বৈশিষ্ট্য হাইড্রোজেন বা অক্সিজেন কোনোটার মতোই হয় না। তাই জড়ের সুনির্দিষ্ট সম্বিবেশে জীব গঠিত হলেও তার মধ্যে এমন সব নতুন ধরনের বৈশিষ্ট্যের উত্তর ঘটে, যা তার জড় গাঠনিক উপাদানগুলোর মধ্যে ছিল না।

জীববিজ্ঞান বেশ প্রাচীন বিজ্ঞান। জীববিজ্ঞানকে ইংরেজিতে Biology বলে। এটি গঠিত হয়েছে গ্রিক bios (জীবন) এবং logos (জ্ঞান) শব্দ দুটির সংযোগের মাধ্যমে। যেহেতু চিকিৎসা ও কৃষিসংক্রান্ত ব্যাপারে জীববিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, সেহেতু সভ্যতার একেবারে আদিকাল থেকে গ্রিস, মিশর, মধ্যপ্রাচ্য, ভারতবর্ষ ও চীনসহ বিভিন্ন অঞ্চলের সভ্যতায় জীববিজ্ঞানের কিছু না কিছু চর্চা হয়েছে। যদিও সেসব চর্চাকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিচারে ঠিক বিজ্ঞান বলা যায় না, তবু জ্ঞানের এই শাখার বিকাশের জন্য তা অপরিহার্য ছিল।

1.2 জীববিজ্ঞানের শাখাগুলো

জীবের যে দুটি ধরন আমরা চারপাশে তাকালেই দেখতে পাই, সেগুলো হলো উক্তিদ এবং প্রাণী। তাই বহুদিন পর্যন্ত জীববিজ্ঞান পাঠের সুবিধার জন্য একে দুটি শাখায় ভাগ করে নেওয়ার প্রচলন ছিল: উক্তিদবিজ্ঞান এবং প্রাণিবিজ্ঞান। এ রীতি এখনও কিছুটা চালু আছে। যদিও জীববিজ্ঞান আজ এতটাই বিস্তৃতি লাভ করেছে যে শুধু দুটি শাখায় ভাগ করে এখন এর পাঠ আর চলবে না। এমন অনেক জীব আছে যা উক্তিদ বা প্রাণী কোনোটাই নয়। যেমন: ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ইত্যাদি। আবার কখনো কখনো প্রাণী, উক্তিদ, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, ভাইরাস প্রভৃতির কোনো সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে একসাথে বিশ্লেষণ করার দরকার হয়, তখন আর জীবের ধরনভিত্তিক শাখা লাগসহ হয় না। তাই প্রয়োজনের তাগিদে ১২ জীববিজ্ঞান এখন বহুসংখ্যক শাখায় বিভক্ত হয়েছে। জ্ঞানের প্রায় প্রতিটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত শাখাগুলোকে ১৩ ভৌত বা মৌলিক এবং ফলিত এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। জীববিজ্ঞানও তার ব্যতিক্রম নয়।

ভৌত শাখা বলতে সেসব শাখা বোঝানো হয়, যেখানে তার তাত্ত্বিক ভিত্তি অনুসন্ধান করাটা প্রয়োগ-সংক্রান্ত দিকের তুলনায় বেশি গুরুত্ব পায়। আর যেখানে প্রয়োগটাই বড়, সেটা হচ্ছে ফলিত শাখা।

1.2.1 ভৌত জীববিজ্ঞান

ভৌত জীববিজ্ঞান শাখায় তত্ত্বীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে। এতে সাধারণত নিচে উল্লিখিত বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়:

- (a) **অঙ্গসংস্থান (Morphology):** জীবের সার্বিক অঙ্গসংস্থানিক বা দৈহিক গঠন বর্ণনা এ শাখার আলোচ্য বিষয়। দেহের বাহ্যিক বর্ণনার বিষয়কে বহিঃ অঙ্গসংস্থান (External Morphology) এবং দেহের অভ্যন্তরীণ বর্ণনার বিষয়কে অন্তঃ অঙ্গসংস্থান (Internal Morphology) বলা হয়।
- (b) **শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যা বা ট্যাক্স়োনমি (Taxonomy):** জীবের শ্রেণিবিন্যাস এবং তার রীতিনীতিগুলো এ শাখার আলোচিত বিষয়।
- (c) **শারীরবিদ্যা (Physiology):** জীবদেহের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জৈবরাসায়নিক কার্যাদি, যেমন: শ্বসন, রেচন, সালোকসংশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয় এ শাখায় আলোচিত হয়। এছাড়া জীবের যাবতীয় শারীরবৃত্তীয় কাজের বিবরণ এ শাখায় পাওয়া যায়।
- (d) **হিস্টোলজি (Histology):** জীবদেহের টিস্যুসমূহের গঠন, বিন্যাস এবং কার্যাবলি এ শাখায় আলোচনা করা হয়।
- (e) **ভূগোলবিদ্যা (Embryology):** জনন কোষের উৎপত্তি, নিষিক্ত জাইগোট থেকে ভূগের সৃষ্টি, গঠন, পরিস্ফুটন, বিকাশ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা এ শাখার প্রধান বিষয়।
- (f) **কোষবিদ্যা (Cytology):** জীবদেহের কোষের গঠন, কার্যাবলি ও বিভাজন সম্পর্কে যাবতীয় আলোচনা এ শাখার বিষয়।
- (g) **বংশগতিবিদ্যা বা জেনেটিক্স (Genetics):** জিন ও জীবের বংশগতিধারা সম্পর্কে এ শাখায় আলোচনা করা হয়।
- (h) **বিবর্তনবিদ্যা (Evolution):** পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ, জীবের বিবর্তন এবং ক্রমবিকাশের তথ্যসমূহের আলোচনা এ শাখার বিষয়।
- (i) **বাস্তুবিদ্যা (Ecology):** এ শাখায় প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে জীবের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়।
- (j) **এন্ডোক্রিনোলজি (Endocrinology):** জীবদেহে হরমোনের (hormone) কার্যকারিতা বিষয়ক আলোচনা এ শাখার বিষয়।
- (k) **জীবভূগোল (Biogeography):** এ শাখায় পৃথিবীর বিভিন্ন ভৌগোলিক সীমারেখায় জীবের বিস্তৃতি

এবং অভিযোজন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। জীবের ভৌগোলিক বিস্তারের সাথে ভূমণ্ডলের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কিত বিদ্যা।

১.২.২ ফলিত জীববিজ্ঞান

এ শাখায় রয়েছে জীবন-সংশ্লিষ্ট প্রায়োগিক বিষয়গুলো। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শাখার কথা নিচে উল্লেখ করা হলো:

- (a) **জীবাশ্বিজ্ঞান (Palaeontology):** প্রাগৈতিহাসিক জীবের বিবরণ এবং জীবাশ্ব সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
- (b) **জীবপরিসংখ্যানবিদ্যা (Biostatistics):** জীবপরিসংখ্যান-বিষয়ক বিজ্ঞান।
- (c) **পরজীবীবিদ্যা (Parasitology):** পরজীবী জীবের জীবনপ্রণালি এবং রোগ সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
- (d) **মৎস্যবিজ্ঞান (Fisheries):** মাছ, মাছ উৎপাদন, মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
- (e) **কীটতত্ত্ব (Entomology):** কীটপতঙ্গের জীবন, উপকারিতা, অপকারিতা, ক্ষয়ক্ষতি, দমন ইত্যাদি সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
- (f) **অণুজীববিজ্ঞান (Microbiology):** ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, আণুবীক্ষণিক ছত্রাক এবং অন্যান্য অণুজীব সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
- (g) **কৃষিবিজ্ঞান (Agriculture):** কৃষিবিষয়ক বিজ্ঞান।
- (h) **চিকিৎসাবিজ্ঞান (Medical Science):** মানবদেহ, রোগ, চিকিৎসা ইত্যাদি সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
- (i) **জিনপ্রযুক্তি (Genetic Engineering):** জিনপ্রযুক্তি ও এর ব্যবহার সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
- (j) **প্রাণরসায়ন (Biochemistry):** জীবের প্রাণরাসায়নিক কার্যপ্রণালি, রোগ ইত্যাদি সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
- (k) **পরিবেশবিজ্ঞান (Environmental Science):** পরিবেশ সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
- (l) **সামুদ্রিক জীববিজ্ঞান (Marine Biology):** সামুদ্রিক জীব সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
- (m) **বনবিজ্ঞান (Forestry):** বন, বন সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
- (n) **জীবপ্রযুক্তি (Biotechnology):** মানব এবং পরিবেশের কল্যাণে জীব ব্যবহারের প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
- (o) **ফার্মেসি (Pharmacy):** ঔষধশিল্প ও প্রযুক্তিবিষয়ক বিজ্ঞান।
- (p) **বন্য প্রাণিবিদ্যা (Wildlife):** বন্যপ্রাণী বিষয়ক বিজ্ঞান।
- (q) **বায়োইনফরমেটিকস্ (Bioinformatics):** কম্পিউটার প্রযুক্তিনির্ভর জীববিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য, যেমন ক্যাল্সার বিশ্লেষণ বিষয়ক বিজ্ঞান।



একক কাজ

কাজ : নিচের চিহ্নটি দেখে কোনটি জীববিজ্ঞানের কোন শাখার অন্তর্ভুক্ত তার একটি তালিকা তৈরি করে প্রেরিতে উপর্যুক্ত কর।



চিত্র 1.01: জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উদাহরণ



একক কাজ

কাজ: দৈনিক পরিকার প্রকল্পিত জীববিজ্ঞানের খবর থেকে জীববিজ্ঞানের শাখার তালিকা তৈরি।

ধর্মোচনীর উপর্যুক্ত: দৈনিক সংবাদপত্র/সাময়িকী, কাটি/কাটাৰ, আঠা, আর্টসেপ্টাৰ, সাইনপেন।

শক্তি : ৩-৫ জনের ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে থাণ।

দৈনিক পরিকাৰ বা সাময়িকী থেকে প্রতিটি দল একটি করে খবর খুঁজে বের কৰবে মেখানে জীববিজ্ঞানের একাধিক শাখার সম্পৃক্ততা রয়েছে এবং সেই খবরের সাথে সংলগ্ন জীববিজ্ঞানের তৌত এবং কলিত শাখার তালিকা কৰবে। তাৰপৰ আট পেপারে খবরটিৱ পেপাৰ কাটিং আঠা দিয়ে লাগিয়ে তার পাশে বা নিচে সাইনপেন দিয়ে শাখাপুলোৱ সেই তালিকা লিখে প্রদর্শন কৰবে।

1.3 জীবেৰ ব্রেণ্টিভিল্যাস

আজ পৰ্যন্ত বিভিন্ন উত্তিদেৱ প্রায় চার দশ এবং প্রাপ্তিৰ প্রায় তেৱে শক্ত প্রজাতিৰ সামৰণ্য ও বৰ্ণনা কৰা হয়েছে। তবে এ সংখ্যা চূড়ান্ত নহ, কেননা প্রায় প্রতিদিনই আৱণও নতুন নতুন প্রজাতিৰ বৰ্ণনা সংযুক্ত হচ্ছে। অনুমান কৰা হয়, ভবিষ্যতে সব জীবেৰ বৰ্ণনা শেষ হলৈ (যদি সংজ্ঞা কখনো শেষ কৰা যায়) ১০ এৰ সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় এক কোটিতে। জ্ঞান, বোৰা এবং শেখাৰ সুবিধাৰ জন্য এই অসংখ্য জীবকে

সুষ্ঠুভাবে বিন্যাস করা বা সাজানোর প্রয়োজন। জীবজগৎকে একটি স্বাভাবিক নিয়মে প্রেপিবিন্যাস করার প্রয়োজনীয়তা অবশ্য অনেক আগে থেকেই প্রকৃতিবিদগণ অনুভব করেছিলেন। সেই প্রয়োজনের তালিদেই জীববিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা গড়ে উঠেছে, যার নাম ট্যাক্সোনমি বা প্রেপিবিন্যাসবিদ্যা। প্রেপিবিন্যাসের লক্ষ্য মূলত একটাই। তা হচ্ছে এই বিশাল এবং বৈচিত্র্যময় জীবজগৎকে সহজভাবে অল্প গুরিয়ে এবং অল্প সময়ে সঠিকভাবে জানা।

প্রেপিবিন্যাসে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন সুইডিস প্রকৃতিবিদ ক্যারোলাস লিনিয়াস (1707-1778)। 1735 সালে আপসালা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিপ্লি লাতের পর তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানাটমির অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন। বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ, বিশেষ করে ফুল সংগ্রহ আর জীবের প্রেপিবিন্যাসে তার অনেক আবশ্যিক ছিল। তিনিই প্রথম জীবের পূর্ণ প্রেপিবিন্যাসের এবং নামকরণের ডিপ্লি প্রবর্তন করেন। অসংখ্য নমুনা জীবের বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করে তিনি জীবজগৎকে দুটি ভাগে, যথা উদ্ভিদজগৎ এবং প্রাণিজগৎ হিসেবে বিন্যস্ত করেন।

প্রেপিবিন্যাসের উদ্দেশ্য

প্রেপিবিন্যাসের উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি জীবের দল ও উপদল সমষ্টি জান আহরণ করা। জীবজগতের জিনিতার দিকে আলোকপাত করে আহরিত জ্ঞানকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা, পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানকে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা এবং প্রতিটি জীবকে শনাক্ত করে তার নামকরণের ব্যবস্থা করা, সর্বোপরি জীবজগৎ এবং মানবকল্পাধৈ প্রয়োজনীয় জীবগুলোকে শনাক্ত করে তাদের সংরক্ষণে সচেতন হওয়া।

জীবজগৎ

ক্যারোলাস লিনিয়াসের সময়কাল থেকে
শুরু করে বিশ্ব প্রতার্কীর মানবামৃতি সময়
পর্যন্ত জীবজগৎকে উদ্ভিদজগৎ এবং
প্রাণিজগৎ হিসেবে বিবেচনা করে দুটি রাজ্য
(Kingdom) প্রেপিবিন্যাস করা হচ্ছে।
বিজ্ঞানের অগ্রাধীন বর্তমানে কোষের DNA
এবং RNA-এর অক্সারেনে, জীবদেহে কোষের
বৈশিষ্ট্য, কোষের সংখ্যা ও খাদ্যাভ্যাসের
ভাষ্য-উপায়ের উপর ভিত্তি করে আর. এইচ.
হুইটেকার (R. H. Whittaker) 1969 সালে
জীবজগৎকে পাঁচটি রাজ্য বা কাইড ক্লিডমে
(Five Kingdom) ভাগ করার প্রস্তাব



করেন। পরবর্তীকালে মারগুলিস (Margulis) 1974 সালে Whittaker-এর শ্রেণিবিন্যাসের পরিবর্তিত ও বিস্তারিত রূপ দেন। তিনি সমস্ত জীবজগতকে দুটি সুপার ক্লিন্ডেমে ভাগ করেন এবং পাঁচটি রাজ্যকে এই দুটি সুপার ক্লিন্ডেমের আওতাভুক্ত করেন।

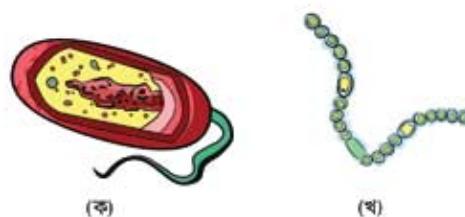
(a) সুপার ক্লিন্ডেম ১

প্রোক্যারিওটা (Prokaryotae): এরা আদিকোষ (নিউক্লিয়াস সুগঠিত নয়) বিশিষ্ট এককোষী, আধুনিকশিক জীব।

(i) রাজ্য 1: মনেরা (Monera)

বৈশিষ্ট্য: এরা এককোষী, ফিলামেন্টাস (একটির পর একটি কোষ লম্বালভিত্তাবে সৃষ্টি হয়ে ফিলামেন্ট পঢ়ল করে), কলোনিয়াল। কোষে ক্রোমাটিন বশ্তু থাকে কিন্তু নিউক্লিয়াস ও নিউক্লিয়ার পর্দা নেই। অন্যের কোষে প্লাস্টিক, মাইটোকল্টিয়া, এণ্ডোপ্লাজমিক জালিকা ইত্যাদি নেই, কিন্তু রাইবোজোম আছে। কোষ বিভাজন বিভাজন প্রক্রিয়ায় সক্ষম হয়। প্রথমত শোষণ পদ্ধতিতে খাস্তগ্রহণ করে। তবে কেউ কেউ ফটোসিনলথেসিস বা সালোকসংস্ক্রেষণ পদ্ধতিতে খাস্ত প্রস্তুত করে।

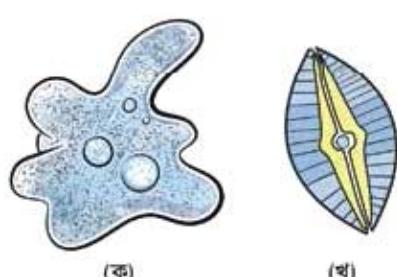
উদাহরণ: নীলাভ সবুজ শৈবাল, ব্যাকটেরিয়া।



চিত্র 1.02: (ক) ব্যাকটেরিয়া,
(খ) Nostoc (নীলাভ সবুজ শৈবাল)

(b) সুপার ক্লিন্ডেম ২

ইউক্যারিওটা (Eukaryota): এরা অকৃতকোষ (নিউক্লিয়াস সুগঠিত) বিশিষ্ট এককোষী বা বহুকোষী জীব। এরা এককভাবে অথবা কলোনি আকারে দলবদ্ধভাবে বসবাস করে।



চিত্র 1.03: (ক) অ্যামিবা
(খ) ডায়াটিম (এককোষী শৈবাল)

(i) রাজ্য-2: প্রোটিস্টা (Protista)

বৈশিষ্ট্য: এগুলো এককোষী বা বহুকোষী, একক বা কলোনিয়াল (দলবদ্ধ) বা ফিলামেন্টাস এবং সুগঠিত নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট। কোষে ক্রোমাটিন বশ্তু নিউক্লিয়ার পর্দা থাকা পরিবৃক্ত থাকে। ক্রোমাটিন বশ্তুতে DNA, RNA এবং প্রোটিন থাকে। কোষে সকল ধরনের অঙ্গাশ থাকে। খাস্তগ্রহণ শোষণ, শ্রেণী বা ফটোসিনলথেটিক পদ্ধতিতে ঘটে। মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাঝ্যমে অঙ্গোন প্রজনন ঘটে।

এবং কনক্ষুগোশলের মাধ্যমে অর্ধাং জৈবনিকতাবে তিনি কিন্তু পঠনগতভাবে এক, অবৃপ্ত সুটি শ্যামেটের বিলনের মাধ্যমে বৌন প্রজনন ঘটে। কোনো ভূপ পঠিত হয় না।

উদাহরণ: অ্যামিবা, প্যারামেসিয়াম, এককোষী ও বহুকোষী শৈবাল।

(II) গাঁথ ৩: ফানজাই (Fungi)

বৈশিষ্ট্য: অধিকাংশই স্থলজ, যুক্তজীবী বা পরজীবী।
সেহ এককোষী অথবা মাইসেলিয়াম (সরু সূতার মতো
অংশ) দিয়ে পঠিত। এগুলোর নিউক্লিয়াস সুপঠিত।
কোষপ্রাচীর কাইটিন বস্তু দিয়ে পঠিত। আদৃতহণ
শোষণ পদ্ধতিতে ঘটে। ক্লোরোফ্লাস্ট অনুপস্থিত।
হাঁপ্রয়োজ স্পোর দিয়ে বংশবৃদ্ধি ঘটে।

উদাহরণ: ইস্ট, *Penicillium*, মাশবূম ইত্যাদি।



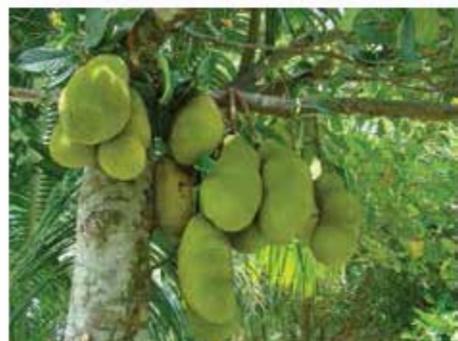
চিত্র 1.04: (ক) *Penicillium* (খ) মাশবূম

(III) গাঁথ ৪: প্লান্ট (Plantae)

বৈশিষ্ট্য: এরা অকৃত নিউক্লিয়াসযুক্ত সালোকসংশ্লেষণকারী
উদ্ভিদ। এদের দেহে উন্নত টিস্যুতত্ত্ব বিস্তারান। এদের
ভূগ সূচি হয় এবং তা থেকে ডিপ্লোড পর্যায় শুরু হয়।
প্রধানত স্থলজ, তবে অসংখ্য জলজ প্রজাতি আছে।
এদের বৌন জনন অ্যানাইলোগ্যামাস (anisogamous)
অর্ধাং আকার, আকৃতি অথবা শারীরবৃত্তীয় পার্থক্যবিশিষ্ট
তিনিখন্দী সুটি শ্যামেটের বিলনের মাধ্যমে বৌন জনন
সম্ভব হয়। এরা আর্কিপোনিয়োট অর্ধাং আর্কিপোনিয়াম
বা ক্রীজন অভিবিষ্ট উদ্ভিদ। এরা সপুষ্পক।

উদাহরণ: উন্নত সবুজ উদ্ভিদ।

প্লান্টের বিভাগগুলো হকের মাধ্যমে দেখানো হলো :



চিত্র 1.05: কাঠাল গাছ (আবৃতবীজী উদ্ভিদ)



(iv) ক্লাস ৫: অ্যানিমেলিয়া (Animalia)

বৈশিষ্ট্য: এরা নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট ও বহুকোষী প্রাণী। এদের কোষে কোনো জড় কোষথাতীর, প্লাস্টিড ও কোষগঠন নেই। প্লাস্টিড না থাকায় এরা হেটারোট্রফিক অর্থাৎ প্রয়োজী এবং খাদ্য প্রাপ্তকরণ করে, সেহে জটিল চিল্ড্রেন বিন্দমান। এরা প্রধানত ঘোল জননের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে। পরিষত ডিপ্লয়েড পুরুষ এবং ছী প্রাণীর জননক্ষম থেকে হ্যাল্ফেড গ্যামেট উৎপন্ন হয়। আপ বিকাশকালীন সময়ে ভূগীয় স্তর সৃষ্টি হয়।



চিত্র ১.০৬: রংমেল খেলাল টাইগার

উদাহরণ: প্রোটোজোয়া ব্যক্তিত সকল অমেরুদণ্ডী এবং মেরুদণ্ডী প্রাণী।

২০০৪ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের টমাস কেভলিয়ার-স্মিথ (Thomas Cavalier-Smith) জীবজগতের প্রোটিস্টকে প্রোটোজোয়া (Protozoa) এবং ক্রোমিস্টা (Chromista) নামে দুটি ভাগে ভাগ করেন এবং মনেরাকে ব্যাকটেরিয়া রাখ্য হিসেবে পুনঃ নামকরণ করেন। এভাবে তিনি জীবজগতকে মোট ছয়টি রাখ্যে ভাগ করেছেন। এ বিষয়ে তোমরা উপরের প্রেপিতে আরও বিস্তারিত জানবে। এখানে বিভিন্ন রাখ্যের প্রাণীগুলোর বে বৈশিষ্ট্যসমূহের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে, তোমরা এই বইটি পড়ার সময়ে পরবর্তী অধ্যায়ে সেগুলোর সাথে থীরে থীরে পরিচিত হবে।

১.৪ প্রেপিবিন্যাসের বিভিন্ন ধাপ

প্রেপিবিন্যাসের প্রতিটি ধাপে তার আগের ধাপের বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে সঙ্গে সঙ্গে কিছু বৈশিষ্ট্য যোগ হয়। যত উপরের ধাপ, তার অন্তর্ভুক্ত বৈশিষ্টের সংখ্যা তত কম এবং অন্তর্ভুক্ত জীবের সংখ্যা তত বেশি। আবার যত নিচের ধাপ, তার অন্তর্ভুক্ত বৈশিষ্টের সংখ্যা তত বেশি এবং অন্তর্ভুক্ত জীবের সংখ্যা তত কম। একটি জীবকে প্রজাতি পর্যায়ে বিন্যাসে মূলত আন্তর্জাতিক কোড চিহ্নিত সাংগঠি ধাপ আছে।

রাজ্য (Kingdom)

পর্য (Phylum)/ বিভাগ (Division)

প্রেপি (Class)

বর্গ (Order)

গোত্র (Family)

গণ (Genus)

প্রজাতি (Species)

উপরের ধাপ যেন বড় একটা সেট আর তার নিচের ধাপ হলো তার উপসেট। রাজ্যের উপসেট হলো পর্ব, পর্বের উপসেট হলো শ্রেণি, শ্রেণির উপসেট হলো বর্গ... ইত্যাদি। শ্রেণিবিন্যাসের এই পদ্ধতিকে বলে নেস্টেড হায়ারার্কি (nested hierarchy)। অনেক সময় পুনরাবৃত্তি এড়ানোর জন্য আগের ধাপের যেসব বৈশিষ্ট্য পরের ধাপেও থাকে, সেগুলো উহ্য রাখা হয়। সেভাবে লিখলে মানুষের (*Homo sapiens*) শ্রেণিবিন্যাস হবে এরকম:

রাজ্য (Kingdom): Animalia; কারণ,

সুকেন্দ্রিক কোষবিশিষ্ট, বহুকোষী,

পরভোজী এবং জটিল টিসুতত্ত্ব আছে।

পর্ব (Phylum): Chordata; কারণ,

জীবনের কোনো এক পর্যায়ে নটোকর্ড থাকে।

শ্রেণি (Class): Mammalia; কারণ,

বাচ্চাকে ঝুকের দুধ খাওয়ায় এবং

লোম/চুল আছে।

বর্গ (Order): Primate; কারণ,

আঁকড়ে ধরার উপযোগী হাত এবং

ঘ্রাণ অপেক্ষা দৃষ্টিশক্তি বেশি উন্নত।

গোত্র (Family): Hominidae; কারণ,

শিম্পাঞ্জি, গরিলা, বানর প্রভৃতির সাথে সাদৃশ্য আছে।

গণ (Genus): Homo; কারণ,

দেহের অনুপাতে মস্তিষ্ক সবচেয়ে বড় এবং

খাড়াভাবে দুই পায়ে হাঁটতে পারে।

প্রজাতি (Species): *Homo sapiens*; কারণ,

চওড়া এবং খাড়া কপাল, খুলির হাড় *Homo* গণের অন্য প্রজাতির তুলনায় পাতলা এবং
বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে উন্নত।

কোনো প্রজাতিকে শ্রেণিবিন্যাসের কোন ধাপে কেন অন্তর্ভুক্ত করা হলো, তার কারণগুলো জীববিজ্ঞানের শিক্ষার্থী হিসেবে জেনে নিতে হয়, কারণ কোনো একটা প্রজাতির শ্রেণিবিন্যাস লেখার সবচেয়ে প্রচলিত রীতি এটাই, যেখানে আলাদা করে কারণগুলো লেখা হয় না।

১.৫ দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতি

একটি জীবের বৈজ্ঞানিক নাম দুটি অংশ বা পদ নিয়ে গঠিত হয়। প্রথম অংশটি তার গণের নাম এবং দ্বিতীয় অংশটি তার প্রজাতির নাম। যেমন গোল আলুর বৈজ্ঞানিক নাম *Solanum tuberosum*। এখানে *Solanum* গণ নাম এবং *tuberosum* প্রজাতির নাম বুঝায়, এরূপ দুটি পদ নিয়ে গঠিত নামকে দ্বিপদ নাম এবং নামকরণের প্রক্রিয়াকে দ্বিপদ নামকরণ (binomial nomenclature) পদ্ধতি বলে। দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতির লক্ষ্য একটাই, তা হচ্ছে এই বৈচিত্র্যময় জীবজগতের প্রতিটি জীবকে আলাদা নামে সঠিকভাবে জানা। আন্তর্জাতিকভাবে কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি মেনে জীবের বৈজ্ঞানিক নাম নির্ধারণ করা হয়। উক্তিদের নাম International Code of Botanical Nomenclature (ICBN) কর্তৃক এবং প্রাণীর নাম International Code of Zoological Nomenclature (ICZN) কর্তৃক স্বীকৃত নিয়মানুসারে হতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এই code পুষ্টকাকারে লিখিত একটি দলিল। নামকরণ ল্যাটিন শব্দে হওয়ায় কোনো জীবের বৈজ্ঞানিক নাম সারা বিশ্বে একই নামে পরিচিত হয়।

1753 সালে সুইডিশ বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস *Species plantarum* বইটি রচনা করেন। এই বইটি উক্তিদিবিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করে, কারণ এর প্রকাশনার মাধ্যমে তিনি দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতির প্রবর্তন করেন এবং গণ ও প্রজাতির সংজ্ঞা দেন। তিনিই প্রথম ঐ গ্রন্থে জীবের শ্রেণি, বর্গ, গণ এবং প্রজাতি ধাপগুলো ব্যবহার করেন। লিনিয়াসের এই দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতি নিঃসন্দেহে একটি চমৎকার উদ্ভাবন। এ পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিটি জীবের:

- নামকরণ ল্যাটিন ভাষায় কিংবা ল্যাটিন ভাষার মতো করে উপস্থাপন করতে হবে। (তরুণ প্রাণিবিজ্ঞানী সাজিদ আলী হাওলাদার সম্মতি নতুন প্রজাতির এক ব্যাঙ আবিষ্কার করেছেন, যা কেবল ঢাকায় পাওয়া যায়। ব্যাঙটির বৈজ্ঞানিক নামকরণ হয়েছে *Zakerana dhaka*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা কাজী জাকের হোসেনের প্রতি সম্মান দেখিয়ে এই গণের নাম জাকেরানা রাখা হয়েছে।)
- বৈজ্ঞানিক নামের দুটি অংশ থাকবে, প্রথম অংশটি গণ নাম এবং দ্বিতীয় অংশটি প্রজাতি নাম। যেমন: *Labeo rohita*। এটি বুই মাছের বৈজ্ঞানিক নাম, এখানে *Labeo* গণ এবং *rohita* প্রজাতিক পদ।
- জীবজগতের প্রতিটি বৈজ্ঞানিক নামকে অনন্য (unique) হতে হয়। কারণ, একই নাম দুটি পৃথক জীবের জন্য ব্যবহারের অনুমতি নেই।
- বৈজ্ঞানিক নামের প্রথম অংশের প্রথম অক্ষর বড় অক্ষর হবে, বাকি অক্ষরগুলো ছোট অক্ষর

হবে এবং দিতোষ অংশটির নাম ছেট অক্ষর দিয়ে লিখতে হবে।
যেমন- পিঙাগ *Allium cepa*, শিংহ *Panthera leo*।

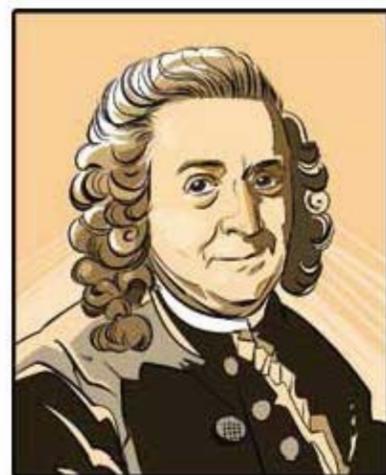
(e) বৈজ্ঞানিক নাম মুসলিমের সময় সর্বদা ইটালিক অক্ষরে লিখতে হবে। যেমন; ধান *Oryza sativa*, কাটল মাছ *Catla catla*।

(f) হাতে সেখাৰ সময় পণি ও প্রজাতিক নামেৰ নিচে আলাদা আলাদা দাগ দিতে হবে। যেমন: *Oryza sativa*, *Catla catla*।

(g) যদি কোৱেকজন বিজ্ঞানী একই জীবকে বিভিন্ন নামকৰণ কৰেন, তবে অগ্রাধিকাৰ আইন অনুস৾ৰে প্ৰথম বিজ্ঞানী কৰ্তৃক দৃষ্টিগত নামটি গৃহীত হবে।

(h) যিনি প্ৰথম কোনো জীবেৰ বিজ্ঞানসম্বন্ধ নাম দিবেন। তাৰ নাম থকালোৱা সাক্ষসহ উন্ন জীবেৰ বৈজ্ঞানিক নামেৰ শেষে সহকেপে সহযোজন কৰতে হবে। যেমন: *Homo sapiens L.*,¹⁷⁵⁸, *Oryza sativa L.*,¹⁷⁵³ (এখানে L লিনিয়াসেৰ নামেৰ সংক্ষিপ্ত রূপ, তবে দৈনন্দিন গবেষণা ও পাঠে এটুকু অনেক সময় লেখা হয় না)।

কোৱেকটি জীবেৰ বিপদ নাম:



চিত্ৰ 1.07: কারলোস লিনিয়াস

সাধাৰণ নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
ধান	<i>Oryza sativa</i>
পাট	<i>Croton capsularis</i>
আম	<i>Mangifera indica</i>
কাঁচল	<i>Artocarpus heterophyllus</i>
শাপলা	<i>Nymphaea nouchali</i>
জবা	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>
কলেজা জীবাণু	<i>Vibrio cholerae</i>
ম্যালেরিয়া জীবাণু	<i>Plasmodium vivax</i>
আগশোলা	<i>Periplaneta americana</i>
মৌমাছি	<i>Apis indica</i>
ইলিশ	<i>Tenuilosa ilisha</i>
কুলো ব্যাঙ	<i>Duttaphrynus melanostictus</i> (<i>Bufo melanostictus</i>)
দোয়েল	<i>Copsychus saularis</i>
ব্ৰহ্মল বেঙাল টাইগাৰ	<i>Panthera tigris</i>
মানুষ	<i>Homo sapiens</i>



একক কাজ

কাজ : মনে কর তুমি তোমার এলাকায় একটি নতুন প্রজাতির ফড়িৎ আবিষ্কার করেছ। তুমি এটিকে কী নাম দিবে? তোমার নামকরণের ঘোষিকভা ব্যাখ্যা কর।



অনুশীলনী



সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- জীববিজ্ঞান শিক্ষার পুরুষ কী?
- জীববিজ্ঞানের ভৌত শাখাগুলোর নাম লেখ।
- জীববিজ্ঞানের ফলিত শাখাগুলোর নাম লেখ।
- হিপদ নামকরণ পদ্ধতি কী?
- প্রেশিভিন্যাসের ধাপগুলো উল্লেখ কর।



অচলামূলক প্রশ্ন

- জীবের প্রেশিভিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা কী?



বন্ধুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জীববিজ্ঞানের কোন শাখার কীটপতঙ্গ দিয়ে আলোচনা করা হয়?

- | | |
|----------------|--------------------|
| ক. এন্টোমোলজি | খ. ইকোলজি |
| গ. একোফাইনোলজি | ঘ. মাইক্রোবায়োলজি |

২. প্রেপিলিয়াসের উদ্দেশ্য হলো-

- জীবের উপদল সম্পর্কে জ্ঞান
- জীবের এককের নামকরণ করতে পারা
- বিস্তারিতভাবে জ্ঞানকে উপস্থাপন করা

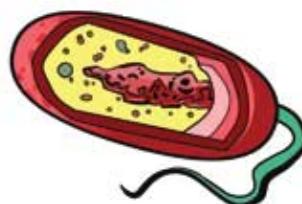
নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও iii | খ. i ও ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

গাণের উকীগুকুটি লক কর এবং ৩ ও ৪ নং ধাত্রের উচ্চর দাঁও।

৩. চিকিৎসা পদ্ধতি জীবটির নাম কী?

- | | |
|---------------------|-----------------|
| ক. অ্যামিবা | খ. ডায়াটম |
| গ. প্যারামেসিসিয়াম | ঘ. ব্যাকটেরিয়া |



৪. উকীগুকুটি পদ্ধতি জীবটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

- এরা চলনে সক্ষম
- এরা খাদ্য তৈরিতে অক্ষম
- জাতের নিউক্লিয়াস সুগঠিত

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |



সূজনশীল প্রশ্ন

১.



চিত্র- ১

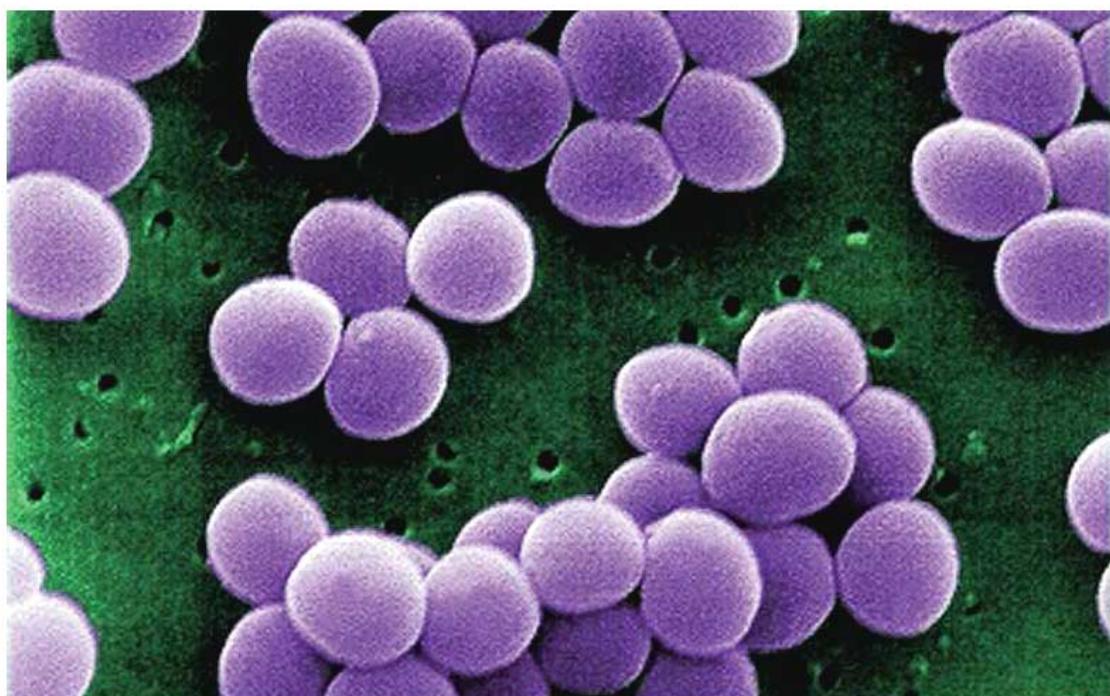


চিত্র- ২

- ক. শ্রেণিবিন্যাসের একক কী?
- খ. বংশগতিবিদ্যাকে জীববিজ্ঞানের তোত শাখা বলা হয় কেন?
- গ. চিত্র-২-এর উদ্ভিদটির নামকরণের ক্ষেত্রে কীভাবে ফুমি ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে প্রয়োজন করা।
- ঘ. চিত্র-১ এবং চিত্র-২-এর মধ্যে কোন জীবটি অধিক উদ্গত, কারণসহ বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবকোষ ও টিস্যু



আগের শ্রেণিতে তোমরা জীবকোষ সম্পর্কে ধারণা পেয়েছিলে। সেই সব ধারণার উপর ভিত্তি করে তোমরা এই অধ্যায়ে জীবকোষ সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানতে পারবে। সাধারণ অণুবীক্ষণ যত্নে দেখা একটি জীবকোষ আর ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যত্নে দেখা এই একই জীবকোষের গঠন কি এক রকম? এই অধ্যায়ে তোমরা এই ধরনের প্রশ্নগুলোর উত্তরগুলোও খুঁজে পাবে।



এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের শৈথান অঙ্গাধুর কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের ফুলনা করতে পারব।
- ঝালু, পেশি, রস্ত, ফুক এবং অন্থির কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে বিভিন্ন অকার কোষের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারব।
- জীবদেহে কোষের উপযোগিতা মূল্যায়ন করতে পারব।
- উদ্ভিদ টিস্যু ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাণি টিস্যু ব্যাখ্যা করতে পারব।
- একই রকম কোষ সমষ্টির ও একই কাজ সম্পাদ করার ভিত্তিতে টিস্যুর কাজ মূল্যায়ন করতে পারব।
- টিস্যু, অঙ্গ এবং তত্ত্বে কোষের সংগঠন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- টিস্যুতত্ত্বের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অঙ্গ ও অঙ্গতত্ত্বের ধারণা এবং গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদকোষ (পেরাজ) ও প্রাণিকোষ (গ্রোটোজোরা) পর্যবেক্ষণ করে চিহ্নিত চিহ্ন অঙ্কন করতে পারব।
- উদ্ভিদ ও প্রাণিটিস্যুর চিহ্ন অঙ্কন করে চিহ্নিত করতে পারব।
- সঠিকভাবে অণুবীক্ষণ যজ্ঞ ব্যবহার করতে পারব।
- জীবের নানা কার্যক্রমে কোষের অবদান অনুধাবন করতে পারব।

2.1 জীবকোষ

আগের শ্রেণিতে তোমরা জেনেছ যে জীবকোষ হচ্ছে জীবদেহের একক। এই জীবকোষ কী? কোনো কোনো বিজ্ঞানী জীবকোষকে জীবদেহের গঠন ও জীবজ ক্রিয়াকলাপের একক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। লোয়ি (Loewy) এবং সিকেভিজ (Siekevitz) 1969 সালে বৈশম্য ভেদ্য (selectively permeable) পর্দা দিয়ে আবৃত এবং জীবজ ক্রিয়াকলাপের একক যা অন্য সজীব মাধ্যম ছাড়াই নিজের প্রতিরূপ তৈরি করতে পারে, এমন সত্তাকে কোষ বলেছেন।

কোষের প্রকারভেদ

সকল জীবকোষ এক রকম নয়। এদের মধ্যে গঠনগত পার্থক্য যেমন আছে তেমনই আছে আকৃতি ও কাজের পার্থক্য। নিউক্লিয়াসের গঠনের ভিত্তিতে কোষ দুই ধরনের, আদি কোষ এবং প্রকৃত কোষ।

(a) আদিকোষ বা প্রাককেন্দ্রিক কোষ (Prokaryotic cell)

এ ধরনের কোষে কোনো সুগঠিত নিউক্লিয়াস (nucleus) থাকে না। এজন্য এদের আদি নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষও বলা হয়। এসব কোষের নিউক্লিয়াস কোনো পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে না, তাই নিউক্লিও-বস্তু সাইটোপ্লাজমে ছড়ানো থাকে। এসব কোষে মাইটোকন্ড্রিয়া, প্লাস্টিড, এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ইত্যাদি অঙ্গাণু থাকে না তবে রাইবোজোম থাকে। ক্রোমোজোমে কেবল DNA থাকে। নীলাভ সবুজ শৈবাল বা ব্যাকটেরিয়ায় এ ধরনের কোষ পাওয়া যায়।

(b) প্রকৃত কোষ বা সুকেন্দ্রিক কোষ (Eukaryotic cell)

এসব কোষের নিউক্লিয়াস সুগঠিত অর্থাৎ নিউক্লিয়ার বিল্লি (nuclear membrane) দিয়ে নিউক্লিও-বস্তু পরিবেষ্টিত ও সুসংগঠিত। এসব কোষে রাইবোজোমসহ সকল অঙ্গাণু উপস্থিত থাকে। ক্রোমোজোমে DNA, প্রোটিন, হিস্টোন এবং অন্যান্য উপাদান থাকে। অধিকাংশ জীবকোষ এ ধরনের হয়।

কাজের ভিত্তিতে প্রকৃত কোষ দুই ধরনের, দেহকোষ এবং জননকোষ।

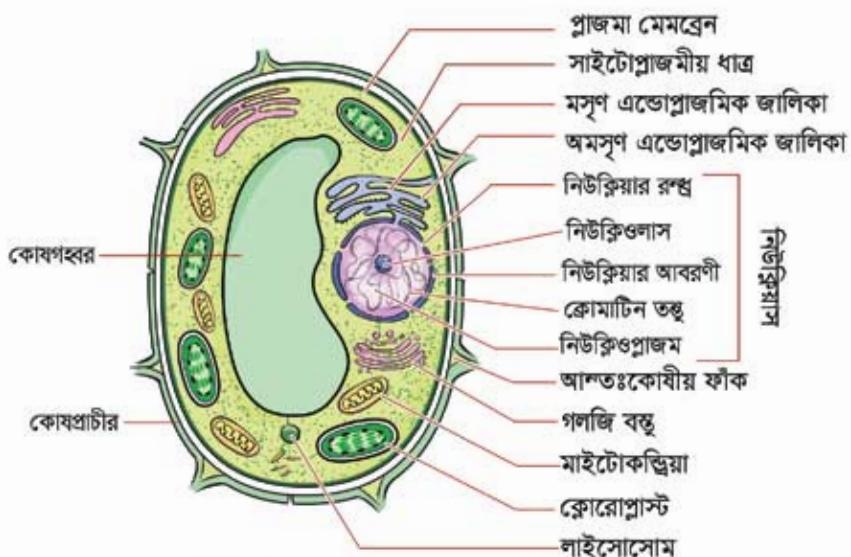
দেহকোষ (Somatic cell): বহুকোষী জীবের দেহ গঠনে এসব কোষ অংশগ্রহণ করে। মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভাজনের মাধ্যমে দেহকোষ বিভাজিত হয় এবং এভাবে দেহের বৃদ্ধি ঘটে। বিভিন্ন তন্ত্র ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠনে দেহকোষ অংশ নেয়।

জননকোষ (Gametic cell): যৌন প্রজনন ও জনঃক্রম দেখা যায়, এমন জীবে জননকোষ উৎপন্ন হয়। মিয়োসিস পদ্ধতিতে জনন মাতৃকোষের বিভাজন ঘটে এবং জনন কোষ উৎপন্ন হয়। অপত্য জননকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃজনন কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক থাকে। পুঁ ও স্ত্রী জননকোষ মিলিত

হয়ে নতুন জীবের দেহ পর্যবেক্ষণ সূচনা করে। পৃথি ও জী অভ্যন্তরীণের মিলনের ফলে সৃষ্টি এই প্রথম কোষটিকে জাইগোট (Zygote) বলে। জাইগোট বারবার বিভাজনের মাধ্যমে জীবদেহ গঠন করে।

২.২ উত্তিদ ও প্রাণিকোষের প্রধান অঙ্গাবস্থ এবং তাদের কাজ

উচ্চপ্রেৰিত উত্তিদ ও প্রাণীরা সকলেই প্রকৃত কোষ। প্রতিটি কোষ কতগুলো অঙ্গাবস্থ নিয়ে তৈরি হয়।



চিত্ৰ ২.০১: উত্তিদকোষের প্রধান অঙ্গাবস্থ



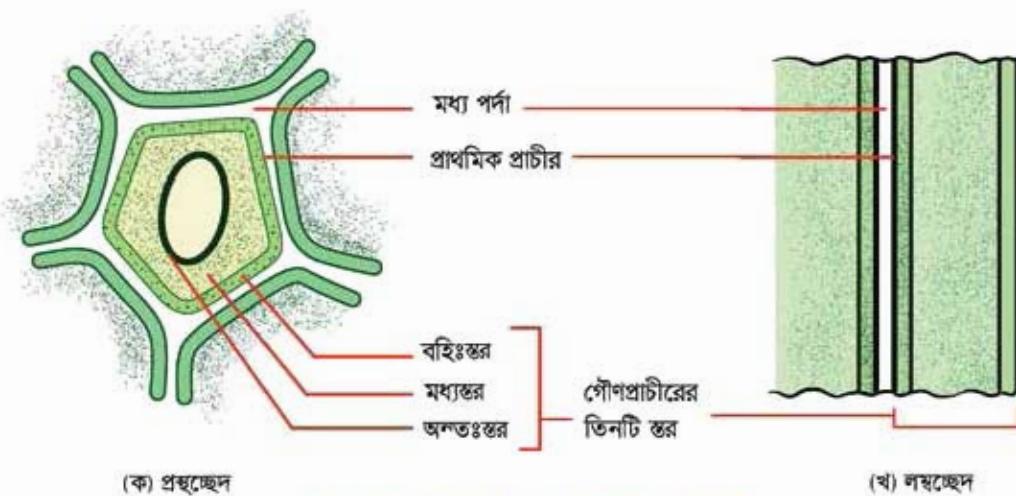
চিত্ৰ ২.০২: প্রাণিকোষের প্রধান অঙ্গাবস্থ

এসব অঙ্গান্তর অধিকাংশই উত্তিদ ও প্রাণী উভয়ের কোষে থাকলেও কিছু অঙ্গান্ত আছে, যা কেবল উত্তিদকোষে অথবা কেবল প্রাণিকোষে পাওয়া যায়।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যত্নে দেখা যায়, এমন কিছু কোষ অঙ্গান্ত সাথে এবাব আমরা পরিচিত হব।

কোষপ্রাচীর (cell wall)

কোষপ্রাচীর উত্তিদ কোষের একটি অন্যতম শুলুকশূর বৈশিষ্ট্য। এটি মৃত বা জড়বস্তু দিয়ে তৈরি। প্রাণিকোষে কোষপ্রাচীর থাকে না। কোষপ্রাচীরের রাসায়নিক গঠন বেশ জটিল, এতে সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ, লিগনিন, পেকটিন, সুবেরিন নামক রাসায়নিক পদার্থ থাকে। তবে ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীর প্রোটিন, লিপিড ও পলিস্যাকারাইড দিয়ে এবং ছ্যাকের কোষপ্রাচীর কাইটিন দিয়ে তৈরি। প্রাথমিক কোষপ্রাচীরটি একস্তরবিশিষ্ট। যথ্য পর্দার উপর প্রোটোপ্লাজম থেকে নিঃসৃত করেক ধরনের রাসায়নিক হ্রব্য জয়া হয়ে ক্রমশ গৌণপ্রাচীর সৃষ্টি হয়। এ প্রাচীরে যাবে যাবে ছিঁ থাকে, যাকে কূপ বলে। কোষপ্রাচীর কোষকে দৃঢ়ত্ব প্রদান করে, কোষের আকার ও আকৃতি বজায় রাখে। পাশের কোষের সাথে প্লাজমোডেজমাটা (আণুবীক্ষণিক নামি) সৃষ্টির মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং পানি ও খনিজ ত্বরণ চলাচল নিরাপদ করে।



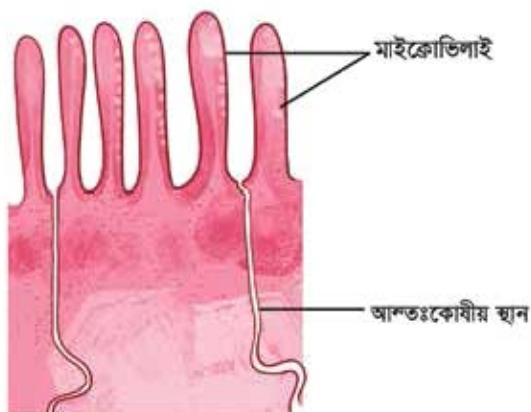
চিত্র ২.০৩: কোষপ্রাচীরের আণুবীক্ষণিক চিত্র

প্রোটোপ্লাজম

কোষের ভিতরে যে অর্ধবাহু, ধৰকথকে জেলির মতো বস্তু থাকে তাকে প্রোটোপ্লাজম বলে। কোষবিহীন দিয়ে ঘেরা সবকিছুই প্রোটোপ্লাজম, এমনকি কোষবিহীন নিজেও প্রোটোপ্লাজমের অংশ। কোষবিহীন ছাড়াও এখানে আছে সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গান্তগুলো এবং সিউক্রিয়াস।

২.২.১ কোষবিলম্বি (Plasmalemma)

প্রোটোপ্লাজমের বাইরে দুই স্তরের যে শিপিল্যাপক গর্দা থাকে, তাকে কোষবিলম্বি বা প্লাজমালেমা বলে। কোষবিলম্বির ভাঁজকে মাইক্রোভিলাই বলে। এটি প্রধানত লিপিড এবং প্রোটিন দিয়ে তৈরি। কোষবিলম্বি একটি বৈশম্যাত্মক পর্দা হওয়ায় অভিন্নবস্তের মাধ্যমে পানি ও খনিজ সবগুলি নিরুৎস্থ করে এবং পাশাপাশি কোষগুলোকে পরম্পরার থেকে আলাদা করে রাখে।



চিত্র ২.০৪: কোষবিলম্বি

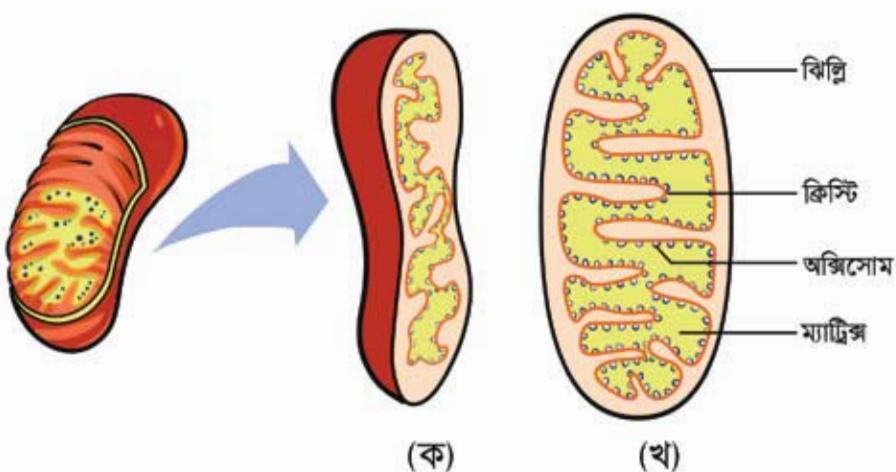
২.২.২ সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাশু (Cytoplasmic organelles)

প্রোটোপ্লাজম থেকে নিউক্লিয়াস বা কেলিকাটিকে সরিয়ে দিলে যে জেলির মতো বস্তুটি থেকে শায় সেটিই সাইটোপ্লাজম। এই সাইটোপ্লাজমের মধ্যে অনেক ধরনের অঙ্গাশু থাকে। এদের পাঁতেকের কাজ আলাদা হলেও একে অপরের উপর নির্ভরশীল। এই অঙ্গাশুগুলোর কোনো কোনোটি বিপিন্ন আবার কোনো কোনোটি বিলিবিহীন। অঙ্গাশুগুলো হচ্ছে:

বিপিন্ন সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাশু

(a) মাইটোকন্ড্রিয়া (Mitochondria)

শুসনে অংশপ্রথমকারী এ অঙ্গাশুটি 1898 সালে বেনডা (Benda) আবিষ্কার করেন। এটি দুই স্তরবিশিষ্ট আবরণী বা বিলি দিয়ে বেরা। ভিতরের স্তরটি ভিতরের দিকে ভাঁজ হয়ে থাকে। এদের ক্রিস্ট (cristae) বলে। ক্রিস্ট গায়ে বৃক্ষসূক্ষ্ম গোলাকার বস্তু থাকে, এদের অক্সিজেম (oxisomes) বলে। অক্সিজেমে উৎসেচকগুলো (enzymes) সাজানো থাকে। মাইটোকন্ড্রিয়নের ভিতরে থাকে ম্যাট্রিক্স (matrix)। জীবের শসনকার্যে সাহায্য করা মাইটোকন্ড্রিয়ার পাঁতান কাজ। তোমরা পরে দেখবে যে শসন ক্রিয়ার ধাপ চারটি; প্লাইকোলাইসিস, আসিটাইল কো-এ সৃষ্টি, ক্রেবস চক্র এবং ইলেক্ট্রন প্রবাহ তত্ত্ব। এর প্রথম



ଚିତ୍ର ୨.୦୫: (କ) ମାଇଟୋକଡ଼ିମା (ଖ) ଲସଯୁକ୍ତ

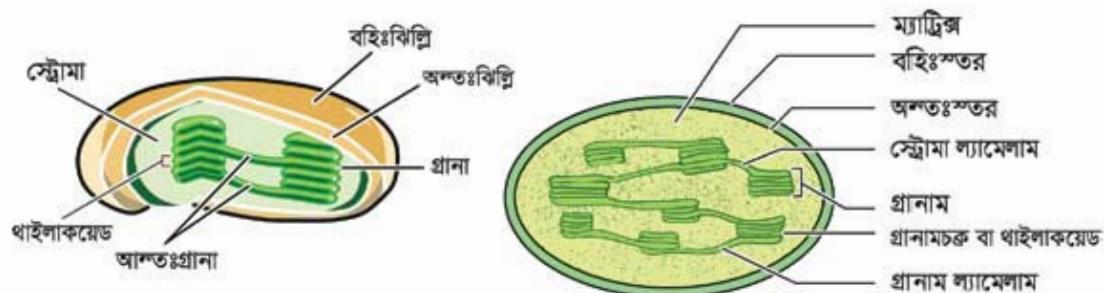
ধাপ (গ্রাইকোলাইসিসের বিক্রিয়াগুলো) মাইটোকল্টিওর ঘটে না। তবে বিটীয় এবং অত্যন্ত শুরুতপূর্ণ ধাপ ক্রেবস চক্রের বিক্রিয়াগুলো এই অঙ্গাধুর ঘটেই সম্ভব হয়। ক্রেবস চক্র অংশপ্রতিপক্ষারী সব উৎসেরক এতে উপস্থিত ধাকাগ্র এ বিক্রিয়াগুলো মাইটোকল্টিওতেই সম্ভব হয়। তোমরা দেখবে, ক্রেবস চক্র সবচেয়ে বেশি শক্তি উৎপাদিত হয়। অজন্য মাইটোকল্টিওকে কোথের ‘শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র’ বা ‘পাওয়ার হাউস’ বলা হয়। এই শক্তি জীব তার বিভিন্ন কাজে খরচ করে। কিন্তু ব্যক্তিগত ছাড়া সকল উত্তিদক্ষিয়ত ও প্রাণিকোষে মাইটোকল্টিও পাওয়া যায়।

ପ୍ରାକକେନ୍ତିକ କୋଷେ ମାଇଟୋକଲ୍ଲିଆ ଥାକେ ନା । ଏମନକି କିଛୁ ସୁକେନ୍ତିକ କୋଷେଓ (ଯେଉଁ: *Trichomonas*, *Monocercomonoides* ଇତ୍ୟାଦି ଶୋଟୋଜୋଯାଟେ) ମାଇଟୋକଲ୍ଲିଆ ଅନୁପର୍ଦ୍ଧିତ । ତାହଳେ ଏମନ କି ହତେ ଗାତ୍ରେ ଯେ ବିବତ୍ତନୀୟ ଇତିହାସେର କୋନୋ ଏକ ସମୟେ ସୁକେନ୍ତିକ କୋଷେର ଭିତର ମାଇଟୋକଲ୍ଲିଆ (କିମ୍ବା ତାର ପୂର୍ବସ୍ଵରୀ) ଚୁକେ ପଡ଼େଛିଲ ଏବଂ ତାରଗତ ସେହି ଲେଟି କୋଷେର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହସ୍ତେ ଗେଛେ? ଏଥିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚମା ତଥ୍ୟ-ଟପାନ୍ତ ସେହି ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟିଟି ଅନୁଯାନ କରା ହସ୍ତ ।

(b) प्लास्टिक (Plastic)

প্লাস্টিক উত্তিদ কোষের একটি পুরুষগুরূ অঙ্গাঙ্গ। প্লাস্টিডের প্রধান কাজ খাদ্য প্রস্তুত করা, খাদ্য সংরক্ষণ করা এবং উত্তিদেহকে বর্ষময় এবং আকর্ষণীয় করে পরাগায়নে সাহায্য করা। প্লাস্টিড ডিন ধরনের—ক্রোরোপ্লাস্ট, ক্রোমোপ্লাস্ট এবং সিউকোপ্লাস্ট।

(i) ক্লোরোপ্লাস্ট (Chloroplast): সবুজ রংতের প্লাস্টিডকে ক্লোরোপ্লাস্ট বলে। পাতা, কঠি কাণ্ড ও অন্যান্য সবুজ অংশে এদের পাওয়া যায়। প্লাস্টিডের আনা (grana) অংশ সূর্যোলোককে আবক্ষ করে রাসায়নিক প্রক্রিয়ে মুগান্তরিত করে। এই আবক্ষ সৌরশক্তি স্ট্রোমাতে (stroma) অবস্থিত উৎসেচক



চিত্র 2.06: একটি প্লাস্টিড কণা (খণ্ডিত)। ক্রোমোপ্লাস্টের বিভিন্ন অঙ্গ (ইলেক্ট্রন অপুরীকৃত বর্জন দেখা এবং সরলভাবে উপস্থাপিত।)

সমষ্টি, বাস্তু থেকে শৃঙ্খিত কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং কোষের পিতৃতরকার পানি ব্যবহার করে সরল শর্করা তৈরি করে। এই প্লাস্টিডে ক্লোরোফিল থাকে, তাই এদের সবুজ দেখায়। এছাড়া এতে ক্যারোটিনয়েড নামে এক ধরনের রঞ্জকও থাকে।

(ii) ক্রোমোপ্লাস্ট (Chromoplast): এগুলো রঙিন প্লাস্টিড তবে সবুজ নয়। এসব প্লাস্টিডে জ্যান্থকিল, ক্যারোটিন, ফাইকোএরিওচ্রিন, ফাইকোসায়ানিন ইত্যাদি রঞ্জক থাকে, তাই কোনোটিকে হলুদ, কোনোটিকে নীল আবার কোনোটিকে লাল দেখায়। এদের মিথেণজনিত কারণে ফুল, পাতা এবং উদ্ভিদের অন্যান্য অংশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠে। রঙিন ফুল, পাতা এবং পাজেরের মূলে এদের পাওয়া যায়। মূলকে আকর্ষণীয় করে পরাগায়নে সাহায্য করা এদের প্রধান কাজ। এরা বিভিন্ন ধরনের রঞ্জক পদার্থ সংপ্রচারণ করে জমা করে রাখে।

(iii) লিউকোপ্লাস্ট (Leucoplast): যেসব প্লাস্টিডে কোনো রঞ্জক পদার্থ থাকে না, তাদের লিউকোপ্লাস্ট বলে। যেসব কোষে সূর্যের আলো পেঁচায় না, বেমল মূল, ঝুঁট, জননকোষ ইত্যাদি সেধালে এদের পাওয়া যায়। এদের প্রধান কাজ খাদ্য সংরক্ষণ করা। আলোর সংশর্পণে এসে লিউকোপ্লাস্ট ক্রোমোপ্লাস্টে রূপান্তরিত হতে পারে।



একক কাজ

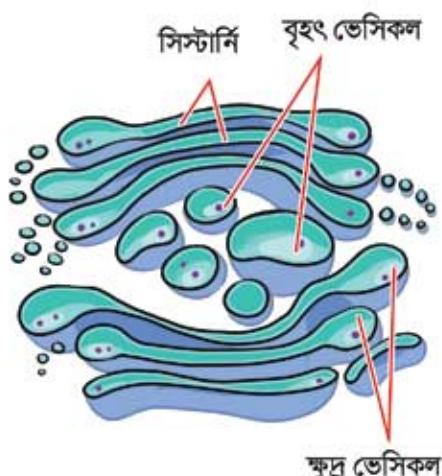
কাজ : প্লাস্টিডের চিত্র আঁকা।

উপকরণ : বিভিন্ন রকমের প্লাস্টিডের চিত্র, পোস্টার পেপার, সাইন পেন।

পদ্ধতি : বিভিন্ন রকমের প্লাস্টিডের চিত্র এঁকে বোর্ডে খুলিয়ে দাও এবং প্রেসিতে উপস্থাপন কর।

(c) গলজি বস্তু (Golgi body)

গলজি বস্তু (কিংবা গলগি বস্তু) অধিনত প্রাণিকোষে পাওয়া যায়, তবে অনেক উদ্ভিদকোষেও এসের দেখা যায়। এটি সিস্টামি ও কয়েক ধরনের ভেসিকল নিরে তৈরি। এর পর্যায় বিভিন্ন উৎসেচকের পানি বিনোজন সম্পর্ক হয়। জীবকোষে বিভিন্ন পদার্থ নিঃসৃতকরণের সাথে এর লিখিত সম্পর্ক রয়েছে। হরমোল নিঃসরণেও এর সূয়িকা লক্ষ করা যায়। কোনো কোনো বিপাকীয় কার্যের সাথেও এরা সম্পর্কিত এবং কখনো কখনো এরা প্রোটিন সংরক্ষ করে রাখে।



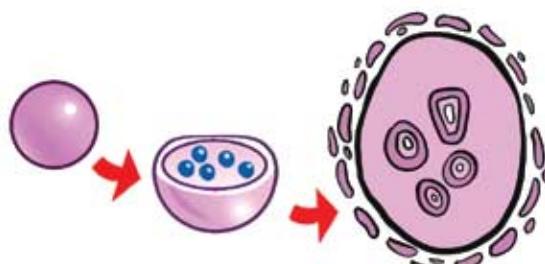
চিত্র 2.07: গলজি বস্তু

(d) এনডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (Endoplasmic reticulum)

এনডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এর আবরণীর পারে প্রায়ই রাইবোজোম দেখে থাকে, তাই স্বাভাবিকভাবেই এসব স্থানে প্রোটিন সংশ্লেষণের ঘটনা ঘটে। কোথে উৎপাদিত পদার্থগুলোর প্রবাহ পথ হিসেবে এনডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ব্যবহৃত হয়। এগুলো কখনো কখনো প্লাজমা মেম্ব্রেনের সাথে স্ফুর থাকে, তাই ধারণা করা হয় যে, এক কোষ থেকে অন্য কোষে উৎসেচক ও কোথে উৎপাদিত অন্যান্য মূলাদি এর মাধ্যমে চলাচল করে। মাইটোকন্ড্রিয়া, কোষগহর এগুলো সৃষ্টিতে এনডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গুরুত্বপূর্ণ সূয়িকা রয়েছে। উভিস এবং প্রাণী উভয় কোষেই এরা উপস্থিত থাকে।

(e) কোষগহর (Vacuole)

সাইটোপ্লাজমে কোষের মধ্যে যে আপাত ঝাঁকা স্থান দেখা যায়, সেগুলোই হচ্ছে কোষগহর। বহু কোষগহর উভিস কোষের বৈশিষ্ট্য। এর প্রধান কাজ কোষরস ধারণ করা। বিভিন্ন ধরনের অজ্ঞের লবণ, আমিষ, শর্করা, চর্বিজাতীয় পদার্থ, জৈব এসিড, রক্তক পদার্থ, পানি ইত্যাদি এই কোষগহরে থাকে। প্রাণিকোষে কোষগহরের সাধারণত অনুগম্ভিত থাকে, তবে যদি কখনো থাকে, তবে সেগুলো আকারে ছোট হয়।



চিত্র 2.08: লাইসোজোম কণা

(f) লাইসোজোম (Lysosome)

লাইসোজোম জীবকোষকে জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করে। এর উৎসেচক আগত

জীবাণুলোকে হজম করে ফেলে। এর পরিপাক করাৰ উৎসেচকগুলো একটি পর্দা দিয়ে আলাদা কৰা থাকে, তাই অন্যান্য অঙ্গাণু এৱং সংস্পর্শে এলেও হজম হয় না। সেহে অভিজনেৰ অভাৱ হলো বা বিভিন্ন কাৰণে সাইসোজোমেৰ পৰ্দা ক্ষতিগ্রস্ত হলো তখন এৱং আশেপাশেৰ অঙ্গাণুলো নষ্ট হয়ে থাক। কখনো কোৰটিই মাৰা থাক।

বিভিন্নিল সাইটোপ্লাজমাত অঙ্গাণু

(a) কোষকক্ষাল (Cytoskeleton)

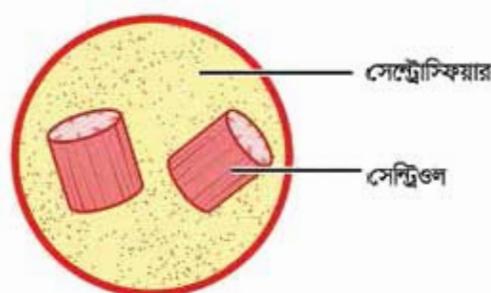
কোষবিহীন অতিক্রম কৰে কোষেৰ ভিতৰে চুকলে প্ৰথমেই কোষকক্ষাল নজৰে পড়বে। সেটি শৰী এবং মোটা-চিকন পিণিয়ে অসংখ্য দড়িৰ মতো বন্ধু বা কোষেৰ চাৰদিকে জালেৰ মতো ছড়িয়ে রয়েছে। কোষকক্ষাল ভিতৰ থেকে কোষটাকে খোৰে রাখে। অ্যাকটিন, মারোসিন, টিউবিউলিন ইত্যাদি প্ৰোটিন দিয়ে কোষকক্ষালেৰ বিভিন্ন ধৰনেৰ তন্তু নিৰ্মিত হয়। মাইক্ৰোটিভিউল, মাইক্ৰোফিলামেন্ট কিংবা ইন্টারিয়িডিয়েট কিলামেন্ট এ ধৰনেৰ তন্তুৰ জৰাহৰণ।

(b) রাইবোজোম (Ribosome)

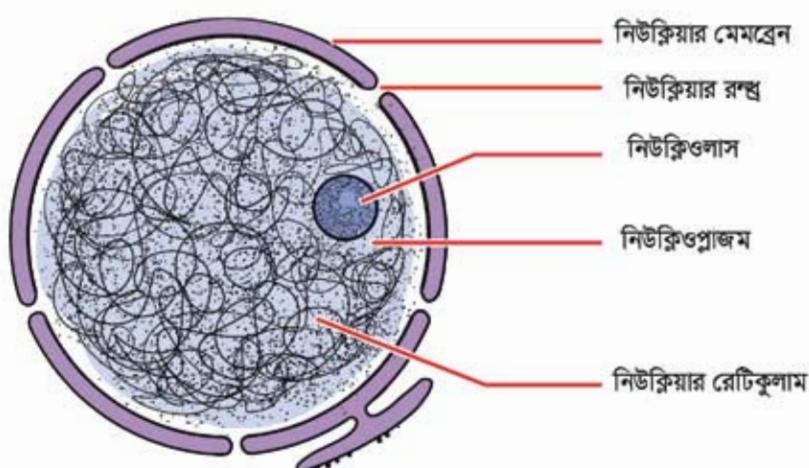
শাণী এবং উক্তি উভয় ধৰনেৰ কোৰেই এদেৱ পাওয়া থাক। এই বিভিন্নিল বা পৰ্দাবিহীন অঙ্গাণুটি প্ৰধানত প্ৰোটিন সংশ্লেষণে সাহায্য কৰে। প্ৰোটিনেৰ পলিপেপটাইড চেইন সংৰোজন এই রাইবোজোমে হয়ে থাকে। এছাড়া রাইবোজোম এ কাজে হামোজনীয় উৎসেচক সুৰক্ষাৎ কৰে থাকে। উৎসেচক বা এনজাইমেৰ কাজ হলো প্রাপ্তৰাসাম্নিক বিক্ৰিয়াৰ পতি বাঢ়িয়ে দেওয়া।

(c) সেন্ট্রোজোম (Centrosome)

এটি প্ৰাপ্তিকোষেৰ বৈশিষ্ট্য, প্ৰধানত প্ৰাপ্তিকোষে এদেৱ পাওয়া থাক। নিম্নোপিৰ উক্তি কোৰে কদাচিৎ এদেৱ দেখা থাক। প্ৰাপ্তিকোষেৰ নিউক্লিয়াসেৰ কাছে দুটি কাঁপা নলাকাৰ বা ম্যাকার অঙ্গাণু দেখা থাক, তাদেৱ সেন্ট্রিওল বলে। সেন্ট্রিওলেৰ চাৰপাশে অবস্থিত গাঢ় তন্তুকে সেন্ট্রোফিলাৰ এবং সেন্ট্রোফিলাসহ সেন্ট্রিওলকে সেন্ট্রোজোম বলে। সেন্ট্রোজোমে থাকা সেন্ট্রিওল কোষ বিভাজনেৰ সময় অ্যাস্টার রে তৈৱি কৰে। এছাড়া লিঙ্গল হচ্ছ সৃষ্টিতেও সেন্ট্রোজোমেৰ অবদান রয়েছে। বিভিন্ন ধৰনেৰ ক্লানেলা সৃষ্টিতে এতো অৰ্পণাহৰণ কৰে।



চিত্ৰ ২.০৯: সেন্ট্রোজোম



চিত্ৰ 2.10: নিউক্লিয়াস

2.2.3 নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রিকা (Nucleus)

জীবকোষের প্রোটোপ্লাজমে নির্মিত পর্যাপ্ত ক্রোমোজোম বহনকারী সূক্ষ্ম বৈ বস্তুটি সেখা যায় সেটিই হচ্ছে নিউক্লিয়াস। এর আকৃতি গোলাকার, ডিস্কাকার বা নলাকার। সিঙ্কড়োৰ এবং লোহিত রক্তকণিকার নিউক্লিয়াস থাকে না। নিউক্লিয়াসে বহুগতির বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে। এটি কোৰে সংৰক্ষিত বিপাকীৰ কাৰ্যাবলিসহ সব ক্রিয়া-বিক্রিয়া নিরূপণ কৰে। সুপষ্ঠিত নিউক্লিয়াসে নিচেৰ অংশগুলো সেখা যায়।

(a) নিউক্লিয়াসৰ খিলি (Nuclear membrane)

নিউক্লিয়াসকে ধৰে রাখে যে খিলি, তাকে নিউক্লিয়াসৰ খিলি বা কেন্দ্রিকা খিলি বলে। এটি দুই স্তৱ বিশিষ্ট। এই খিলি লিপিড ও প্রোটিনেৰ সমষ্টিয়ে তৈৰি হয়। এই খিলিতে ঘাবে ঘাবে কিছু ছিছ থাকে, যেগুলোকে নিউক্লিয়াসৰ রাশ্মি বলে। এই ছিছেৰ ক্ষেত্ৰ দিয়ে নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজমেৰ মধ্যে কিছু বস্তু চলাচল কৰে। নিউক্লিয়াসৰ খিলি সাইটোপ্লাজম থেকে নিউক্লিয়াসেৰ অন্তান্ত বস্তুকে পৃথক রাখে এবং বিভিন্ন বস্তুৰ চলাচল নিৰীক্ষণ কৰে।

(b) নিউক্লিওপ্লাজম (Nucleoplasm)

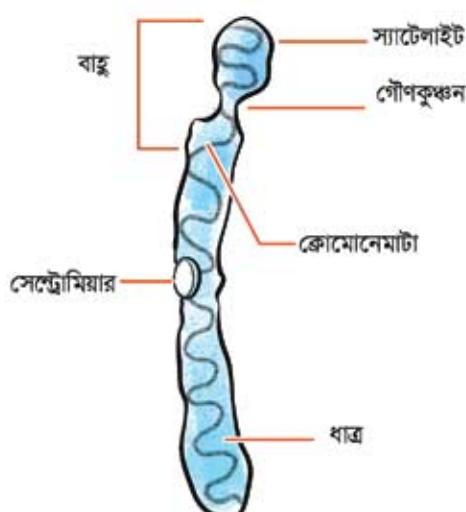
নিউক্লিয়াসৰ খিলিৰ ভিতৰে জেলিৰ মতো বস্তু বা রস থাকে। একে কেন্দ্রিকারস বা নিউক্লিওপ্লাজম বলে। নিউক্লিওপ্লাজমে নিউক্লিক এসিড, প্রোটিন, উৎসোচক ও কতিপয় অনিজ লবণ থাকে।

(c) নিউক্লিওলাস (Nucleolus)

নিউক্লিওপ্লাজমেৰ মধ্যে ক্রোমোজোমেৰ সাথে সংলগ্ন গোলাকার বস্তুকে নিউক্লিওলাস বা কেন্দ্রিকালু বলে। ক্রোমোজোমেৰ বৃত্তান্তাবৃত্তি অংশেৰ সাথে এৱা লেগে থাকে। এৱা RNA ও প্রোটিন দিয়ে তৈৰি হয়। এৱা রাইবোজোম সংজ্ঞেৰণ কৰে।

(d) ক্রোমাটিন জালিকা (Chromatin reticulum)

কোষের বিভিন্নকালে অর্ধাং বর্থন কোষ বিভাজন চলে না, তখন নিউক্লিয়াসে কৃতৃপক্ষ পাকানো সূক্ষ্ম সূতার মতো অংশই হচ্ছে ক্রোমাটিন জালিকা বা নিউক্লিয়াস রেটিকুলাম। কোষ বিভাজনের সময় এরা মোটা এবং খাটো হয়, তাই তখন তাদের আলাদা আলাদা ক্রোমোজোম হিসেবে দেখা যায়। ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিলগুলো বৎশগতির গুণাবলি বহন করে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্ম নিয়ে আয়। কোনো একটি জীবের ক্রোমোজোম সংখ্যা ঐ জীবের জন্য নির্দিষ্ট। এসব ক্রোমোজোমে বৎশধারা বহনকারী জিল (gene) অবস্থান করে এবং বৎশের বৈশিষ্ট্য বৎশগতিগুলো বহন করা ক্রোমোজোমের কাজ।



চিত্র ২.১১: ক্রোমোজোম



একক কাজ

কাজ: এখানে আলোচিত কোষের বিভিন্ন অঙ্গগুরু প্রেরণিভাবে একটি চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন কর।

২.৩ উত্তিদ ও প্রাণীর কাজ পরিচালনায় বিভিন্ন প্রকার কোষের ভূমিকা

কোষ জীবদেহের (উত্তিদ ও প্রাণী) পঠনের একক। এককোষী ও বহুকোষী প্রাণীদের কোষের কাজ তিনি তিনভাবে পরিচালিত হয়। পৃথিবীর আদি প্রাণের আবির্ভাবের প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত এককোষী প্রাণী হোটোজোৱা পর্বের অজাতিশুলো তাদের মেহের সব ধরনের ফ্রিমার্কলাপ—যেমন খাদ্যাশৃঙ্খল, মেহের বৃদ্ধি ও থেজন ঐ একটি কোষের মাধ্যমেই সম্পন্ন করে থাকে। বহুকোষী প্রাণীদের মেহকোষের মাঝে তিনিভাবে আছে, আছে বৈচিত্র্য।

২.৩.১ উত্তিদ টিস্যু (Plant tissue)

একই বা বিভিন্ন প্রকারের একপুঁজ কোষ একত্রিত হয়ে যদি একই কাজ করে এবং তাদের উৎপত্তিও যদি অভিমুক্ত হয়, তখন তাদের টিস্যু বা কলা বলে। টিস্যু দুই ধরনের, ভাজক টিস্যু এবং স্থায়ী টিস্যু। ভাজক টিস্যুর কোষগুলো বিভাজনে সক্ষম কিন্তু স্থায়ী টিস্যুর কোষগুলো বিভাজিত হতে পারে না। স্থায়ী

টিস্যু তিনি ধরনের, যথা- সরল টিস্যু, জটিল টিস্যু এবং নিঃস্থাবী (করণকারী) টিস্যু। এখানে শুধু সরল এবং জটিল টিস্যু নিয়ে আলোচনা করা হবে।

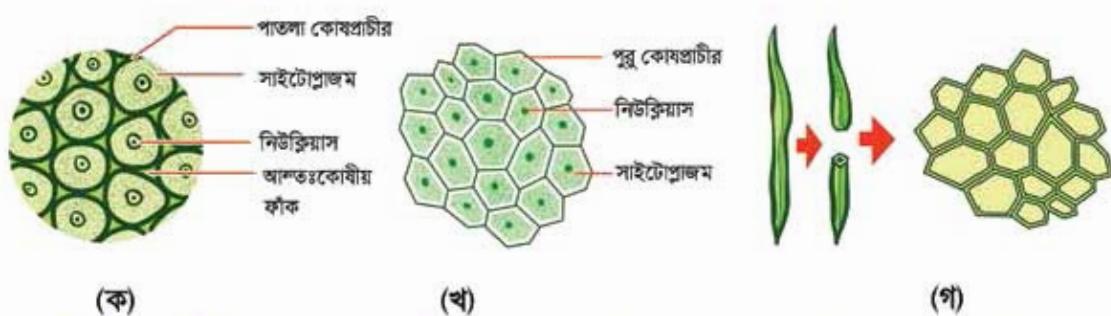
(এ) সরল টিস্যু (Simple tissue)

যে স্থায়ী টিস্যুর প্রতিটি কোষ আকার, আকৃতি ও গঠনের দিক থেকে অভিম, তাকে সরল টিস্যু বলে। কোষের ইকৃতির উপর ভিত্তি করে সরল টিস্যুকে তিনি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- প্যারেনকাইমা, কোলেনকাইমা এবং স্কেলেনকাইমা।

প্যারেনকাইমা (Parenchyma): উজ্জিদদেহের সব অংশে এদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এ টিস্যুর কোষগুলো জীবিত, সমব্যাসীয়, পাতলা প্রাচীরযুক্ত এবং প্রোটোপ্লাজম দিয়ে পূর্ণ। এই টিস্যুতে আন্তঃকোষীয় ফাঁক দেখা যায়। কোষপ্রাচীর পাতলা এবং সেলুলোজ দিয়ে তৈরি হয়। এসব কোষে যখন ক্লোরোফিল থাকে, তখন তাকে প্যারেনকাইমা (Chlorenchyma) বলে। অপর উজ্জিদের বড় বড় বায়ুপূর্ণ প্যারেনকাইমাকে আরেনকাইমা (Aerenchyma) বলে। প্যারেনকাইমা টিস্যুর প্রধান কাজ দেহ গঠন করা, খাদ্য প্রস্তুত করা, খাদ্য সঞ্চয় করা এবং খাদ্যস্বাদ পরিবহন করা।

কোলেনকাইমা (Collenchyma): এগুলো বিশেষ ধরনের প্যারেনকাইমা কোষ দিয়ে তৈরি হয়। কোষপ্রাচীরে সেলুলোজ এবং পেকটিন জমা হয়ে পূর্ণ হয়। তবে এদের কোষপ্রাচীর অসমতাবে পূর্ণ এবং কোষগুলো অধিক পূর্ণ হয়। এ টিস্যুর কোষগুলো লম্বাটে ও সজীব। এরা প্রোটোপ্লাজমপূর্ণ কোষ দিয়ে তৈরি হয়। এতে আন্তঃকোষীয় ফাঁক থাকতে পারে। কোষপ্রাচীর তোকোনাকার, সূর্য বা তির্যক হতে পারে। খাদ্য প্রস্তুত এবং উজ্জিদদেহকে দৃঢ়তা প্রদান করা এদের প্রধান কাজ। পাতার শিরা এবং পত্রবৃক্ষে এদের দেখা যায়। কচি ও নমনীয় কাণ্ড, যেমন কুমড়া ও দক্তকলসের কাণ্ডে এ টিস্যু দৃঢ়তা প্রদান করে। এ কোষে যখন ক্লোরোফিল থাকে, তখন এরা খাদ্য প্রস্তুত করে।

স্কেলেনকাইমা (Sclerenchyma): এ টিস্যুর কোষগুলো শক্ত, অনেক লম্বা এবং পূর্ণ প্রাচীরবিশিষ্ট হয়। প্রোটোপ্লাজমবিহীন, সিগনিলভুক্ত এবং যাঞ্চিক ফাজের জন্য নির্দিষ্ট কোষ দিয়ে গঠিত টিস্যুকে



চিত্র ২.12: বিভিন্ন প্রকারের সরল টিস্যু, (ক) প্যারেনকাইমা (খ) কোলেনকাইম (গ) স্কেলেনকাইম।

ক্লেরেলকাইমা টিস্যু বলে। প্রাথমিক অবস্থায় কোষগুলোতে প্রোটোপ্লাজম উপস্থিত ধারকগুলি খুব ভাঙ্গাত্তি ভাঙ্গাত্তি করে পরিষ্ঠিত হয়। কোষগুলো প্রধানত দুই ধরনের, ফাইবার এবং ক্লেরাইড। উভিদেহে দৃঢ়তা প্রদান এবং পানি ও খনিজ লবণ পরিবহন করা এর মূল কাজ।

(i) **ফাইবার বা তন্তু (Fibre):** এরা অভ্যন্তর দীর্ঘ, পুরু প্রাচীরবৃত্ত, শর্কর এবং দুই প্রাচী সমূহ। তবে কখনো কখনো ভৌতা হতে পারে। প্রাচীরের পায়ে ছিঁজ থাকে, এ ছিঁজকে কূপ বলে। অবস্থান এবং গঠনের ভিত্তিতে এদের বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে, যেমন বাস্ট ফাইবার, সার্কেস ফাইবার, জাইলেম তন্তু বা কার্টিলজ্যুলুন্ডু।

(ii) **ক্লেরাইড (Sclereids):** এদেরকে স্টোন সেলও বলা হয়। এরা খাটো, সমব্যাপীয়, কখনো লম্বাটে আবার কখনো ভারকাকার হতে পারে। এদের সৌশ্চেতার খুবই শর্কর, অভ্যন্তর পুরু এবং লিগনিলযুক্ত। পরিষ্ঠিত ক্লেরাইড কোষ সাধারণত মৃত থাকে এবং এদের কোষপ্রাচীর কৃপযুক্ত হয়।

নম্বৰীজী ও বিবীজপ্রাণী উভিদের কর্টেজ, কল ও বীজস্তকে ক্লেরাইড টিস্যু দেখা যায়। বহিষঙ্ক জাইলেম এবং ক্লেরাইডের সাথে একস্বরে প্রত্যন্তক কোষগুচ্ছসমূহে থাকতে পারে।



একক কাজ

কাজ : তিন ধরনের সরল টিস্যুর চিয় অভিন্ন।

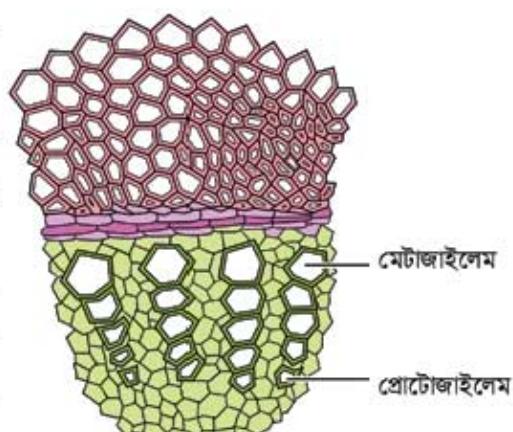
উৎকর্ষ : পোস্টোর পেপার, সাইলপেন।

পদ্ধতি : তিন ধরনের সরল টিস্যুর চিহ্নিত চিয় আঁক এবং এদের পার্থক্যগুলো উপস্থাপন কর।

(b) অজিল টিস্যু (Complex tissues)

বিভিন্ন ধরনের কোষের সমন্বয়ে যে স্থায়ী টিস্যু তৈরি হয়, তাকে অজিল টিস্যু বলে। এরা উভিদে পরিবহনের কাজ করে, তাই এদের পরিবহন টিস্যুও বলা হয়। এ টিস্যু দুই ধরনের, জাইলেম এবং ক্লেরাইড। জাইলেম এবং ক্লেরাইড উভিদের পরিবহন টিস্যুগুচ্ছ (vascular bundle) গঠন করে।

জাইলেম (Xylem): জাইলেম দুই ধরনের, প্রাথমিক ও সৌধ জাইলেম। প্রোক্যাপিয়ায় থেকে সৃষ্টি জাইলেমকে প্রাথমিক জাইলেম বলে। প্রাথমিক বৃক্ষ শেষে বেসের ক্ষেত্রে সৌধ জাইলেম থাকে, সেখানে সৌধ জাইলেম সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক জাইলেম দুই ধরনের।



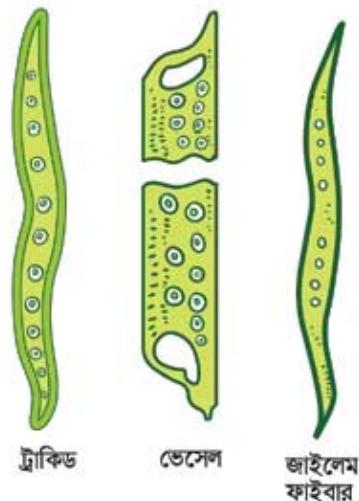
চিত্র 2.13: একটি পরিবহন টিস্যুগুচ্ছ

প্রাথমিক অবস্থার একে প্রোটোজাইলেম এবং পরিপন্থ অবস্থায় মেটাজাইলেম বলে। মেটাজাইলেমের অভ্যন্তরীণ ফাঁকা গহ্বরাচি বড় থাকে। জাইলেমে কয়েক ধরনের কোষ থাকে, যেমন: ট্রাকিড, ভেসেল, জাইলেম প্যারেনকাইমা ও জাইলেম ফাইবার।

(i) **ট্রাকিড (Tracheids):** ট্রাকিড কোষ লম্বা। এর প্রান্তবর্ত সরু এবং সূচালো। প্রাচীরে লিগনিল জমা হয়ে পুরু হয় এবং অভ্যন্তরীণ গহ্বর বৃক্ষ হয়ে যায়। কলে পানির চলাচল পাশাপাশি জোড়া কুপের (paired pits) আধারে হয়ে থাকে। প্রাচীরের পুরুষ কয়েক ধরনের হয়, যেমন- বলয়াকার, সর্পিলাকার, সোপানাকার, জালিকাকার কিংবা কৃপাক্ষিত। ফার্নবর্গ, নম্ফবীজী ও আবৃতবীজী উদ্ভিদের প্রাথমিক ও গৌণ জাইলেম কলায় ট্রাকিড দেখা যায়। কোষবসের পরিবহন এবং অঙ্ককে দৃঢ়তা প্রদান করা এদের প্রধান কাজ। তবে কখনো খাল্প সঞ্চয়ের কাজও এই টিস্যু করে থাকে।

(ii) **ভেসেল (Vessels):** ভেসেল কোষগুলো খাটো গোলের মতো। কোষগুলো একটির মাথার আরেকটি সংজোত হয় এবং প্রাণীয় প্রাচীরটি গলে গিয়ে একটি দীর্ঘ নলের মতো অঙ্গের সৃষ্টি করে। এর কলে কোষবসের উপরে ঝঠার জন্য একটি সরু পথ সৃষ্টি হয়ে যায়। প্রাথমিক অবস্থার এ কোষগুলো প্রোটোপ্লাজমপূর্ণ থাকলেও পরিপন্থ বয়সে এরা মৃত এবং প্রোটোপ্লাজমবিহীন হয়। ভেসেলের প্রাচীর ট্রাকিডের মতো বিভিন্নরূপে পুরু হয়, যেমন- সোপানাকার, সর্পিলাকার, বলয়াকার, কৃপাক্ষিত ইত্যাদি। ভেসেল সাধারণত কয়েক সেটিয়টার লম্বা হয়। তবে বৃক্ষ বা আরোহী উদ্ভিদে আরও অনেক লম্বা হতে পারে। এদের প্রধানত পুষ্টবীজী উদ্ভিদের সব অঙ্গে দেখা যায়। নম্ফবীজী উদ্ভিদের মধ্যে উজ্জ্বল উক্সিস, যেমন নিটায়ে (Gnetum) প্রাথমিক পর্যান্তের ভেসেল থাকে। পানি এবং খনিজ জরুর পরিবহনে এবং অঙ্ককে দৃঢ়তা প্রদান করা এর প্রধান কাজ।

(iii) **জাইলেম প্যারেনকাইমা (Xylem parenchyma):** জাইলেমে অবস্থিত প্যারেনকাইমা কোষকে জাইলেম প্যারেনকাইমা বা উচ্চ প্যারেনকাইমা (wood parenchyma) বলে। এদের প্রাচীর পুরু বা পাতলা হতে পারে। প্রাইমারি জাইলেমে অবস্থিত প্যারেনকাইমার কোষ পাতলা প্রাচীরযুক্ত। তবে গৌণ জাইলেমে এরা পুরু প্রাচীরযুক্ত হয়ে থাকে। খাল্প সঞ্চয় এবং পানি পরিবহন করা এদের প্রধান কাজ।

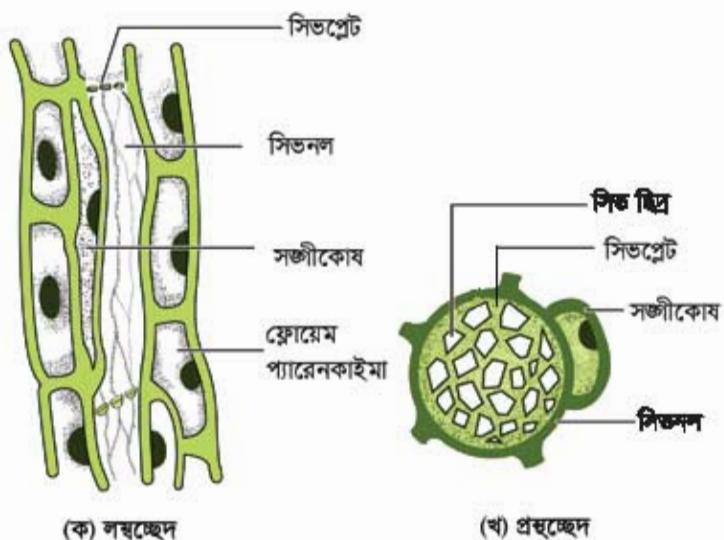


চিত্র 2.14: বিভিন্ন ধরনের জাইলেম

(iv) জাইলেম কাইবার (Xylem fibre): জাইলেমে অবস্থিত প্লেরেনকাইমা কোষই হচ্ছে জাইলেম কাইবার। এদের উচ্চ কাইবারও বলে। এ কোষগুলো সহা, এদের দুপ্রান্ত সরু। পরিষত কোষে প্রোটোপ্লাজম থাকে না বলে এরা মৃত। উড়িসে এরা বাতিক শক্তি বোঝায়। দ্বিতীয়গুলী উড়িসের সব জাইলেমে এরা অবস্থান করে। পানি ও খনিজ পদার্থ পরিবহন, খাদ্য সংরক্ষণ, উড়িসকে যান্ত্রিক শারীর আর দৃঢ়তা প্রদান করা জাইলেম টিস্যুর প্রধান কাজ।

ফ্লোেম (Phloem): উড়িস কাণ্ডে এরা জাইলেমের সাথে একত্রে পরিবহন টিস্যুগুচ্ছ তৈরি করে। সিভনল, সজীকোষ, ফ্লোেম প্যারেনকাইমা এবং ফ্লোেম তন্তু নিয়ে ফ্লোেম টিস্যু গঠিত হয়।

জাইলেম যেমন খাদ্যের কাঁচামাল পানি সরবরাহ করে, তেমনি ফ্লোেম পাতায় প্রস্তুত খাদ্য উড়িস দেহের বিভিন্ন স্থানে পরিবহন করে।



চিত্র 2.15: ফ্লোেম টিস্যু

(i) **সিভকোষ (Sieve cell):** এগুলো বিশেষ ধরনের কোষ। মীর্ত, পাতলা কোষপ্রাচীরমুক্ত এবং জীবিত এ কোষগুলো সমাপ্তিভাবে একটির উপর একটি সজ্জিত হয়ে সিভনল (Sieve tube) গঠন করে। এ কোষগুলো চালুনির মতো ছিস্যুক সিভপ্রেট নিয়ে পরম্পর থেকে আলাদা থাকে। সিভকোষে প্রোটোপ্লাজম প্রাচীর দ্বারে থাকে বলে একটি কেজীয় ফাঁপা জায়গার সৃতি হয়, বেঁটা খাদ্য পরিবহনের লক হিসেবে কাজ করে। এদের প্রাচীর লিগনিনমুক্ত। পরিষত সিভকোষে কোনো নিউক্লিয়াস থাকে না। সকল ধরনের পুষ্টবীজী উড়িসের ফ্লোেমে সজীকোষ এবং সিভনল থাকে। পাতায় প্রস্তুত খাদ্য উড়িসদেহের বিভিন্ন অংশে পরিবহন করা এদের প্রধান কাজ।

(ii) **সজীকোষ (Companion cell):** প্রতিটি সিভকোষের সাথে একটি করে প্যারেনকাইমা জাতীয় কোষ অবস্থান করে। এদের কেন্দ্রিক বা নিউক্লিয়াস বেশ বড়। ধারণা করা হয় এই

নিউক্লিয়াস সিভকোমের কার্যাবলি কিছু পরিমাণে হলেও নিয়ন্ত্রণ করে। এ কোষ প্রোটোপ্লাজম দিয়ে পূর্ণ এবং পাতলা প্রাচীরযুক্ত। ফার্ন ও ব্যন্তিবীজী উভিদে এদের উপস্থিতি নেই।

(iii) **ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা (Phloem parenchayma):** ফ্লোয়েমে উপস্থিত প্যারেনকাইমা কোষগুলোই ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা। এদের কোষ সাধারণ প্যারেনকাইমার মতো পাতলা কোষপ্রাচীরযুক্ত এবং প্রোটোপ্লাজমযুক্ত। এরা খাদ্য সংপ্রয় করে এবং খাদ্য পরিবহনে সহায়তা করে। ফার্ন জাতীয় উভিদ (Pteridophyta), নগ্নবীজী উভিদ এবং দ্বিবীজপত্রী উভিদের ফ্লোয়েম টিস্যুতে ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা থাকে। একবীজপত্রী উভিদে ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা থাকে না।

(iv) **ফ্লোয়েম ফাইবার বা তন্তু (Phloem fibre):** স্লেরেনকাইমা কোষ সমন্বয়ে ফ্লোয়েম ফাইবার তৈরি হয়। এগুলো একধরনের দীর্ঘ কোষ, যাদের প্রান্তদেশ পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে। এদের বাস্ট ফাইবারও বলে। পাটের আঁশ এক ধরনের বাস্ট ফাইবার। উভিদ অঙ্গের গৌণবৃদ্ধির সময় এ ফাইবার উৎপন্ন হয়। এসব কোষের প্রাচীরে কূপ দেখা যায়। ফ্লোয়েম টিস্যুর মাধ্যমে পাতায় উৎপাদিত শর্করা এবং মূলে সঞ্চিত খাদ্য একই সাথে উপরে নিচে পরিবাহিত হয়।

2.3.2 প্রাণিটিস্যু

বহুকোষী প্রাণিদেহে অনেক কোষ একত্রে কোনো বিশেষ কাজে নিয়োজিত থাকে। একই ভূগীয় কোষ থেকে উৎপন্ন হয়ে এক বা একাধিক ধরনের কিছুসংখ্যক কোষ জীবদেহের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে সমষ্টিগতভাবে একটা কাজে নিয়োজিত থাকলে ঐ কোষগুলো সমষ্টিগতভাবে টিস্যু (Tissue) বা তন্ত্র তৈরি করে। একটি টিস্যুর কোষগুলোর উৎপত্তি, কাজ এবং গঠন একই ধরনের হয়। টিস্যু নিয়ে আলোচনাকে টিস্যুতত্ত্ব (Histology) বলে। কোষ এবং টিস্যুর মধ্যে পার্থক্য খুবই নির্দিষ্ট। কোষ হচ্ছে টিস্যুর গঠনগত ও কার্যকরী একক, যেমন লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং অগুচক্রিকা বিভিন্ন ধরনের রক্তকোষ। আবার এরা একত্রে তরল যোজক টিস্যু নামে এক ধরনের টিস্যু হিসেবে পরিচিত। তরল যোজক টিস্যু রক্ত দেহের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় শারীরবৃত্তীয় কাজে অংশ নেয়।

মানবদেহে নানা ধরনের কোষ আছে, যারা ভিন্ন ভিন্ন কাজে নিয়োজিত। মানবদেহের ম্যায়ুকোষ দেহজুড়ে জালের মতো ছড়িয়ে থাকে। দেহের যেকোনো অংশের উদ্বৃত্তি গ্রহণ করে মস্তিষ্কে প্রেরণ করা, আবার মস্তিষ্কের কোনো বার্তা শরীরের নির্দিষ্ট অংশে পৌঁছে দেওয়াই এদের কাজ। চোখের ম্যায়ুকোষগুলো দেখতে এবং কানের ম্যায়ুকোষগুলো শুনতে সাহায্য করে। মানুষের চোখের মতো বিভিন্ন ধরনের ম্যায়ুকোষ না থাকায় বেশিরভাগ প্রাণীই পৃথিবীর দৃশ্যমান বস্তুগুলো রঙিন হিসেবে দেখতে পারে না, অনেক প্রাণী শুধু দিনে বা রাতে দেখতে পায়। আমাদের কাজকর্মে, হাঁটা-চলায় এবং নড়াচড়ায় পেশিকোষ ব্যবহৃত হয়। তিনি ধরনের রক্তকোষ মানব দেহের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত। লোহিত রক্তকণিকা কোষগুলো ফুসফুসে অক্সিজেন গ্রহণ করে হৃদযন্ত্রের সাহায্যে ধমনির মাধ্যমে কৈশিকনালি হয়ে দেহের প্রতিটি

কোষে অঙ্গিজেন সরবরাহ করে। শ্রেণি রক্তকণিকা দেহের রোগ প্রতিরোধ করে। রক্তের অশুচক্রিকা কোষগুলো শরীরের কেটে যাওয়া অংশ থেকে রক্তক্ষরণ ব্যবহার করতে সাহায্য করে। শরীরের দ্বিতীয় কোষগুলো দেহের আবরণ দেওয়া ছাড়াও শরীরের অবস্থানভেদে বিভিন্ন কাজ করে থাকে। মাথার দ্বিতীয় কোষগুলো থেকে চুল পজিয়ে থাকে। শরীরের দ্বিতীয় কোষগুলো নির্দিষ্ট স্থানে ঘাম নির্গমন কোষ থেকে ঘাম নির্গত করে। অস্থিকোষ দেহে অস্থি অথবা কোষলাস্থি তৈরি করে দেহের দৃঢ়তা দিয়ে থাকে। দেহের আকার, গঠন, অস্থির বৃক্ষি ইত্যাদিতে অস্থিকোষের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রাণিটিস্যুর প্রকারভেদ: প্রাণিটিস্যু তার গঠনকারী কোষের সংখ্যা, বৈশিষ্ট্য এবং তাদের নিঃসূত পদার্থের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রধানত চার ধরনের হয়— আবরণী টিস্যু, যোজক টিস্যু, পেশি টিস্যু এবং মাঝু টিস্যু।

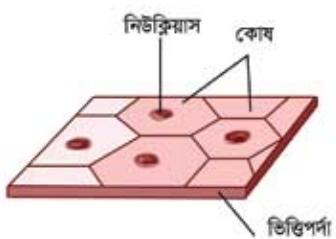
(a) আবরণী টিস্যু (Epithelial Tissue)

এই টিস্যু বিভিন্ন অংশের আবরণ (lining) হিসেবে কাজ করে। তবে অংশকে আবৃত রাখাই আবরণী টিস্যুর একমাত্র কাজ নয়। এই টিস্যুর আরও চারটি কাজ হলো: অংশকে আবৃত রাখা, সেটকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করা (protection), প্রোটিনসহ বিভিন্ন পদার্থ ক্ষরণ বা নিঃসরণ করা (secretion), বিভিন্ন পদার্থ শেষণ করা (absorption) এবং কোষীয় স্তর পেরিয়ে সুনির্দিষ্ট পদার্থের পরিবহন (transcellular transport)।

আবরণী টিস্যুর কোষগুলো ঘন সজিবেশিত এবং একটি ভিজিপর্মার উপর বিন্যস্ত থাকে। কোষের আকৃতি, প্রাণিদেহে তার অবস্থান এবং কাজের প্রকৃতিভেদে এ টিস্যু তিনি ধরনের হয়। যেমন:

(i) **স্কোয়ামাস আবরণী টিস্যু (Squamous Epithelial Tissue):** এই টিস্যুর কোষগুলো মাহের আঁশের মতো ঢাপটা এবং এদের নিউক্লিয়াস বড় আকারের হয়। **উদাহরণ:** বৃক্ষের বোম্যাস ক্যাপসুল প্রাচীর। এই টিস্যু প্রধানত আবরণ ছাড়াও ছাঁকনির কাজ করে থাকে।

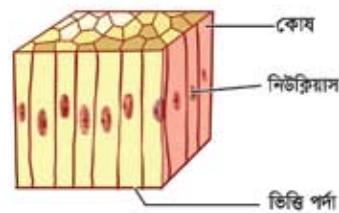
(ii) **কিউবিয়াল আবরণী টিস্যু (Cuboidal Epithelial Tissue):** এই টিস্যুর কোষগুলো ঘনাকার বা কিউব আকৃতির অর্থাৎ কোষগুলোর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা প্রায় সমান। **উদাহরণ:** বৃক্ষের সংগ্রাহক



চিত্র 2.16: স্কোয়ামাস (অলিশাকার) আবরণী টিস্যু



চিত্র 2.17: কিউবিয়াল (ঘনাকৃতি) আবরণী টিস্যু



চিত্র 2.18: কলামার (স্টেচাকার) এপিথেলিয়াল টিস্যু

নালিকা। এই টিস্যু প্রধানত পরিশেষণ এবং আবরণ কাজে লিপ্ত থাকে।

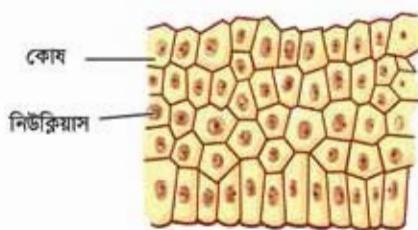
(iii) কলামসার আবরণী টিস্যু (Columnar Epithelial Tissue): এই টিস্যুর কোষসমূহ স্তরের অঙ্গে সরু এবং সমৃ। উদাহরণ: প্রাণীর অঙ্গের অস্তঃপাচীরের কোষগুলো প্রাধানত ক্ষেত্র, রক্ষণ এবং শোষণ কাজ করে থাকে।

প্রাণিদেহে ভিত্তিপর্দির উপর সজ্জিত কোষগুলোর সংখ্যার ভিত্তিতে এপিথেলিয়াল বা আবরণী টিস্যুকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

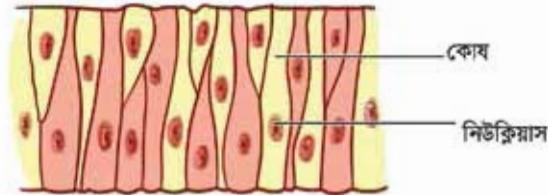
(i) সাধারণ আবরণী টিস্যু: ভিত্তিপর্দির উপর কোষসমূহ একস্তরে সজ্জিত। উদাহরণ: বৃক্কের বোম্যাল ক্যাপসুল, বৃক্কের সংগ্রাহক নালিকা, অঙ্গ প্রাচীর।

(ii) স্ট্রাটিফাইড আবরণী টিস্যু: ভিত্তিপর্দির উপর কোষগুলো একধিক স্তরে সজ্জিত। এমন স্ট্রাটিফাইড আবরণী টিস্যুও আছে, যার স্তরের সংখ্যা মিনিটের মধ্যে পাল্টে যেতে পারে—কখনো দেখা যায় তিন-চারটি স্তর আবার পরকলেই দেখা যায় সাত-আটটি স্তর। তাই একে বলে প্রানজিপিয়াল আবরণী। উদাহরণ: মেরুদণ্ডী প্রাণিদের কুক।

(iii) সিটো-স্ট্রাটিফাইড আবরণী টিস্যু: এই টিস্যুর কোষগুলো ভিত্তিপর্দির উপর একস্তরে বিন্দুস্ত থাকে। তবে কোষগুলো বিভিন্ন উচ্চতার হওয়ায় এই টিস্যুকে দেখতে স্তরীভূত টিস্যু মনে হয়। উদাহরণ প্রাকিয়া।



চিত্ৰ 2.19: স্ট্রাটিফাইড
(স্তরীভূত) বা যৌগিক আবরণী টিস্যু



চিত্ৰ 2.20: সিটো-
স্ট্রাটিফাইড এপিথেলিয়াল টিস্যু

আবরণী টিস্যুর কোষগুলো আবার বিভিন্ন কাজের জন্য নানাভাবে রূপান্তরিত হয়। যেমন-

(i) শিলিয়াস্ত আবরণী টিস্যু: মেরুদণ্ডী প্রাণীদের শাসনালির প্রাচীরে দেখা যায়।

(ii) ফ্লাইচেলাস্ত আবরণী টিস্যু: হাইড্রো এজেডার্ম থাকে।

(iii) অ্যাপেন্ড্যুল আবরণী টিস্যু: হাইড্রো এজেডার্ম এবং মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অঙ্গে দেখা যায়।

(iv) অনন্ত অঙ্গের আবরণী টিস্যু: বিশেষভাবে রূপান্তরিত আবরণী টিস্যু যা থেকে শুক্রাণু এবং তিস্বামু কোষ উৎপন্ন হয়। এক্ষােমেন্টেন অংশগ্রহণ করে প্রজাতির খান্দা অক্ষুম রাখে।

(v) অণ্ডি আবরণী টিস্যু: বিভিন্ন ধরনের রস নিষ্ঠেরণ করে।

দেখা যাচ্ছে যে আবরণী টিস্যু কোনো অংশের বা নালিক শিতলের ও বাইরের অংশ তৈরি করে থাকে। আবার এই টিস্যু মূল্যান্তরিত হয়ে রক্তপ, ক্রমপ, শোষণ, ব্যাগন, পরিবহন এই সব কাজে অংশ দেয়। আবরণী টিস্যু মূল্যান্তরিত হয়ে অণ্ডি টিস্যু এবং জলন টিস্যুতে পরিণত হয় এবং দেহের বিভিন্ন পুরুষপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে।

(b) যোজক টিস্যু (Connective Tissue)

যোজক বা কানেকটিভ টিস্যুতে যাতৃকার (Matrix) পরিযাপ্ত তুলনামূলকভাবে বেশি এবং কোনোর সংখ্যা কম। গঠন এবং কাজের ভিত্তিতে কানেকটিভ টিস্যু প্রধানত তিনি ধরনের হয়। যথা-

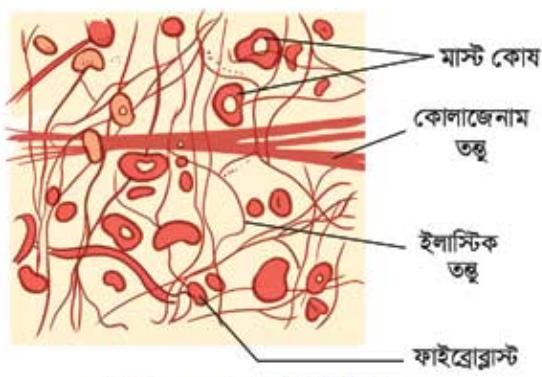
(i) ফাইব্রোস যোজক টিস্যু (Fibrous Connective Tissue): এই ধরনের যোজক টিস্যু দেহস্থলের নিচে পেশির মধ্যে থাকে। এদের মাতৃকার্য বিভিন্ন ধরনের তন্তুর আধিক্য দেখা যায়।

(ii) স্কেলিটাল যোজক টিস্যু (Skeletal Connective Tissue): দেহের অঙ্গস্তরীয় কাঠামো পঠনকারী টিস্যুকে স্কেলিটাল যোজক টিস্যু বলে। এই টিস্যু দেহের অঙ্গস্তরীয় কাঠামো পঠন করে। দেহকে নির্দিষ্ট আকৃতি এবং দৃঢ়তা দেয়। অঙ্গ সঞ্চালন এবং চলনে সহায়তা করে। মস্তিষ্ক, মেরুরজ্বল, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড এবং দেহের নরম ও নালুক অংশগুলোকে রক্ষা করে। বিভিন্ন ধরনের ক্রচকশিকা উৎপাদন করে। প্রতিক্রিয়া প্রেশিগুলোর সংযুক্তির ব্যবস্থা করে। গঠনের ভিত্তিতে স্কেলিটাল যোজক টিস্যু দুটিরনের হয়। যেমন: কোষলাস্থি এবং অণ্ডি।

কোষলাস্থি (Cartilage): কোষলাস্থি এক ধরনের নমনীয় স্কেলিটাল যোজক টিস্যু। মানুষের নাক ও কানের পিনা কোষলাস্থি দিয়ে তৈরি।

অণ্ডি: অণ্ডি বিশেষ ধরনের দৃঢ়, তন্তুর এবং অনমনীয় স্কেলিটাল কানেকটিভ টিস্যু। এদের মাতৃকার্য ক্যালসিয়াম-জাতীয় পদার্থ জমা হয়ে অণ্ডির দৃঢ়তা প্রদান করে।

(iii) তরল যোজক টিস্যু (Fluid connective tissue): তরল টিস্যুর মাতৃকা তরল। মাতৃকার্য বিভিন্ন ধরনের জৈব পদার্থ মুখ্যত অবস্থায় থাকে। এই টিস্যুর প্রধান কাজ দেহের অঙ্গস্তরে বিভিন্ন ক্র্যানি পরিবহন করা, ঝোগ প্রতিরোধ করা এবং ক্রচ জমাট বাঁধার বিশেষ স্ফুরিকা রাখা। তরল যোজক টিস্যু দুই ধরনের, ক্রম এবং লসিকা।



চিত্র ২.২১: কানেকটিভ টিস্যু

অন্ত: কন্ত এক ধরনের কারীয়, ইবৎ শব্দান্ত এবং লালবর্ণের তরল ঘোজক তিস্যু। থমনি, শিরা ও কৈশিকনালির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কন্ত অভ্যন্তরীণ পরিবহনে অংশ নেয়। উক্ত কন্তবাহী প্রাণীর দেহে কন্ত আপমানার আরসাম্য রক্ষা করে। কন্তের উপালান দুটি— কন্তুরস এবং কন্তকপিকা। কন্তুরস (Plasma) কন্তের তরল অংশ, এর ইবৎ হলুদাত। এর প্রায় ৯১-৯২% অংশ পানি এবং ৪-৫% অংশ জৈব ও অজৈব পদার্থ। এসব কন্তুরসের ভিত্তি বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন এবং বর্জ্য পদার্থ থাকে। কন্তকপিকা তিন ধরনের, যথা- লোহিত কন্তকপিকা (Erythrocyte বা Red blood corpuscles বা RBC), শ্বেত কন্তকপিকা (Leukocyte বা white blood corpuscles বা WBC) এবং অগুচক্রিকা (Thrombocytes বা Blood platelet)। লোহিত কন্তকপিকার হিমোগ্লোবিন নামে একটি লৌহজাত যৌগ থাকে, যার জন্য কন্ত লাল হয়। হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনের সঙ্গে স্থুল হয়ে একটি অক্সিহিমোগ্লোবিন যৌগ গঠন করে এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে অক্সিজেন পরিবহন করে। শ্বেত কন্তকপিকা জীবাণু খবস করে দেহের শক্তিগত আচ্চান্তকায় অংশ নেয়। মানবদেহে বেশ কয়েক ধরনের শ্বেত কন্তকপিকা থাকে। অগুচক্রিকা কন্ত জমাট



চিত্র 2.22: বিভিন্ন ধরনের রক্তকণিকা

বাঁধার অংশ নেয়। যষ্ঠ অঞ্চায়ে কন্ত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

লসিকা: মানবদেহে বিভিন্ন তিস্যুর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানে (Intercellular space) যে জলীয় পদার্থ জমা হয় তাকে লসিকা বলে। এগুলো ছোট নালির মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে একটি আলাদা নালিকাতন্ত্র গঠন করে, যাকে লসিকাতন্ত্র (Lymphatic system) বলে। লসিকা ইবৎ কারীয় স্বাক্ষ হলুদ বর্ণের তরল পদার্থ। এর মধ্যে কিছু রোগপ্রতিরোধী কোষ থাকে, এদের লসিকাকোষ (Lymphoid cell) বলে।

(c) পেশি তিস্যু (Muscular Tissue)

বৃশের মেসোজার্ম থেকে তৈরি সহকোচন ও প্রসারণশীল বিশেষ ধরনের তিস্যুকে পেশি তিস্যু বলে। এদের মাঝে প্রায় অনুপস্থিত। পেশিকোষপুলো সরু, লম্বা এবং তক্ষুময়। যেসব তক্ষুতে আড়াআড়ি ডোরাকাটা থাকে, তাদের ডোরাকাটা পেশি (Striated muscle) এবং ডোরাবিহীন তক্ষুকে মসৃণ পেশি (Smooth muscle) বলে। পেশিকোষ সংকোচন এবং প্রসারণের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশ সঞ্চালন, চলন ও



চিত্র 2.23: বিভিন্ন ধরনের পেশি

অভ্যন্তরীণ পরিবহন ঘটাই। অবস্থান, গঠন এবং কাজের জিনিতে পেশি টিস্যু তিনি ধরনের, ঐচ্ছিক পেশি, অনেক্ষিক পেশি এবং হৎপেশি।

(i) **ঐচ্ছিক পেশি (Voluntary)** বা **তোরাকাটা পেশি (Striated muscle):** এই পেশি আপীর ইচ্ছানুযায়ী সংকুচিত বা প্রসারিত হয়। ঐচ্ছিক পেশিটিসুর কোষগুলো নলাকার, শাখাবিহীন ও আড়াআড়ি তোরাযুক্ত হয়। এদের শাখাবন্ধ একাধিক নিউক্লিয়াস থাকে। এই পেশি স্তুত সংকুচিত এবং প্রসারিত হতে পারে। ঐচ্ছিক পেশি অস্থিতথ্বে সংলগ্ন থাকে। উদাহরণ: মানুষের হাত এবং পাদের পেশি।

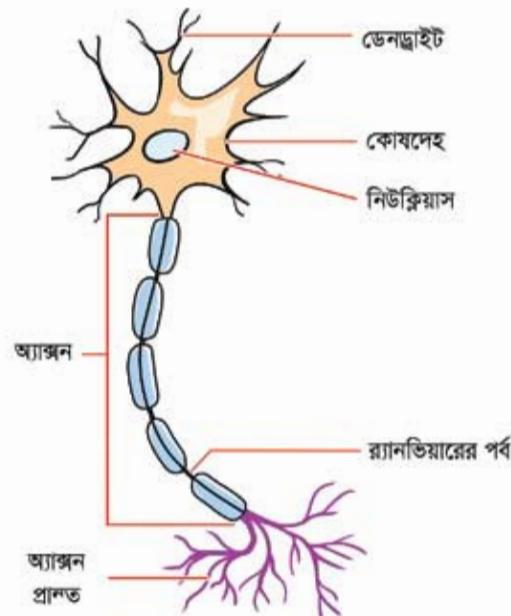
(ii) **অনেক্ষিক পেশি (Involuntary muscle)** বা **স্মৃথ পেশি (Smooth muscle):** এই পেশি টিস্যুর সংকোচন ও প্রসারণ প্রাপ্তীর ইচ্ছানীন নয়। এ পেশি কোষগুলো মাঝু আকৃতির। এদের গাঁথে আড়াআড়ি দাগ থাকে না। এজন্য এ পেশিকে স্মৃথ পেশি বলে। মেরুদণ্ডী প্রাপ্তীদের রক্তনালি, পৌটিকনালি ইত্যাদির প্রাপ্তীরে অনেক্ষিক পেশি থাকে। অনেক্ষিক পেশি প্রধানত দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গাদির সঞ্চালনে অংশ নেয়। যেমন, খাদ্য হজম প্রক্রিয়ার অঙ্গের ক্রমসংকোচন।

(iii) **কার্ডিয়াক পেশি বা হৎপেশি (Cardiac muscle):** এই পেশি মেরুদণ্ডী প্রাপ্তীদের হৎপিণ্ডের এক বিশেষ ধরনের অনেক্ষিক পেশি। এই টিস্যুর কোষগুলো নলাকৃতি (অনেকটা ঐচ্ছিক পেশির মতো), শাখাবিত ও আড়াআড়ি দাগযুক্ত। এ টিস্যুর কোষগুলোর মধ্যে ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক (Intercalated disc) থাকে। এদের সংকোচন ও প্রসারণ প্রাপ্তীর ইচ্ছানীন নয়। অর্থাৎ কার্ডিয়াক পেশির গঠন ঐচ্ছিক পেশির মতো হলেও কাজ অনেক্ষিক পেশির মতো। কার্ডিয়াক পেশির কোষগুলো শাখার মাধ্যমে পরম্পর স্থুত থাকে। হৎপিণ্ডের সব কার্ডিয়াক পেশি সমিতিভাবে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। মানুষ সূপ সূচির একটা বিশেষ পর্যায় থেকে স্থুত পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত হৎপিণ্ডের কার্ডিয়াক পেশি একটা নির্দিষ্ট গতিতে সংকুচিত ও প্রসারিত হবে দেহের মধ্যে রক্ত চলাচলের পরিমাণ সচল রাখে।

(d) মাঝু টিস্যু (Nerve tissue)

দেহের বিশেষ সংবেদী কোষ নিউরন বা মাঝুকোষগুলো একত্রে মাঝু টিস্যু গঠন করে। মাঝু টিস্যু অসংখ্য নিউরন দিয়ে গঠিত। এর গঠন সম্পর্কে তোমরা দশম অধ্যায়ে আরও বিস্তারিতভাবে জানতে পারবে। মাঝু টিস্যু পরিবেশ থেকে উচ্চীপনা, ধেমন তাপ, স্পর্শ, চাপ ইত্যাদি ঘৃণ করে দেহের ডিঙ্গে মস্তিষ্কে বহন করে এবং মস্তিষ্কের বিশ্লেষণের পর সিদ্ধান্ত অনুসৰী উপযুক্ত কাজ করে থাকে। একটি আদর্শ নিউরনের তিলটি অংশ থাকে, কোষদেহ, ডেনড্রাইট এবং আ্যুক্ত। নিউরন কোষ বহুভুজাকৃতি এবং নিউক্লিয়াসযুক্ত। কোষের সাইটোপ্লাজমে মাইটোকন্ড্রিয়া, পলিজিবিটি, রাইবোজোম, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ইত্যাদি থাকে, তবে নিউরনের সাইটোপ্লাজমে সক্রিয় সেটিলো থাকে না বলে নিউরন বিভাজিত হয় না। কোষদেহের চারদিকের শাখাযুক্ত কৃত কৃত প্রস্তুতি

অংশকে ডেনড্রন বলে। ডেনড্রন থেকে যে শাখা বের হয়, তাদের ডেনড্রাইট বলে। ডেনড্রাইটের সংখ্যা এক বা একাধিক হতে পারে। নিউরনের কোষদেহ থেকে একটি লম্বা মাঝুকৃত পরবর্তী নিউরনের ডেনড্রাইটের সাথে যুক্ত থাকে, তাকে আ্যুক্ত বলে। একটি নিউরনের একটি মাঝ আ্যুক্ত থাকে। পরপর মুটি নিউরনে প্রথমটির আ্যুক্ত এবং পরেরটির ডেনড্রাইটের মধ্যে একটি মাঝুসম্বিহ গঠিত হয়, তাকে সিন্যাপস (Synapse) বলে। সিন্যাপসের মধ্য দিয়েই একটি নিউরন থেকে উচ্চীপনা পরবর্তী নিউরনে পরিবাহিত হয়। মাঝুটিস্যু উচ্চীপনা ঘৃণ করে মস্তিষ্কে প্রেরণ করে এবং মস্তিষ্ক তাতে সাড়া দেয়। উচ্চতর প্রাণীতে মাঝুটিস্যু শৃঙ্খি সংরক্ষণ (Memorise) করাসহ দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কাজ নিরবাচন এবং তাদের মধ্যে সময়স্থান সাধন করে।



চিত্র 2.24: একটি নিউরন

অনেকের মধ্যে একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে আমরা আমাদের মস্তিষ্কের মাঝ দশ শতাংশ ব্যবহার করতে পারি। ধারণাটি সঠিক নয়। অকৃতপক্ষে স্বাভাবিক অবস্থার মানুষ বা অন্য সব প্রাণী তার মস্তিষ্কের একশে শতাংশ ব্যবহার করে থাকে। এটা ঠিক যে সবসময় একই সাথে মস্তিষ্কের সকল অংশ সম্মানভাবে সক্রিয় থাকে না। কিন্তু মস্তিষ্কের সবগুলো অংশ কখনো না কখনো আমরা কোনো না কোনোভাবে ব্যবহার করা যাব না। এরকম কোনো সীমা নেই। বিবর্তনগতভাবে এরকম কোনো সীমা আরোপিত হওয়ার কোনো কারণও নেই।

২.৪ অঙ্গ ও তন্ত্র

এক বা একাধিক টিস্যু দিয়ে তৈরি এবং একটা নির্দিষ্ট কাজ করতে সক্ষম প্রাণিদেহের অংশবিশেষকে অঙ্গ (Organ) বলে। অর্থাৎ কোনো অঙ্গে একই অথবা একাধিক ধরনের টিস্যু থাকে এবং সেই অঙ্গ কোনো না কোনো নির্দিষ্ট কাজ করতে পারে। দেহের অঙ্গসমূহ নিয়ে জীববিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয়, তাকে অঙ্গসংস্থানবিদ্যা (Morphology) বলে।

অবস্থানভেদে মানবদেহে দুধরনের অঙ্গ আছে। চোখ, কান, নাক, হাত, পা, মাথা— এগুলো বাহ্যিক অঙ্গ। বাহ্যিক অঙ্গসংস্থান সমন্বে জীববিজ্ঞানের যে শাখায় বিশদভাবে আলোচনা করা হয়, তাকে বহিঅঙ্গসংস্থান (External Morphology) বলে। আর জীবদেহের ভিতরের অঙ্গগুলো সমন্বে জীববিজ্ঞানের যে শাখায় বিশদভাবে আলোচনা করা হয়, তাকে অন্তঃঅঙ্গসংস্থান (Internal morphology বা Anatomy) বলে। পাকস্থলী, ডিওডেনাম, ইলিয়াম, মলাশয়, হৎপিণ্ড, ঘৃণ্ণন, অঞ্চলসমূহ, প্লীহা, ফুসফুস, বৃক্ষ, শুক্রাশয়, ডিহাশয়— এগুলো হচ্ছে মানবদেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ।

পরিপাক, শ্বসন, রেচন, প্রজনন ইত্যাদি শারীরবৃত্তীয় কাজ করার জন্য প্রাণিদেহে কতগুলো অঙ্গের সমন্বয়ে বিভিন্ন তন্ত্র গঠিত হয়। নিচে মানবদেহের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তন্ত্রের ধারণা দেওয়া হলো। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

(a) পরিপাকতন্ত্র (Digestive system)

এই তন্ত্র খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক, শোষণ এবং অপাচ্য খাদ্যাংশ নিষ্কাশনের সাথে জড়িত। পরিপাকতন্ত্রের দুটি প্রধান অংশ থাকে, যথা: পৌষ্টিক নালি (digestive canal) এবং পৌষ্টিক গ্রন্থি (digestive glands)। মুখছিদ্র, মুখগ্রহণ, গলবিল, অম্লনালি, পাকস্থলী, ডিওডেনাম, ইলিয়াম, রেকটাম বা মলাশয় এবং পায়ুছিদ্র নিয়ে পৌষ্টিক নালি গঠিত। মানুষের লালাগ্রন্থি, ঘৃণ্ণন এবং অঞ্চলসমূহ পৌষ্টিক গ্রন্থি হিসেবে কাজ করে। এসব গ্রন্থির নিঃসৃত রস খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে।

(b) শ্বসনতন্ত্র (Respiratory system)

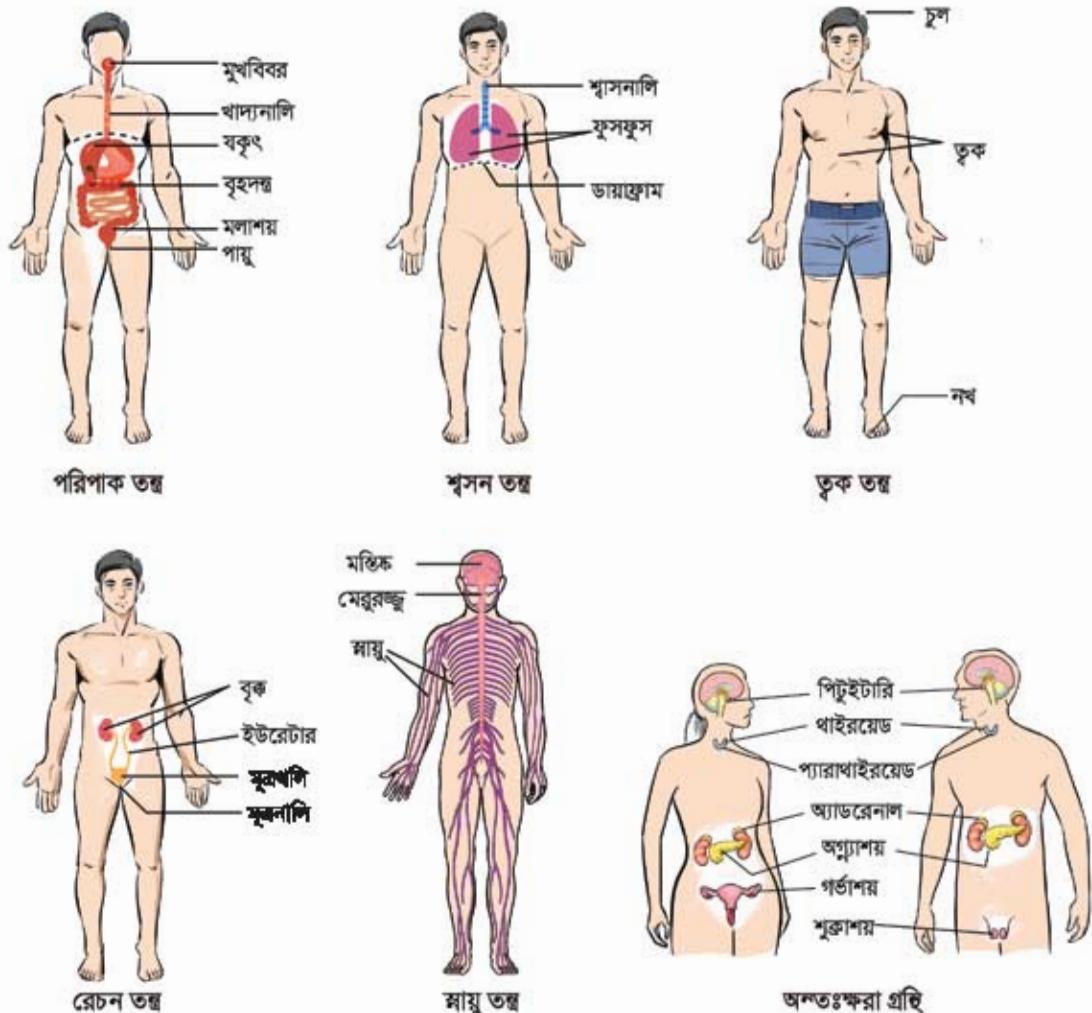
নাসারন্ধা, গলবিল, ল্যারিংস, ট্রাকিয়া, ব্রজ্জাস, ব্রঙ্গিওল, অ্যালভিওলাই এবং একজোড়া ফুসফুস নিয়ে মানুষের শ্বসনতন্ত্র গঠিত। এই তন্ত্র মানুষের দেহের সঞ্চিত খাদ্যকে পরিবেশ থেকে গৃহীত অক্সিজেনের সাহায্যে জ্বরণ প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপাদন করে। এ শক্তি দেহের দৈনন্দিন কাজে সহায়তা করে।

(c) ম্যায়ুতন্ত্র (Nervous system)

দেহের বাইরের এবং ভিতরের উদ্বীপনা গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা এই তন্ত্রের কাজ। মস্তিষ্ক, সুষুম্বাকাণ্ড এবং করোটিক ম্যায়ু নিয়ে ম্যায়ুতন্ত্র গঠিত। এছাড়া স্বয়ংক্রিয় ম্যায়ুতন্ত্র নামে ম্যায়ুতন্ত্রের আরও একটি অংশ আছে। ম্যায়ুতন্ত্রের এই অংশ দেহের অনৈচ্ছিক পেশির কাজগুলো নিয়ন্ত্রণ করে।

(d) রেচনতন্ত্র (Excretory system)

বিভিন্ন শারীরবৃক্ষীয় বিপাক ক্রিয়ার ফলে শরীরে উৎপন্ন হওয়া হিসেবে নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ তৈরি হয়। এসব বর্জ্য পদার্থ সাধারণত দেহের জন্য ক্ষতিকর এবং দেহ থেকে নিষ্কাশনের প্রয়োজন হয়। দেহ থেকে এসব অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন করার পদ্ধতিকে রেচন অক্ষিয়া বলে। যে তত্ত্বের সাহায্যে রেচন প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাকে রেচনতন্ত্র বলে। একজোড়া বৃক্ষ, একজোড়া ইউরেটার, একটি মূত্রধারি এবং একটি মূত্রনালি (ইউরেশ্যা) নিয়ে মানুষের রেচন তন্ত্র গঠিত।



চিত্র 2.25: মানবদেহের বিভিন্ন তন্ত্রের সমন্বয় চিত্র

(e) জননতন্ত্র (Reproductive system)

প্রজাতির ধারাকে বিলুপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য এই তন্ত্র নিজস্ব বৈশিষ্ট্যযুক্ত নতুন প্রজনন সূচির লক্ষ্যে গ্যামেট (অর্থাৎ শুক্রাণু ও ডিম্বাণু) তৈরি করে। এটি ভূগ ও শিশু ধারক অঙ্গ নিয়ে গঠিত হয়। সাধারণত পরিণত বয়সে জননতন্ত্রের মাধ্যমে প্রাণী প্রজনন ক্ষমতা অর্জন করে। এভাবে প্রজননের মাধ্যমে প্রজাতির ধারা অব্যাহত থাকে। মানুষ একলিঙ্গ প্রাণী। পুরুষ মানুষের দেহে পুরুষ প্রজননতন্ত্র এবং নারীর দেহে স্ত্রী প্রজননতন্ত্র থাকে।

(f) ত্বকতন্ত্র (Integumentary system)

দেহের বাইরের দিকে যে আচ্ছাদনকারী আবরণ থাকে, তাকে ত্বক বা চামড়া (skin) বলে। কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থিযুক্ত এই ত্বক দেহকে আচ্ছাদন করে, বাইরের আঘাত এবং জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। এছাড়া দেহের জলীয় অংশকে দেহের ভিতর সংরক্ষণ করে।

(g) অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র (Endocrine system)

প্রাণিদেহে কতগুলো নালিহীন বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি আছে। এসব গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসকে হরমোন বলে। পরিবহন করার জন্য এর কোনো নির্দিষ্ট নালি থাকে না। শুধু রক্তের মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে হরমোন পরিবাহিত করে। পিটুইটারি, থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গোরহ্যানস, সুপ্রারেনাল ইত্যাদি গ্রন্থির সমন্বয়ে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র গঠিত।

2.5 অণুবীক্ষণ যন্ত্র

যোদ্ধার কাছে যেমন অস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কাছে যেমন দূরবীক্ষণ যন্ত্র, ঠিক তেমনি জীববিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের কাছে অণুবীক্ষণ যন্ত্র একটি অপরিহার্য গবেষণা সহায়ক উপকরণ। এর সাহায্যে অতি ক্ষুদ্র কোনো বস্তুকে বহুগুণ বড় করে দেখা যায়। তোমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যে যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র রয়েছে, তাতে আলোর সাহায্যে এসব ক্ষুদ্র বস্তু দেখার ব্যবস্থা আছে। এসব অণুবীক্ষণ যন্ত্রকে আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র বলে। আলোর বদলে ইলেকট্রন ব্যবহার করা হয় যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে, তাকে ইলেকট্রন (ইলেক্ট্রনিক নয়!) অণুবীক্ষণ যন্ত্র বলে। আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র দুধরনের, সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র এবং যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

2.5.1 সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Simple microscope)

এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ফুটের উপরে একটি স্তম্ভ থাকে, যার সাথে একটি কাচের স্টেজ সংযুক্ত থাকে। এই কাচের স্টেজে দুটো ক্লিপ লাগানো থাকে। স্তম্ভের নিচের দিকে সম্মুখভাগে একটি আয়না রয়েছে। স্তম্ভের উপরে একটি টানা নল এবং এর বাহুতে লেস ধরে রাখার জন্য আংটা থাকে। এই আংটায়



চিত্র ২.২৬: একটি সরল অপুরীক্ষণ যন্ত্র।

লেজ বসিরে স্থূল এডজাস্টমেন্ট ক্লিপ ঘূরিয়ে দ্রষ্টব্য বস্তুর উপর কোকাস করা যায়। আয়না দিয়ে দ্রষ্টব্য বস্তুতে আলো প্রতিফলিত করে পরীক্ষার কাজ শুরু করতে হবে। যে ভিত্তির উপর যত্নটি দাঁড়িয়ে, সেটিকে পাদদেশ বলে।

২.৫.২ বৌগিক অপুরীক্ষণ যন্ত্র (Compound Microscope)

বৌগিক অপুরীক্ষণ যন্ত্র কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তা জানার পূর্বে এর বিভিন্ন অংশগুলোর নাম জেনে নেওয়া প্রয়োজন। অপুরীক্ষণ যন্ত্রের চিত্রটি লক্ষ করো।

স্ট্যান্ড: এটি বেজ-এর উপর দণ্ডায়মান একটি উল্লম্ব পিলার।

আর্ম: স্ট্যান্ড-এর উপরের দিকে বাঁকানো অংশকে আর্ম বলে।

বেজ: স্ট্যান্ড-এর নিচের দিকে পাটাতলের মতো অংশটির নাম বেজ।

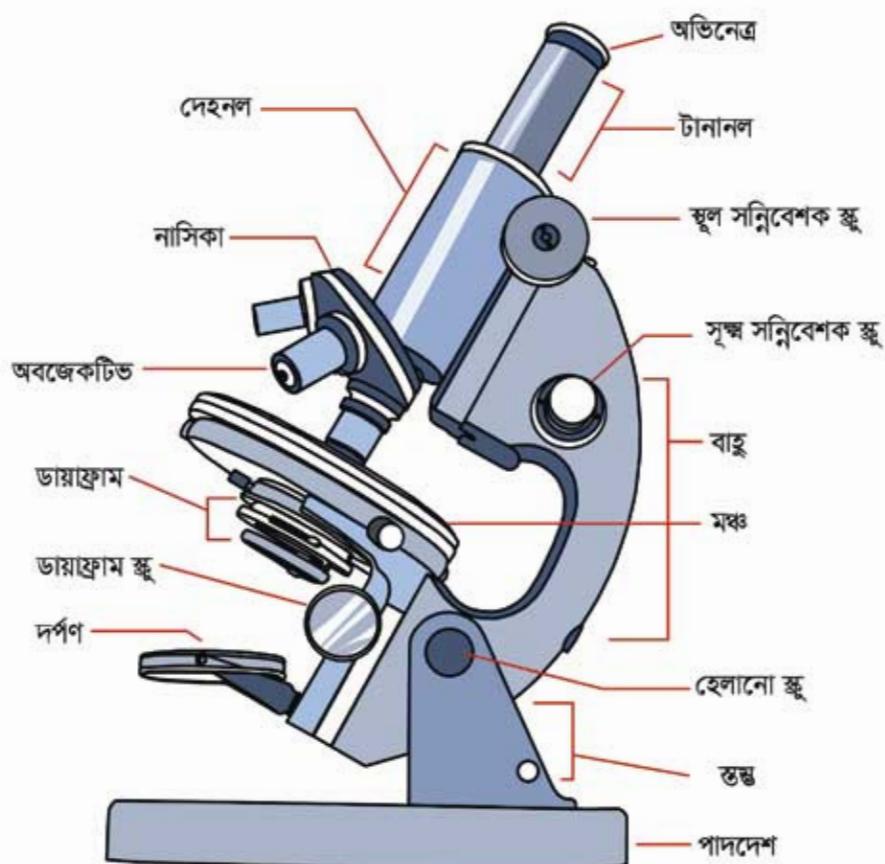
স্টেজ: আর্ম-এর নিচের অংশে স্টেজ লাগানো থাকে।

বড় চিকিৎসা: অপুরীক্ষণ যন্ত্রের উপরের দিককার একটি নলাকার অংশ যার একপাশে আইপিস এবং অপর পাশে অবজেকটিভ লেন্সগুলো লাগানো থাকে।

নোজপিস ও অবজেকটিভ: বড় টিউবের নিচের দিকের ঘূর্ণশীল অংশটিকে নোজপিস বলে। এতে তিনটি অবজেকটিভ (লেন্স) লাগানো থাকে, যথা- লো পাওয়ার অবজেকটিভ ($10\times-12\times$), হাই পাওয়ার অবজেকটিভ ($40\times-45\times$), অয়েল ইমারশন অবজেকটিভ ($100\times$)। কোনো কোনো যন্ত্রে অবশ্য আরও একটি অবজেকটিভ থাকে, যাকে বলে ক্লিনিং অবজেকটিভ ($4\times-5\times$)।

আইপিস: বড় টিউবের উপরের অংশে একটি (monocular) বা দুটি (binocular) আইপিস (লেন্স) লাগানো থাকে। এর বিবর্ণ ক্ষমতা সাধারণত $10\times-12\times$ হয়।

ফাইব্র অ্যাকচুস্টেবেল মুখ: এটি একটি ছোট মুখ। এটিকে দূরবিষ্ণু স্টেজকে উঠা-নামা করানোর মাধ্যমে স্লাইডকে লেন্সের ফোকাস দূরত্বের (focal length) ভিতরে বা বাইরে স্থানান্তর করা যায়। এটিকে অনেকখানি ঘোরালে স্টেজের অল্প একটু সরণ ঘটে অর্থাৎ এটি দিয়ে ফোকাসের সূচক সম্পর্ক করা হয়।



চিত্র 2.27: মৌলিক আলোক অধুরীকৃত যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ

কোর্স অ্যাডজাস্টমেন্ট নব: এটি একটি বড় নব। এটিকে ঘূরিয়ে স্টেজকে উঠা-নামা করানোর মাধ্যমে স্লাইডকে লেঙ্গের ফোকাস দূরত্বের ভিতরে বা বাইরে নেওয়া যায়। এটিকে অল্প ঘোরালেই স্টেজের অনেকখানি সরণ ঘটে অর্থাৎ এটি দিয়ে ফোকাসের স্থূল সমন্বয় করা হয়।

সাবস্টেজ ডায়াফ্রাম ও কনডেঙ্গার: স্টেজের নিচে সাবস্টেজ অবস্থিত যেটা উঠা-নামা করানো যায় এবং এর সাথে একটি কনডেঙ্গার লাগানো থাকে। কনডেঙ্গারের মধ্যে একটি ডায়াফ্রাম বা পর্দা থাকে যেটা কতটুকু আলো কনডেঙ্গারের ভিতরে প্রবেশ করবে তা নির্ধারণ করে।

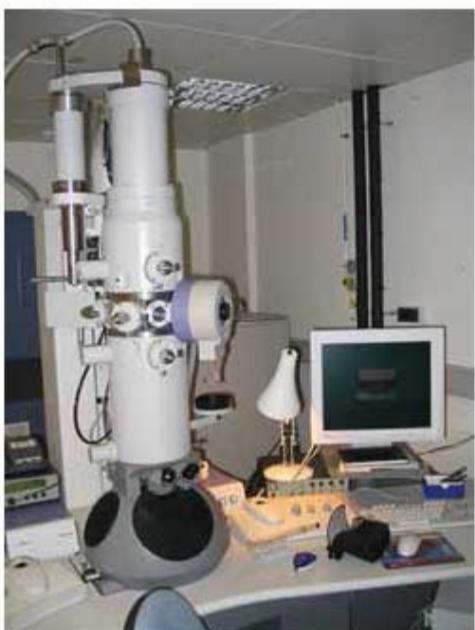
আলোর উৎস: বেস-এর কেন্দ্রে একটি আলোর উৎস থাকে, যেখান থেকে আলো কনডেঙ্গারের মধ্য দিয়ে লেঙ্গে প্রবেশ করে।

যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে প্রাকৃতিক আলো ব্যবহার করতে চাইলে গবেষণাগারের আলোকিত স্থানে এটি স্থাপন করতে হবে। প্রথমেই আয়নাটি এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি মঞ্চটির ছিদ্র বরাবর বসানো কাচের স্লাইডের নিচে প্রতিফলিত হয়। আর যদি কৃত্রিম আলোক উৎস অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অংশ হিসেবে উপস্থিত থাকে, তাহলে শুধু সেটি জ্বালালেই চলবে। যে স্লাইডটি পর্যবেক্ষণ করা হবে তা মঞ্চের ক্লিপের সাহায্যে এঁটে দিতে হবে। এরপর নোজপিস ঘূরিয়ে নিয়ে অবজেকটিভের কম পাওয়ারের লেঙ্গ স্লাইড বরাবর স্থাপন করতে হবে। এবার প্রথমে কোর্স অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রু এবং পরে ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রু ঘূরিয়ে দেখার বস্তুটি ফোকাসে আনতে হবে। এবার বডি টিউবে স্থাপিত আইপিস লেঙ্গে চোখ রেখে দেখতে হবে। প্রয়োজনে ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রু ঘূরিয়ে নেওয়া যাবে। মনোকুলার হোক বা বাইনোকুলার, অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখার সময় দুটি চোখই খোলা রাখার চেষ্টা করতে হবে। প্রথমে কষ্ট হলেও ধীরে ধীরে অভ্যাস হয়ে যাবে। এক চোখে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দেখলে চোখ সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। যদি উচ্চ পাওয়ারের দরকার হয়, তবে অবশ্যই শিক্ষকের সহায়তা নিয়ে নোজপিস ঘূরিয়ে উচ্চ পাওয়ারের লেঙ্গ স্থাপন করতে হবে।

স্টেইনিং (staining)

কোষ বা টিস্যুর পাতলা স্তরকে যখন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা হয়, তখন সেটি যে জলীয় মাধ্যমে অবস্থান করে, তার থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করা মুশকিল। এ সমস্যা সমাধান করার বিভিন্ন উপায় রয়েছে, তার মধ্যে একটি উপায় হলো ওই কোষ বা টিস্যুকে রং করা, যাতে সেই রং দেখে পরিপার্শ্বিকতার সাপেক্ষে তার অবস্থান এবং আকৃতি আলাদা করে চিহ্নিত করা যায়। অনেক সময় এই রঞ্জন প্রক্রিয়া এত সুস্থিতার সাথে করা সম্ভব, যাতে করে শুধু বিশেষ ধরনের কোষ কিংবা কোষের বিশেষ কোনো অংশ বা অঙ্গাণু অথবা টিস্যুর নির্দিষ্ট কোনো উপাদানই কেবল রঙিন হয়। একেই বলে স্লাইড স্টেইনিং। যেসব রঞ্জক পদার্থ দিয়ে স্টেইনিং করা হয়, সেগুলোকে একত্রে স্টেইন (stain) বলে।



চিত্র 2.28: ইলেক্ট্রন অপুরীক্ষণ যন্ত্র

2.5.3 ইলেক্ট্রন অপুরীক্ষণ যন্ত্র (Electron microscope)

বিবর্ধনের জন্য ব্যবহৃত তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যত কম হবে, তত ছোট বস্তুকে বিবর্ধিত করা সম্ভব হবে। সাধারণত বিবর্ধনে ব্যবহৃত তরঙ্গ মৈর্ঝের থাই অর্ধেকের চেয়ে ছোট বস্তু অপুরীক্ষণ যন্ত্রে দেখার মতো করে ফোকাস করা সম্ভব নয়। দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 400-700 ন্যানোমিটারের ঘন্টে থাকে। তাই সবচেয়ে উন্নতমানের আলোক অপুরীক্ষণেও 200 ন্যানোমিটারের থেকে ছোট বস্তুকে বিবর্ধিত করে দেখা যায় না, এমনকি অনেক শক্তিশালী বহুসংখ্যক লেনের সমষ্টি করেও সেটি করা যায় না। ফলে আলোক অপুরীক্ষণে কোবের কোষবিক্রিয়া, নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজম ছাড়া আর কিছু খুব একটা ভাসো করে বোঝা যায় না। সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত অভ্যন্তরীণ প্রযুক্তি আলাদা করে দেখা যায় না।

অভ্যন্তরীণ প্রযুক্তি আলাদা করে দেখা যায় না। এ সমস্যা সমাধানের জন্য দৃশ্যমান আলোর পরিবর্তে ইলেক্ট্রন তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়, কেননা ইলেক্ট্রনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দৃশ্যমান আলোর চেয়ে অনেক ছোট করা সম্ভব। কাচের লেনের পরিবর্তে সেখালে ব্যবহৃত হয় শক্তিশালী ভড়িৎ চূমক, যা ইলেক্ট্রন স্ট্রাইকের গতিপথ বাঁকিয়ে দিতে পারে, ঠিক যেরকম কাচ, আলোকে বাঁকিয়ে দেয়। ফলে কোবের ভিতরকার অভ্যন্তরীণ প্রযুক্তি দেখা সম্ভব হয়। যে অপুরীক্ষণ যন্ত্রে ইলেক্ট্রন তরঙ্গকে ব্যবহার করে বিবর্ধন করা হয়, তাকে ইলেক্ট্রন (ইলেক্ট্রনিক নয়) মাইক্রোস্কোপ (electron microscope) বা ইলেক্ট্রন অপুরীক্ষণ যন্ত্র বলে। উল্লেখ্য, ইলেক্ট্রন তরঙ্গ দিয়ে তৈরি করা ছবি আমরা সবাসবি চোখে দেখতে পাই না। ইলেক্ট্রন অপুরীক্ষণ যন্ত্রের সাথে সংযুক্ত একটি কম্পিউটার ঐ অনুশ ছবিকে আমাদের দেখার উপযোগী ছবিতে পরিণত করে যা, কম্পিউটারের মনিটরে দৃশ্যমান হয়।



একক কাজ

কাজ : অপুরীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উজিদকোব (পেঁয়াজ কোব) পর্যবেক্ষণ কর।

শিক্ষাজ্ঞান উপাদান: পেঁয়াজ, তেজ, শাহিড, কভার লিপ, ওড়াচ ফ্লাস, ফুলি, প্লিসারিন এবং অপুরীক্ষণ যন্ত্র।

পদ্ধতি: পেঁয়াজ থেকে শুকলো খোসাগুলো ছাঢ়িয়ে নাও। এবার যেকোনো একটি স্বীত, ঝসাল শক্তিপন্থ

নাখ। ত্রুটি দিয়ে শুল্কপত্রের উপরিভাগ থেকে সামান্য স্ফুরণ হৃতে নিয়ে শুয়াচ প্লাসের পানিতে রাখ। এবারে স্ফুলির সাহায্যে শুয়াচ প্লাসের পানি থেকে স্ফুরণ হৃতে নিয়ে একটি পরিষ্কার স্লাইডের উপর রাখ। স্ফুরণের উপর এক ফৌটা প্রিসারিন দিয়ে তার উপর ধীরে ধীরে কভার লিপ রাখ।

পর্যবেক্ষণ: মৌগিক অণুবীক্ষণ যত্নের নিষ্পত্তিভাসক্ষম অভিলক (Objective) দিয়ে দেখ। আরতাকার, পাতলা কোষপ্রাচীরমুক্ত কোষ দেখতে পাবে। এবার উচ্চস্ফুরণভাসক্ষম অভিলক দিয়ে দেখ। প্রতিটি কোষে পাতলা দানামুক্ত হোটোপ্লাজম, কোষগহ্বর এবং একপাশে একটি নিষ্টিলিমাস দেখতে পাবে। এবার যা যা দেখলে তার চিয়ে খাতাম এঁকে চিহ্নিত কর।



একক কাজ

কাজ : অণুবীক্ষণ যত্নের সাহায্যে প্রাপিকোষ (অ্যামিবা) পর্যবেক্ষণ কর।

যোজনার উপায়া: অণুবীক্ষণ যত্ন, স্লাইড, কভার লিপ, ছুপার, পেট্রিডিস, সিপেট, কাচের মত, কাচের বাতি এবং পুরুরের তলদেশ থেকে সংগৃহীত ডালপালাসহ পচা পাতা ও পানি।

পদ্ধতি : কাচের শুরুতে কোনো পচা ভোবা বা পুরুরের তলদেশ থেকে ডালপালাসহ পচা পাতা সংগ্রহ কর। এগুলো ছেট ছেট করে কেটে কাচের বাতিতে ঝেখে অল্প পানিসহ কাচের মত দিয়ে আস্তে আস্তে নাড়তে থাক। এভাবে কিছুক্ষণ নেড়ে বাতিটিকে একস্থানে স্থিরভাবে ঝেখে দাও। কাচ পাত্রে তলানি জমলে একটি শিপেট দিয়ে ঐ তলানি তুলে পেট্রিডিসে জমা কর। এবার ছুপার দিয়ে এক ফৌটা তলানি কাচের স্লাইডে তুলে কভার লিপ দিয়ে চালা দেওয়ার পর অণুবীক্ষণ যত্নের নিচে বসাও।

পর্যবেক্ষণ : স্লাইড একটু এদিক সেদিক করে খোঁজাখুঁজি করলেই অ্যামিবা মতো কতগুলো স্ফুরণ জীব দেখতে পাবে। এগুলোই অ্যামিবা। এতে বহু অসম্পদ এবং শহুর দেখতে পাবে এবং কোষটিকে বেটেন করে প্লাজমালেমা নামক একটি পর্দা দেখতে পাবে। এতে উকিলকোষের মতো কোনো প্লাস্টিড থাকে না। উকিলকোষ ও প্রাপিকোষের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখা গেল কি? এবার যা যা দেখলে তার চিয়ে খাতাম এঁকে চিহ্নিত কর।

অনুশীলনী



সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- কোথা কাকে বলে?
- প্লাস্টিজের কাজগুলো কী কী?
- টিসু ও অঙ্গের মধ্যে সম্পর্ক দেখো।
- অন্তঃপ্রস্থ প্রাণিগুরুত্ব কী?
- কোষের প্রতিষ্ঠান কাকে বলে?
- রক্তের কাজ কী?



রচনামূলক প্রশ্ন

- চিকিৎসা মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠন বর্ণনা কর।
- বিভিন্ন ধরনের সরল কলার গঠন এবং কাজের ঝুলনামূলক আলোচনা কর।
- বিভিন্ন ধরনের প্রাণিকলার গঠন এবং কাজ আলোচনা কর।



বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- শাহিসোজোমের কাজ কোনটি?

ক. খান্দ তৈরি	খ. শক্তি উৎপাদন
গ. জীবাণু উৎপন্ন	ঘ. আমিব সংজ্ঞেবণ
- আ্যুধিবা একটি প্রাণিকোষ, কারণ এর-
 - কেন্দ্রিকার গঠন সুসংরূপ
 - বর্ষ গঠনকারী অঙ্গ আছে
 - কোষবিজ্ঞি দেখা যাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্বীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর ধর্মের উত্তর দাও।

রোহিত ধামের বাড়িতে শাখার সময় দেখল একজন লোক পাটগাছ থেকে আঁশ ছাঢ়াচ্ছে।

৩. উদ্বীপকের সংগৃহীত অংশটিকে কোন ধরনের টিস্যু বিস্তৃত?

ক. প্যারেনকাইমা

খ. কোলেনকাইমা

গ. ফ্লোরেনকাইমা

ঘ. ফ্লোরেনকাইমা

৪. উদ্বীপকের সংগৃহীত অংশের টিস্যুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—

i. কোষপ্রাচীন লিগনিনযুক্ত

ii. কোষপ্রাচীনের পুরুষ অসমান

iii. কোষে প্রোটোগ্লাভ অনুপস্থিত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii



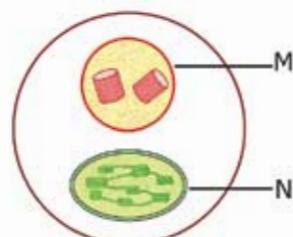
সূজনশীল প্রশ্ন

১. (ক) প্লাজমালেমা কী?

(খ) প্লাস্টিককে বর্ণনাকারী অঙ্গ বলা হয় কেন?

(গ) জীবজগতের জন্য N চিহ্নিত অংশটি পুরুষপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) M চিহ্নিত অংশটির অনুপস্থিতিতে জীবসদেহ কী ধরনের সমস্যা দেখা দিবে তা বিশ্লেষণ করো।

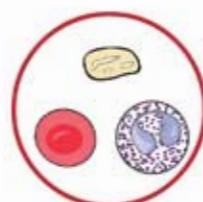
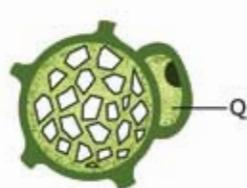


২. ক. পেশি টিস্যু কী?

খ. স্কেলিটোল টিস্যু কীভাবে মস্তিষ্ককে ঝুঁকা করে?

গ. চিয়ের Q চিহ্নিত অংশটির ঐতুগ অবস্থানের কাঙ্গাল ব্যাখ্যা করো।

ঘ. চিয়ে A ও B-এর মধ্যে একটি পরিবহন কাজ ছাড়াও অন্যান্য জৈবিক কাজে কীভাবে সূমিকা রাখে শুভিসহ ব্যাখ্যা করো।

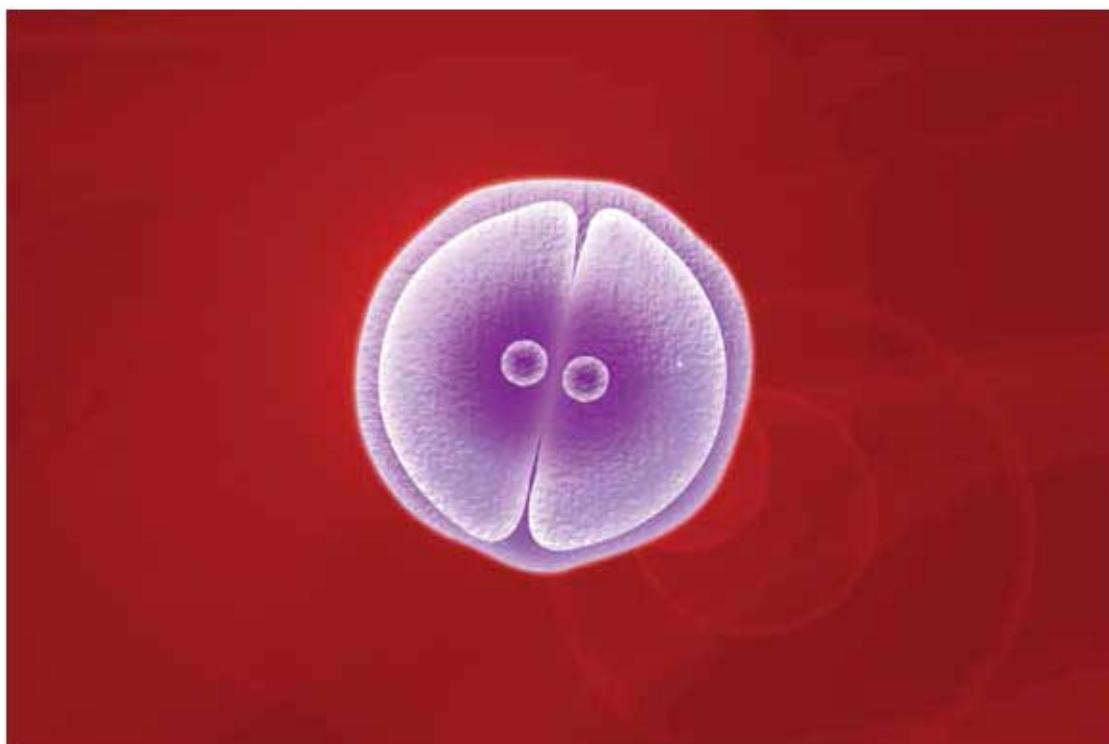


চিয়ে - A

চিয়ে - B

ভূতীয় অধ্যায়

কোষ বিভাজন



এককোষী জীব থেকে শুরু করে বহুকোষী জীব পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই নানা ধরনের কোষ বিভাজন দেখা যায়। এগুলোর কোনোটি দেহবৃদ্ধি ঘটায়, কোনোটি জননকোষ সৃষ্টি করে, আবার কোনোটি ইবিভাজন পদ্ধতিতে সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এই বিভিন্ন ধরনের কোষ বিভাজন কীভাবে হয়ে থাকে, এ সম্বর্কে আমরা এ অধ্যায়ে জ্ঞানার চেষ্টা করব।



এই অধ্যার পাঠ শেষে আমরা-

- কোষ বিভাজনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কোষ বিভাজনের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারব।
- মাইটোসিস ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মাইটোসিসের পর্যায়সমূহ বর্ণনা করতে পারব।
- জীবদেহে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- মিয়োসিস ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জননকোষ উৎপাদনে মিয়োসিসের তাত্পর্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষায় কোষ বিভাজনের অবসান উপলব্ধি করতে পারব।

৩.১ কোষ বিভাজন এবং তার প্রকারভেদ (Cell Division and its Classifications)

প্রতিটি জীবদেহ কোষ দিয়ে তৈরি। একটিমাত্র কোষ দিয়ে প্রতিটি জীবের জীবন শুরু হয়। বিভাজনের মাধ্যমে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি জীবদেহের একটি স্বাভাবিক এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কোনো কোনো জীবের দেহ একটিমাত্র কোষ দিয়ে গঠিত, এদের বলা হয় এককোষী (unicellular) জীব, যেমন ব্যাকটেরিয়া, অ্যামিবা, প্লাজমোডিয়াম ইত্যাদি। এককোষী জীব বিভাজনের মাধ্যমেই একটি থেকে অসংখ্য এককোষী জীব উৎপন্ন করে। আবার অনেক জীব একাধিক কোষ দিয়ে গঠিত। এদের বলা হয় বহুকোষী (multicellular) জীব। মানুষ, বট গাছ, তিমি মাছ ইত্যাদি জীব কোটি কোটি কোষ দিয়ে গঠিত। বিশালদেহী একটি বট গাছের সূচনাও ঘটে একটি মাত্র কোষ (জাইগোট বা নিষিণ্ড ডিম্বাণু) থেকে। এককোষী নিষিণ্ড ডিম্বাণু থেকে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় একসময় কোটি কোটি কোষের একটি পরিণত মানুষের সৃষ্টি হয়। আবার কোষ বিভাজনের মাধ্যমেই পুঁঁ ও স্ত্রী গ্যামেট সৃষ্টি হয়ে নতুন প্রজননের জন্ম হয়। জীবের বৃদ্ধি ও প্রজননের উদ্দেশ্যে কোষ বিভাজনের (cell division) মাধ্যমে কোষের সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে থাকে।

জীবদেহের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া হচ্ছে, মাইটোসিস (Mitosis) এবং মিয়োসিস (Meiosis)।

৩.২ মাইটোসিস (Mitosis)

এই কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় প্রকৃত বা সুকেন্দ্রিক কোষ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় বিস্তৃত হয়ে দুটি অপ্ত্য কোষে পরিণত হয়। মাইটোসিসে নিউক্লিয়াস প্রায় সমানভাবে একবার বিভাজিত হয়। নিউক্লিয়াসের প্রতিটি ক্রোমোজোমও একবার করে বিভাজিত হয়। সাইটোপ্লাজমও বিভাজিত হয় একবারই। তাই মাইটোসিস বিভাজনে কোষের মাত্রকোষ এবং অপ্ত্য কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা, তথা DNA-এর পরিমাণ সমান থাকে। শুধু যে পরিমাণে একই থাকে তা নয়, মাত্রকোষের DNA-এর প্রায় তুবহু অনুলিপি অপ্ত্য কোষে পাওয়া যায়। একে সমীকরণিক বিভাজনও বলে। এই বিভাজন প্রকৃত নিউক্লিয়াসযুক্ত জীবের দেহকোষে (somatic cell) হয়ে থাকে এবং বিভাজনের ফলে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণী এবং উদ্ভিদ দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে বৃদ্ধি পায়। প্রাণীর দেহকোষে এবং উদ্ভিদের বর্ধনশীল অংশের ভাজক টিস্যু, যেমন: কাণ্ড, মূলের অগ্রভাগ, ভূগর্ভস্থ এবং ভূগর্ভস্থ, বর্ধনশীল পাতা, মুকুল ইত্যাদিতে মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজন হয়। নিমফ্রেশনির উদ্ভিদ এবং প্রাণীর অয়ৌন জননের সময়ও এ ধরনের বিভাজন হয়।

୩.୨.୧ ମାଇଟୋସିସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବୂଦ୍ଧ

ମାଇଟୋସିସ କୋଷ ବିଭାଜନ ଏକଟି ଅବିଜ୍ଞମ ବା ଧାରାବାହିକ ପାଇଁ ଥିଲା । ଏହି ବିଭାଜନେ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାରିଓକାଇନେସିସ ଅର୍ଦ୍ଧାଂ ନିଡ଼ିକ୍ଲିଯାସେର ବିଭାଜନ ଘଟେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ ସାଇଟୋକାଇନେସିସ ଅର୍ଦ୍ଧାଂ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମେର ବିଭାଜନ ଘଟେ । ବିଭାଜନ ଶୁଭ୍ର ଆଶେ କୋଷେର ନିଡ଼ିକ୍ଲିଯାସେ କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଭିତ୍ୟମୂଳକ କାଜ ହୁଏ । ଏ ଅବଧାରେ ଇନ୍ଟାରଫେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଲେ । ବର୍ଣନାର ସୁବିଧାର ଜଳ୍ୟ ମାଇଟୋସିସର ନିଡ଼ିକ୍ଲିଯାସେର ବିଭାଜନ ପାଇଁ କୋଷକେ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥା କରା ହେଁ ଥାକେ, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତଗୁଲୋ ହେଁ; ପ୍ରୋଫେଜ, ପ୍ରୋ-ମୋଟାଫେଜ, ମୋଟାଫେଜ, ଅୟାନାଫେଜ ଏବଂ ଟେଲୋଫେଜ ।

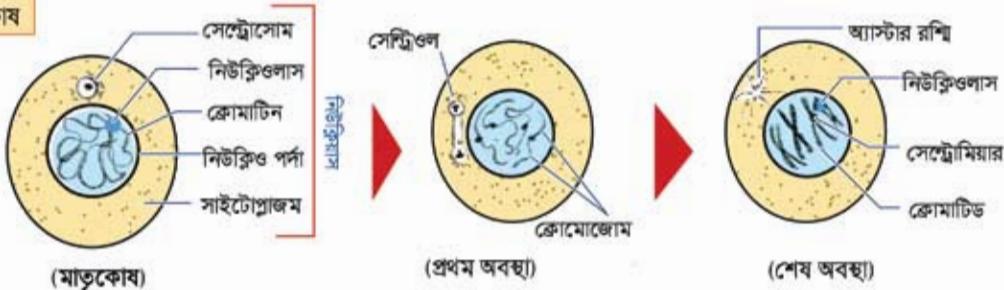
(ପ୍ରୋଫେଜ) (Prophase)

ଏହି ମାଇଟୋସିସର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଷେର ନିଡ଼ିକ୍ଲିଯାସ ଆକାରେ ବଢ଼ି ହୁଏ ଏବଂ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଥିବା ପାଣି ହ୍ରାସ ପେତେ ଥାକେ । ଏର ଫଳେ କ୍ରୋମୋଜୋମଗୁଲୋ ଆଲ୍ଟ ସର୍କୁଟିତ ହୁଏ ଯୋଟି ଏବଂ ଥାଟୋ ହତେ ଶୁଭ୍ର କରେ । ବୌଲିକ ଅଧ୍ୟବିକଳ ସର୍ବେ ତଥନ ଏଦେର ଦେଖା ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁ କ୍ରୋମୋଜୋମ ସେନ୍ଟ୍ରୋମିଆର ବ୍ୟତୀତ ଲହାଲହି ଦୂରାବେ ବିଭଜନ ହୁଏ ଦୁଟି କ୍ରୋମାଟିଡ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ । କ୍ରୋମୋଜୋମଗୁଲୋ କୁଣ୍ଡଲିତ ଅବଧାର ଥାକାଯ ଏଦେର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ନା କରା ଯାଏ ନା ।

ଉତ୍ତିଦକୋଷ



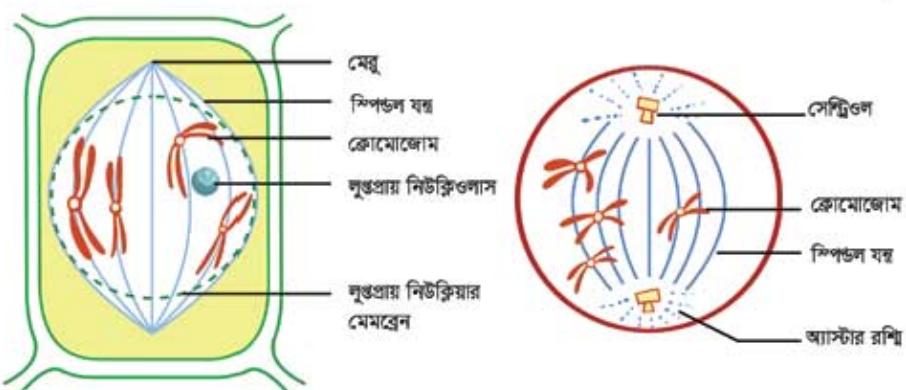
ପ୍ରାଣିକୋଷ



ଚିତ୍ର ୩.୦୧-୦୨: ପ୍ରୋଫେଜ

(b) প্রো-মেটাফেজ (Pro-metaphase)

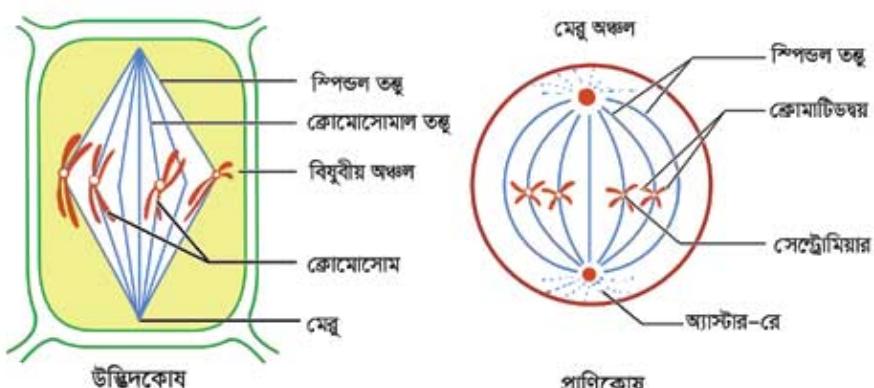
এ পর্যায়ের একেবারে প্রথম দিকে উত্তিস্থানে ক্রতৃপক্ষে ক্রতৃপক্ষে তন্তুয়ের প্রোটিনের সমষ্টিয়ে দুই মেরু বিশিষ্ট স্পিন্ডল যত্তের (spindle apparatus) সৃষ্টি হয়। স্পিন্ডল যত্তের দুই মেরুর মধ্যবর্তী স্থানকে ইকুয়েটর বা বিষুবীয় অক্ষল বলা হয়। কোষকক্ষকাসের ঘাইক্লোটিভিউল দিয়ে তৈরি স্পিন্ডলযত্তের তন্তুগুলো এক



চিত্ৰ ৩.০৩: প্রো-মেটাফেজ

মেরু থেকে অপৰ মেরু পৰ্যন্ত বিস্তৃত, এদেৱকে স্পিন্ডল তন্তু (spindle fibre) বলা হয়। এ পর্যায়ে ক্রোমোজোমসের সেন্ট্রোমিয়ার স্পিন্ডলযত্তের কিছু নির্দিষ্ট তন্তুর সাথে সংযুক্ত হয়। এই তন্তুগুলোকে আকৰ্ষণ তন্তু (traction fibre) বলা হয়। ক্রোমোজোমের সাথে এই তন্তুগুলি সংযুক্ত বলে এদেৱ ক্রোমোসোমাল তন্তুণ বলা হয়। ক্রোমোজোমগুলো এ সময়ে বিষুবীয় অক্ষলে বিস্তৃত হতে থাকে। কোষেৱ নিউক্লিয়াসেৱ নিউক্লিয়ার মেম্ব্ৰেন ও নিউক্লিওলাসেৱ বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। প্রাণিকোষে স্পিন্ডল যজ্ঞ সৃষ্টি হাজার পূৰ্বে বিস্তৃত সেন্ট্রিউল সূচি দুই মেরুতে অবস্থান কৰে এবং সেন্ট্রিউল দুটিৰ চারপিক থেকে রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। একে অ্যাস্টের-রে বলে।

(c) মেটাফেজ (Metaphase)

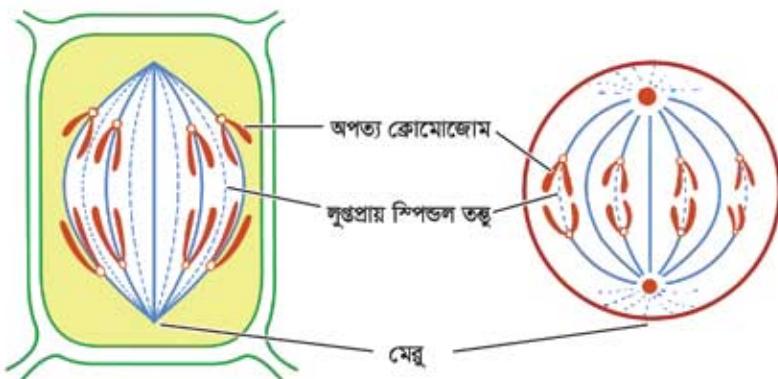


চিত্ৰ ৩.০৪: মেটাফেজ

এ পর্যায়ের প্রথমেই সব ক্রোমোজোম স্পিলস ঘৰের বিশুবীয় অঞ্চলে (দুই মেরুর মধ্যাখানে) অবস্থান করে। প্রতিটি ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার বিশুবীয় অঞ্চলে এবং বাহু দুটি মেরুমুখী হয়ে অবস্থান করে। এ পর্যায়ে ক্রোমোজোমগুলো সর্বাধিক মোটা এবং খাটো হয়। প্রতিটি ক্রোমোজোমের ক্রোমাটিড দুটির আকর্ষণ করে যায় এবং বিকর্ষণ শুরু হয়। এ পর্যায়ের শেষ দিকে সেন্ট্রোমিয়ারের বিভাজন শুরু হয়। নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন এবং নিউক্লিওলাসের সঙ্গীর্ণ বিলুপ্তি ঘটে।

(d) অ্যানাফেজ (Anaphase)

প্রতিটি ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, ফলে ক্রোমাটিড দুটি আলাদা হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় প্রতিটি ক্রোমাটিডকে অপজ্য ক্রোমোজোম বলে এবং এতে একটি করে সেন্ট্রোমিয়ার থাকে। অপজ্য ক্রোমোজোমগুলো বিশুবীয় অঞ্চল থেকে পরস্পর বিপরীত মেরুর দিকে সরে যেতে থাকে। অর্থাৎ ক্রোমোজোমগুলোর অর্ধেক এক মেরুর দিকে এবং বাকি অর্ধেক অন্য মেরুর দিকে অবস্থার

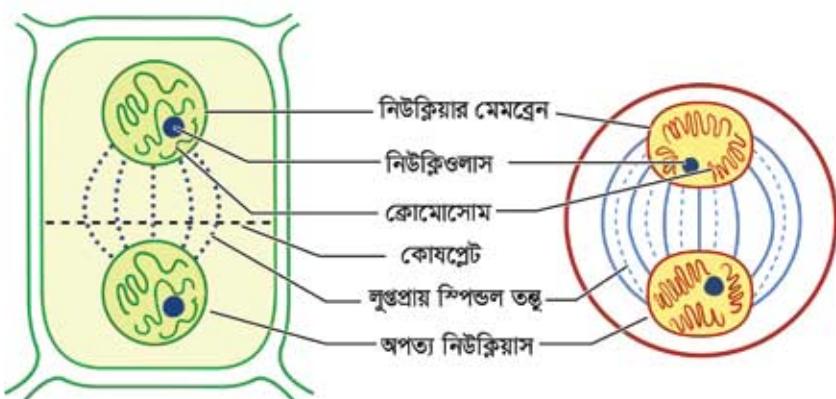


চিত্র 3.05: অ্যানাফেজ

হতে থাকে। অপজ্য ক্রোমোজোমের মেরু অভিশুর্ভী চলনে সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলামী থাকে এবং বাহুবয় অনুগামী হয়। সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোজোমগুলো V, L, J বা I-এর মতো আকার ধারণ করে। এদেরকে ঘৰাকুমে মেটাসেন্ট্রিক, সাবমেটাসেন্ট্রিক, আক্রোসেন্ট্রিক বা টেলোসেন্ট্রিক বলে। অ্যানাফেজ পর্যায়ের শেষের দিকে অপজ্য ক্রোমোজোমগুলো স্পিলসযোজের মেরুপাস্তে অবস্থান নেয় এবং ক্রোমোজোমের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেতে থাকে।

(e) টেলোফেজ (Telophase)

এটি মাইটোসিসের শেষ পর্যায়। এখানে শ্রোফেজের ঘটনাগুলো পর্যাকুমে বিপরীতভাবে ঘটে। ক্রোমোজোমগুলোতে পানি যোজন ঘটতে থাকে এবং সরু ও লম্বা আকার ধারণ করে।



চিত্র ৩.০৬: টেলোফেজ

অবশেষে একা অভিযানে গিয়ে নিউক্লিয়ার রেটিভুলাম গঠন করে। নিউক্লিওলাসের পুনরাবির্ভাব ঘটে। নিউক্লিয়ার রেটিভুলামকে ধীরে পুনরায় নিউক্লিয়ার মেম্ব্ৰেনের সৃষ্টি হয়, কলে দুই স্বেচ্ছতে দুটি অপত্য নিউক্লিয়াস গঠিত হয়। শিখলায়ের কাঠামো ক্ষেত্রে পড়ে এবং তন্তুগুলো ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যাব। টেলোফেজ পর্যায়ের শেষে বিশুদ্ধীয় তলে একোষ্ট্রাজিক জালিকার দূষ অবশ্যিক ছাঁচা হয় এবং পরে একা মিলিত হয়ে কোষপ্রেট গঠন করে। সাইটোল্যাজিক অভাসুসমূহের সমবর্টন ঘটে। কলে দুটি অপত্য কোষ (daughter cell) সৃষ্টি হয়। প্রাণীৰ ক্ষেত্রে শিখলায়ের বিশুদ্ধীয় অবশ্য বৰাবৰ কোষক্ষিপ্তি গঠনের মতো ভিত্তিতে দিকে ঢুকে যাব এবং এ গৰ্ত স্বাদিক থেকে ক্রমাবৰ্ত্তে পঞ্চান্তর হয়ে একজো মিলিত হয়, কলে কোষটি দুভাগে ভাগ হয়ে পড়ে।



দলগত কাজ

কাজ : সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুসারে বিভিন্ন ধরনের ক্রোমোজোমের মডেল নির্মাপ।

ধৰণোভৱনীৰ উৎকৃষ্ট : দড়ি বা সূতা, আর্ট পেপার, আঠা, স্কচেটপ, কাটিৱ, সাইনপেন ইত্যাদি।

পদ্ধতি : প্রথমে আমুৱা তৈরি কৰব যেটাকেজ দশায় দৃশ্যমান ক্রোমোজোমের মডেল। একই দৈর্ঘ্যের দড়ি বা সূতার দুটি টুকুৱো নাও। এই টুকুৱা দুটো হলো একই ক্রোমোজোমের দুটি সিটিটাৰ ক্রোমাটিডের মডেল। এমনভাৱে এদেৱকে গিটি দাও যাতে গিটিটি উভয়ের দৈর্ঘ্যের মাঝখালে পড়ে। গিটিটি হলো সেন্ট্রোমিয়ার মডেল। ঠিকমতো মাঝখালে গিটিটি দিকে পাৰলে বা পাৰওয়া থাবে তা হলো একটি মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোমের মডেল, যাৰ সেন্ট্রোমিয়াৰ থেকে চাৰটি বাহু বেৰ হয়ে আছে বলে মনে হয়। চাৰ বাহুৰ দুটি হলো একটি ক্রোমাটিডের আৰ অপৰ দুটি অপৰ ক্রোমাটিডের। সবগুলো বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য সমান। একইভাৱে আৱও দুই টুকুৱো সমান মাপেৰ দড়ি বা

ମୁଣ୍ଡା ନିର୍ମାଣ ସାଥୀନାମ ଥେବେ ଏକଟୁ ସରିଯେ ଗିଟ ଦିଲେ ସାବମେଟୋସେଟ୍ରିକ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ୟର ମଜ୍ଜେଳ ତୈରି କର । ଆମ୍ବର ଖୁବ ନିକଟେ ଗିଟ ଦିଲେ ତୈରି ହବେ ଆକ୍ରୋସେଟ୍ରିକ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ୟର ମଜ୍ଜେଳ । ଏକଦିନ ଆମ୍ବର ବନି ଗିଟ ଦେଖିଯା ହୁଏ ତାହଲେ ସେଟୀ ହବେ ଟେଲୋସେଟ୍ରିକ । ଏବାର ଚାର ଧରନେର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ୟର ମଜ୍ଜେଳ ଏକଟି ଆର୍ଟପେଶାରେ ଆଠା ବା କ୍ରଚ୍ଟଟେପ ଦିଲେ ଲାଗାଏ । ସାଇନପେନ ଦିଲେ କୋନଟି କୀ ତା ଦେଖ ଏବଂ ଅର୍ଥଗୁଲୋ ଲେବେଳ କର । ଲେବେଳେ ଅବଶ୍ୟକ ଯେଟାକେଜ କଥାଟି ଉତ୍ସର୍ଜିତ କରିବେ ।



ତିବ ୩.୦୭: ସେଟ୍ରୋମିଆରେ ଅବଶ୍ୟକ ଅନୁମାନ ଯେଟାକେଜ ଦଶାଯ ମୃଦ୍ଦୟାନ ଧରନେର କ୍ରୋମାଟିଜେର ମଜ୍ଜେଳ । ବାଯ ଥେବେ ଜାଲ: ଯେଟାସେଟ୍ରିକ, ସାବମେଟୋସେଟ୍ରିକ, ଆକ୍ରୋସେଟ୍ରିକ ଏବଂ ଟେଲୋସେଟ୍ରିକ ।

ଏବାର ଏକଇଭାବେ ଏନାକେଜ ଦଶାଯ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍, ଅର୍ଦ୍ଧ କ୍ରୋମାଟିଜ୍‌ଗୁଲୋକେ କେମନ ଦେଖି ଯାଇ ତାର ମଜ୍ଜେଳ ବାନାତେ ହବେ । ଏହଙ୍କି ଥିଥେ ଯେଟାକେଜ ଦଶାଯ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ୟର ମଜ୍ଜେଳ ବାନାଏ । ଯେଟାସେଟ୍ରିକ, ସାବମେଟୋସେଟ୍ରିକ, ଆକ୍ରୋସେଟ୍ରିକ ଏବଂ ଟେଲୋସେଟ୍ରିକ – ଚାରଟିଇ । ଏନାକେଜ ଦଶାଯ ସେଟ୍ରୋମିଆର ବରାବର ପ୍ରତିଟି କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଏମନଭାବେ ଦୁଇ ଭାଗେ ବିଭଜନ ହେବେ ଯାଇ ଯାତେ ଏକଟି ଭାଗେ କେବଳ ଏକଟି କ୍ରୋମାଟିଜ ପଡ଼େ । ଯାରେ ନିର୍ମାଣ ଯାଇ ଯେଟାସେଟ୍ରିକ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥେବେ ପ୍ରାପ୍ତ କ୍ରୋମାଟିଜ ଦୂଟିର ପ୍ରତିଟିଇ ଦେଖିତେ ଇଂରେଜି V ବର୍ଣ୍ଣର ମଜ୍ଜେ ସେହେତୁ ତାର ସେଟ୍ରୋମିଆର ଧାକେ କ୍ରୋମାଟିଜେର ଠିକ ଯାବାକାନ । ଯାବାକାନ ଥେବେ ଏକଟୁ ପାଶେର ଦିକେ ଧାକା ସେଟ୍ରୋମିଆରିବିଶିଷ୍ଟ ସାବମେଟୋସେଟ୍ରିକ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥେବେ ଅନୁରୂପଭାବେ ଅର୍ଦ୍ଧକ କରେ କେଟେ ଆଶାଦ କରା କ୍ରୋମାଟିଜେର ଚେହାରା ହବେ ଇଂରେଜି L ବର୍ଣ୍ଣର ମଜ୍ଜେ । ଏକଇଭାବେ ଆକ୍ରୋସେଟ୍ରିକ ଓ ଟେଲୋସେଟ୍ରିକ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥେବେ ପ୍ରାପ୍ତ କ୍ରୋମାଟିଜ ହବେ ଯଥାକ୍ରମେ ଇଂରେଜି J ଏବଂ I ବର୍ଣ୍ଣର ମଜ୍ଜେ । ଏବାର ଚାର ଧରନେର କ୍ରୋମାଟିଜେର ମଜ୍ଜେଳ ଏକଟି ଆର୍ଟପେଶାରେ ଆଠା ବା କ୍ରଚ୍ଟଟେପ ଦିଲେ ଲାଗାଏ । ସାଇନପେନ ଦିଲେ କୋନଟି କୀ ତା ଶିଖ ଏବଂ ଅର୍ଥଗୁଲୋ ଲେବେଳ କର । ଲେବେଳେ ଅବଶ୍ୟକ ଏନାକେଜ କଥାଟି ଉତ୍ସର୍ଜିତ କରିବେ ।

ତାରପର ଟ୍ରେଡିଂ ଆର୍ଟପେଶାରେ ଦେଖାଲୋ ମଜ୍ଜେଳ ଟ୍ରେପିକକେ ଥିର୍ମରିନ କର । କୋନ ଧରନେର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ବା କ୍ରୋମାଟିଜ ଯେଟାକେଜ ବା ଏନାକେଜ ଦଶାଯ କେମନ ଚେହାରା ନେଇ, ତାର କାରଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।

মাইটোসিসের গুরুত্ব

জীবদেহে মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজনের কারণে প্রতিটি কোষের নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজমের মধ্যকার আয়তন ও পরিমাণগত ভারসাম্য রক্ষিত হয়। এর ফলে বহুকোষী জীবের দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে। সব বহুকোষী জীবই জাইগোট নামক একটি কোষ থেকে জীবন শুরু করে। এই একটি কোষই বারবার মাইটোসিস বিভাজনের ফলে অসংখ্য কোষ সৃষ্টির মাধ্যমে পূর্ণ জীবে পরিণত হয়। আপাতদ্রুতিতে মনে হতে পারে, একটি থেকে দুটি, দুটি থেকে চারটি, চারটি থেকে আটটি, এভাবে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে একটি কোষ থেকে সম্পূর্ণ একটি জীব (যেমন: মানুষ, প্রায় 30 ট্রিলিওন কোষ) গঠিত হতে বুঝি অনেক লম্বা সময় প্রয়োজন। কিন্তু সেটি সত্ত্বেও নয়। যদি বৃদ্ধির জন্য দরকারি পুঁতির সরবরাহ অক্ষুণ্ন থাকে, সবগুলো কোষই বিভাজনক্ষম হয় এবং প্রতিবার বিভাজনে যদি একদিন করে সময় লাগে বলে ধরে নিই, তবু মাত্র 40-50 দিনের মাথায় মানবদেহের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কোষ তৈরি হয়ে যাবে। মাইটোসিসে তৈরি অপত্য কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা ও গুণাগুণ একই রকম থাকায় জীবের দেহের বৃদ্ধি সুশৃঙ্খলভাবে হতে পারে। মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি করে, মাইটোসিসের ফলে অঙ্গজ প্রজনন সাধিত হয় এবং জননকোষের সংখ্যাবৃদ্ধিতে মাইটোসিস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্ষতস্থানে নতুন কোষ সৃষ্টির মাধ্যমে জীবদেহের ক্ষতস্থান পূরণ করতে মাইটোসিস অপরিহার্য। কিছু কিছু জীবকোষ আছে যাদের আয়ুস্কাল নির্দিষ্ট। এসব কোষ বিনষ্ট হলে মাইটোসিসের মাধ্যমে এদের পূরণ ঘটে। মাইটোসিসের ফলে একই ধরনের কোষের উৎপত্তি হওয়ায় জীবজগতের গুণগত বৈশিষ্ট্যের স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। তবে অনিয়ন্ত্রিত মাইটোসিস টিউমার এমনকি ক্যাঙ্গার সৃষ্টির কারণ হতে পারে।

টিউমার, ক্যাঙ্গার এ শব্দগুলোর সাথে আমরা সবাই পরিচিত। এগুলো অস্বাভাবিক কোষ বিভাজনের ফল। মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি থেকে দুটি, দুটি থেকে চারটি এভাবে কোষের সংখ্যা বাড়তে থাকে। কিন্তু কোষ বিভাজন প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রিত থাকে। কোনো কারণে এই নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হয়ে গেলে অস্বাভাবিকভাবে কোষ বিভাজন চলতে থাকে। এর ফলে টিউমার সৃষ্টি হয় এবং প্রাণঘাতী টিউমারকে ক্যাঙ্গার বলে।

ক্যাঙ্গার কোষ এই নিয়ন্ত্রণহীন অস্বাভাবিক কোষ বিভাজনেরই ফল। গবেষণায় দেখা গেছে, বিভিন্ন ধরনের রোগজীবাণু, কেমিক্যাল কিংবা তেজস্ক্রিয়তা ক্যাঙ্গার কোষ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। সহস্রাধিক জিনকে ক্যাঙ্গার কোষ তৈরিতে সহায়ক হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। উদাহরণ দেওয়ার জন্যে বলা যায়, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের E6 এবং E7 নামের দুটি জিন এমন কিছু প্রোটিন সৃষ্টি করে, যা কোষ বিভাজন নিয়ন্ত্রক প্রোটিন অণুসমূহকে স্থানচ্যুত করে। এর ফলে কোষ বিভাজনের নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হয়ে যায় এবং সৃষ্টি হয় জরায়ুমুখের টিউমার। অনেক সময় এ দুটি জিন পোষক কোষের জিনের সাথে একীভূত হয়ে যায় এবং কোষের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী প্রোটিন অণুগুলোর কাজ বন্ধ করে দেয়। সৃষ্টি হয় ক্যাঙ্গার কোষ, কিংবা ক্যাঙ্গার।

ଅଲେକ ଥରନ୍ସର କ୍ୟାଲାର ରମ୍ପେହେ ଏବଂ ସେଗୁଲୋ ସବେଇ କମବେଳି ମାର୍ଗବ୍ୟକ ଗୋପ । ଶିତାର, ମୁସମୁଲ, ମନ୍ତିକ, ସତନ, ହୃଦ, କୋଲନ ଏବଂ ଜୟାମ୍ବ, ଅର୍ଧା ମେହେର ପ୍ରାୟ ସକଳ ଆଜେଇ କ୍ୟାଲାର ହତେ ପାରେ ।

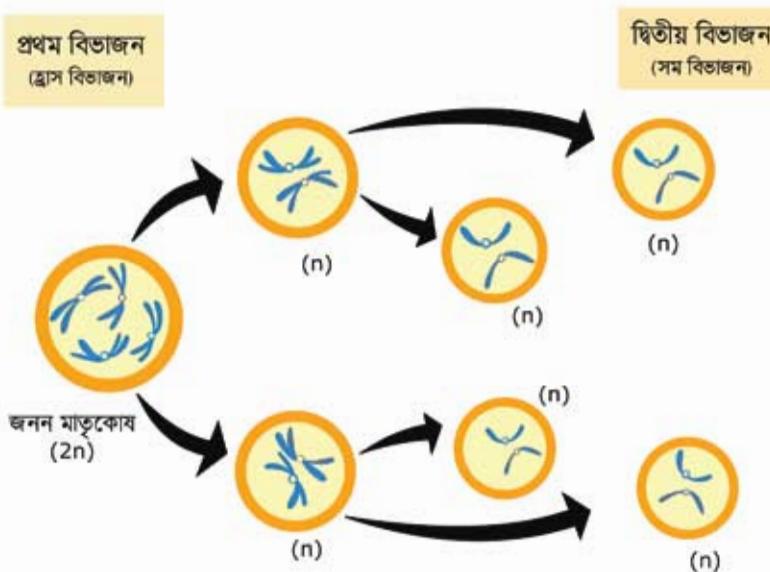


ଦଳଗତ କାଜ

କାଜ: ଶିକ୍ଷକ କରେକଜନ କରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଯେ ଦଳ ଗଠନ କରିବେଳ ଏବଂ ଏକ ଏକ ଦଳକେ ମାଇଟୋସିସ କୋଷ ବିଭାଜନେର ଏକ ଏକଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ର ଅଳକନ କରେ ଶ୍ରେଣିତେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତେ ବଲବେଳ ।

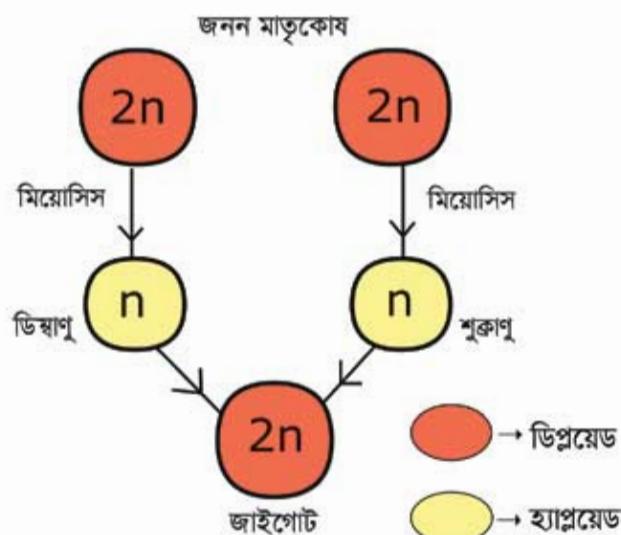
୩.୩ ମିୟୋସିସ (Meiosis)

ମିୟୋସିସ ବିଭାଜନେର ଏକ ଚକ୍ର ନିউଡ଼ିକ୍ଲିସ୍ସ ଦୂରାର ବିଭାଜିତ ହୁଏ । ପ୍ରଥମବାରେ ନିଉଡ଼ିକ୍ଲିସ୍ସେର କ୍ରୋମୋଜୋମ ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଧେକ ହସେ ଥାଏ । ଏହି ବିଭାଜନେ ମାତୃକୋଷେ ସେ ଦୁଟି ନିଉଡ଼ିକ୍ଲିସ୍ସ ପାଇଁ ଥାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟବାରେ ତାର ପ୍ରତିଟିଇ ଆବାର ଦୁଟି କୋଷେ ବିଭାଜିତ ହୁଏ । ଏବାର ଅବଶ୍ୟ କ୍ରୋମୋଜୋଜୋମ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପରିମାଣ ସମାନ ଥାକେ । ତାହିଁ ସବ ମିଳିଯେ ଚାଢାନ୍ତ ଫଳ ହଲୋ, ମିୟୋସିସ ବିଭାଜନେ ଏକଟି ମାତୃକୋଷ ଥେକେ ଚାରଟି ଅପଞ୍ଜ କୋଷ ପାଇଁ ଥାଏ, ସେଗୁଲୋର ପ୍ରତିଟିଇ ମାତୃକୋଷେ ଅର୍ଦ୍ଧକସଂଖ୍ୟକ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଧାରଣ କରେ (କାଜେଇ DNA-ର ପରିମାଣ ହୁଏ ଥାଏ ଅର୍ଦ୍ଧ) । ତାହିଁ ମିୟୋସିସେର ଆର୍ଦ୍ଧକ ନାମ ହ୍ରାସମୂଳକ ବିଭାଜନ ।



ଛିତ୍ର ୩.୦୪: ମିୟୋସିସ ବିଭାଜନ ସମୟରେ ଥାରଣ୍ତି

প্রশ্ন হচ্ছে মিয়োসিস কেন হয়? মাইটোসিস কোষ বিভাজনে অপর্যাপ্ত কোষগুলোর ক্রোমোজোম সংখ্যা মাত্রকোষের সমান থাকে। বৃদ্ধি এবং অযৌন জননের জন্য মাইটোসিস কোষ বিভাজন অপরিহার্য। যৌন জননে পুরুষ ও মহিলা জনন কোষের মিলনের প্রয়োজন হয়। যদি জনন কোষগুলোর ক্রোমোজোম সংখ্যা সেহসকোষের সমান থেকে বান্ধ তা হলে জাইগোট কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা জীবটির সেহসকোষের বিশুণ হয়ে যাবে। মনে কর, একটা জীবের সেহসকোষে এবং জনন কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা চার (4)। পুরুষ ও মহিলা জনন কোষের মিলনের ফলে সূচী জাইগোটে ক্রোমোজোম সংখ্যা দৌড়াবে আট (8) এবং নতুন জীবটির প্রতিটি কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা হবে আট, যা মাতৃজীবের কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার বিশুণ। যদি প্রতিটি জীবের জীবনচক্র এভাবে চলতে থাকে তাহলে প্রতি চক্রে বৌন জননের ফলে ক্রোমোজোম সংখ্যা বারবার বিশুণ হতে থাকবে। আমরা জানি, ক্রোমোজোম জীবের বৈশিষ্ট্য নিরূপণকারী জিন বহন করে। কাজেই ক্রোমোজোম সংখ্যা বিশুণ হতে থাকলে বশনধরনের মধ্যে আয়ুর পরিবর্তন ঘটে যাবে। যেহেতু পুরুষ ও মহিলা জনন কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা অর্ধেক, তাই জীবের বৌনজননে পুরুষ ও মহিলা জনন কোষের মিলন হয়ে জাইগোটে পূর্ণসংখ্যক ক্রোমোজোম পাওয়া যাবে। এভাবে জীবের ক্রোমোজোম সংখ্যা বৎসরপঞ্চায়া একই থাকে। জনন কোষ সৃষ্টির সময় এবং নিমফেলি উত্তিসের জীবনচক্রের কোনো এক সময় ঘর্ষন এ রূক্ষ ঘটে, তখন কোষের অর্ধেক ক্রোমোজোম সংখ্যার সে অবস্থাকে হ্যাপ্লোড (n) বলে। যখন দুটি হ্যাপ্লোড কোষের মিলন ঘটে, তখন সে অবস্থাকে ডিপ্লোড ($2n$) বলে। অর্ধেক মিয়োসিস কোষ বিভাজন হয় বলেই প্রতিটি প্রজাতির বৈশিষ্ট্য বৎসরপঞ্চায়া টিকে থাকতে পারে।



চিত্র ৩.০৯: কোষ বিভাজনের মাধ্যমে জাইগোট সৃষ্টি

মিয়োসিস প্রধানত জীবের জনন কোষ বা গ্যায়েট সৃষ্টির সময় জনন মাত্রকোষে ঘটে। সপুরুক উত্তিসের পরাপরানী এবং ডিমকের মধ্যে এবং উন্নত প্রাপিসেহের শুকাশয়ে এবং ডিমাশয়ের মধ্যে মিয়োসিস ঘটে। এস ও কার্নজাতীয় উত্তিসের ডিপ্লোড মাত্রকোষ থেকে যখন হ্যাপ্লোড রেখে উৎপন্ন হয়, তখন জাইগোটে এ ধরনের বিভাজন ঘটে।

মিয়োসিস বিভাজনের সময় একটি কোষ পর পর দুবার বিভাজিত হয়। প্রথম বিভাজনকে প্রথম মিয়োটিক বিভাজন বা মিয়োসিস-১ এবং দ্বিতীয় বিভাজনকে দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজন বা মিয়োসিস-২

ବଳା ହୁଯ । ପ୍ରଥମ ବିଭାଜନେର ସମୟ ଅପରତ୍ୟ କୋଷେ କ୍ରୋମୋଜୋମେର ସଂଖ୍ୟା ମାତୃକୋଷେର କ୍ରୋମୋଜୋମ ସଂଖ୍ୟାର ଅର୍ଥକେ ପରିଣତ ହୁଯ । ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଜନଟି ମାଇଟୋସିସେର ଅନୁରୂପ, ଅର୍ଥାଏ କ୍ରୋମୋଜୋମ ସଂଖ୍ୟାର କୋଳୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଯ ନା ।

ବାସ୍ତବେ ଯାଏଁ ଯାଏଁ ହଠାତ୍ କରେ କ୍ରୋମୋଜୋମେର ସଂଖ୍ୟା ବେଡ଼େ ଲିଯେ ନତୁନ ପ୍ରଜାତିର ଉତ୍ତର ଘଟିଲେ ପାରେ । ସେମନ: ବ୍ୟାଙ୍ଗେର ଏକଟି ପ୍ରଜାତି *Xenopus tropicalis*-ଏର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରୋମୋଜୋମ ସେଟ ଦିଗ୍ନଂ ହୁଯ *Xenopus laevis* ପ୍ରଜାତିର ଉତ୍ତର ଘଟିଲେ । ଫ୍ଲୋନ୍ଟି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସଦସ୍ୟେର (ସେମନ: ଆଲୁ) ଦେହକୋଷେ (ଜଳନକୋଷେ ନାହିଁ) ଏହି ପ୍ରକିଳ୍ପା ଏକଟି ଚାନ୍ଦାବିକ ଘଟନା । ଅନେକ ସମୟ ଆମରା ଇଚ୍ଛାକୃତଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ହିସେବେ ବ୍ୟବହାର କରାର ଜନ୍ୟ ଉତ୍ତିଦେର ଏହି ଜାତ ବେହେ ମିଇ, ଏମନିକି ସେବକମ ଜାତ ପରିକଳ୍ପିତଭାବେ ସୃଷ୍ଟି କରି, କାରଣ ତା ଆକାରେ ତୁଳନାମୂଳକଭାବେ ବଡ଼ ହୁଯ । ଏସବ ଜାତ ଖାଦ୍ୟେର କ୍ରମବର୍ଧମାନ ଚାହିଁଦା ଯେତାତେ ଅଧିକତର ସହାୟକ ।

କ୍ରୋମୋଜୋମ ବା ଜେନୋଟିକ ବନ୍ଧୁର ସମତା ରଙ୍ଗା କରା ଛାଡ଼ାଏ ଜୀନଗତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବଜାଯ ରାଖା ମିଆସିସେର ଏକଇରକମ ପୁରୁଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକଟି ଅବଦାନ । ଯୌନ ଜଳନ କରେ ଏମନ ସକଳ ଜୀବେ ମିଆସିସେର ଯାଥ୍ୟମେ ଏକଇଭାବେ ଜିନଗତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଯ ଥାକେ । କୋଳୋ ପ୍ରଜାତିର ଟିକେ ଥାକା ବା ନା ଥାକା ମୂଳଭ ନିର୍ଭର କରେ ତାର ସଦସ୍ୟ ଜୀବଦେର ମଧ୍ୟେ କହଟା ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଆଛେ, ତାର ଉପର । ପରିବେଶ ପ୍ରତିନିଯିତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ । ସେଇସବ ପ୍ରଜାତି ଟିକେ ଥାକେ, ଯାଦେର ଅନ୍ତତ କିଛୁ ସଦସ୍ୟେର ମଧ୍ୟେ ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିବେଶେ ସାଥେ ଥାପ ଥାଓୟାରେ ମତୋ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରମେଛେ । ସଦି କୋଳୋ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବଦେର ମଧ୍ୟେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ କମ ଥାକେ ତାହଲେ ନତୁନ କୋଳୋ ପରିବେଶେ ଥାପ ଥାଓୟାନୋର ମତୋ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କାରୋ ନା କାରୋ ମଧ୍ୟେ ଥାକାର ସଞ୍ଚାବନାଓ ହବେ କମ । ଫଳେ ହୁଏତୋ ପୁରୋ ପ୍ରଜାତିଟାଇ ବିଲୁପ୍ତ ହୁଯ ଯାବେ । ଆର ସଦି କୋଳୋ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବଦେର ମଧ୍ୟେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବେଶି ଥାକେ, ତାହଲେ ନତୁନ କୋଳୋ ପରିବେଶେ ଥାପ ଥାଓୟାନୋର ମତୋ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କାରୋ ନା କାରୋ ମଧ୍ୟେ ଥାକାର ସଞ୍ଚାବନାଓ ହବେ ବେଶି । ତଥନ ସଦି ବଡ଼ କୋଳୋ ବିପଦ୍ରେ ଆସେ, ତରୁ ତାର ଅନ୍ତତ କିଛୁ ସଦସ୍ୟ ବେଁଚେ ଯାବେ । ତାଇ ମିଆସିସ କୋଳୋ ଜୀବେର ଜିନଗତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ପ୍ରଜାତିର ଟିକେ ଥାକାର ସଞ୍ଚାବନା ବାଢ଼ିଲେ ଦେଇ ।

ଜୀବେର ଟିକେ ଥାକାର କ୍ଷେତ୍ରେ ବିଶେଷ ସୁରିଧା ଦେଇ ବଳେଇ ମିଆସିସ ବିଭାଜନ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଯ ଜୀବଜଗତେ ନିଜେର ସ୍ଥାନ କରେ ନିର୍ମେଛେ ।



ଚିତ୍ର ୩.୧୦: ବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରଜାତି *Xenopus tropicalis* (ନିଚେ) ଏବଂ *Xenopus laevis* (ଉପରେ)

ଅନୁଶୀଳନୀ



সংক্ষিপ্ত উচ্চন প্রশ্ন

1. କୋଷ ବିଭାଜନ କୀ?
 2. ସମ୍ମିକ୍ରମିକ କୋଷ ବିଭାଜନ କାହେ ବଲେ?



ଅଚଳାମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା

1. মাইটেসিসেস বিভিন্ন পর্যায়সমূহ চিহ্নিত কর্তৃসহ বর্ণনা করো।
 2. মাইটেসিস অক্ষিয়ার গুরুত্ব আলোচনা করো।



ବ୍ୟାନିରୀତିଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା

1. କୋନ ଧାରେ ନିଉଗ୍ରହାସତି ଆକାଶେ ବଢ଼ି ହୁଏ?

କ. ପ୍ରୋମେଜ
ଖ. ମେଟୋଫେଜ
ଗ. ଏନାଫେଜ
ଘ. ଟେଲୋଫେଜ

2. ପିରୋଶିଳେ କାରଣେ କୌଣ୍ଠେ—

 - କ୍ଲୋମୋଜୋମେର ସଂଖ୍ୟାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ
 - ହାଷାପ୍ରେଷ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ୟାମେଟ ତୈରି ହୁଏ
 - ଗୁପ୍ତଶୁଦ୍ଧେର ନିର୍ଧିତଶୀଳତା ବଜାୟ ଥାଏ

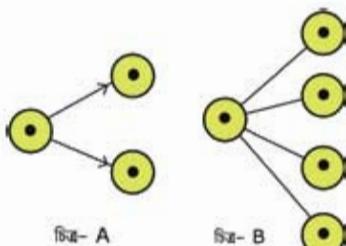
ନିଚ୍ଛେ କୋନଟି ସତିକ?

କ. i ଓ ii
ଖ. ii ଓ iii
ଗ. i ଓ iii
ଘ. i, ii ଓ iii

ପାଲେର ଚିନ୍ତାର ଆଶାକେ ୩ ଓ ୪ ନମ୍ବର ଧରେବ ଉତ୍ତର ଦାତା ।

৩. A চিকিৎসা কোষ বিভাগে—

 - i. মাতৃকোষ ও নতুন সৃষ্টি কোষ সমগ্র সকল থাকে
 - ii. নতুন কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের অর্ধেক থাকে
 - iii. ক্রোমোজোম যারা একবার বিভাজিত হয়



ନିମ୍ନେ କୋଣଟି ସତିକ?

କ. i ଓ ii

ଘ. ii ଓ iii

ଘ. i ଓ iii

ଘ. i, ii ଓ iii

୫. B ଟିଲେର ବିଭାଜନଟି A ଥେକେ ସ୍ଥାନକୁଳ କାରଣ, ଏଇ କଣ—

କ. ଅପଞ୍ଜ ଜୀବେ କ୍ରୋମୋଜୋମେର ସଂଖ୍ୟା ଠିକ ଥାକେ

ଘ. କ୍ରୋମୋଜୋମେର ସଂଖ୍ୟା ବେଳେ ଦାର

ଘ. ଅନ୍ୟାନ୍ୟାବିକ କୋଷ ସୃତି ହେଲା

ଘ. ଦେହର ସ୍ଥାନକୁଳ ସ୍ଥାନ ଘଟେ

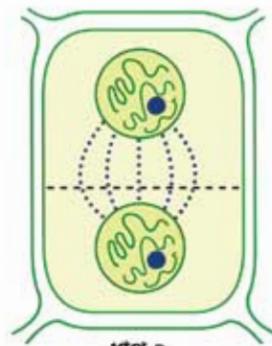


ସ୍ଵଜନଶୀଳ ପ୍ରଣ୍ଟ

୧.



ଧାପ A



ଧାପ B

କ. ମାଇଟୋସିସ କୋଥାଯ ଘଟେ?

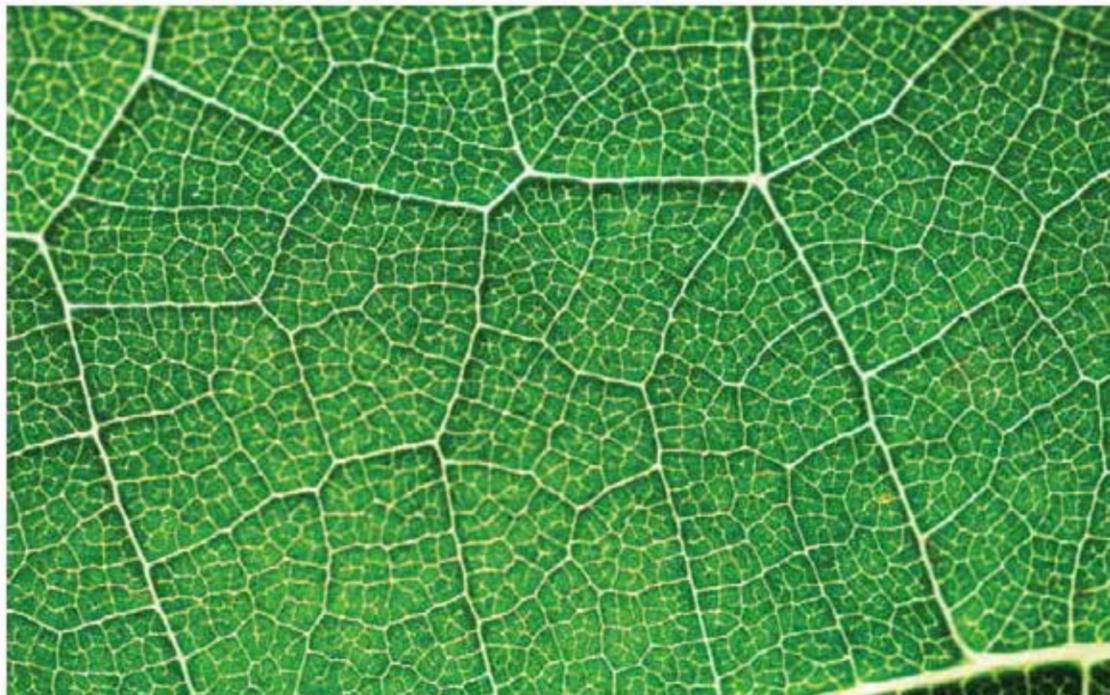
ଘ. ଫିରୋସିସକେ ହ୍ରାସମୂଳକ ବିଭାଜନ ବଳା ହେଲା କେନ ବୁଝିରେ ଲେଖ?

ଘ. ଡକ୍ଟିପକେର B ଧାପଟିତେ କୀ ଧରନେର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ—ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି।

ଘ. ଡକ୍ଟିପକେ ଡର୍ଶନିତ ପ୍ରକିଳ୍ପାତି ସତିକଣାବେ ନା ଘଟିଲେ ଜୀବେ କୀ ସମସ୍ୟା ହତେ ଗାରେ ବିଜ୍ଞୋଧଣ କରି।

চতুর্থ অধ্যায়

জীবনীশক্তি



জীবন পরিচালনার জন্য জীবকোষে প্রতি মূহূর্তে হাজারো রকমের জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটতে থাকে। এসব বিক্রিয়ার জন্য কমবেশি শক্তির প্রয়োজন হয়। পৃথিবীতে শক্তির মূল উৎস সূর্য। সবুজ উত্তিদ সালোকসংগ্রহণের মাধ্যমে সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত করে শক্তিগুজ্জাড়ীয় খাদ্য তৈরি করে। ধার্মী কিংবা অসবুজ উত্তিদ সৌরশক্তিকে সরাসরি আবদ্ধ করে দেহিক কাজে ব্যবহার করতে পারে না। জীবন পরিচালনার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয়, সে শক্তির জন্য তাদের কোনো না কোনোভাবে সবুজ উত্তিদের উপরেই নির্ভর করতে হয়। এসব বিষয় আলোচনা করাই জীবনীশক্তি বা বায়োএনার্জেটিক্স (Bioenergetics)-এর মূল উক্তব্য। এই অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে জীবনীশক্তি সমর্কে আলোচনা করা হলো।

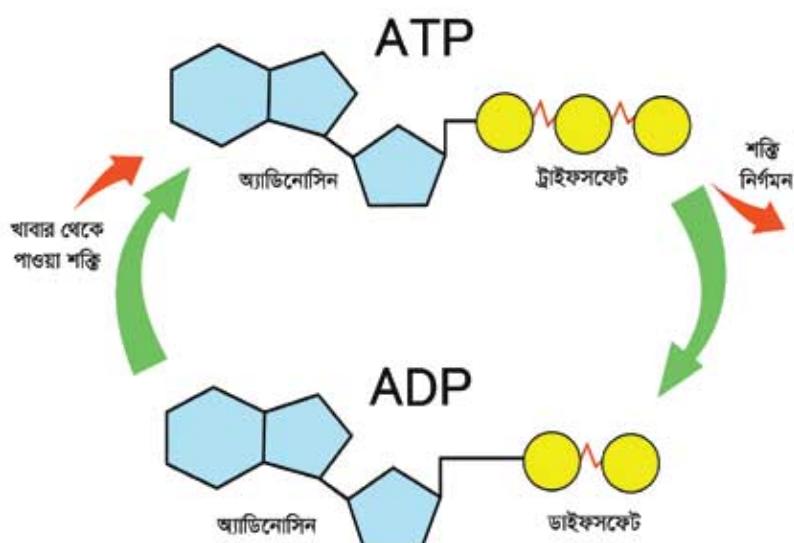


এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- কোষে প্রধান শক্তির উৎস হিসেবে এটিপির (ATP) ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সালোকসংক্ষেপে শক্তিগত শক্তির শক্তি ও প্রক্রিয়া করতে পারব।
- সালোকসংক্ষেপে ক্লোরোফিল এবং আলোর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সালোকসংক্ষেপের প্রভাবকের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারব।
- সালোকসংক্ষেপের উপর জীবের নির্ভরশীলতার কারণ মূল্যায়ন করতে পারব।
- শুসল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সবাত ও অবাত শুসলের ধারণা ও পুরুষ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সালোকসংক্ষেপ ও শুসলের মধ্যে তুলনা করতে পারব।
- সালোকসংক্ষেপ শক্তিগত ক্লোরোফিল ও আলোর অপরিহার্যতাৰ পরীক্ষা করতে পারব।
- শুসল থেক্সিয়ায় ডাপ নির্মালের পরীক্ষা করতে পারব।
- জীবের খাদ্য প্রস্তুতে উত্তিদের অবদান উপলব্ধি করতে পারব এবং উত্তিদের প্রতি সংবেদনশীল আচরণ করতে শিখব।

৪.১ জীবনীশক্তি ও ATP-এর ভূমিকা

জীবনীশক্তি বা জৈবশক্তি (bioenergy) বলতে আয়োজিত বা বিশেষ কোনো শক্তিকে বুঝাই না। পদার্থবিজ্ঞানে শক্তির যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা থেকে, এটি আলাদা কিছু নয়, জীবদেহ বা জৈব অণুর রাসায়নিক বন্ধন ছিল করার মাধ্যমে প্রাপ্ত শক্তিকে এই নামে ডাকা হয় যাত্র। জীব প্রতিনিয়ত পরিবেশ থেকে শক্তি সংগ্রহ করে, সংগৃহীত শক্তিকে এককূপ থেকে অন্যরূপে পরিবর্তিত করে, কখনো বা সংরক্ষণ করে এবং শেষে সেই শক্তি আবার পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়।



চিত্র ৪.০১: অ্যাডিনোসিন ডাইফসফেটের (ADP) সাথে ফসফেট (P) যুক্ত হয়ে অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট (ATP) গঠিত হতে যতখানি শক্তি বাইরে থেকে সরবরাহ করা আবেগিন, ATP তেওঁে ADP এ ফসফেট উৎপাদন করলে প্রায় যতখানি শক্তি নির্ণয় হয়। জীবকোষে এই সূচি বিক্রিয়া চক্রাকারে চলতে থাকে।

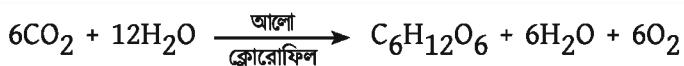
DNA এবং RNA-এর গাঠনিক উপাদানগুলোর একটি হলো অ্যাডেনিন। এটি একটি নাইট্রোজেন বেস। এর সাথে পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট রাইবোজ সুপার অণু যুক্ত হয়ে তৈরি হয় অ্যাডিনোসিন। অ্যাডিনোসিন অণুর সাথে পর্যায়ক্রমে একটি, সূচি এবং ডিনটি ফসফেট/ফসফোরিক এসিড গুপ যুক্ত হয়ে যথক্রমে অ্যাডিনোসিন ফনোফসফেট (AMP), অ্যাডিনোসিন ডাইফসফেট (ADP) এবং অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট (ATP) গঠন করে। এভাবে ফসফেট যুক্ত করতে বাইরে থেকে শক্তি দিতে হয়। এই বিক্রিয়ার নাম ফসফোরাইলেশন (phosphorylation)। আবার এর বিপরীত প্রক্রিয়ায়, ফসফেট গুপ বিজ্ঞাহ হলে শক্তি বের হয়ে আসে। এই বিক্রিয়ার নাম ডিফসফোরাইলেশন (dephosphorylation)। উদ্দেশ্য, প্রতিমোল

ATP অণুর প্রান্তীয় ফসফেট গুপে 7.3 কিলোক্যালরি (প্রায় 30.55 কিলোজুল) শক্তি জমা থাকতে পারে। পরিবেশ থেকে শক্তি সংগ্রহ করে তাকে কোষের তথা জীবদেহের ব্যবহার-উপযোগী রূপে পরিবর্তিত করার জন্য কাজ করে দুটি কোষীয় অঙ্গাণ: মাইটোকন্ড্রিয়া এবং প্লাস্টিড। উভয়েরই রয়েছে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম নামক একসেট বিশেষ জৈব অণু, যাদের কাজ হলো পুষ্টি উপাদান (যেমন: গ্লুকোজ) বা কোনো অন্তর্বর্তীকালীন অণুর শক্তিকে ATP-এর ফসফেট গুপের বন্ধনশক্তি হিসেবে জমা করা। আবার, ATP-এর রাসায়নিক বন্ধন ভেঙে যে শক্তি বের হয়, সেই শক্তি দিয়ে জীবদেহের প্রতিটি জৈবনিক কাজ অর্থাৎ, মাংসপেশির সংকোচন থেকে ইলিয়ানুভূতি, খাবার খাওয়া থেকে হজম করা, নিঃশ্বাস নেওয়া থেকে কথা বলা, চিৎকার করা থেকে হাসি-কাঙ্ঘা, দৈহিক বৃদ্ধি থেকে প্রজনন, দেহের তাপমাত্রা ঠিক রাখা থেকে শুরু করে দেহের প্রতিটি কোষের স্বাভাবিক আয়তন বজায় রাখা এর সবই সম্পন্ন হয়। আমরা যে খাবার খাই তা জারিত হয়, সেই জারণ থেকে নির্গত শক্তি দ্বারা ফসফোরাইলেশনের মাধ্যমে আবার সেই ভাঙা দুই টুকরা জোড়া লেগে ATP তৈরি হয়। শক্তির প্রয়োজন হলে তা আবার ভাঙে। তারপর খাদ্য থেকে শক্তি নিয়ে আবার জোড়া লাগে। এ যেন এক রিচার্জেবল ব্যাটারি। ATP শক্তি জমা করে রাখে এবং প্রয়োজন অনুসারে অন্য বিক্রিয়ায় শক্তি সরবরাহ করে। এজন্য ATP-কে অনেক সময় ‘জৈবমুদ্রা’ বা ‘শক্তি মুদ্রা’ (Biological coin or energy coin) বলা হয়।

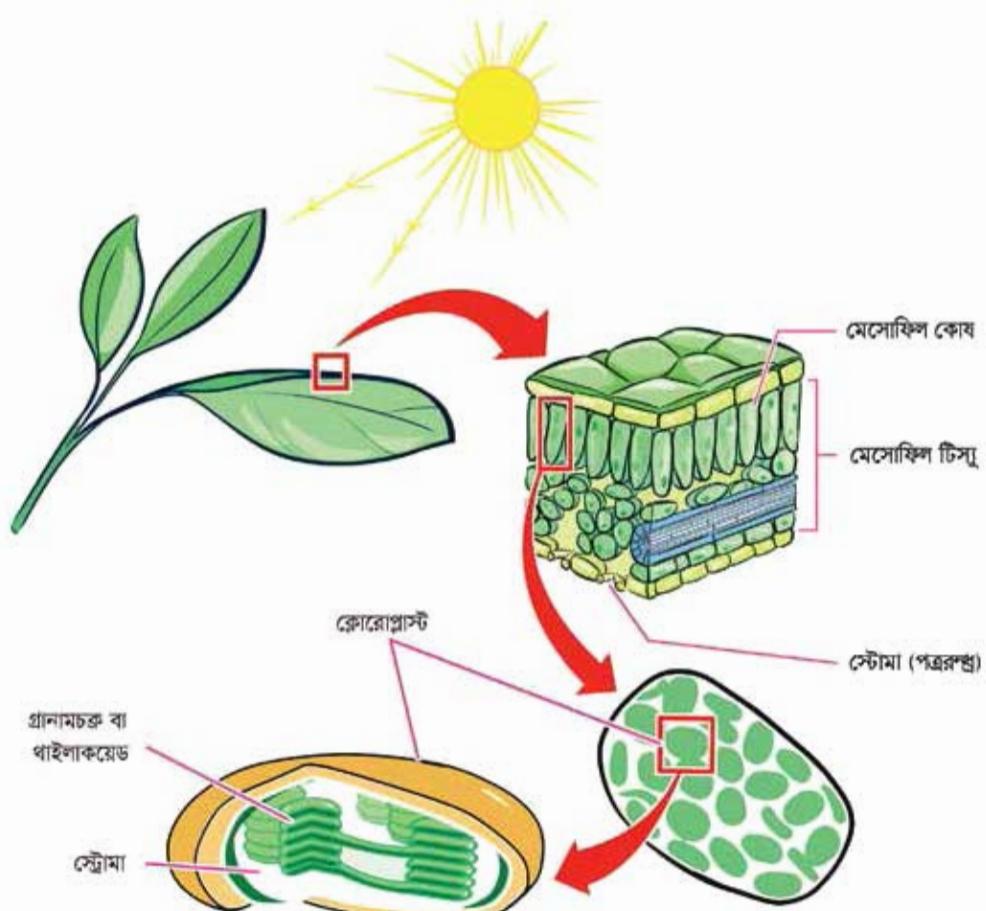
4.2 সালোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis)

সবুজ উড়িদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো যে এরা সূর্যালোকের উপস্থিতিতে কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) এবং পানি থেকে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করাজাতীয় খাদ্য তৈরি করে। সবুজ উড়িদে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য তৈরি হওয়ার এ প্রক্রিয়াকে সালোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis) বলা হয়। এই প্রক্রিয়ায় আলোকশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সবুজ উড়িদে প্রস্তুত খাদ্য উডিদ নিজে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় বিপাকীয় প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে ব্যবহার করে এবং অবশিষ্ট খাদ্য ফল, মূল, কাণ্ড অথবা পাতায় সংরিত রাখে। উড়িদে সংরিত এই খাদ্যের উপরেই মানবজাতি ও অন্যান্য জীবজন্তুর অস্তিত্ব নির্ভর করে।

সালোকসংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো হলো: ক্লোরোফিল, আলো, পানি এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড। সালোকসংশ্লেষণ একটি জৈব রাসায়নিক (biochemical) বিক্রিয়া, যেটি এরকম:



পাতার মেসোফিল টিস্যু সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার প্রধান স্থান। স্থলজ সবুজ উডিদ মাটি থেকে মূলের মাধ্যমে পানি শোষণ করে পাতার মেসোফিল টিস্যুর ক্লোরোপ্লাস্টে পৌঁছায় এবং স্টোমা বা পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে বায়ু থেকে CO_2 গ্রহণ করে, যা মেসোফিল টিস্যুর ক্লোরোপ্লাস্টে পৌঁছে। জলজ উডিদ পানিতে



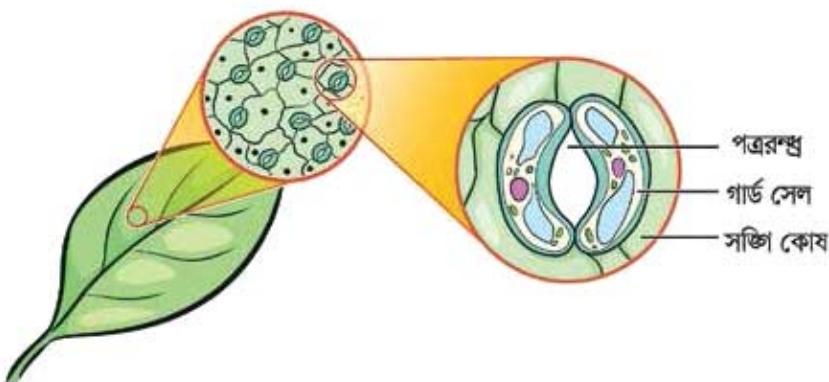
চিত্র ৪.০২: সালোকসংশ্লেষণ

অবৈক্রিক CO_2 শৃঙ্খল করে। বাস্তুমণ্ডলে ০.০৩% এবং পানিতে ০.৩% CO_2 আছে, তাই অলজ উভিদে সালোকসংশ্লেষণের হার স্থলজ উভিদ থেকে বেশি।

অক্সিজেন এবং পানি সালোকসংশ্লেষণের উপজাত মূখ্য (by-product)। এটি একটি জ্বারণ-বিজ্ঞান প্রক্রিয়া (oxidation-reduction process)। এ প্রক্রিয়ায় H_2O আরিত হয় এবং CO_2 বিজ্ঞারিত হয়।

৪.২.১ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া

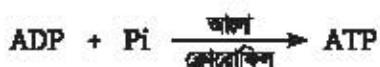
সালোকসংশ্লেষণ একটি জটিল এবং দীর্ঘ প্রক্রিয়া। 1905 সালে ইংরেজ শারীরতত্ত্ববিদ ব্ল্যাকম্যান (Blackman) এ প্রক্রিয়াকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করেন। পর্যায় দুটি হলো, আলোকনির্ভর পর্যায় (Light dependent phase) এবং আলোক নিরপেক্ষ পর্যায় (Light independent phase)।



চিত্র 4.03: একটি পত্রস্থ বা স্টোমা

(a) আলোকনির্ভর পর্যায় (Light dependent phase)

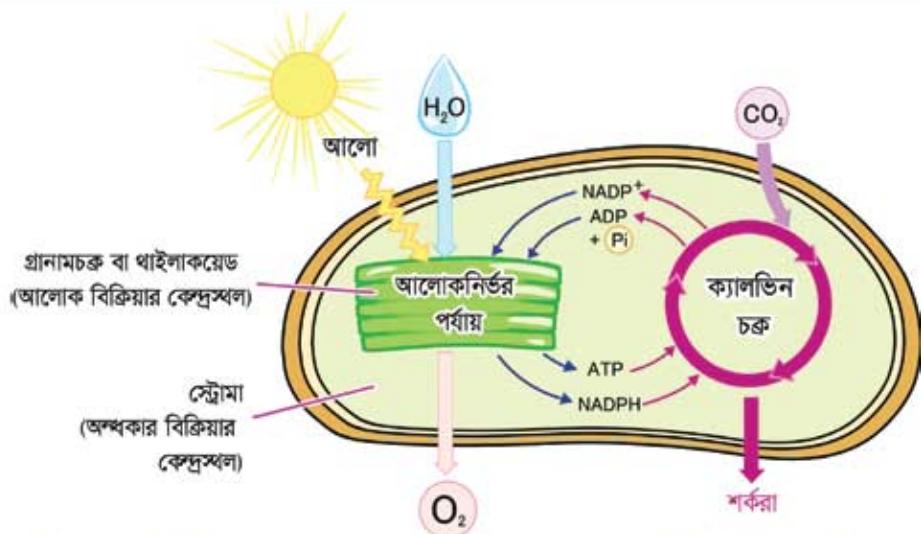
আলোকনির্ভর পর্যায়ের জন্য আলো অপরিহার্য। এ পর্যায়ে সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এ প্রক্রিয়ার ATP (অ্যাডিনোসিল ফ্লাইক্সফেট), NADPH (বিজরিত নিকোটিনামিইড আডিনিন ডাইনিউক্লিওফটাইড ফসফেট) এবং H⁺ (হাইড্রোজেন আয়ন বা প্রোটন) উৎপন্ন হয়। এই রূপান্তরিত শক্তি ATP-এর মধ্যে সংক্ষিপ্ত হয়। এই বিক্রিয়ায় ক্লোরোফিল পুরুষপূর্ণ জীবিকা পালন করে। ক্লোরোফিল অণু আলোকনির্খির কোটিন (photon) শোষণ করে এবং শোষণকৃত কোটিন থেকে শক্তি সংরক্ষণ করে ADP (অ্যাডিনোসিল ডাইফসফেট) অণুর ফসফেট (Pi = inorganic phosphate)-এর সাথে মিলিত হয়ে ATP তৈরি করে। ATP তৈরির এই প্রক্রিয়াকে ফটোফসফোরাইলেশন (photophosphorylation) বলে।



সূর্যালোক এবং ক্লোরোফিলের সাহায্যে পানি বিজ্ঞিপ্তি হয়ে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও ইসোকট্টেন উৎপন্ন হয়। এ প্রক্রিয়াকে পানির ফটোলাইসিস (photolysis) বলা হয়।

(b) আলোক নিরপেক্ষ পর্যায় বা অস্থকার পর্যায় (Light independent phase বা dark phase)

আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে আলোর প্রভাব দৃঢ়োজন পড়ে না, তবে আলোর উপস্থিতিতেও এই প্রক্রিয়া চলতে পারে। বায়ুমণ্ডলের CO₂ প্রয়োজনের ঘণ্টা দিয়ে ক্ষেত্রে হাবেশ করে। আলোক পর্যায়ে তৈরি ATP, NADPH এবং H⁺ এর সাহায্যে আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে CO₂ বিজরিত হয়ে কার্বোহাইড্রেট পরিপন্থ হয়। সবুজ উদ্ভিদে CO₂ বিজরাপের তিনটি গতিপথ শনাক্ত করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ক্যালসিন চক্র, হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র এবং ক্রেস্টোসিয়াল এগিজ বিপাক। এদের মধ্যে প্রথম দুটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিচে দেওয়া হলো।



চিত্র 4.34: C₃ উত্তিদে সালোকসংঘোষণের দৃষ্টি ধারণ—আলোকনির্ভর পর্যায় ও ক্যালভিন চক্র

(i) ক্যালভিন চক্র বা C₃ পত্তিপথ (Calvin cycle বা C₃ cycle): CO₂ আভিকরণের এ পত্তিপথকে আবিকারকদের নামানুসারে ক্যালভিন—বেনসন ও ব্যাশাম চক্র বা সংক্ষেপে ক্যালভিন চক্র বলা হয়। ক্যালভিন তার এ আবিকারের জন্য 1961 সালে নোবেল পুরস্কার পাল। অধিকাংশ উত্তিদে এই প্রক্রিয়ায় শর্করা তৈরি হয় এবং প্রথম স্থায়ী পদার্থ 3-কার্বনবিশিষ্ট কসফেটিলিসারিক এসিড বলে এই ধরনের উত্তিদকে বলে C₃ উত্তিদ।

(ii) হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র বা C₄ পত্তিপথ (Hatch and Slack cycle বা C₄ cycle): অস্ট্রেলীয় বিজ্ঞানী M.D. Hatch ও C.R. Slack (1966 সালে) CO₂ বিজ্ঞারণের আর একটি পত্তিপথ আবিকার করেন। এই পত্তিপথের প্রথম স্থায়ী পদার্থ হলো 4-কার্বনবিশিষ্ট অক্সালো এসিটিক এসিড তাই, একে C₄ পত্তিপথ বলে।

C₄ উত্তিদে একই সাথে হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র এবং ক্যালভিন চক্র পরিচালিত হতে দেখা যায়। C₃ উত্তিদের তুলনায় C₄ উত্তিদে সালোকসংঘোষণের হার বেশি এবং উৎপাদন ক্ষমতাও বেশি। সাধারণত খুঁটা, আখ, অন্যান্য ঘাসজাতীয় উত্তিদ, মুখা ঘাস, অ্যামারান্থাস (*Amaranthus*) ইত্যাদি উত্তিদে C₄ পরিচালিত হয়।

4.2.2 সালোকসংঘোষণে ক্লোরোফিলের ভূমিকা

পাতার ক্লোরোফিলের পরিমাণের সাথে সালোকসংঘোষণের হারের সম্পর্ক রয়েছে, কারণ একমাত্র ক্লোরোফিলই আলোকপথ প্রাপ্ত করতে পারে। পুরাতন ক্লোরোফিল নতুন হয়ে যায় এবং তখন নতুন ক্লোরোফিল সংগ্রহিত হয়। নতুন ক্লোরোফিল এবং ক্লোরোফিলের উৎপাদন সৃষ্টির হারের উপর সালোকসংঘোষণের হার নির্ভরশীল। সালোকসংঘোষণ ক্ষমতা রক্ষা করার জন্য ক্লোরোফিলের বিভিন্ন

উপাদান দ্রুত এবং প্রাচুর পরিমাণে পুনর্গঠিত হওয়া প্রয়োজন। তবে কোষে খুব বেশি পরিমাণ ক্লোরোফিল থাকলে এনজাইমের অভাব দেখা দেয় এবং সালোকসংশ্লেষণ কমে যায়।

4.2.3 সালোকসংশ্লেষণে আলোর ভূমিকা

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় আলোর গুরুত্ব অপরিসীম। পানি এবং CO_2 থেকে শর্করা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির উৎস আলো। সূর্যালোক ক্লোরোফিল সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করে। সূর্যালোকের প্রভাবেই পত্ররন্ধ্র উন্মুক্ত হয়, CO_2 পাতার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে এবং খাদ্য প্রস্তুতকরণে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু পাতায় যেটুকু আলো পড়ে, তার অতি সামান্য অংশই সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। আবার আলোকবর্ণালির লাল, নীল, কমলা এবং বেগুনি অংশটুকুতেই সালোকসংশ্লেষণ ভালো হয়। সবুজ কিংবা হলুদ আলোতে সালোকসংশ্লেষণ ভালো হয় না। একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আলোর পরিমাণ বাড়লে সালোকসংশ্লেষণের হারও বেড়ে যায়। কিন্তু আলোর পরিমাণ অত্যধিক বেড়ে গেলে পাতার ভিতরকার এনজাইম নষ্ট হয়ে যায়, ক্লোরোফিল উৎপাদন কম হয়। ফলে সালোকসংশ্লেষণের হারও কমে যায়। সাধারণত 400 nm থেকে 480 nm এবং 680 nm (ন্যানোমিটার) তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট আলোতে সালোকসংশ্লেষণ সবচেয়ে ভালো হয়।

4.2.4 সালোকসংশ্লেষণের প্রভাবক

আলো এবং ক্লোরোফিল ছাড়াও সালোকসংশ্লেষণ আরও কতগুলো প্রভাবক দিয়ে প্রভাবিত হয়। প্রভাবকগুলো কিছু বাহ্যিক এবং কিছু অভ্যন্তরীণ। প্রভাবকের উপস্থিতি, অনুপস্থিতি, পরিমাণের কম-বেশি সলোকসংশ্লেষণের পরিমাণও কম-বেশি করে থাকে। প্রভাবকগুলো হচ্ছে:

(a) বাহ্যিক প্রভাবকসমূহ

(i) **আলো:** এ সম্পর্কে ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে।

(ii) **কার্বন ডাই-অক্সাইড:** কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়া সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া চলতে পারে না। এ প্রক্রিয়ায় যে খাদ্য প্রস্তুত হয় তা কার্বন ডাই-অক্সাইড বিজ্ঞারণের ফলেই হয়ে থাকে। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ 0.03 ভাগ, কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ শতকরা এক ভাগ পর্যন্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যবহার করতে পারে। তাই বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সালোকসংশ্লেষণের পরিমাণও বেড়ে যায়। তবে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ খুব বেশি মাত্রায় বেড়ে গেলে পাতার মেসোফিল টিসুর কোষের অঞ্চলও বেড়ে যায় এবং পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে সালোকসংশ্লেষণের হার কমে যায়।

(iii) **তাপমাত্রা:** সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তাপমাত্রা বিশেষ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। সাধারণত

অতি নিম্ন তাপমাত্রা (0° সেলসিয়াস, এর কাছাকাছি) এবং অতি উচ্চ তাপমাত্রায় (45° সেলসিয়াসের উপরে) এ প্রক্রিয়া চলতে পারে না। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার জন্য পরিমিত (optimum) তাপমাত্রা হলো 22° সেলসিয়াস থেকে 35° সেলসিয়াস পর্যন্ত। তাপমাত্রা 22° সেলসিয়াসের কম বা 35° সেলসিয়াসের বেশি হলে সালোকসংশ্লেষণের হার কমে যায়।

(iv) পানি: সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শর্করা তৈরির উদ্দেশ্যে CO_2 কে বিজ্ঞারণের জন্য প্রয়োজনীয় H^{+} (হাইড্রোজেন আয়ন) পানি থেকেই আসে। পানির ঘাটতি হলে পত্ররশ্মের রক্ষীকোষেও স্ফীতি হারিয়ে রন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বাতাস থেকে CO_2 অনুপ্রবেশ বাধাগ্রস্ত হয়। অতিরিক্ত পানি ঘাটতির ফলে এনজাইমের সক্রিয়তা বিনষ্ট হয়ে সালোকসংশ্লেষণ বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

(v) অক্সিজেন: বাতাসে অক্সিজেনের ঘনত্ব বেড়ে গেলে সালোকসংশ্লেষণের হার কমে যায় আর অক্সিজেনের ঘনত্ব কমে গেলে সালোকসংশ্লেষণের হার বেড়ে যায়। তবে অক্সিজেনবিহীন পরিবেশে সালোকসংশ্লেষণ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে।

(vi) খনিজ পদার্থ: ক্লোরোফিলের প্রধান উপকরণ হচ্ছে নাইট্রোজেন এবং ম্যাগনেসিয়াম। লোহার অনুপস্থিতিতে পাতা ক্লোরোফিল সংশ্লেষণ করতে পারে না, ফলে পাতা হলুদ হয়ে যায়। কাজেই মাটিতে এসব খনিজের অভাব হলে সালোকসংশ্লেষণের হার কমে যায়।

(vii) রাসায়নিক পদার্থ: বাতাসে ক্লোরোফর্ম, হাইড্রোজেন সালফাইড, মিথেন বা কোনো বিষাক্ত গ্যাস থাকলে সালোকসংশ্লেষণে ব্যাঘাত ঘটে বা একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়।

(b) অভ্যন্তরীণ প্রভাবকসমূহ

(i) ক্লোরোফিল: এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

(ii) পাতার বয়স ও সংখ্যা: একেবারে কচি পাতা এবং একেবারে বয়স্ক পাতায় ক্লোরোফিলের পরিমাণ কম থাকে বলে সালোকসংশ্লেষণ কম হয়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে ক্লোরোপ্লাস্টের সংখ্যাও বেশি হয়। মধ্যবয়সী পাতায় সবচেয়ে বেশি সালোকসংশ্লেষণ ঘটে। পাতার সংখ্যা বেশি হলে সালোকসংশ্লেষণ বেশি হয়।

(iii) শর্করার পরিমাণ: সালোকসংশ্লেষণ চলাকালীন শর্করার পরিবহন কর হলে তা সেখানে জমা হয়ে থাকে। বিকেলে পাতায় বেশি শর্করা জমা হয় বলে সালোকসংশ্লেষণের গতি মন্থর হয়।

(iv) পটাশিয়াম: পটাশিয়ামের অভাবে সালোকসংশ্লেষণের পরিমাণ বেশ কমে যেতে দেখা যায়। কারণ, সম্ভবত এ প্রক্রিয়ায় পটাশিয়াম অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

(v) এনজাইম: সালোকসংশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন ধরনের এনজাইমের প্রয়োজন হয়।

4.2.5 জীবজগতে সালোকসংশ্লেষণের গুরুত্ব

সালোকসংশ্লেষণ বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সূর্যালোক এবং জীবনের মধ্যে সেতুবন্ধ সৃষ্টি হয়েছে। নিচের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে সালোকসংশ্লেষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে। বিশ্বজুড়ে এ প্রক্রিয়ার ব্যাপকতা লক্ষ করে কোনো কোনো বিজ্ঞানী এ প্রক্রিয়াকে জৈব রাসায়নিক কারখানা নামে অভিহিত করেছেন।

সমস্ত শক্তির উৎস হলো সূর্য। একমাত্র সবুজ উত্তিদেই সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত করে খাদ্যের মধ্যে আবদ্ধ করতে পারে। কোনো প্রাণীই তার নিজের খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না। আমরা খাদ্য হিসেবে ভাত, বুটি, ফলমূল, মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি যা-ই গ্রহণ করি না কেন, তার সবই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সবুজ উত্তি থেকে পেয়ে থাকি। কাজেই খাদ্যের জন্য সমগ্র প্রাণিকুল সবুজ উত্তিদের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল, আর সবুজ উত্তি এ খাদ্য প্রস্তুত করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায়। কাজেই বলা যায়, পৃথিবীর সকল উত্তি এবং প্রাণীর খাদ্য প্রস্তুত হয় সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়, বিশেষ করে O_2 ও CO_2 -এর সঠিক অনুপাত রক্ষায় সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। বায়ুতে অক্সিজেন গ্যাসের পরিমাণ 20.95 ভাগ এবং CO_2 গ্যাসের পরিমাণ 0.033 ভাগ।

পৃথিবীতে উত্তি ও প্রাণীর স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং জীবনযাপনের জন্য বায়ুতে এ দুটি গ্যাসের পরিমাণ স্বাভাবিক পর্যায়ে থাকতে হয়। এ পরিমাণের তারতম্য ঘটলে বায়ুমণ্ডল জীবজগতের জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠবে। আমরা জানি, সব জীবেই (উত্তি ও প্রাণী) সব সময়ের জন্য শ্বসনপ্রক্রিয়া চলতে থাকে। শ্বসন প্রক্রিয়ায় জীব O_2 গ্রহণ করে এবং CO_2 ত্যাগ করে। কেবল শ্বসন প্রক্রিয়া চলতে থাকলে বায়ুমণ্ডলে O_2 গ্যাসের স্বল্পতা এবং CO_2 গ্যাসের আধিক্য দেখা দিত। কিন্তু সবুজ উত্তি সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডল থেকে CO_2 গ্রহণ করে এবং O_2 ত্যাগ করে বলে এখনও বায়ুমণ্ডলে O_2 ও CO_2 গ্যাসের সঠিক অনুপাত রক্ষিত হচ্ছে। তবে বর্তমানে অধিক হারে বন-জঙ্গল ধ্বংস করার ফলে বায়ুমণ্ডলে এ দুটি গ্যাসের অনুপাত নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, কাজেই আমাদেরকে অবশ্যই অধিক হারে গাছ লাগাতে হবে।

মানবসভ্যতার অগ্রগতি অনেকাংশে সালোকসংশ্লেষণের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। অন্ন, বস্ত্র, শিল্পসামগ্ৰী (যেমন নাইলন, রেয়েন, কাগজ, সেলুলোজ, কাঠ, রাবার), ঔষধ (যেমন কুইনাইন, মৱফিন), জ্বালানি কয়লা, পেট্রল, গ্যাস প্রভৃতি উত্তি থেকে পাওয়া যায়। তাই সালোকসংশ্লেষণ না ঘটলে মানবসভ্যতা ধ্বংস হবে, বিলুপ্ত হবে জীবজগৎ। সুতৰাং সালোকসংশ্লেষণ জীবজগতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া।

শুধু তা-ই নয়, আজ থেকে প্রায় 5 বিলিয়ন বছর আগে যখন পৃথিবী সৃষ্টি হয়, তখন এখানে কোনো গ্যাসীয় অক্সিজেন ছিল না। আদি উত্তি সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন তৈরি করে এই পৃথিবীকে আমাদের জন্য বাসযোগ্য করে দিয়েছিল।



একটি কাজ

কাজ: সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার আলোর অপরিহার্তার পরীক্ষা।

পরীক্ষার উপকরণ: টবে লাগানো সবুজ পাতাবিশিষ্ট একটি গাছ, কালো কাগজ, ৯৫% ইথাইল আলকোহল, ১% আয়োডিন ম্রবণ, ক্লিপ, পেট্রিডিস, টেস্ট টিউব, বিকার, বুনসেন বার্নার বা পিপাইট ল্যাঙ্ক, ছাপাৰ, ক্ষেত্ৰসেল, পানি।

পদ্ধতি: টবে লাগানো পাতাটিকে ৪৪ ঘণ্টার জন্য অন্ধকার কোনো স্থানে রেখে দিতে হবে যেন পাতাগুলো খেতসারবিহীন হয়ে পড়ে। অন্ধকারে রাখা পাতাটির একটি পাতার একাংশের উভয় দিক কালো কাগজ দিয়ে আবৃত করে ক্লিপ দিয়ে আটকে দিতে হবে যেন এই অংশে সূর্যালোক প্রবেশ করতে না পারে। এরপর পাতাসহ টবটিকে সূর্যালোকে রেখে দিতে হবে। কয়েক (৬-৭) ঘণ্টা পর পাহ থেকে পাতাটিকে ছিঁড়ে এনে কালো কাগজ খুলে কেলে পানিতে কয়েক মিনিট সিদ্ধ করতে হবে। এরপর পাতাটিকে ক্লোরোফিলমুক্ত করার জন্য ৯৫% ইথাইল আলকোহলে সিদ্ধ করতে হবে, যতক্ষণ না পাতাটি বিবর্ণ হয়। এবার সিদ্ধ কর্ষিত পাতাটিকে আলকোহল থেকে তুলে পানিতে ধূঝে নিয়ে আয়োডিন ম্রবণে ধূঝাতে হবে। দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য আলকোহলে সিদ্ধ করার সময় সরাসরি তাপ না দিয়ে টেস্ট টিউবে আলকোহল এবং পাতা নিয়ে টেস্ট টিউবকে বিকারের পানিতে রেখে তাপ দিতে হবে।

পর্যবেক্ষণ: আয়োডিন ম্রবণ থেকে উঠিয়ে আনলে দেখা যাবে, পাতাটির কালো কাগজ দিয়ে আবৃত অংশ ছাড়া বাকি সবচৌক অংশই নীল বা গাঢ় বেগুনি বা কালো বর্ণ ধারণ করেছে।

সিদ্ধান্ত: খেতসার এবং আয়োডিন ম্রবণের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে খেতসার নীল বা গাঢ় বেগুনি বা কালো বর্ণ ধারণ করবে। কালো কাগজ দিয়ে আবৃত অংশে সূর্যালোক শোঝাতে পারে না, কেলে পাতার এই অংশে সালোকসংশ্লেষণ হয় না বলে খেতসারও প্রস্তুত হয় না। খেতসার প্রস্তুত হয় না বলে পাতার আবৃত অংশ আয়োডিন ম্রবণে বিক্রিয়া করে নীল বা গাঢ় বেগুনি বা কালো বর্ণ ধারণ



চিত্র ৪.০৫: সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার আলোর অপরিহার্তার পরীক্ষা

করে না। কিন্তু পাতাটির অন্তর্বৃত্ত অংশে সূর্যালোক পড়েছিল বলে ঐসব সংখানে শ্রেতসার উৎপন্ন হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় সালোকসংঘোষণ কথা শ্রেতসার প্রস্তুতের জন্য আলো অপরিহার্য।

সতর্কতা:

- পরীক্ষার পূর্বে টবের পাছটি যেন বেশ কিন্তু সময়ের জন্য অন্ধকারে রাখা হয়।
- কালো কাগজ এমন হতে হবে যেন তার মধ্যে দিয়ে সূর্যালোক প্রবেশ করতে না পারে।
- পরীক্ষা চলাকালীন কমপক্ষে ৬-৭ মিটা পূর্বে টবটিকে সূর্যালোকে রাখতে হবে।
- আলকোহলে পাতাটিকে সিঞ্চ করার সময় সরাসরি তাপ না দেওয়াই ভালো।



একক কাজ

কাজ: সালোকসংঘোষণ প্রক্রিয়ার ক্লোরোফিলের অপরিহার্যতার পরীক্ষা।

পরীক্ষার উপকরণ: ম্যানিহট বা পাতাবাহার উজ্জিদের নানা বর্ণের পাতা, আলকোহল, আয়োডিন ম্রবণ, পানি, পেট্রিওলিস, টেস্ট টিউব, বুলসেল বার্নার, ম্লগার, বিকার।

পদ্ধতি: দুপুরের দিকে উজ্জিদের একটি বাহারি পাতা এনে এর সবুজ অংশটাকে চিহ্নিত করে পাতাটিকে কয়েক মিনিট পানিতে সিঞ্চ করতে হবে। এরপর পানি থেকে পাতাটিকে ঢুলে নিয়ে আলকোহলে সিঞ্চ করতে হবে যতক্ষণ না পাতাটি বিবর্ষ হয়। এবার পাতাটিকে ঢুলে পানিতে ধূয়ে নিয়ে আয়োডিন ছবলে ফুরাতে হবে। দুর্ঘটনা এড়ালোর জন্য আলকোহলে সিঞ্চ করার সময় সরাসরি তাপ না দিয়ে টেস্ট টিউবে আলকোহল এবং পাতা নিয়ে টেস্ট টিউবকে বিকারের পানিতে রেখে তাপ দিতে হবে।

পর্যবেক্ষণ: আয়োডিন ছবলে ফুরানোর পর দেখা যাবে পাতার কেবল সবুজ অংশই নীল বা গাঢ় বেগুনি বা কালো হয়েছে।

মিথ্যাক: ক্লোরোফিল ধাকায় কেবল সবুজ অংশই সালোকসংঘোষণের মাধ্যমে শর্করা প্রস্তুত করেছে। ক্লোরোফিল না ধাকায় অসবুজ (কমলা বা হলুদ) অংশে শর্করা প্রস্তুত হয়নি। সবুজ অংশে শর্করা ছিল বলেই আয়োডিন ছবলে ঐ অংশ নীল বা গাঢ় বেগুনি বা কালো হয়েছে।

সতর্কতা: আলকোহলে পাতাটিকে সিঞ্চ করার সময় সরাসরি তাপ না দেওয়াই ভালো।

৪.৩ শ্বসন (Respiration)

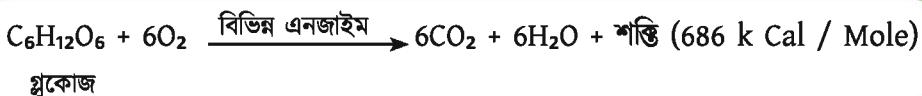
আগের শ্রেণিতে তোমরা শ্বসন প্রক্রিয়া কাকে বলে এবং শ্বসনের ফলে যে দেহের বৃদ্ধিসাধন হয় এবং দেহ শক্তি পায়, সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে জেনেছি। এ অধ্যায়ে শ্বসন সম্পর্কে আরও একটু বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

জীবের জীবন ধারণ অর্থাৎ চলন, ক্ষয়পুরণ, বৃদ্ধি, জনন প্রভৃতি জৈবিক কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। আমরা আগেই জেনেছি এ শক্তির প্রধান উৎস হলো সূর্যালোক। সালোকসংশ্লেষণের সময় উক্তি সৌরশক্তিকে শর্করা জাতীয় খাদ্যবস্তুর মধ্যে স্থিতি শক্তিরূপে (Potential energy) সংযোগ করে রাখে। খাদ্যের মধ্যে সঞ্চিত এই ধরনের শক্তি জীব তার জীবন ধারণের জন্য সরাসরি ব্যবহার করতে পারে না। শ্বসনের সময় জীবদেহে এই স্থিতি শক্তি রাসায়নিক শক্তি (ATP) হিসেবে তাপরূপে মুক্ত হয় এবং জীবের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি যোগায়। শর্করাজাতীয় খাদ্যবস্তু ছাড়াও প্রোটিন, ফ্যাট এবং বিভিন্ন জৈব এসিড শ্বসনিক বস্তুরূপে ব্যবহৃত হয়। জীবদেহে এই জটিল যৌগগুলো প্রথমে ভেঙে সরল যৌগে পরিণত হয় এবং পরে জারিত হয়ে রাসায়নিক শক্তিতে (ATP) রূপান্তরিত হয়। সাধারণ তাপমাত্রায় জীবদেহের প্রতিটি কোষে দিবারাত্রি 24 ঘণ্টাই শ্বসন চলতে থাকে। তবে উক্তিদের বর্ধিমুণ্ড অঞ্চলে (ফুল ও পাতার কুঁড়ি, অঙ্গুরিত বীজ, মূল ও কাণ্ডের অগ্রভাগ) শ্বসন ক্রিয়ার হার অনেক বেশি। সজীব কোষের সাইটোপ্লাজম ও মাইটোকল্রিয়াতে শ্বসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এ জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জীবদেহ যৌগিক খাদ্যদ্রব্য জারিত করে সরল দ্রব্যে পরিণত করে এবং শক্তি উৎপন্ন করে।

৪.৩.১ শ্বসনের প্রকারভেদ

শ্বসনের সময় অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে শ্বসনকে দুভাগে ভাগ করা হয়। সেগুলো হচ্ছে সবাত শ্বসন ও অবাত শ্বসন।

সবাত শ্বসন (Aerobic respiration): যে শ্বসন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় এবং শ্বসনিক বস্তু (শর্করা, প্রোটিন, লিপিড, বিভিন্ন ধরনের জৈব এসিড) সম্পূর্ণভাবে জারিত হয়ে CO_2 , H_2O এবং বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করে, তাকে সবাত শ্বসন বলে। সবাত শ্বসনই হলো উক্তি ও প্রাণীর স্বাভাবিক শ্বসন প্রক্রিয়া। সবাত শ্বসনের সামগ্রিক সমীকরণটি এরকম:



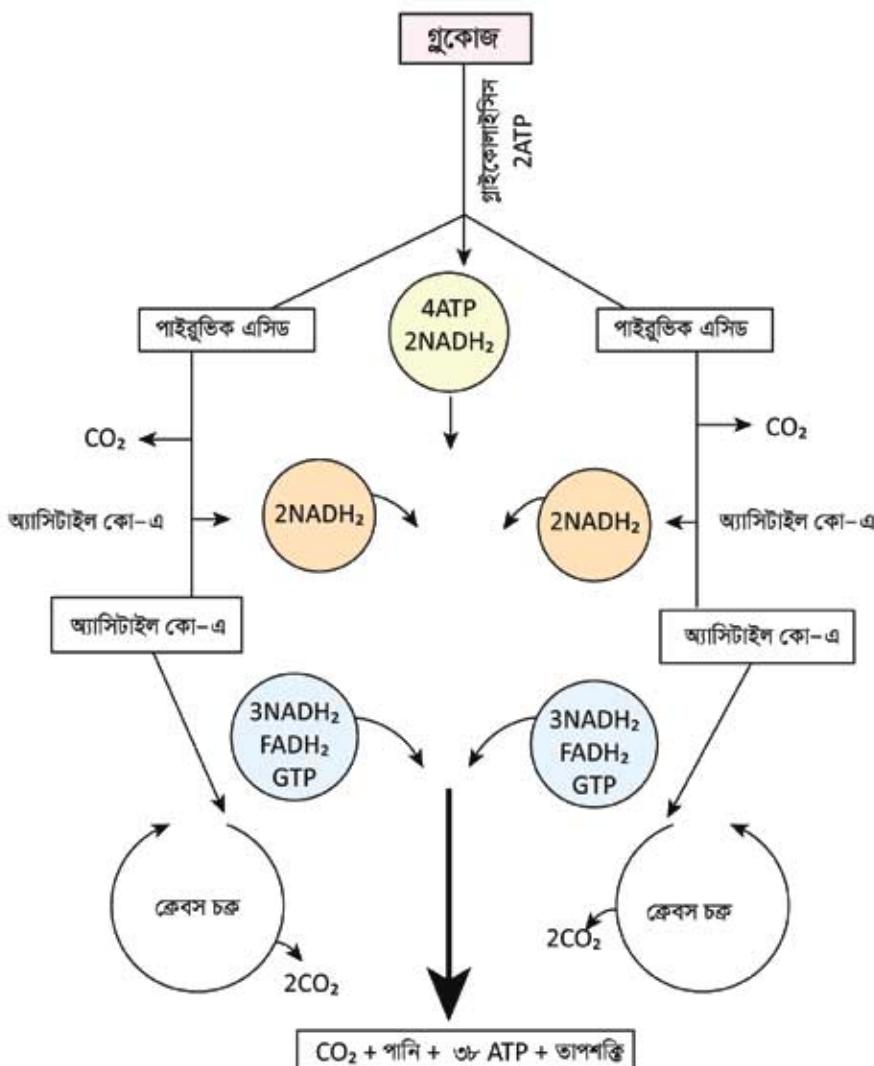
সবাত শ্বসন প্রক্রিয়ায় এক অণু গ্লুকোজ সম্পূর্ণরূপে জারিত হয়ে সর্বমোট 6 অণু CO_2 , 6 অণু পানি এবং 38টি ATP উৎপন্ন করে।

অবাত শ্বসন (Anaerobic respiration): যে শ্বসন প্রক্রিয়া অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে হয়, তাকে অবাত শ্বসন বলে। অর্থাৎ যে শ্বসন প্রক্রিয়ার কোনো খাসনিক বন্ধু অক্সিজেনের সাহায্য ছাড়াই কোথের ভিতরকার এনজাইম দিয়ে আণশিকরূপে জারিত হয়ে বিভিন্ন প্রকার জৈব যৌগ (ইথাইল অ্যালকোহল, ল্যাকটিক এসিড ইত্যাদি), CO_2 এবং সামান্য পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করে, তাকে অবাত শ্বসন বলে।



কেবল মাত্র কিছু অণুজীবে বেমন ব্যাকটেরিয়া, ইস্ট ইত্যাদিতে অবাত শ্বসন হয়ে থাকে।

(a) সর্বাত শ্বসনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা



চিত্র 4.06: সর্বাত শ্বসন প্রক্রিয়া

সবাত শ্বসন প্রক্রিয়া সাধারণত চারটি ধাপে সম্পন্ন হয়। ধাপগুলো এরকম:

ধাপ 1: গ্লাইকোলাইসিস (Glycolysis): এই প্রক্রিয়ায় এক অণু ফ্লুকোজ ($C_6H_{12}O_6$) বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জারিত হয়ে দুই অণু পাইরুভিক এসিড ($C_3H_4O_3$) উৎপন্ন করে। এই ধাপে চার অণু ATP (এর মাঝে দুই অণু খরচ হয়ে যায়) এবং দুই অণু $NADH+H^+$ উৎপন্ন হয়। এই প্রক্রিয়ার জন্য কোনো অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না, তাই গ্লাইকোলাইসিস সবাত ও অবাত উভয় প্রকার শ্বসনেরই প্রথম পর্যায়। গ্লাইকোলাইসিসের বিক্রিয়াগুলো কোষের সাইটোপ্লাজমে ঘটে থাকে।

ধাপ 2: অ্যাসিটাইল কো-এ সৃষ্টি: গ্লাইকোলাইসিস পর্যায়ে সৃষ্টি প্রতি অণু পাইরুভিক এসিড পর্যায়ক্রমিক বিক্রিয়া শেষে 2 কার্বনবিশিষ্ট এক অণু অ্যাসিটাইল কো এনজাইম-এ (Acetyl Co-A), এক অণু CO_2 এবং এক অণু $NADH+H^+$ (অথবা $NADH_2$) উৎপন্ন করে (অর্থাৎ দুই অণু পাইরুভিক এসিড থেকে দুই অণু অ্যাসিটাইল কো এনজাইম-এ, দুই অণু CO_2 এবং দুই অণু $NADH+H^+$ উৎপন্ন হয়)। এই ধাপটি সাইটোপ্লাজমে ঘটে।

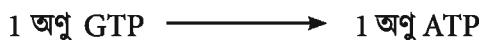
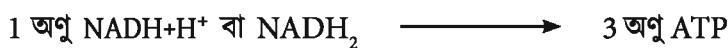
ধাপ 3: ক্রেবস চক্র (Krebs cycle): ইংরেজ প্রাণরসায়নবিদ Sir Hans Krebs এ চক্রটি আবিষ্কার করেন বলে একে ক্রেবস চক্র বলা হয়। এ পর্যায়ে অ্যাসিটাইল Co-A মাইটোকন্ড্রিয়াতে প্রবেশ করে এবং ক্রেবস চক্রে অংশগ্রহণ করে। এ চক্রের সকল বিক্রিয়াই মাইটোকন্ড্রিয়াতে সংঘটিত হয়। এই চক্রে এক অণু অ্যাসিটাইল Co-A থেকে দুই অণু কার্বন ডাইঅক্সাইড, তিন অণু $NADH+H^+$, এক অণু $FADH_2$ এবং এক অণু GTP (গুয়ানোসিন ট্রাইফসফেট) উৎপন্ন হয় (অর্থাৎ দুই অণু অ্যাসিটাইল Co-A থেকে চার অণু CO_2 , 6 অণু $NADH+H^+$, দুই অণু $FADH_2$ এবং দুই অণু GTP উৎপন্ন হয়)।

ধাপ 4: ইলেক্ট্রন প্রবাহতন্ত্র (Electron transport system): উপরোক্ত তিনটি ধাপে যে $NADH+H^+$ (বিজারিত NAD), $FADH_2$ (বিজারিত FAD) উৎপন্ন হয়, এই ধাপে সেগুলো জারিত হয়ে ATP, পানি, উচ্চ শক্তির ইলেক্ট্রন এবং প্রোটন উৎপন্ন হয়। উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ইলেক্ট্রনগুলো ইলেক্ট্রন প্রবাহতন্ত্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় যে শক্তি প্রদান করে সেই শক্তি ATP তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। ইলেক্ট্রন প্রবাহতন্ত্র মাইটোকন্ড্রিয়ায় সংঘটিত হয় (চিত্র: 4.06)।

কাজেই তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে সবাত শ্বসন প্রক্রিয়ায় এক অণু ফ্লুকোজ সম্পূর্ণরূপে জারিত হয়ে সর্বমোট ছয় অণু CO_2 ছয় অণু পানি এবং 38টি ATP উৎপন্ন করে। নিচের চার্টে সেটি দেখানো হলো:

শ্বসনের পর্যায়	উৎপাদিত বস্তু	ব্যয়িত বস্তু	নিট উৎপাদন
গ্লাইকোলাইসিস	2 অণু পাইরুভিক এসিড 2 অণু $NADH+H^+$ 4 অণু ATP	2 অণু ATP	6 অণু ATP 2 অণু ATP

অ্যাসিটাইল Co-A	2 অণু অ্যাসিটাইল Co-A 2 অণু CO_2 2 অণু $\text{NADH}+\text{H}^+$	2 অণু পাইরুভিক এসিড	2 অণু CO_2 6 অণু ATP
ক্রেবস চক্র	4 অণু CO_2 6 অণু $\text{NADH}+\text{H}^+$ 2 অণু FADH_2 2 অণু GTP	2 অণু অ্যাসিটাইল Co-A	4 অণু CO_2 18 অণু ATP 4 অণু ATP 2 অণু ATP
মোট			38 অণু ATP + 6 অণু CO_2



(b) অবাত শ্বসনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

দুটি ধাপে অবাত শ্বসন হয়ে থাকে। ধাপ দুটি হলো:

ধাপ 1: ফ্লুকোজের অসম্পূর্ণ জারণ: এই ধাপে এক অণু ফ্লুকোজ থেকে দুই অণু পাইরুভিক এসিড, চার অণু ATP (এর মধ্যে দুই অণু ব্যবহার হয়ে যায়) এবং দুই অণু $\text{NADH}+\text{H}^+$ উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে এ পর্যন্ত বিক্রিয়া সবাত শ্বসনের প্লাইকোলাইসিসের অনুরূপ। তবে উৎপন্ন পাইরুভিক এসিড পরবর্তী ধাপে বিজারিত হয়ে যায় বলে অবাত শ্বসনে ফ্লুকোজের অসম্পূর্ণ জারণ ঘটে- এমনটা বিবেচনা করা হয়।

ধাপ 2: পাইরুভিক অ্যাসিডের বিজারণ: সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত এনজাইমের কার্যকারিতায় পাইরুভিক অ্যাসিড বিজারিত হয়ে CO_2 এবং ইথাইল অ্যালকোহল অথবা শুধু ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। এক্ষেত্রে প্লাইকোলাইসিসে উৎপন্ন বিজারিত NAD (অর্থাৎ $\text{NADH}+\text{H}^+$) জারিত হয়ে যে ইলেক্ট্রন, প্রোটন ও শক্তি নির্গত করে, তা ব্যবহৃত হয় পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে ল্যাকটিক অ্যাসিড বা ক্ষেত্রবিশেষে ইথাইল উৎপাদনের জন্য। অন্যদিকে, অক্সিজেনের অভাবে তখন অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশনও চলে না। তাই অবাত শ্বসনের ক্ষেত্রে এক অণু ফ্লুকোজের প্লাইকোলাইসিসে নিট মাত্র 2 অণু ATP পাওয়া যায়।

4.3.2 শ্বসন প্রক্রিয়ার প্রভাবকসমূহ

শ্বসন প্রক্রিয়ার প্রভাবকগুলো বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ দুরকম হতে পারে।

১০ (a) বাহ্যিক প্রভাবক: বাহ্যিক প্রভাবকগুলো হলো:

- (i) তাপমাত্রা: 20° সেলসিয়াসের নিচে এবং 45° সেলসিয়াসের উপরের তাপমাত্রায় শ্বসন হার কমে যায়। শ্বসনের জন্য উত্তম তাপমাত্রা 20° সেলসিয়াস থেকে 45° সেলসিয়াস।
- (ii) অক্সিজেন: সবাত শ্বসনে পাইরুভিক এসিড জারিত হয়ে CO_2 ও H_2O উৎপন্ন করে। কাজেই অক্সিজেনের অভাবে সবাত শ্বসন কোনোক্ষেত্রেই চলতে পারে না।
- (iii) পানি: পরিমিত পানি সরবরাহ শ্বসন ক্রিয়াকে স্বাভাবিক রাখে। কিন্তু অত্যন্ত কম কিংবা অতিরিক্ত পানির উপস্থিতিতে শ্বসন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়।
- (iv) আলো: শ্বসন কার্যে আলোর প্রয়োজন পড়ে না সত্ত্বেও কিন্তু দিনের বেলা আলোর উপস্থিতিতে পত্ররশ্মি খোলা থাকায় O_2 গ্রহণ ও CO_2 ত্যাগ করা সহজ হয় বলে শ্বসন হার একটু বেড়ে যায়।
- (v) কার্বন ডাই-অক্সাইড: বায়ুতে CO_2 -এর ঘনত্ব বেড়ে গেলে শ্বসন হার একটুখানি কমে যায়।

(b) অভ্যন্তরীণ প্রভাবক: অভ্যন্তরীণ প্রভাবকগুলো হলো:

- (i) খাদ্যদ্রব্য: শ্বসন প্রক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্য (শ্বসনিক বস্তু) ভেঙ্গে শক্তি, পানি এবং CO_2 নির্গত করে, তাই কোমে খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ ও ধরন শ্বসন হার নিয়ন্ত্রণ করে।
- (ii) উৎসেচক: শ্বসন প্রক্রিয়ায় অনেক ধরনের এনজাইম বা উৎসেচক সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। কাজেই এনজাইমের ঘাটতি শ্বসনের হার কমিয়ে দেয়।
- (iii) কোষের বয়স: অল্পবয়স্ক কোষে, বিশেষ করে ভাজক কোষে প্রোটোপ্লাজম বেশি থাকে বলে সেখানে বয়স্ক কোষ থেকে শ্বসনের হার বেশি।
- (iv) অজৈব লবণ: কোনো কোনো লবণ শ্বসন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করলেও কোষের সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক কাজের জন্য এবং স্বাভাবিক শ্বসন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য কোষের ভিতরে অজৈব লবণ থাকতে হয়।
- (v) কোষমধ্যস্থ পানি: বিভিন্ন শ্বসনিক বস্তু দ্রবীভূত করতে এবং এনজাইমের কার্যকারিতা প্রকাশের জন্য পানির প্রয়োজন।

4.3.3 শ্বসনের গুরুত্ব

শ্বসন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তি দিয়ে জীবের সব ধরনের ক্রিয়া-বিক্রিয়া এবং কাজকর্ম পরিচালিত হয়। শ্বসনে নির্গত CO_2 জীবের প্রধান খাদ্য শর্করা উৎপন্নের জন্য সালোকসংশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়। এ প্রক্রিয়া উত্তিদে খনিজ লবণ পরিশোষণে সাহায্য করে, যা পরোক্ষভাবে উত্তিদের বৃদ্ধি এবং অন্যান্য জৈবিক প্রক্রিয়া চালু রাখে। কোষ বিভাজনের প্রয়োজনীয় শক্তি ও কিছু আনুষঙ্গিক পদার্থ শ্বসন প্রক্রিয়া থেকে আসে। তাই বলা যেতে পারে এ প্রক্রিয়া জীবের দৈহিক বৃদ্ধিও নিয়ন্ত্রণ করে। এ প্রক্রিয়া বিভিন্ন উপক্ষার ও জৈব এসিড সৃষ্টিতে সহায়তা করার মাধ্যমে জীবনের অন্যান্য জৈবিক কাজেও সহায়তা করে।

কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া অক্সিজেনের উপস্থিতিতে বাঁচতে পারে না। এদের শক্তি উৎপাদনের একমাত্র উপায় হলো অবাক শুসন। এ অক্সিয়ায় ইথাইল অ্যালকোহল তৈরি হয়, যা বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত হয়। ল্যাকটিক এসিড ফার্মেসিশেনের মাধ্যমে এ অক্সিয়ার দই, পলি ইত্যাদি উৎপাদিত হয়। মুটি তৈরিতে এ অক্সিয়া ব্যবহৃত হয়। ইলেক্ট্র অবাক শুসনের ফলে অ্যালকোহল এবং CO_2 গ্যাস তৈরি হয়। এই CO_2 গ্যাসের চাপে মুটি কুলে শিল্পে উৎপন্ন হয়।



একক কাজ

কাজ: শুসন অক্সিয়ায় তাপ নির্গমনের পরীক্ষা।

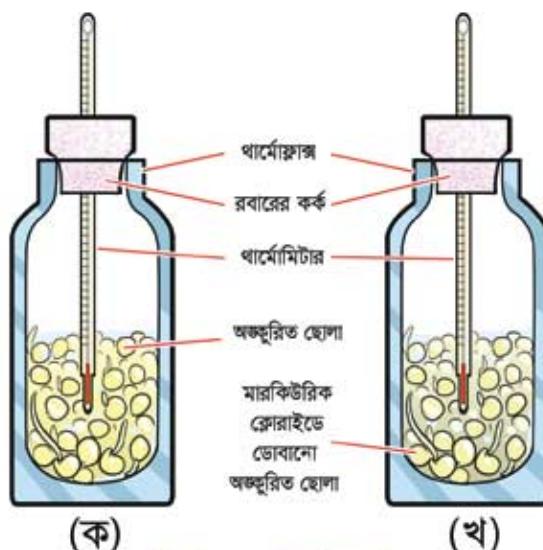
উপকরণ: মুটি থার্মোজ্যাম্প, মুটি থার্মোমিটার, ছিদ্রযুক্ত মুটি রাবার কর্ক, অক্সুরিত হোলা এবং 10% মারকিউরিক ক্লোরাইড স্ববন।

গুরুত্ব: মুটি থার্মোজ্যাম্পের একটিতে ‘ক’ ও অন্যটিতে ‘খ’ লেবেল লাগাতে হবে। ‘ক’ চিহ্নিত থার্মোজ্যাম্পে সামান্য পানিসহ কিছু অক্সুরিত হোলাবীজ নিতে হবে। ছিদ্রযুক্ত রাবার কর্কের মধ্য দিয়ে একটি থার্মোমিটার প্রবেশ করানোর পর ঝালকের মুখটি ভালো করে বন্ধ করে দিতে হবে। অবশিষ্ট অক্সুরিত হোলাগুলোকে 10% মূটিশুক্ত মারকিউরিক ক্লোরাইড স্ববনে 10 মিনিট ছড়িয়ে রেখে ‘খ’ চিহ্নিত ঝালকে নিতে হবে এবং ছিদ্রযুক্ত কর্কের মধ্য দিয়ে একটি থার্মোমিটার ঢুকিয়ে ঝালকের মুখ ভালোভাবে আটকে দিতে হবে।

এবার ‘ক’ ও ‘খ’ চিহ্নিত থার্মোমিটার মুটির প্রাথমিক তাপমাত্রা শিখে রেখে ঝালক মুটিকে রেখে দিতে হবে।

পর্যবেক্ষণ: করেক ঘণ্টা পর দেখা যাবে ‘ক’ থার্মোমিটারের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে কিন্তু ‘খ’ থার্মোমিটারের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকবে।

সিদ্ধান্ত: ‘ক’ থার্মোজ্যাম্পের অক্সুরিত হোলাগুলো সজীব থাকার শুসন অক্সিয়া অব্যাহত থাকে এবং তাপ নির্গমনের কারণে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে ‘খ’ ঝালকের হোলাগুলো মারকিউরিক



চিত্র 4.07: থার্মোজ্যাম্প

অক্সাইড দ্রবণে ফুরিয়ে নেওয়াতে বীজগুলো মরে গিয়ে নির্বাচ (Sterilized) হয়ে যাব। কলে শ্বসন প্রক্রিয়া ব্যাখ্য হওয়ায় তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকে।

সতর্কতা:

১. লক রাখতে হবে বেন বীজগুলো সতেজ এবং অক্সুরিত হয়।
২. ধার্মায়িটারের পারদপূর্ণ অংশটি যেন বীজের মাঝখানে থাকে।

অনুশীলনী



সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সালোকসংঘেষণ কাকে বলে? বিক্রিয়ার মাধ্যমে দেখাও।
২. সালোকসংঘেষণের কাঁচামাল কী কী?
৩. শ্বসন কাকে বলে? বিক্রিয়ার মাধ্যমে দেখাও?
৪. সালোকসংঘেষণ ও শ্বসনের মধ্যে সম্পর্ক কী?
৫. অবাক ও সবাক শ্বসনের পার্থক্য লেখ।



রচনামূলক প্রশ্ন

১. জীবের সালোকসংঘেষণের উপর নির্ভরশীলতার কারণ ব্যাখ্যা কর।
২. শ্বসনের শুরুত আলোচনা কর।



বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সালোকসংঘেষণ প্রক্রিয়ার উপরাক হিসেবে নির্ণয় কোনটি?

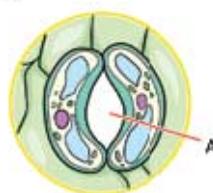
ক. পানি	খ. শর্করা
গ. অক্সিজেন	ঘ. কার্বন ডাই-অক্সাইড
২. শ্বসনের গ্রাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ার কত অপু ATP তৈরি হয়?

ক. ৪	খ. ৬
গ. ৮	ঘ. ১৮

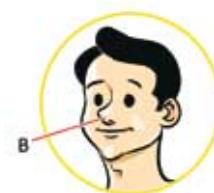
উদ্বৃত্তিকারী সক্ষ কর এবং ৩ ও ৪ নং প্রয়োর উত্তর দাও

৩. চিত্র A ও B উভয়েরই কাজ হচ্ছে—

- i. O_2 শৈল
- ii. H_2O নির্মাণ
- iii. CO_2 ভাস্তু



চিত্র X



চিত্র Y

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. চিত্র X-এ সর্বেষিত প্রক্রিয়াটি—

- i. পরিবেশকে শীতল রাখে
- ii. সালোকসংস্কারণে সহায়তা করে
- iii. শুসলে ব্যাধাত ঘটায়

নিচের কোনটি সঠিক?

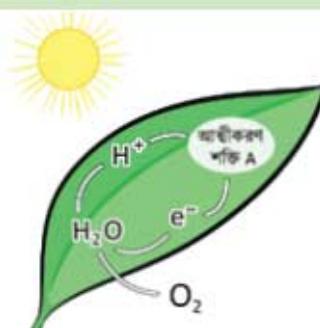
- ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii



সূজনশীল প্রশ্ন

১.

- ক. পাইরুটিক এসিডের সহকেত কী?
 খ. অবাত শুসল বলতে কী বোঝায়?
 গ. চিত্রে A উপাদানটি কীভাবে তৈরি হচ্ছে তা ব্যাখ্যা কর।
 ঘ. চিত্রে A উৎপাদনটি উৎপন্নে ব্যাধাত ঘটলে উডিসের উপর কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে তা যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

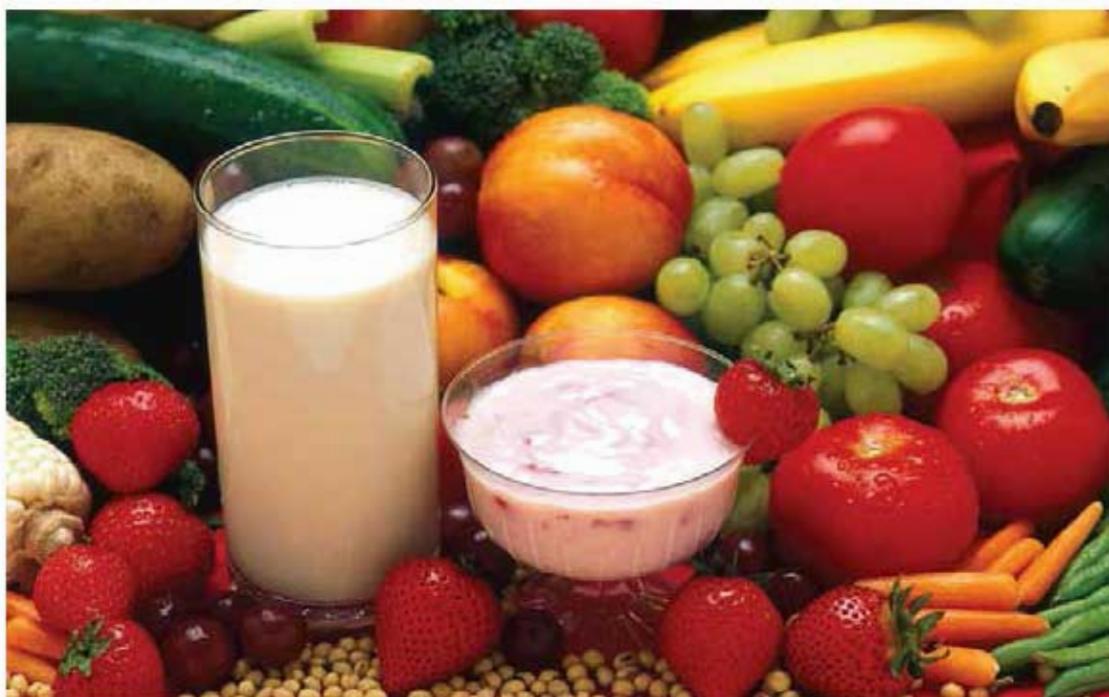


২. দশম শ্রেণির জ্ঞানী বিদ্যালয় গাছের থেকে পানী করে। গাছের প্লাকোজ থাকায় এটা তার কাজ করার প্রতি মোগায়। তার ছেট বোল ভাকে ধোকা করে, গাছ বড় হওয়ার অন্য প্রতি কীভাবে পার? সে তার বোলকে জানায়, গাছও শুসল প্রক্রিয়ায় প্লাকোজ থেকে প্রতি পার।

- ক. ক্ষটোলাইসিস কী?
 খ. C_4 উডিস বলতে কী বোঝায়?
 গ. বিদ্যালয় পৃষ্ঠাত খাদ্য উপাদানের ২ অঙ্গ থেকে ক্লেবস চক্রে কী পরিমাণ প্রতি উৎপন্ন হয় ছক্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর।
 ঘ. উত্ত প্রক্রিয়াটি বাধাগ্রস্ত হলে উডিসের মধ্যে কী প্রভাব ফেলবে তা বিশ্লেষণ কর।

পঞ্চম অধ্যায়

খাদ্য, পুষ্টি এবং পরিপাক



জীবমাত্রাই খাদ্য গ্রহণ করে, কারণ জীবের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। তবে উচ্চিদ ও আর্থীর খাদ্যগ্রহণ প্রক্রিয়া ভিন্ন। জীবের পুষ্টির জন্য বিভিন্ন উপাদানের প্রয়োজন হয়। মানবদেহের জন্য খাদ্য, পুষ্টি ও পরিপাক প্রক্রিয়া এবং উচ্চিদের পুষ্টি এ অধ্যায়ের আলোচনা বিষয়।



এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- উচ্চদের পুষ্টির অতি প্রয়োজনীয় উপাদান বর্ণনা করতে পারব।
- উচ্চদের পুষ্টির অভাবজনিত সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারব।
- প্রাণীর খাদ্যের প্রধান উপাদান ও উৎস বর্ণনা করতে পারব।
- আদর্শ খাদ্য পিরামিড ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খাদ্য গ্রহণের নিয়মনীতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পুষ্টির অভাবজনিত রোগের লক্ষণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকার বর্ণনা করতে পারব।
- কিলোক্যালরি ও কিলোজুল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পুষ্টি উপাদানে শক্তির পরিমাণ এবং ক্যালরি ও জুলে এসের মূল্যান্তর ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বড় মাস ইনডেক্স (বিএমআই) ও বড় মাস রেশিওর (বিএমআর) গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিএমআই ও বিএমআরের হিসাব করতে পারব।
- বিএমআর এবং ব্যবিধি শক্তির সাথে সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারব।
- বয়স ও লিঙ্গভেদে বিএমআই হিসাব করতে পারব।
- সুস্থ জীবনযাপনে শরীরচর্চা ও বিশ্রামের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খাদ্য সংরক্ষণে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খাদ্য অতিশায়ায় রাসায়নিক পদার্থ এবং রক্তক ব্যবহারের শারীরিক বিক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে পারব।
- পৌর্ণিকত্বের প্রধান অংশ ও সহায়তাকারী অংশের গঠন ও কাজ বর্ণনা করতে পারব।
- পৌর্ণিকত্বের প্রধান অংশের চিহ্নিত চির অঙ্কন করতে পারব।
- যকৃতের (Liver) কাজ বর্ণনা করতে পারব।
- অঞ্চলসম্মত কাজ বর্ণনা করতে পারব।
- খাদ্য পরিপাকে উৎসেচকের (Enzyme) ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারব।
- অঙ্গের বিভিন্ন সমস্যাজনিত রোগ এবং এর প্রতিরোধ ও প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে পারব।
- পরিপাকত্বের রোগের বিষয়ে নিজে সচেতন হব এবং পরিবারের সদস্যদের সচেতন হতে উন্মুক্ত করব।
- সাত দিনের শুরীত খাদ্যের একটি তালিকা তৈরি করে এটিকে সুব্যয় খাদ্যের সাথে তুলনা করতে পারব।
- স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনে পুষ্টির অবদান বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পোস্টার অঙ্কন করতে পারব।
- স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনে পুষ্টির অবদান বিষয়ে নিজে সচেতন হব অন্যদের সচেতন করব।

৫.১ উক্তিদের খনিজ পুষ্টি (Plant Mineral Nutrition)

উক্তিদ তার বৃদ্ধি ও পরিপূর্ণির জন্য মাটি, বায়ু এবং পানি থেকে কতগুলো উপাদান গ্রহণ করে। এ উপাদানগুলোর অভাবে উক্তিদ সুস্থুভাবে বাঁচতে পারে না। এ উপাদানগুলোকে উক্তিদের পুষ্টি উপাদান বলে। এ সকল পুষ্টি উপাদানের অধিকাংশই উক্তিদ মাটি থেকে সংগ্রহ করে বলে এদেরকে খনিজ পুষ্টি বলা হয়। উক্তিদে প্রায় ৬০ টি অজৈব উপাদান শনাক্ত করা হয়েছে, তবে এই ৬০ টি উপাদানের মধ্যে মাত্র ১৬ টি উপাদান উক্তিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। এ ১৬ টি পুষ্টি উপাদানকে সমষ্টিগতভাবে অত্যাবশ্যকীয় উপাদান (essential elements) বলা হয়। এই উপাদানগুলো সব ধরনের উক্তিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, শারীরবৃত্তীয় কাজ এবং প্রজননের জন্য প্রয়োজন। এদের যেকোনো একটির অভাব হলে উক্তিদে তার অভাবজনিত লক্ষণ (deficiency symptoms) দেখা দেয় এবং পুষ্টির অভাবজনিত রোগের সূচী হয়। একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদানের কাজ অপরটি দিয়ে সম্পূর্ণ হয় না।

অত্যাবশ্যকীয় ১৬ টি উপাদানের মধ্যে উক্তিদ কোনো কোনো উপাদান বেশি পরিমাণে গ্রহণ করে, আবার কোনো কোনো উপাদান সামান্য পরিমাণে গ্রহণ করে। উক্তিদ কর্তৃক গৃহীত অত্যাবশ্যকীয় খনিজ পুষ্টির পরিমাণের উপর ভিত্তি করে এদেরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা ম্যাক্রো উপাদান এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা মাইক্রো উপাদান।

(a) **ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা ম্যাক্রো উপাদান (macro-nutrient বা macro-element):** উক্তিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য যেসব উপাদান বেশি পরিমাণে দরকার হয়, সেগুলোকে ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা ম্যাক্রো উপাদান বলা হয়। ম্যাক্রো উপাদান ১০ টি, যথা: নাইট্রোজেন (N), পটাশিয়াম (K), ফসফরাস (P), ক্যালসিয়াম (Ca), ম্যাগনেসিয়াম (Mg), কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H), অক্সিজেন (O), সালফার (S) এবং লোহ (Fe)।

(b) **মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা মাইক্রো উপাদান (micro-nutrient বা micro-element):** উক্তিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য যেসব উপাদান অত্যন্ত সামান্য পরিমাণে প্রয়োজন হয় তাদেরকে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা মাইক্রো উপাদান বলে। মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ৬ টি, যথা: দস্তা বা জিংক (Zn), ম্যাংগানিজ (Mn), মোলিবডেনাম (Mo), বোরন (B), তামা বা কপার (Cu) এবং ক্লোরিন (Cl)।

৫. ১.১ পুষ্টি উপাদানের উৎস এবং ভূমিকা

পুষ্টি উপাদানের উৎস

উক্তিদ পুষ্টি উপাদানগুলোর মধ্যে কার্বন এবং অক্সিজেন বায়ুমণ্ডল থেকে গ্রহণ করে। হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পানি থেকে গ্রহণ করে। অন্যসব উপাদান মাটি থেকে মূলের সাহায্যে শোষণ করে। এ উপাদানগুলো মাটিতে বিভিন্ন লবণ হিসেবে থাকে। কিন্তু উক্তিদ এগুলোকে লবণ হিসেবে সরাসরি শোষণ করতে পারে না, আয়ন হিসেবে শোষণ করে। যেমন: Ca^{++} , Mg^{++} , NH_4^+ , NO_3^- , K^+ ইত্যাদি।

উডিদের পুষ্টিতে বিভিন্ন খনিজ উপাদানের ভূমিকা

উডিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন খনিজ পুষ্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিছু ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টের ভূমিকার কথা নিচে বর্ণনা করা হলো।

নাইট্রোজেন : নাইট্রোজেন নিউক্লিক অ্যাসিড, প্রোটিন আর ক্লোরোফিলের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। উডিদের সাধারণ দৈহিক বৃদ্ধিতে নাইট্রোজেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং কোষ কলায় পানির পরিমাণ বৃদ্ধি করে। নাইট্রোজেনের অভাব হলে ক্লোরোফিল সৃষ্টি ব্যাহত হয়, আর ক্লোরোফিল সৃষ্টি ব্যাহত হলে খাদ্য প্রস্তুত বাধাপ্রাপ্ত হয়। খাদ্যপ্রস্তুত বাধাপ্রাপ্ত হলে শ্বসন প্রক্রিয়ায় বিষ্ফল ঘটে এবং শক্তি নির্গমন হ্রাস পায়। **ম্যাগনেসিয়াম:** ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরোফিল অণুর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং শ্বসন প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। এর অভাব হলে ক্লোরোফিল অণু সৃষ্টি এবং সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রস্তুত ব্যাহত হবে। **পটাশিয়াম:** উডিদের বহু জৈবিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় পটাশিয়াম সহায়ক হিসেবে কাজ করে। পত্ররন্ধ্র খেলা এবং বন্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে পটাশিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম। পটাশিয়াম উডিদে পানি শোষণে সাহায্য করে। কোষবিভাজনের মাধ্যমে উডিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে পটাশিয়াম। এটি মূল, ফুল ও ফল উৎপাদন এবং বর্ধনেও সাহায্য করে।

ফসফরাস: মূল বর্ধনের জন্য ফসফরাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। ফসফরাস জীবকোষের DNA, RNA, NADP, ATP প্রভৃতির গাঠনিক উপাদান। কাজেই এটি ছাঢ়া উডিদের পুষ্টি একেবারেই সম্ভব নয়। উডিদের মূল বৃদ্ধির জন্য ফসফরাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান।

আয়রন: আয়রন সাইটোক্রোমের সাংগঠনিক উপাদান, কাজেই বায়বীয় শ্বসন এর উপর নির্ভরশীল। ক্লোরোফিল সৃষ্টিতেও আয়রনের ভূমিকা অপরিসীম।

পুষ্টিতে এগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্যই আমরা ভালো ফলন পেতে জমিতে নাইট্রোজেন (ইউরিয়া), পটাশিয়াম (মিউরেট অফ পটাশ), ফসফরাস (ট্রিপল সুপার ফসফেট) প্রভৃতি সার ব্যবহার করে থাকি। উডিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টগুলোও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন:

ম্যাংগানিজ: ক্লোরোপ্লাস্ট গঠন ও সংরক্ষণের জন্য ম্যাংগানিজ প্রয়োজন।

কপার: টমেটো, সূর্যমুখী উডিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য কপার বা তামার প্রয়োজন, শ্বসন প্রক্রিয়ার উপরও কপারের প্রভাব উল্লেখযোগ্য।

বোরন: উডিদের সক্রিয়ভাবে বর্ধনশীল অঞ্চলের জন্য বোরন প্রয়োজন, চিনি পরিবহনে বোরন পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে।

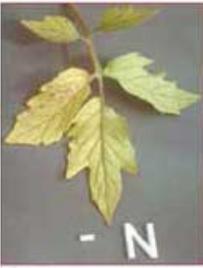
মোলিবডেনাম: অণুজীব দিয়ে বায়বীয় নাইট্রোজেন সংবন্ধনের জন্য মোলিবডেনাম আবশ্যিক।

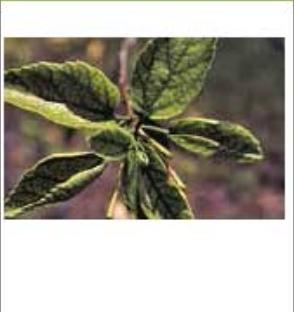
ক্লোরিন: সুগারবিট এর মূল এবং কাণ্ডের বৃদ্ধির জন্য ক্লোরিন প্রয়োজন।

5.1.2 পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত লক্ষণ

উডিদের কোনো পুষ্টি উপাদানের অভাব হলে বিশেষ লক্ষণের মাধ্যমে উডিদ তা প্রকাশ করে। এ

লক্ষণগুলোকে বলা হয় অভাবজনিত লক্ষণ (deficiency symptoms)। এ লক্ষণ দেখে আমরা বুঝতে পারি কোন উত্তিদ বা ফসলে কোন পুষ্টি উপাদানের অভাব রয়েছে। নিচে কিছু উপাদানের অভাবজনিত লক্ষণ উল্লেখ করা হলো:

অভাবজনিত লক্ষণ	রোগাক্রান্ত উত্তিদ
<p>নাইট্রোজেন (N): নাইট্রোজেনের অভাব হলে ক্রোরোফিল সূচিতে বিঘ্ন ঘটে। ক্রোরোফিলের অভাবে পাতার সবুজ রং হালকা হতে হতে একসময় হলুদ হয়ে যায়। তার কারণ ক্রোরোফিল ছাড়া অন্যান্য বর্ণকণা বা পিগমেন্ট মিলিতভাবে হলুদ দেখাই। পাতা হলুদ হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে 'ক্লোরোসিস' (chlorosis) বলে। গৌহ, ম্যাশানিজ বা দমতার অভাবেও ক্লোরোসিস হতে পারে কেবল এগুলোও ক্রোরোফিল উৎপাদনের সাথে কোনো না কোনোভাবে জড়িত। ক্লোরোসিসে কোথের বৃক্ষি এবং বিভাজন হ্রাস পায়, তাই উত্তিদের বৃক্ষি করে যায়। চিরে ব্যথাক্রমে নাইট্রোজেনের ঘাটতিবিশিষ্ট এবং সুস্থ পাতা দেখানো হয়েছে।</p>	 
<p>ফসফরাস (P): ফসফরাসের অভাব হলে পাতা বেগুনি হয়ে যায়। পাতায় মৃত অঞ্চল সূচি হয় এমনকি পাতা, ফুল ও ফল বারে যেতে পারে। উত্তিদের বৃক্ষি বন্ধ হয়ে যায় এবং উত্তিদ খর্বাকার হয়। বেশিরভাগ সময় খালি চোখে দেখে ফসফরাসের ঘাটতি বোঝা যায় না। যত দিনে লক্ষণ দৃশ্যমান হয়, তত দিনে বেশিরভাগ ফেঁয়েই আর তেমন কিছু করার থাকে না।</p>	
<p>পটাশিয়াম (K): পটাশিয়ামের অভাবে পাতার শীর্ষ এবং কিনারা হলুদ হয় এবং মৃত অঞ্চল সূচি হয়। বিশেষ করে পাতার শিরার অধ্যবর্তী স্থানে ক্লোরোসিস হয়ে হলুদবর্ণ ধারণ করে। পাতার কিনারায় পুড়ে যাওয়া সদৃশ বাদামি রং দেখা যায় এবং পাতা কুঁকড়ে আসে। উত্তিদের বৃক্ষি কম হয় এবং শীর্ষ ও পার্শ্ব মুকুল ঘরে যায়।</p>	

<p>ক্যালসিয়াম (Ca): কোষের সাইটোসলে ক্যালসিয়ামের স্থান্তরিক যাত্রা, মাইটোকল্টিয়া এবং এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের স্থান্তরিক কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত। যাত্রা করে শেলে মাইটোকল্টিয়ায় অক্সিডেটিভ ফসফকোরাইলেশন প্রক্রিয়া এবং এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের প্রোটিন প্রাফিকিং প্রক্রিয়া বিপর্যস্ত হয়। তাই ক্যালসিয়ামের অভাবে উত্তিদের বর্ধনশীল শীর্ষ অঞ্চল, বিশেষ করে পাতার কিনারা বরাবর অঞ্চলগুলো মরে যায়। পাতা কুঁকড়ে যায়, ফুল ফোটার সময় উত্তিদের কাণ্ড শুকিয়ে যায় এবং উত্তিদ হঠাতে নেতৃত্বে পড়ে।</p>	
<p>ম্যাগনেসিয়াম (Mg): ম্যাগনেসিয়ামের অভাবে ক্লোরোফিল সংরক্ষণিত হয় না বলে সবুজ রং হালকা হয়ে যায় এবং সালোকসংরক্ষণের হার কমে যায়। পাতার শিরাগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে অধিক হারে ক্লোরোসিস হয়।</p>	
<p>শৌচ (Fe): শৌচের অভাবে প্রথমে কঢ়ি পাতার রং হালকা হয়ে যায়, তবে পাতার সবুজ শিরার মধ্যবর্তী স্থানেই প্রথম হালকা হয় এবং ক্লোরোসিস হয়। কখনো কখনো সম্পূর্ণ পাতা বিবর্ষ হয়ে যায়। কাণ্ড দুর্বল এবং ছেট হয়।</p>	
<p>সালফার (S): সালফার উত্তিদের বিভিন্ন প্রোটিন, হরমোন ও সিটোগ্লিনের পার্টিনিক উপাদানই শুধু নয়, একই সাথে এটি কোষে পানির সমতা রক্ষা করে। সালফারের অভাবে পাতা হালকা সবুজ হয় এবং পাতায় লাল ও বেগুনি দাগ দেখা যায়। কঢ়ি পাতায় বেশি এবং বয়োবৃদ্ধি পাতায় কম ক্লোরোসিস হয়। সালফারের অভাবে মূল, কাণ্ড এবং পাতার শীর্ষ থেকে শুরু করে পর্যাঙ্গমে টিসু মারা যেতে থাকে, যাকে ডাইব্যাক (dieback) বলে। কাণ্ডের মধ্যপর্ব ছেট হয় বলে গাছ খরাকৃতির হয়।</p>	
<p>বোরন (B): বোরন কোষপ্রাচীনের কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করে প্রাচীয়াটিকে তথা কোষটিকে দৃঢ়তা দেয়। বিপাক ক্লিয়ার বিভিন্ন বিক্রিয়ায় এর নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা রয়েছে। তাই বোরনের অভাবে পর্যাপ্ত দৃঢ়তা না পেয়ে এবং বিপাকে পোলবোগ হওয়ার কারণে উত্তিদের বর্ধনশীল অবস্থাগ মরে যায়। কঢ়ি পাতার বৃদ্ধি করে যায় এবং পাতা বিকৃত হয়, কাণ্ড খসখসে হয়ে দেখতে যায়। মূলের কুঁড়ির জন্ম ব্যাহত হয়।</p>	



একক কাজ

কাজ: কোন কোন অনিজ ঘৌলের অভাবে গাছে কী কী অভাবজনিত লক্ষণ দেখা দের, শিক্ষক তার একটি ভালিকা শিক্ষার্থীদেরকে তৈরি করতে বলবেন।

৫.২ প্রাণীর খাদ্য ও পুষ্টি

জোমরা বল্ট এবং অটেম শ্রেণিতে জেনেছ, জীবনধারণের জন্য খাদ্য হেমন অপরিহার্য, তেমনি সুস্থানের জন্য পুষ্টির ও সুব্যবস্থা প্রয়োজন। এই খাদ্যই জীবকোষে জারিত হয়ে দেহে জাগ এবং শক্তি তৈরি করে। জোমরা এবং আগের অধ্যায়ে ইসন প্রক্রিয়ার কীভাবে জীবদেহের ভিতরে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফাগ এবং শক্তি উৎপন্ন হয় সেটা জেনেছ। চলাকেরা, খেলাযুগ্ম ইত্যাদি সব কাজে শক্তির প্রয়োজন। আমরা এই শক্তি পাই খাদ্য থেকে। যেসব বস্তু খাওয়ার পর দেহে পোষিত হয়ে বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করে, তাকে খাদ্য বলে। এই কাজগুলো হচ্ছে দেহের পুষ্টিসাধন, দেহের ক্রিয়াপ্রণালী, দেহে রোগ প্রতিরোধক শক্তি উৎপাদন এবং কর্মশক্তি ও ভাগ উৎপাদন।

৫.২.১ খাদ্যের প্রধান উৎপাদন ও ভাগ উৎস

সম্পৃক্ষিতভাবে আগে উল্লিখিত কাজগুলো আমাদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন। এ কাজগুলো সূচারূপে সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন খাদ্য উৎপাদনের দরকার হয়। খাদ্য অনেকগুলো রাসায়নিক বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত। এই রাসায়নিক বস্তুগুলোকে খাদ্য উৎপাদন বলে। এই উৎপাদনগুলোর মধ্যে পুষ্টি খাকে, তাই খাদ্য উৎপাদনকে পুষ্টি উৎপাদনও বলা হয়। অধিকাংশ খাদ্যে একাধিক খাদ্য উৎপাদন থাকে। কোনো খাদ্যে যে উৎপাদনটি বেশি পরিমাণে থাকে, তাকে সেই উৎপাদনের খাদ্য হিসেবে প্রেরিত করা হয়। উৎপাদন অনুযায়ী খাদ্যবস্তুকে প্রথান্ত তিনি ভাগ করা হয়:

- আমিদ: দেহের বৃক্ষিসাধন এবং ক্রিয়াপ্রণালী করে।
- শর্করা: দেহে শক্তি উৎপাদনে সহায়তা করে।
- রেহ ও চর্বিজাতীয় খাদ্য: দেহে ভাগ এবং শক্তি উৎপাদন করে।

এছাড়া আরও তিনি ধরনের উৎপাদনও দেহের জন্য প্রয়োজন। যেমন:

- খাদ্যশাশ্ব বা ভিটামিন: রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাঢ়ায় এবং বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উন্নীপনা যোগায়।
- খনিজ শব্দ: বিভিন্ন জৈবিক কাজে অংশ নেয়।
- পানি: দেহে পানি এবং জাপের সমতা রক্ষা করে, এছাড়া কোষের কার্বনাদি নিয়ন্ত্রণ করে এবং

কোষ ও তার অঙ্গগুলোকে ধারণ করে।

উপরে উল্লেখ করা খাদ্য উপাদানের বাইরে আরও একটি উপাদান রয়েছে, যেটি কোনো পৃষ্ঠি না জোগালেও একটি পূরুষপূর্ণ খাদ্য উপাদান।

(g) খাদ্য আর্থ (Fibre) বা রাকেজ: রাকেজ পানি শেবণ করে এবং মসের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ও বৃহদর থেকে ঘল নিষ্কাশনে সাহায্য করে।

(a) আমিষ (Protein)

আমিষ বা প্রোটিন-জাতীয় খাদ্য কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন দিয়ে গঠিত। আমিষে শতকরা 16 ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। আমিষে সামান্য পরিমাণে সালফার, ফসফরাস এবং আয়রনও থাকে। নাইট্রোজেন এবং শেবেন্ট উপাদানগুলোর উপস্থিতির কারণে আমিষের পূরুষ শর্করা ও রেহ পদার্থ থেকে আলাদা। শুধু আমিষজাতীয় খাদ্যই শরীরে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে বলে পৃষ্ঠিবিজ্ঞানে আমিষকে একটি পূরুষপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আমিষের উৎস: আমরা আশেই জেনেছি মাছ, মাস, ডিম, দুধ, ডাল, শিমের বীচি, শুটকি মাছ, চিনাবাদাম ইত্যাদি থেকে আমরা আমিষ পাই। উৎস অনুযায়ী আমিষ দুই ধরনের: প্রাণিজ আমিষ এবং উদ্ভিজ্জ আমিষ।

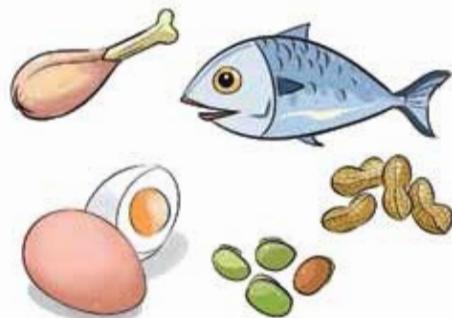
প্রাণিজ আমিষ: মাছ, মাস, ডিম, পনির, ছানা, কলিজা বা যকৃৎ ইত্যাদি প্রাণিজ আমিষ। এসব খাদ্যে দেহের প্রয়োজনীয় আয়াইলো এসিড পাওয়া যায়।

উদ্ভিজ্জ আমিষ: ডাল, চিনাবাদাম, শিমের বীচি ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ আমিষ। একসময় ধারণা করা হতো এগুলো প্রাণিজ আমিষের স্থুলনাম কম পৃষ্ঠিকর, কান্দণ উদ্ভিজ্জ আমিষে প্রয়োজনীয় সব কয়টি আয়াইলো এসিড থাকে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উদ্ভিজ্জ আমিষ প্রাণিজ আমিষের মতোই সকল আয়াইলো এসিড পর্যাপ্ত পরিমাণে ধারণ করে।

অনেক সময়, দুই বা ততোধিক উদ্ভিজ্জ আমিষ একত্রে রাখা করা যায়। কিন্তু এতে আয়াইলো এসিডের অনুপাতের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় না।

(b) শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrate)

শর্করাজাতীয় খাদ্য শর্করা কাজ করার শক্তি যোগায়। শর্করার মৌলিক উপাদান কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন। উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল ও বীজে শর্করা বিভিন্নরূপে জমা থাকে। ফলের



চিত্র 5.01: আমিষজাতীয় খাদ্য

রসে গুকোজ, দুধে ল্যাকটোজ, গম, আলু, চাল ইত্যাদিতে শ্বেতসার (স্টোর্ট) ইত্যাদি শর্করাজাতীয় খাদ্যের বিভিন্ন রূপ। গর্তনগুচ্ছতি অনুসারে শর্করাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। নিচের সারণিতে এই তিন ধরনের শর্করার গঠন এবং উৎস দেখানো হলো।

সারণি 10.2: শর্করার শ্রেণিবিভাগ

শর্করা প্রেসি	গঠন	উদাহরণ	উৎস
এক শর্করা (Mono-saccharide)	একটি মনোমার বিশিষ্ট শর্করা	গুকোজ	মধু, ফলের রস
বি-শর্করা (Disaccharide)	দুইটি মনোমারবিশিষ্ট (ডাইমার) শর্করা	সুক্রোজ, ল্যাকটোজ	চিনি ও দুধ
বহু শর্করা (Polysaccharide)	বহু মনোমারবিশিষ্ট (গোলিমার) শর্করা	শ্বেতসার, প্রাইকোজেল	চাল, আটা, আলু, সবজি শাক-সবজি ইত্যাদি।

গুরুতর চাল, গম, আলু থেকে আমরা শ্বেতসার পাই। কাঁচা খাদ্যের শ্বেতসার সহজে হজম হয় না। এজন্য আমরা চাল, আটা, আলু ইত্যাদি রাখা করে থাই। খাওয়ার পর শর্করা পরিপাক হয়ে গুকোজে পরিণত হয়। বি-শর্করা এবং বহু শর্করা পরিপাকের মাধ্যমে সরল শর্করার পরিণত হয়ে দেহে শোষণযোগ্য হয়। মানব পরিপূর্ণির জন্য সরল শর্করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মানবদেহ শুধু সরল শর্করা শোষণ করতে পারে।

(c) শর্করাজাতীয় খাদ্য (Fats)

চর্বি একটি অরোজনীয় খাদ্য উপাদান। কার্বন, হাইড্রোজেল, অক্সিজেল দিয়ে তৈরি এই উপাদানটির মুখ্য কাজ হলো ভাপ উৎপাদন করা। এই উপাদানটি পাকস্বলীভূতে অনেকক্ষণ থাকে, তাই তখন কুধা পাই না। দেহের ভক্তের নিচে চর্বি জমা থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন অঙ্গ ঘেঁষন: বক্তৃৎ, অঙ্গস্তোক, মাংস পেশিভেগ চর্বি জমা থাকে। দেহের এ সক্রিয় চর্বি উপবাসের সময় কাজে আগে। শর্করা ও আমিরের তুলনায় চর্বিতে প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ ক্যালরি থাকে

(ক্যালরি হলো প্রাপ্তিদেহে শক্তি মাপার একটি একক)। খাবার তেল বা ঘি দিয়ে রাখা করা খাবার বেশ সুস্বাদু হয়, সঙ্গে এর পুরিমানও বেড়ে যাব। ঘেঁষন সিক্ষ আলুর চেরে ভাজা আলু, ঝুটির চেরে শুচি বা



চিত্র 5.02: শর্করাজাতীয় খাদ্য

পরোটা শুধু মুখরোচকই নয়, এতে ক্যালরি বেশি পাওয়া যায়। কোনো কোনো চর্বিতে ভিটামিন ‘এ’ আছে, আবার কোনোটিতে আছে ভিটামিন ‘ই’।

উৎস অনুযায়ী মেহপদার্থ দুই ধরনের, উচ্চিক্ষ মেহপদার্থ এবং প্রাণিক মেহপদার্থ।

উচ্চিক্ষ মেহপদার্থ: সয়াবিন, সরিষা, তিল, বাদাম, সূর্যমুখী এবং জুটার তেল তোজ্জন্তেল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তোজ্জন্তেলের মধ্যে সয়াবিন তেল উৎকৃষ্টতম।

প্রাণিক মেহপদার্থ: চর্বি, ঘি, ডালডা ইত্যাদি প্রাণিক মেহপদার্থ। ডিমের কুসুমে মেহপদার্থ আছে, কিন্তু সামান্য অংশে মেহপদার্থ থাকে না। মেহপদার্থ পানিতে অঙ্গুষ্ঠীয়। পানির চেয়ে হলকা বলে পানির উপর ভাসে। একজন সূচৰ সবল পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দিনে 50-60 গ্রাম চর্বির প্রয়োজন হয়।



চিত্র 5.03: মেহমাতীর খাদ্য

(d) খাদ্যাণশ বা ভিটামিন (Vitamins)

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অয়োজনীয় ভিটামিনের পরিমাণ খুব সামান্য হলেও এর গুরুত্ব অগ্রিমীয়। দেহের বৃদ্ধির জন্য ও সুস্থ ধাকার জন্য ভিটামিন অত্যাবশ্যিক। সুব্যথ খাদ্যে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উপাদান থাকে বলে সুব্যথ খাদ্য থেকে প্রচুর ভিটামিন পাওয়া যায়। তবে নিয়মিত ভিটামিনবিহীন খাবার খেলে কিছুদিনের মধ্যে দেহে ভিটামিনের অভাবজনিত সমস্যা দেখা দেয়। পরবর্তীকালে তা মারাত্মক আকারে স্থায়ীভাবে দেহের ক্ষতিসাধন করে, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

ভিটামিনকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, চর্বিতে ছবণীয় ভিটামিন এবং পানিতে ছবণীয় ভিটামিন।

চর্বিতে ছবণীয় ভিটামিন

ভিটামিন A: দুধ, মাখন, চর্বি, ডিম, পাজুর, আম, কাঁঠাল, রাঙ্গুনি শাকসবজি, মলা মাছ ইত্যাদিতে ভিটামিন ‘এ’ পাওয়া যায়।

ভিটামিন D: দুধ, ডিম, কলিজা বা যকুৎ, দুগ্ধজাত ফ্রুট, মাছের তেল, তোজ্জ্য তেল ইত্যাদিতে ভিটামিন ‘ডি’ থাকে।

ভিটামিন E এবং K: উপরে উল্লিখিত সব খাবার থেকে ভিটামিন ‘ই’ এবং ‘কে’ পাওয়া যায়।

পানিতে ছবণীয় ভিটামিন

ভিটামিন B: ইস্ট, চেকিছাঁটি চাল, জাঁকায় ভাঞ্জা আটা বা শাল আটা, অঙ্গুরিত হোলা, মুগডাল, মটর,

ফুলকপি, চিনাবাদাম, শিমের বীচি, কলিজা বা যকৃৎ, হৎপিণ্ড, দুধ, ডিম, মাংস, সবুজ শাকসবজি ইত্যাদিতে ভিটামিন ‘বি’ থাকে।

ভিটামিন C: পেয়ারা, বাতাবি লেবু, কামরাঙ্গা, কমলা, আমড়া, বাঁধাকপি, টমেটো, আনারস, কাঁচামরিচ, তাজা শাকসবজি ইত্যাদি থেকে ভিটামিন ‘সি’ পাওয়া যায়।

(e) খনিজ লবণ (Mineral salts)

দেহকোষ ও দেহের তরল অংশের জন্য খনিজ লবণ অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। মানুষের শরীরে ক্যালসিয়াম, লৌহ, সালফার, দস্তা, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, আয়োডিন ইত্যাদি থাকে। এ উপাদানগুলো কখনো মৌলিক উপাদানরূপে মানবদেহে অবস্থান করে না, এগুলো খাদ্য ও মানবদেহে বিভিন্ন পরিমাণে অন্য পদার্থের সাথে মিলিত হয়ে নানা জৈব এবং অজৈব ঘোগের লবণ তৈরি করে। খনিজ লবণ দেহ গঠন ও দেহের অভ্যন্তরীণ কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। হাড়, দাঁত, পেশি, এনজাইম এবং হরমোন গঠনের জন্য খনিজ লবণ একটি অপরিহার্য উপাদান। স্নায়ুর উদ্ধীপনা, পেশি সংকোচন, দেহকোষে পানির সাম্যতা বজায় রাখা, অম্ল ও ক্ষারের সমতাবিধান, এসব কাজে খনিজ লবণের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

দুধ, দই, ছানা, পনির, ছোট মাছ (মলা-চেলা), নানা রকম ডাল, সবুজ শাকসবজি, টেঁড়স, লাল শাক, কচু শাক ইত্যাদি ক্যালসিয়ামের প্রধান উৎস। কলিজা, সবুজ শাকসবজি, মাংস, ডিমের কুসুম, কচু শাক ইত্যাদিতে লৌহ থাকে। দুধ, মাছ, মাংস, বাদাম, ডাল থেকে ফসফরাস পাওয়া যায়। খাবার লবণ, চিপস, নোনতা খাবার, পনির, বাদাম, আচার ইত্যাদিতে সোডিয়াম থাকে। মাছ, মাংস, বাদাম, ডাল, কলা, আলু, আপেল ইত্যাদিতে পটাশিয়াম থাকে। আয়োডিনের উৎস হলো সামুদ্রিক উঙ্গিদ ও মাছ, মাংস এবং শেওলা।

(f) পানি (Water)

পানির অপর নাম জীবন। জীবনরক্ষার কাজে অক্সিজেনের পরেই পানির স্থান। দেহের পুষ্টির কাজে পানি অপরিহার্য। দেহের গঠন ও অভ্যন্তরীণ কাজ পানি ছাড়া চলতে পারে না। মানবদেহে পানির কাজগুলোকে তিন ভাগ করা যায়, দেহ গঠন, দেহের অভ্যন্তরীণ কার্য নিয়ন্ত্রণ এবং দেহ থেকে দূষিত পদার্থ নির্গমন।

দেহ গঠন: দেহকোষের গঠন এবং প্রতিপালন পানি ছাড়া কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয়। গড়ে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দৈহিক ওজনের 50%-65% পানি।

দেহের অভ্যন্তরীণ কার্য নিয়ন্ত্রণ: পানি ব্যতীত দেহের অভ্যন্তরের কোনো রাসায়নিক ক্রিয়া চলতে পারে না। দেহে পানি দ্রাবকরূপে কাজ করে। পানির জন্যই দেহে রক্তসঞ্চালন সম্ভব। রক্তে পরিবাহিত খাদ্য উপাদান এবং অক্সিজেন পানির মাধ্যমে দেহকোষে পৌঁছাতে পারে। দেহের সকল ধরনের রসে খনিজ লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। পরিপাককৃত খাদ্য উপাদান পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় ক্ষুদ্রাণ্ডের মধ্য দিয়ে রক্তে বিশোষিত হয়।

দুষ্পুর্ণ পদাৰ্থ নিৰ্গমন: পানি দেহেৰ দুষ্পুর্ণ পদাৰ্থ অপসারণে সাহায্য কৰে। মলমূত্ৰ, ঘাম ইত্যাদি দুষ্পুর্ণ পদাৰ্থেৰ সাথে দেহ থেকে প্রচুৰ পরিমাণে পানি বেৰ হয়ে যায়।

এভাৱে প্ৰতিদিন দেহ থেকে প্রচুৰ পরিমাণে পানি নিৰ্গত হয়। তাছাড়া বয়স, আবহাওয়া, পৱিত্ৰম, খাওয়াৰ অভ্যাস ইত্যাদি বিষয়গুলো পানিৰ চাহিদাকে প্ৰভাৱিত কৰে। তাই একজন প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিৰ দৈনিক 2 লিটাৰ পানি পান কৰা প্ৰয়োজন। যেমন: কোনো ব্যক্তিৰ দৈনিক ক্যালৱি চাহিদা 2000 কিলোক্যালৱি হলে, তাৰ দৈনিক 2 লিটাৰ পানিৰ প্ৰয়োজন হয়।

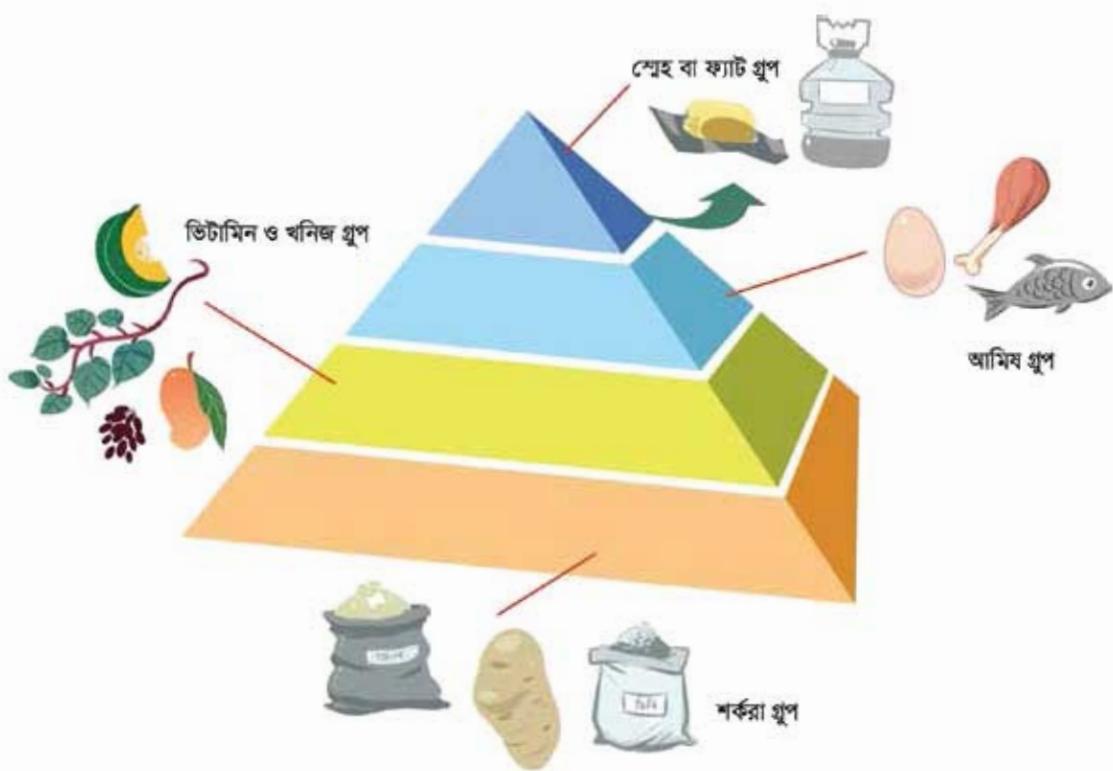
(গ) খাদ্য আঁশ (Fibre) বা রাফেজ

শস্যদানার বহিৱাৰণ, সবজি, ফলেৰ খোসা, শাঁস, বীজ এবং উড়িদেৱ ডাঁটা, মূল ও পাতায় আঁশ থাকে। এগুলো মূলত কোষপ্রাচীৱেৰ সেলুলোজ এবং লিগনিন। হাড় যেমন মানবদেহেৰ কাঠামো তৈৱি কৰে, সেলুলোজ এবং রাফেজ তেমনি উড়িদেৱ কাঠামো তৈৱি কৰে। এগুলো জটিল শৰ্কৱা। গবাদিপশু, যেমন: গৱু, ছাগল, মহিষ ইত্যাদি সেলুলোজ হজম কৰতে পাৱে। কিন্তু মানুষ এগুলো হজম কৰতে পাৱে না। রাফেজ পানি শোষণ কৰে এবং মলেৰ পৱিত্ৰণ বৃদ্ধি কৰে ও বৃহদৰ্ত্ত থেকে মল নিষ্কাশনে সাহায্য কৰে। রাফেজযুক্ত খাবাৰ বিষাক্ত বজনীয় বস্তুকে খাদ্যনালি থেকে পৱিত্ৰণ কৰে। ধাৰণা কৰা হয়, এৱুপ খাবাৰ খাদ্যনালিৰ ক্যালৱি আনেকাংশে হ্রাস কৰে। আঁশযুক্ত খাবাৰ স্থূলতা হ্রাস, ক্ষুধাপ্ৰণতা এবং চাৰি জমাৰ প্ৰণতা হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা পালন কৰে।

5.2.2 আদৰ্শ খাদ্য পিৱামিড

যেকোনো একটি সুষম খাদ্যতালিকায় শৰ্কৱা, ভিটামিন ও খনিজ, আমিষ ও স্লেহ বা চৰ্বিজাতীয় খাদ্য এবং ফাইবাৰ অন্তৰ্ভুক্ত থাকে। একজন কিশোৱা বা কিশোৱী, প্ৰাপ্তবয়স্ক একজন পুৱুষ বা মহিলাৰ সুষম খাদ্যতালিকা লক্ষ্য কৰলে দেখা যায়, তালিকায় শৰ্কৱাৰ পৱিত্ৰণ সবচেয়ে বেশি, শৰ্কৱাকে নিচে রেখে পৱিত্ৰণগত দিক বিবেচনা কৰে পৰ্যায়ক্ৰমে শাকসবজি, ফলমূল, আমিষ এবং স্লেহ ও চৰ্বিজাতীয় খাদ্য সাজালে যে কাল্পনিক পিৱামিড তৈৱি হয়, তাকে আদৰ্শ খাদ্য পিৱামিড বলে। চিত্ৰে এই পিৱামিডেৰ সবচেয়ে উপৱে রয়েছে স্লেহ বা চৰ্বিজাতীয় খাদ্য আৱ সবচেয়ে নিচে রয়েছে শৰ্কৱা।

আমাদেৱ দৈনন্দিন প্ৰয়োজনীয় খাবাৰ তালিকায় যেসব খাবাৰ থাকে তা 5.4 নং চিত্ৰে পিৱামিডেৰ আকাৱে দেখানো হলো। খেয়াল কৰে দেখ, পিৱামিডেৰ অংশগুলো তাৰ আকাৱ অনুযায়ী নিচেৰ দিকে চওড়া এবং উপৱেৰ দিকে সুৱ। সবচেয়ে চওড়া অংশে ভাত, আলু, বুটি এসব। এগুলো বেশি কৰে খেতে হবে। তাৰ পৱেৰ অংশে আছে শাকসবজি এবং ফলমূল। এসব ভাত, বুটিৰ চেয়ে কম খেতে হবে। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল, পনিৱ, ছানা, দই আৱও কম পৱিত্ৰণে খেতে হবে। তেল, চাৰি ও মিষ্টিজাতীয় খাবাৰ সবচেয়ে কম খাওয়া উচিত। আমাদেৱ প্ৰতিদিনেৰ খাবাৰ এই খাদ্য পিৱামিড অনুযায়ী বেছে নিতে হবে, তবেই আমৱা সহজে সুষম খাদ্য নিৰ্বাচন কৰতে পাৱব। কোনো কিছু খেতে ভালো লাগলে আমৱা অনেক সময় বেশি খেয়ে নেই, সুস্বাস্থ্যেৰ জন্য এ অভ্যাস ভালো নয়। তাই আমাদেৱ সবাৱই পৱিত্ৰণ



চিত্র 5.04: আদর্শ খাদ্য পিরামিড

খাউয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে, সেই সঙ্গে খাদ্য প্রহপের নিয়মনীতি এবং সবস্ব মেলে চলতে হবে।

5.2.3 খাদ্য প্রহপের নীতিমালা (Principles of food habit)

খাদ্য উপাদান খাই করা, সুষম খাদ্য নির্বাচন করা ও সুষম আহার করা উভয় জীবনযাপনের একটি পূর্বশর্ত। এ অন্য খাদ্যপ্রহপে নীতিমালা বা নিয়মনীতি প্রজ্যোকের জন্য প্রয়োজন। নীতিমালা সকলকে পূর্ণ জ্ঞান থাকলে খাদ্য নির্বাচন, খাদ্যের পৃষ্ঠিমান, ক্যালরি, পারিবারিক আৰ ইত্যাদি সকলকে নজর রেখে পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যের খাদ্যের চাহিদা মেটানো সহজ হব।

সুষম খাদ্যের বৈশিষ্ট্য

- একজন মানুষের বিপাকের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি উপাদানের সামর্থ্য থাকতে হবে।
- শর্করা, আমিষ এবং চর্বি নির্দিষ্ট অনুপাতে পরিমাণ ঘতো প্রক্ষ করতে হবে।
- খাদ্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও রাসেজ বা সেলুলোজ (ফাইবার) সরবরাহের জন্য সুষম খাদ্য

তালিকায় ফল ও টাটকা শাকসবজি থাকতে হবে।

(d) খাদ্যে অবশ্যই প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি ও খনিজ লবণ থাকতে হবে।

(e) সুষম খাদ্য অবশ্যই সহজপাচ্য হতে হবে।

সুস্থ, সবল ও উন্নত জীবনযাপনের জন্য সুষম খাদ্যের কোনো বিকল্প নেই। দেহের পরিপুষ্টির জন্য ছয় উপাদানবিশিষ্ট খাদ্য অন্তর্ভুক্ত করে সুষম খাদ্যের তালিকা বা মেনু পরিকল্পনা করা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেহের চাহিদা, খাদ্যের সহজলভ্যতা এবং পারিবারিক আয়, এ তিনটি বিষয় বিবেচনা করে খাদ্য উপাদান বাছাই বা মেনু পরিকল্পনা করলে তা বাস্তবযুক্তি হয়। কম দামি খাবার দিয়ে সমান পুষ্টিমানের মেনু পরিকল্পনা করা যায়; তাই সমমানের উপাদান-সংবলিত বেশি দামের খাদ্যের পরিবর্তে কম দামি খাদ্য নির্বাচন করে সুষম খাদ্য গ্রহণের মানসিকতা থাকা ভালো।

সুষম খাদ্যের তালিকা তৈরি

সুষম খাদ্যের তালিকা তৈরির জন্য কতগুলো বিষয়ের দিকে বিশেষ লক্ষ রাখা প্রয়োজন। যেমন:

- ব্যক্তিবিশেষের লিঙ্গ, বয়স, পেশা ও শারীরিক অবস্থা
- খাদ্যের মূল্যমান সম্পর্কে জ্ঞান
- দেহের ক্ষয়পূরণ ও গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আমিষ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ
- খাদ্যে পরিমাণমতো ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানির উপস্থিতি
- ঝর্তু, আবহাওয়া ও খাদ্যাভাস সম্বন্ধে জ্ঞান
- পরিবারের আর্থিক সংগতি ও সদস্যসংখ্যা

নিচের সারণিগুলো পর্যবেক্ষণ কর। এ থেকে তোমরা বিভিন্ন বয়সী মানুষের খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ ও ক্যালরি চাহিদা সম্পর্কে ধারণা পাবে।

তালিকা (a): পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও নারীর জন্য সুষম খাদ্যতালিকা

পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও নারীর দেহে প্রতিদিনের জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রার ক্যালরি পেতে হলে তালিকায় উন্নিখিত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের জন্য অতিরিক্ত খাদ্যের প্রয়োজন হবে। কিশোর ও যুবা বয়সী ছেলেমেয়েদের বয়স অনুযায়ী পরিমাণে একটু কম খেলেও চলবে।

পূর্ণবয়স্ক পুরুষ				পূর্ণবয়স্ক নারী		
খাদ্যশস্যের নাম	পরিশমহীন (গ্রাম)	মোটামুটি পরিশমী (গ্রাম)	পরিশমী (গ্রাম)	পরিশমহীন (গ্রাম)	মোটামুটি পরিশমী (গ্রাম)	পরিশমী (গ্রাম)
শিম/বরবটি	20	25	30	20	22.5	25
ডিম মাছ/মাংস	1টি 30	1টি 30	1টি 30	1টি 30	1টি 30	1টি 30
পাতাযুক্ত শাক	40	40	40	100	100	150
অন্যান্য সবজি	60	70	80	40	40	100
আলু	50	60	80	50	50	60
দুধ	150	200	250	100	150	200
তেল/চর্বি	45	50	70	25	30	45
চিনি/গুড়	30	35	55	20	20	40

তালিকা (b): বাংলাদেশের সাধারণ খাদ্যসমূহের পুষ্টিমান

বাংলাদেশের সাধারণ খাদ্যশস্যগুলোর খাদ্যমান বা পুষ্টিমানের উপর ভিত্তি করে এ ছকটি তৈরি করা হয়েছে। এটি The Institute of Nutrition and Food Science (INFS, 1975) কর্তৃক স্বীকৃত ও প্রকাশিত একটি ছক। প্রতি 100 গ্রাম গ্রহণযোগ্য খাদ্যাংশের ভিত্তিতে ক্যালরি মান নির্ধারণ করা হয়েছে। ক্যালরি মান কীভাবে বের করতে হয়, সেটি এই অধ্যায়েই বর্ণনা করা হয়েছে।

খাদ্যকের নাম (100 gram)	পুষ্টি (কিলোক্রান্তিরি)
চাল	346
গম (আটা)	341
ছোলা	360
মসুর	343
গাজর	48
গোল আলু	97
কলমিশাক	28
পুইশাক	26
কুমড়া (ছেট)	60
বেগুন	24
ফুলকপি	30
বাঁধাকপি	27
বরবটি	26

খাদ্যকের নাম (100 gram)	পুষ্টি (কিলোক্রান্তিরি)
শিঘ	96
ইলিশ মাছ	273
কাভলা মাছ	111
চিংড়ি	89
গো-মাস	114
ডিম	173
মুরগির মাস	109
খাসির মাস	194
গরুর দূধ	67
মাঝের দূধ (মানুষ)	65
গরুর দূধের ধি	900
রামার ক্ষেত	900



একক কাজ

কাজ: তালিকা থেকে শর্করা, আমিষ, চর্বিজাতীয় খাদ্যের তালিকা প্রস্তুত কর।

এছাড়া অন্য যে বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে তা হলো:

- খাদ্য তৈরি, পরিবেশন ও এহসের সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।
- দৈনিক পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পান করা। পানি অবশ্যই ফুটিয়ে পান করতে হবে।
- টাটকা ও সবুজ শাকসবজি এবং মৌসুমি ফলমূল এহস। প্রতিদিন খাদ্যতালিকায় এগুলো থাকা আবশ্যিক। তিনজাত ও হিমায়িত শাকসবজি না খাওয়াই উচিত।



একক কাজ

কাজ: শিক্ষার্থী তার ৭ দিনের গৃহীত খাদ্যের একটি তালিকা তৈরি করবে এবং এটিকে সুষম খাদ্যের সাথে তুলনা করে প্রেরিতে উপস্থাপন করবে।

৫.৩ পৃষ্ঠির অভাবজনিত রোগ

(a) গরটার (Goitre)

অচলিত অর্থে গলগত বলতে থাইরয়োড প্রক্রিয়া বেকোনো কোলাকে বোঝায়। গলগতের কিন্তু বিশেষ ধরনকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে গরটার নামে ডাকা হয়, অর্থাৎ সব গলগত গরটার নয়। টিউমার, ক্যালার, প্রদাহসহ নানা কারণে থাইরয়োড সূলে বেতে পারে, সেগুলো গরটার নয়। আবার, গরটার থাইরয়োড প্রক্রিয়া কোনো নিশ্চিত রোগ বোঝায় না, বরং থাইরয়োডের বিভিন্ন রোগের এক সাধারণ বহিপ্রকাশকে বোঝায়। নানা কারণে গরটার হতে পারে। আবারে আয়োডিনের অভাব গরটার তথা গলগতের অন্যতম কারণ। সমূহ থেকে দূরে উত্তর বঙ্গ এবং পার্বত্য এলাকার মাটিতে আয়োডিন কম থাকায় ওই সব অঞ্চলের মানুষের এই সমস্যা বেশি দেখা যায়।



চিত্র ৫.০৫: গলগত রোগী

(b) রাতকানা (Night Blindness)

কিটামিন ‘এ’-এর অভাবে চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে জেরোফ্যালমিয়া (Xerophthalmia) নামক রোগ হয়। কিটামিন ‘এ’-এর অভাব পূর্ণ না হলে রোগটির মাত্রা ও তীব্রতা বাড়তে থাকে। জেরোফ্যালমিয়ার সাথে থেকে আটটি মাত্রা রয়েছে, যার সর্বনিম্ন মাত্রা হচ্ছে রাতকানা। সাধারণত দুই থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের মধ্যে এ রোগ বেশি দেখা দেয়। অতে চোখের সংবেদী ‘রড’ কোষগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়, স্বল্প

আলোতে ভালো দেখতে পায় না। চোখে সবকিছু ঝাপসা দেখা যায়। রোগটা বেড়ে গেলে কর্নিয়া ঘোলাটে হয়ে যায়। রাতকানা দশা থেকে শুরু করে চতুর্থ বা পঞ্চম মাত্রার জেরোফথ্যালমিয়া ভিটামিন ‘এ’-সহ কিছু ওষুধ প্রয়োগে ভালো হয় কিন্তু রোগ চূড়ান্ত মাত্রায় বা তার কাছাকাছি পৌঁছে গেলে কর্নিয়া প্রতিস্থাপন অঙ্গোপচার ছাড়া আর তেমন কিছু করার থাকে না।

এই রোগ প্রতিরোধের জন্য ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধ খাদ্য, যেমন: মাছের যকৃতের তেল, কলিজা, সবুজ শাকসবজি, রঞ্জিন ফল (পাকা আম, কলা ইত্যাদি) ও সবজি (মিষ্টি কুমড়া, গাজর ইত্যাদি) এবং মলা-চেলা মাছ খাওয়া উচিত।

(c) রিকেটস (Rickets)

এটি কোনো ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ নয়, ভিটামিন ‘ডি’ এর অভাবে এ রোগ হয়। অন্তে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস শোষণ, দাঁত ও হাড় গঠন প্রভৃতি শারীরবৃত্তীয় কাজে এই ভিটামিন প্রয়োজন। দুধ, মাখন, ডিম, কড়লিভার তেল ও হাঙ্গারের তেলে প্রচুর ভিটামিন ‘ডি’ পাওয়া যায়। সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মির প্রভাবে মানুষের ত্বকে জমা থাকা কোলেস্টেরল থেকেও এটি তৈরি হয়, তবে সেক্ষেত্রে ভিটামিন ডি তৈরির শেষ ধাপটি সংঘাটিত হয় কিডনিতে।

দেহের হাড়গুলো দুর্বল হওয়া, গিট ফুলে যাওয়া, হাড়গুলো বিশেষ করে পায়ের হাড় বেঁকে যাওয়া ইত্যাদি এ রোগের লক্ষণ। এছাড়া এই রোগে অনেক সময় দেহের কাঠামো ঠিক থাকে না, হাড়গুলো ভঙ্গুর হয়ে যায় এবং বক্ষদেশ স্বরূ হয়ে যায়।

শিশুদের পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন ‘ডি’ সমৃদ্ধ খাবার খাওয়াতে হবে। চোখ এবং জননাঙ্গ ঢেকে রেখে নবজাতককে কিছুক্ষণ রোদে রাখা ভালো। এতে সূর্যালোকের অতি বেগুনি রশ্মির প্রভাবে শরীরে কোলেস্টেরল থেকে ভিটামিন ‘ডি’ তৈরি হয়। নিয়মিতভাবে সারা শরীর সারা দিন কালো বা গাঢ় রঙের কাপড়ে ঢেকে রাখলে কিংবা দীঘদিন ধরে ঘরের বাইরে না বের হলে তব পর্যাপ্ত সূর্যালোক পায় না এবং এ কারণে ভিটামিন ‘ডি’-এর ঘাটতি দেখা দিতে পারে।

(d) রক্তশূন্যতা (Anemia)

আমাদের দেশে শিশু ও নারীদের ক্ষেত্রে রক্তস্বল্পতা বা রক্তশূন্যতা একটি সাধারণ রোগ। রক্তশূন্যতা হচ্ছে দেহের এমন একটি অবস্থা, যখন বয়স এবং লিঙ্গাভেদে রক্তে হিমোগ্লোবিনের ঘনত্ব স্বাভাবিকের তুলনায় কমে যায়। খাদ্যের মুখ্য উপাদান লৌহ, ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন বি-12 ইত্যাদির অভাব ঘটলে এ রোগ দেখা যায়। রক্তস্বল্পতার শার্তাধিক কারণ জানা গেছে এবং পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি না হয়েও রক্তস্বল্পতা হতে পারে। তবে বাংলাদেশে সাধারণত লৌহের ঘাটতিজনিত রক্তস্বল্পতা বেশি হয়। শিশুদের, প্রজননের উপযুক্ত বয়সী নারীদের (15-45 বছর) এবং গর্ভবতীদের এই রোগ বেশি হয়। লৌহের ঘাটতিজনিত রক্তস্বল্পতা বা রক্তশূন্যতা বিভিন্ন কারণে হতে পারে। যেমন, অত্যধিক রক্তপাত ঘটলে, কৃমির আক্রমণে, লৌহ গঠিত খাদ্য উপাদান শরীরে যথাযথভাবে শোষিত না হলে, বাড়ন্ত শিশু বা গর্ভবতী নারীদের খাদ্যে

লৌহের পরিমাণ কম থাকলে, অঙ্গে সংক্রমণ ঘটলে, কয় বরষী শিশুদের খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ লৌহের অভাব হলে। রক্তশূল্যতা হলে নিয়ন্ত্রিত সক্রিয়গুলো দেখা দেয়: দুর্বলতা অনুভব করা, আধাৰ্যুথা, মনমুগ্ধ জীব, অনিন্দা, চোখে অন্ধকার দেখা, খাওয়ার অসুচি, বুক ধড়কড় করা ইত্যাদি।

এ গ্রোগ প্রতিয়োথের জন্য লৌহসমৃদ্ধ খাবার, যেমন যকুৎ, মাস, ভিম, চিনাবালাম, শোকসবজি, বরবটি, মসুর ডাল, খেজুরের পুড় খেতে হয়। পরীক্ষা করে অঙ্গে ক্রিয় বা হৃকওয়ার্ম-এর সংক্রমণ নিশ্চিত হলে ক্রিয়াশক উষ্ণ সেবন করা যায়। হারোজন হলে ডাঙ্কারের পরামর্শ অনুযায়ী লৌহ উপাদানমুক্ত ওষুধ সেবন করে এই গ্রোগ প্রতিয়োথ করা সহজবপর হয়। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া রক্তশূল্যস্পতার চিকিৎসা করা বিপজ্জনক হতে পারে। কেননা রক্তশূল্যস্পতার এমন কিছু ধরন (যেমন: ধ্যালাসেমিয়া) রয়েছে, যেখানে প্রচলিত যাত্রায় লৌহজাতীয় ওষুধ বা খাদ্য প্রেরণ করলে গ্রোগী আরও বেশি অসুবিধে হয়ে পড়ে। তাই রক্তশূল্যস্পতার চিকিৎসা শুরু করার আগে তার সঠিক কার্যক নির্ণয় করা আবশ্যিক।



একক কাজ

কাজ: স্বাস্থ্যসম্বত্ত জীবন ধাপনে পুষ্টির অবদান বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পোস্টার অঙ্গন করো।

৫.৪ পুষ্টির উপাদানে শক্তি

আমরা জানি, খাদ্য আমাদেরকে পুষ্টি ও শক্তি দেয়। কিন্তু কী পরিমাণ খাদ্য উপাদান থেকে কী পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়, আমরা কি সোটি জানি? আবার বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান থেকে নির্গত শক্তির পরিমাণও কি এক? খাদ্যের হয়টি পুষ্টি উপাদানের মধ্যে শুধু শর্করা, প্রোটিন এবং চর্বিজাতীয় উপাদান শক্তি দিতে পারে। বাকি উপাদান কিন্তি শক্তি দিতে পারে না।

আমাদের দেহের মাইক্রোবায়োজ্য কাজে আমরা চলাতে, ক্রিয়েতে, হাঁটাতে, দৌড়াতে, বসাতে ইত্যাদি কাজে স্বাস্থ্যসম্বোধ করি। মাইক্রোবায়োজ্য এ ধরনের কাজে সহায়তার জন্য কী পরিমাণ শক্তি ব্যবহার হয়? পেশির সংকেচন প্রসারণে শক্তি দরকার হয়। সুতরাং, মাইক্রোবায়োজ্য বেশি সংকুচিত ও প্রসারিত হবে, শক্তিও তত বেশি ব্যবহার হবে। তাই, কাজের উপর নির্ভর করে শক্তি ব্যয়ের পরিমাণ। তবে কি হাঁটা, চলা ও নড়াচড়া না করলে শক্তি ব্যবহার হবে না?

আমরা যদি কোনো কাজ না করি, শুধু শুয়ে বসে থাকি, তবুও আমাদের খাদ্যের দরকার হয়, কুখ্য লাগে, বিশ্রামব্যতীত অবস্থায় শক্তি ব্যবহার হয় বলে মনে হয়। কিন্তু কীভাবে?

বিশ্রামব্যতীত আমাদের বাধ্যতিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন হাত, গা কাজ করে না, কিন্তু আমাদের স্বাস-প্রস্বাস, হৃৎপিণ্ড ঠিকই চলতে থাকে। এদের সাথে সংগ্রাহিত পেশিগুলোর সংকেচন-প্রসারণে সার্বিক কাজ সাধিত

হয়, কাজেই তখনও শক্তি ব্যয় হতে থাকে। এই শক্তিকে মৌলিকপাক শক্তি বলে। একজন লোকের দৈনিক কী পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন তা প্রধানত নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের উপর, মৌলিকপাক, দৈহিক পরিশ্রমের ধরন ও খাদ্যের প্রভাব। এছাড়া দেহের বৃদ্ধির শারীরিক অবস্থা ও আবহাওয়ার উপরও ক্যালরির চাহিদা নির্ভর করে।

৫.৪.১ খাদ্য শক্তি পরিমাপের একক

তোমরা জান, শক্তির বিভিন্ন রূপ রয়েছে। পুষ্টি উপাদান থেকে নির্গত শক্তি হচ্ছে তাপশক্তি। তাপশক্তির একক হচ্ছে ক্যালরি। পদার্থবিজ্ঞানের হিসেবে এক কিলোগ্রাম (1000 গ্রাম) পানির উষ্ণতা 1 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি করতে 1000 ক্যালরি বা 1 কিলোক্যালরি তাপের প্রয়োজন হয়। পুষ্টিবিদেরা খাদ্যের শক্তি বোঝানোর জন্যেও “ক্যালরি” শব্দটি ব্যবহার করে থকেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খাদ্যের ক্যালরি আসলে কিলোক্যালরি। বিভান্তি এডানোর জন্য এখানে খাদ্য শক্তি বোঝানোর জন্য খাদ্য ক্যালরি অথবা কিলোক্যালরি শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সংস্থার মতে, খাদ্যের শক্তিমূল্য প্রকাশের ক্ষেত্রে খাদ্য ক্যালরি কিংবা কিলোক্যালরির পরিবর্তে কিলোজুল একক ব্যবহার করা উচিত।

এক্ষেত্রে 1 খাদ্য ক্যালরি = 1 কিলোক্যালরি = 4.2 কিলোজুল (প্রায়)।

৫.৪ .২ পুষ্টির উপাদানে তাপশক্তি নির্ণয়

প্রতিদিন আমরা নানা রকম পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে থাকি। ভাত, খিচুড়ি, পোলাও, মাংস থেকে শুরু করে ফলমূল, শাকসবজি, পানীয় ইত্যাদির কোনোটিই বাদ যায় না। তাই পুষ্টি উপাদানে শক্তি পরিমাপ করতে হলে এর প্রকৃতি জেনে নিতে হবে।

পুষ্টির প্রকৃতি, মিশুন্ধ খাদ্য: খাদ্যের প্রকৃতি বলতে এটা কি মিশুন্ধ খাদ্য তাকে বোঝায়। মিশুন্ধ খাদ্যে একের অধিক পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান থাকে। যেমন: দুধ, ডিম, খিচুড়ি, পেয়ারা ইত্যাদি। অন্যদিকে বিশুন্ধ খাদ্যে শুধু একটি উপাদান থাকে। যেমন: চিনি, ফ্লুকোজ। এতে শর্করা ছাড়া অন্য কিছু থাকে না।

পুষ্টি উপাদান ও তার পরিমাণ নির্ণয়: পুষ্টি উপাদানের প্রকৃতি জানার পর ঐ খাদ্যে কী কী উপাদান কী পরিমাণে আছে তা জেনে নিতে হবে। তবে বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টি উপাদান ও তার পরিমাণ খাদ্য মূল্যতালিকা দেখে জেনে নিতে হয়।

ক্যালরি নির্ণয়: খাদ্যের পুষ্টি উপাদান ও তার পরিমাণ জানার পর শর্করা, প্রোটিন ও চর্বির ক্যালরি বের করতে হয়। এক্ষেত্রে ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানির ক্যালরি মূল্য শূন্য ধরে হিসাব করতে হবে।

খাদ্য উপাদানে খাদ্য ক্যালরির পরিমাণ

উপাদান (১ খাত)	খাদ্য ক্যালরি
শর্করা	4
আমিষ	4
চর্বি	9



উদাহরণ

প্রশ্ন: 20 শাম চিড়ায় 15.4 শাম শর্করা (77%), 1.32 শাম প্রোটিন (6.6%) এবং 0.24 শাম মেহ (1.2%) আছে, 1 কেজি চিড়াতে খাদ্যশক্তির পরিমাণ কত?

উত্তর: খাদ্য উপাদানে খাদ্য ক্যালরির হক ব্যবহার করে:

$$15.4 \text{ শাম শর্করা থেকে } 15.4 \times 4 = 61.60 \text{ খাদ্য ক্যালরি}$$

$$1.32 \text{ শাম প্রোটিন থেকে } 1.32 \times 4 = 5.28 \text{ খাদ্য ক্যালরি}$$

$$0.24 \text{ শাম মেহ থেকে } 0.24 \times 9 = 2.16 \text{ খাদ্য ক্যালরি}$$

$$\text{অতএব, } 20 \text{ শাম চিড়ার মোট} = 69.04 \text{ খাদ্য ক্যালরি কিলোক্যালরি}$$

$$\text{এ হিসাবে, } 1 \text{ কেজি চিড়ার খাদ্য ক্যালরি} = 1000 \times (69.04/20) = 3452 \text{ কিলোক্যালরি}$$

$$\text{বেহেতু } 1 \text{ কিলোক্যালরি} = 4.2 \text{ কিলোজুল}$$

$$\text{অতএব, } 3452 \text{ কিলোক্যালরি} = 14,490 \text{ কিলোজুল (খাত)}$$

একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দিনে 2000 থেকে 2500 খাদ্য ক্যালরির প্রয়োজন হয়। তবে সিলা, পরিশ্রমের মাঝা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে এই সংখ্যাটি একটু বাঢ়তে বা কমতে পারে। প্রয়োজন থেকে বেশি কিলোক্যালরি গ্রহণ করলে সেটি যেন হিসেবে শরীরে জমা হয়ে যায়।



একক কাজ

কাজ : তোমার দৈনিক প্রয়োজন 2000 কিলোক্যালরি থেরে নিয়ে সুস্থ খাদ্য বিবেচনা করে সারা দিনের জন্য তোমার পছন্দের একটি খাবারের মেলু তৈরি কর।

৫.৫ বিএমআর (BMR) এবং বিএমআই (BMI)

বিএমআর (Basal Metabolic Rate) পূর্ণ বিশ্রামরত অবস্থায় মানবশরীরে ব্যবহৃত শক্তির পরিমাণ নির্দেশ করে।

বিএমআই (Body Mass Index) মানবদেহের গড়ন ও চর্বির একটি সূচক নির্দেশ করে।

শরীরের সুস্থিতা এবং স্থূলতার মান নির্ণয়ে এই মানদণ্ড দুটি খুবই উপযোগী।

৫.৫.১ বিএমআর মান নির্ণয়

বিএমআর মান বের করা একটু কঠিন, এর সমীকরণ লিঙ্গ ও বয়সভেদে পার্থক্য আছে। বিএমআর সম্পর্কে ধারণা পেতে বহুল ব্যবহৃত হ্যারিস বেনেডিক্ট সূত্রটি ব্যবহার করা যায়।

$$\text{মেয়েদের বিএমআর} = 655 + (9.6 \times \text{ওজন কেজি}) + (1.8 \times \text{উচ্চতা সে.মি.}) - (4.7 \times \text{বয়স বছর})$$

$$\text{ছেলেদের বিএমআর} = 66 + (13.7 \times \text{ওজন কেজি}) + (5 \times \text{উচ্চতা সে.মি.}) - (6.8 \times \text{বয়স বছর})$$

ধরা যাক একজন নারীর বয়স 33 বছর, উচ্চতা 165 সে.মি. এবং ওজন 94 কেজি।

$$\begin{aligned}\text{সুতরাং তার বিএমআর} &= 655 + (9.6 \times 94) + (1.8 \times 165) - (4.7 \times 33) \\ &= 655 + 902.4 + 297 - 155.1 \\ &= 1699.3 \text{ ক্যালরি}\end{aligned}$$

নিচের ছকটি ব্যবহার করে বিএমআর এর মান থেকে আমাদের দৈনিক ক্যালরির চাহিদা বের করা যায়।

শারীরিক অবস্থা	ক্যালরি মান
পরিশ্রমী না হলে	বিএমআর মান \times 1.2
হালকা পরিশ্রমী, স্প্রতাহে 2-3 দিন খেলাধূলা করলে	বিএমআর মান \times 1.375
পরিশ্রমী, স্প্রতাহে 2-3 দিন প্রচুর খেলাধূলা করলে	বিএমআর মান \times 1.55
পরিশ্রমী, স্প্রতাহে প্রতিদিন প্রচুর খেলাধূলা করলে	বিএমআর মান \times 1.725
অত্যন্ত পরিশ্রমী, প্রচুর দৌড়ৰাঁপ, খেলাধূলা করলে	বিএমআর মান \times 1.9

উদাহরণ হিসেবে উপরের নারীটি পরিশ্রমী হয়ে থাকলে, প্রতিদিন প্রচুর খেলাধূলা করলে এবং তার বিএমআর মান 1699.3 হলে তার ক্যালরি চাহিদার মান (1699.3×1.725) 2,931.29। অর্থাৎ প্রতিদিন 3,000 কিলোক্যালরির কাছাকাছি খাদ্য গ্রহণ করলে সেই নারীটি তার ওজন একই রাখতে পারবে।

বিএমআর ও শক্তির সম্পর্ক

বিএমআরের মান বয়স, লিঙ্গ, খাদ্যাভ্যাস ও শরীরের গঠনের উপর নির্ভর করে। আমাদের দৈননিক খাদ্য চাহিদার সাথে বিএমআরের মান নিয়ন্ত্রণ লক করা যাব। বিএমআর আমাদের শরীরের ৬০ থেকে ৭৫ শতাংশ শক্তির উৎপাদন নিরীক্ষণ করে। আমাদের শরীর খাদ্য অঙ্গের মাধ্যমে মাঝ ১০-২০ শতাংশ এবং শারীরিক কার্যের মাধ্যমে ২০ থেকে ৩০ শতাংশ শক্তি পেয়ে থাকে। মানুষের বয়স বাঢ়ায় সঙ্গে বিএমআরের মান কমতে থাকে, আবার অনেকেই ওজন কমানোর জন্য খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে ফেলে। এতে বিএমআর মান আরও কমে যায়, কলে আর কম বেংগে শুকানো যায় না। যদি অতিদিন পরিমিত শারীরিক পরিক্রম করা হয়, তাহলে বিএমআরের মান বেড়ে যাব এবং স্বাস্থ্যসম্বত্ত জ্বরায়ে শরীরকে সুস্থি-স্বচ্ছ রাখা যায়।

৫.৫.২ বিএমআই মান নির্ণয়

বিএমআই - দেহের ওজন (কেজি) / দেহের উচ্চতা (মিটার)²

উদাহরণ হিসেবে ১২৫ সেমি (১.২৫ মিটার) উচ্চতা এবং ৫০ কেজি ওজনের একজন ব্যক্তির বিএমআই হচ্ছে ৩২।

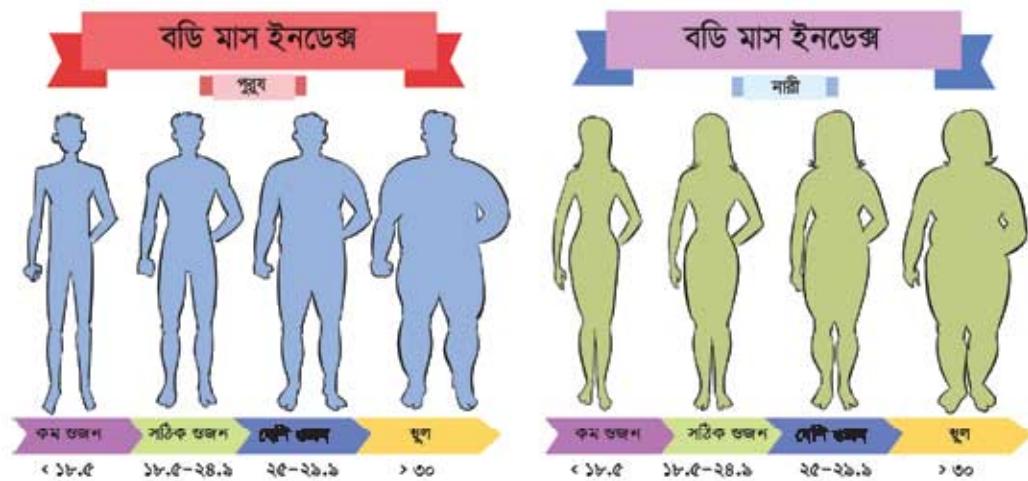
বিএমআই মান	ক্রমীকৃত
১৮.৫-এর নিচে	শরীরের ওজন কম। পরিমিত খাদ্যাহ্বল করে ওজন বাঢ়াতে হবে।
১৮.৫-২৪.৯	সুস্থান্ত্যের আদর্শ মান।
২৫-২৯.৯	শরীরের ওজন অতিরিক্ত। ব্যায়াম করে অতিরিক্ত ওজন কমানো প্রয়োজন।
৩০-৩৪.৯	মোটা হওয়ার পথম স্তর। বেছে খাদ্যাহ্বল ও ব্যায়াম করা প্রয়োজন।
৩৫-৩৯.৯	মোটা হওয়ার দ্বিতীয় স্তর। পরিমিত খাদ্যাহ্বল ও ব্যায়াম করা প্রয়োজন।
৪০ এর উপরে	অতিরিক্ত মোটাত্ত। মৃত্যুবুঝির আশঙ্কা। ডাক্তারের পরামর্শের প্রয়োজন।

বিএমআই মানদণ্ডে ব্যক্তিটির সুস্থান্ত্যের জন্য ৩৪ কেজি ওজন হওয়া প্রয়োজন। অতএব সঠিক পুটি অঙ্গ এবং ব্যায়ামের মাধ্যমে ওজন স্বাস্থ্যসম্বত্ত মানে নিয়ে যেতে হবে।



একক কাজ

কাজ : তোমার বিএমআর বের করে সেখান থেকে অতিদিন তোমার কত কিলোক্যালরি খাওয়া উচিত বের কর।



চিত্র 5.06: বি এম আই



একক কাজ

কাজ : তোমার বিএমআই বের করে দেখ তোমার খাদ্য প্রহৃৎ এবং জীবনধারা সঠিক আছে কি না।



দলগত কাজ

কাজ: তোমাদের পুরো শ্রেণির গড় বিএমআর এবং বিএমআই বের করে তার উপরে একটি অভিবেদন লেখ।

5.6 শরীরচর্চা ও বিশ্রাম

সুস্থ জীবনের জন্য অতিদিন সকলেরই পরিষ্কার করা উচিত। বর্তমানে কাজের ধারা, অভিন্ন ইন্টারনেট আসন্তি, পড়াশোনার চাপ, খেলার মাঝের অপ্রতুলতা ইত্যাদি নানা কারণে আমরা খুবই কম হাঁটাচ্ছা কিন্তু দৌড়া দৌড়ি করি, ফলে আমাদের সামগ্রিক স্থূলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শরীর সুস্থ, সবল থাকছে না এবং আমরা কর্মবিমূর্চ্ছ হয়ে পড়ছি। পরিষিক্ত শরীরচর্চার মাধ্যমে আমরা আমাদের শরীরের কার্যক্রমতা অটুট রেখে সুস্থ থাকতে পারি। দেখা গেছে, যারা অতিদিন এক ঘণ্টা মাঝের মানের শরীরচর্চা করে, পরিষিক্ত খাদ্য প্রহৃৎ করে, তারাই সুস্থ এবং হাসিখুলি জীবনযাপন করে ও দীর্ঘজীবন লাভ করে। শরীরচর্চার মাধ্যমে দেহের অভিন্ন প্রক্রিয়া কমানো সম্ভব। শরীরচর্চার ফলে ডায়াবেটিস, কৃদর্শন এবং বেশি কঁজেক খরচের ক্ষয়ান থেকে পরিজ্ঞান পাওয়া যায়। বিশিষ্ট ইন্সিগ্নিয়ে শরীরচর্চা আছে,

জোরে হাঁটা, জগিং, দৌড়, সাঁতারকাটা, খেলাধুলা করা, সাইকেল চালানো— এগুলো শরীরচর্চার অংশ। আমাদের শরীরের জন্য বিশ্রাম অত্যন্ত প্রয়োজন। শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের পরই বিশ্রামের প্রয়োজন। শুয়ে থাকা, শুমানো ইত্যাদি বিশ্রামের অংশ। বিশ্রামের ফলে শরীরের বিভিন্ন অংশ পুনঃশক্তি সংগ্রহ করে। জীবজগতের প্রায় প্রতিটি প্রাণীই বিশ্রাম নেয়। এই বিশ্রাম দিন এবং রাত্রির চক্রের সাথে সম্পৃক্ষ। অনেক প্রাণী আছে যারা সূর্যালোকে কর্মক্ষম থাকে। আবার অনেক প্রাণী আছে যারা দিনে বিশ্রাম নেয় কিন্তু রাতে কর্মক্ষম হয়ে থাদ্যের খেঁজে বের হয়। এদের নিশাচর বলে।

৫.৭ খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার

খাদ্য সংরক্ষণ এমন একটি প্রক্রিয়া, যেটি খাদ্যের পচন রোধ করে, যার ফলে খাদ্যের গুণাগুণ, গ্রহণযোগ্যতা এবং খাদ্যমান অটুট থাকে। খাদ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে সাধারণত পচনসৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাকের সংক্রমণ এবং খাদ্যের চর্বিজাতীয় অংশের জারণ বন্ধ করা হয়।

মাছের শুটকিকরণ, লোনা ইলিশ, আচার, বরফ দিয়ে শীতলকরণ, চিংড়ির নাপতে, মাছের শীদল এগুলো সবই খাদ্য সংরক্ষণের বিভিন্ন প্রচলিত উপায়। আজকাল খাদ্যদ্রব্যের ক্যানিং বা কোটাজাত করে, ধোঁয়ার মাধ্যমে স্মোকিং প্রভৃতি প্রক্রিয়া খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহার করা হয়। খাদ্য সংরক্ষণে বিভিন্ন স্বাস্থ্যসম্মত অনুমোদিত রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়, যাতে খাদ্যদ্রব্যে পচন সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক সংক্রমণ করতে না পারে। সাধারণত সোডিয়াম নাইট্রেট, সোডিয়াম ক্লোরাইড বা খাবার লবণ, ক্যালসিয়াম এপারনেট, সালফার ডাই-অক্সাইড, সোডিয়াম বাইসালফেট, সোডিয়াম বেনজয়েট, সরবেট (পটাশিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম) খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে অনুমোদিতভাবে ব্যবহার করা হয়। স্বাস্থ্যবুঁকির কারণে ক্ষতিকারক ফরমালিন এবং বিভিন্ন রকমের রঞ্জক পদার্থ কখনই খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহার করা উচিত নয়।

খাদ্যে ভেজাল ও রঞ্জকের ব্যবহার

এই সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে আমাদের নির্মল পরিবেশের যেমন প্রয়োজন, তেমনি নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ অপরিহার্য। বর্তমানে বাজারে অনৈতিকভাবে খাদ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর ও অস্বাস্থ্যকর রাসায়নিক দ্রব্য ভেজাল ও রঞ্জক পদার্থ হিসেবে ব্যবহার করে সেগুলো বিক্রি করা হয়। এর ফলে জনস্বাস্থ্য এখন হুমকির সম্মুখীন। স্বাস্থ্য বিপর্যয়ের এই বুঁকির ধারা চলতে থাকলে রোমানদের মতো আমরাও একদিন বড় ধরনের বিপর্যয়ের মুখোমুখি হব। একসময় রোমবাসী যে পানীয় আধার ব্যবহার করত তা সিসার তৈরি ছিল। যার ফলে পানকারী কোনো না কোনোভাবে সিসার বিষাক্ততার শিকার হয়েছে এবং বিকলাঙ্গ প্রজন্মের জন্ম দিয়েছে। বাংলাদেশে খাদ্যে বিভিন্ন প্রকারের ভেজাল মেশানো হয়। এর মধ্যে বাণিজ্যিক রং, এন্টিবায়োটিক, কীট ও বালাইনাশক, ফরমালিন, হেভি মেটাল উল্লেখযোগ্য। যেসব মাছ, গৃহপালিত পশু ও হাঁস-মুরগিকে অনুমোদিত দ্রব্য দিয়ে তৈরি খাদ্য খাওয়ানো হয়, সেগুলো মানবশরীরের জন্য হুমকিস্বরূপ।

স্বাস্থ্যবুঁকির কয়েকটি ক্ষতিকারক দিক

বাণিজ্যিক রং যা কাপড় কিংবা রঙের কাজে ব্যবহার করা হয়, তা বিভিন্ন ধরনের খাদ্য, যেমন আইসক্রিম, গোলা আইসক্রিম, লজেন্স, বেগুনি, বড়া ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই জাতীয় খাবার ধীরে ধীরে যকৃতের কার্যকারিতা নষ্ট করে নানাবিধি রোগের কারণ হয়।

ফরমালিনে ডুবানো মাছ, ফল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যে পচন সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া জন্ম নিতে পারে না বলে কয়েক দিন বেশ টাটকা দেখা যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, এই ফরমালিন মাছের কোষের সাথে যৌগ তৈরি করে ফেলে। মাছ ধোয়া হলেও ঐ যৌগটি মাছের দেহে থেকে যায়। যা পরে রান্না করা মাছের সাথে মানবদেহে প্রবেশ করে। এই বিষাক্ত যৌগ নানা রকম জটিল রোগের উপসর্গের কারণসহ অনেক ক্ষেত্রে ক্যান্সারজাতীয় রোগের সৃষ্টি করে।

মজুত খাদ্যে এবং সবজিতে কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। কীটনাশকের বিষাক্ততার সময় নষ্ট হবার আগেই দ্রব্যাদি বাজারজাত করলে বিষাক্ত খাদ্যের প্রভাবে স্বাস্থ্যবুঁকির আশঙ্কা থাকে। এতে শিশুরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশি। তাদের শরীরের বাড়ন্ত কোষে এই বিষাক্ত কীটনাশক বিরূপ প্রভাব ফেলে। ফলে একদিকে যেমন শিশুর মনের বিকাশ ব্যাহত হয়, অন্যদিকে তারা নানা রকমের অসুস্থিতায় ভুগে থাকে।

খাদ্যে যেসব রাসায়নিক দ্রব্য ও ভেজাল থাকে, তার একটি তালিকা দেওয়া হলো।

ভেজাল বা বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য	সম্ভাব্য উৎস	প্রতিকার
1. এন্টিবায়োটিক	মাছ ও পশুখাদ্যে ব্যবহারের ফলে প্রাণীর শরীরে জমা হয়।	শুধু অনুমোদিত ঔষধ রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক ব্যবহার করতে হবে।
2. হেভি মেটাল	মাছ ও পশুখাদ্যে ব্যবহৃত অর্থাদ্য উপাদান (যেমন ট্যানারির বর্জ্য) প্রাণীর শরীরে জমা হয়।	অর্থাদ্য উপাদান যেমন ট্যানারির বর্জ্য, কয়লা, মাটি, প্রাণীর বিষ্ঠা ইত্যাদি ব্যবহার পরিহার করা।
3. বাণিজ্যিক রং	আইসক্রিম, গোলা-আইসক্রিম, শরবত, রঙিন পানীয়, ভাজা বড়া ও বিভিন্ন মিষ্টি তৈরিতে কারখানায় ব্যবহৃত রংয়ের অননুমোদিত ব্যবহার।	শুধু অনুমোদিত খাদ্যরং ব্যবহার করা।
4. ফরমালিন	মর্গে লাশ সংরক্ষণের প্রধান উপাদান। মাছ, দুধ, ফল ইত্যাদি সংরক্ষণে অননুমোদিত ব্যবহার।	ফরমালিন ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা।
5. কীটনাশক	শাক-সবজি উৎপাদনে বালাইনাশক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তবে বিষাক্ততা অনেক ক্ষেত্রে রয়ে যায়। শুটকিতে ডিডিটির অননুমোদিত ব্যবহার।	কীটনাশকের বিষাক্ততা নষ্ট হবার পর শাক-সবজি বাজারজাত করা। শুটকিতে ডিডিটি ব্যবহার না করা।

৬. রাসায়নিক পদ্ধতি	কাঁচা ফল ও টমেটো পাকাতে মাঝাতিলিক কার্বোইড ও বিভিন্ন রাসায়নিক পদ্ধতির অনন্যমৌলিক ব্যবহার। কোমল পানীয় জলে মাঝাতিলিক সরবেটের অনন্যমৌলিক ব্যবহার।	ফলকে পাকাতে সময় সেওয়া, যেন প্রকৃতিগতভাবে ফল পাকে। কার্বোইড ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা। পরিষিক মাঝায় সরবেট ব্যবহার করা।
৭. জীবাণু	খাদ্য উৎপাদন কিংবা প্রস্তুতিকালে জনস্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর জীবাণু খাস্ত্য খিল্পে ঘেতে পারে।	বায়োসিকিউরিটি নিশ্চিতকরণ।



দলগত কাজ

কাজ: শিক্ষক প্রেরিতে শিক্ষার্থীদের কাজেকটি দলে বিভক্ত করবেন এবং ভেজালমুক্ত খাবার খাওয়ার ক্ষতিকর দিকগুলো লিপিবদ্ধ করে প্রেরিতে উপলব্ধাগ্ন করতে বলবেন।

৫.৪ পরিপাক

মানবদেহ অসংখ্য কোষের সমন্বয়ে গঠিত। এই কোষগুলোকে সজীব এবং কার্যকর রাখতে হলে সময়মতো খাদ্য সরবরাহ প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ খাদ্য জটিল এবং জৈব যৌগ অবস্থায় অবস্থ করা হয়। দেহের কোষগুলো তা সরাসরি শুষ্ণ করতে পারে না। আস্তকে শোষণযোগ্য ও কোষ উপযোগী করতে হলে তাকে ভেজে সহজ, সরল এবং তরল অবস্থায় মুপান্তরিত করা আবশ্যিক।

দেহে দুটাবে খাদ্য শোষিত হওয়ার উপযোগী হয়, যান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়া।

যান্ত্রিক প্রক্রিয়া: খাদ্যজ্বর্য মুখগহ্যের দাঁতের সাহায্যে চিবালো হয়। প্রথমত চিবালোর ফলে খাদ্যক্ষেত্রে ছোট ছেট টুকরায় পরিষ্পত হয়। পাকস্থলী এবং অঙ্গের মধ্যে এই টুকরা খাদ্যক্ষেত্রগুলো মডে পরিষ্পত হয়।

রাসায়নিক প্রক্রিয়া: রাসায়নিক প্রক্রিয়া পরিপাকের বিভীর ধাপ। পরিপাক রাসের এনজাইম খাদ্যের রাসায়নিক ক্রিয়াকে ক্রান্তি করতে সাহায্য করে। এতে খাদ্যের জটিল উপাদানগুলো ভেজে দেহের শুষ্ণযোগ্য সরল উপাদানে পরিষ্পত হয়। তাছাড়া কোষের ভিতরকার কর্মকাণ্ড এই এনজাইমের উপর নির্ভরশীল।

পরিপাকতন্ত্র বা পৌটিকতন্ত্র (Digestive System): খাদ্যজ্বর্য পরিপাকের জন্য মানবদেহে পরিপাকতন্ত্র বা পৌটিকতন্ত্র নামে একটি আলাদা তন্ত্র আছে। যে তন্ত্রের সাহায্যে খাদ্যজ্বর্য ভেজে দেহের শুষ্ণ উপযোগী উপাদানে পরিষ্পত ও শোষিত হয়, তাকে পৌটিকতন্ত্র বলে। এ তন্ত্রটি পৌটিকনালি এবং করেকটি প্রশ্ন নিয়ে গঠিত। পৌটিকনালি মুখ থেকে শুরু হয়ে পায়তে শেষ হয়।

৫.৮.১ পৌষ্টিকনালি

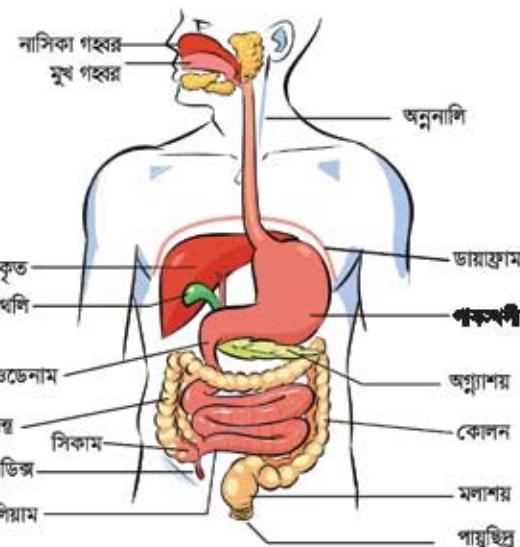
মুখগহর থেকে পায়ুপথ পর্যন্ত বিস্তৃত এই নালিগথ কোথাও সরু আবার কোথাও প্রশস্ত। এর অধান অংশগুলো নিম্নরূপ:

(a) মুখ (Mouth)

মুখ থেকে পৌষ্টিকনালির সূরু হয়। এটি নাকের নিচে আড়াআড়ি একটি বক্ত ছিল, যেটি উপরে এবং নিচে ঠোঁট দিয়ে বেষ্টিত থাকে।

(b) মুখগহর (Buccal cavity)

মুখের অভ্যন্তরে দাঁত, জিহ্বা ও লালাগ্রাণ্ডি থাকে। এগুলো প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে। দাঁত খাদ্যকে চিবিয়ে ছোট ছোট অংশে পরিণত করে। জিহ্বা খাদ্যবস্তুকে নেড়েচেড়ে চিবাতে সাহায্য করে এবং তার স্বাদ প্রহণ করে। মুখের ভিতরের লালাগ্রাণ্ডি থেকে এনজাইম ক্রস্য হয়। এই প্রস্তিগুলো কানের নিচে চোয়ালের পাশে এবং জিহ্বার নিচে অবস্থিত। লালাগ্রাণ্ডি থেকে নিঃসৃত লালারসের মিডিসিন খাদ্যকে পিছিল করে গলাধৃকরণে সাহায্য করে। লালারসের টায়ালিন ও মলটেজ নামক এনজাইম শর্করা পরিপাকে অংশ নেয়।



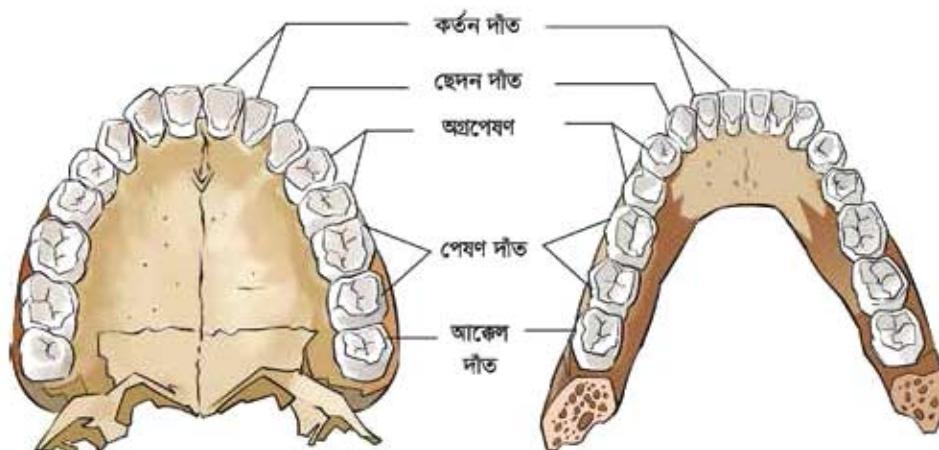
চিত্র ৫.০৭: পরিপাকতন্ত্র

(c) দাঁত (Tooth)

মানবদেহে সবচেয়ে স্তুতি অবশ্য দাঁত। প্রাপ্ত বয়সে মুখগহরে উপরে ও নিচের চোয়ালে সাধারণত ১৬ টি করে মোট ৩২ টি দাঁত থাকে। মানবদেহে দাঁত দুবার গজায়। প্রথমবার শিশুকালে দুধদাঁত, দুধদাঁত পড়ে গিয়ে ১৮ বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বার স্থায়ী দাঁত গজায়।

যানুষের স্থায়ী দাঁত চার ধরনের। সেগুলো হচ্ছে:

- কর্তন দাঁত (Incisor): এই দাঁত দিয়ে খাবার কেটে টুকরা করা হয়।
- ছেলন দাঁত (Canine): এই দাঁত দিয়ে খাবার ছেঁড়া হয়।
- অঙ্গোপেষণ দাঁত (Premolar): এই দাঁত দিয়ে চৰ্বি, পেষণ উভয় কাজ করা হয়।
- পেষণ দাঁত (Molar): এই দাঁত খাদ্যবস্তু চৰ্বি ও পেষণে ব্যবহৃত হয়।



চিত্র ৫.০৪: বিভিন্ন ধরনের দাঁত, উপরের পাটি (বামে) এবং নিচের পাটি (ডাই)

মাড়ির সবচেয়ে শেষের বা শেষের দাঁত দুটোকে আকেল দাঁত বলা হয়। প্রতিটি প্রাণীবদ্ধক মানুষের ৪ টি কর্তন দাঁত, ৪ টি হেদন দাঁত, ৪ টি অংশপেষণ দাঁত, ৪ টি পেষণ দাঁত এবং ০-৫ টি আকেল দাঁত থাকে।

দাঁতের গঠন: প্রতিটি দাঁতের তিনটি অংশ থাকে:

- (I) মুকুট: মাড়ির উপরের অংশ;
- (II) মূল: মাড়ির ভিতরের অংশ;
- (III) শীৰা: দাঁতের মধ্যবর্তী অংশ।

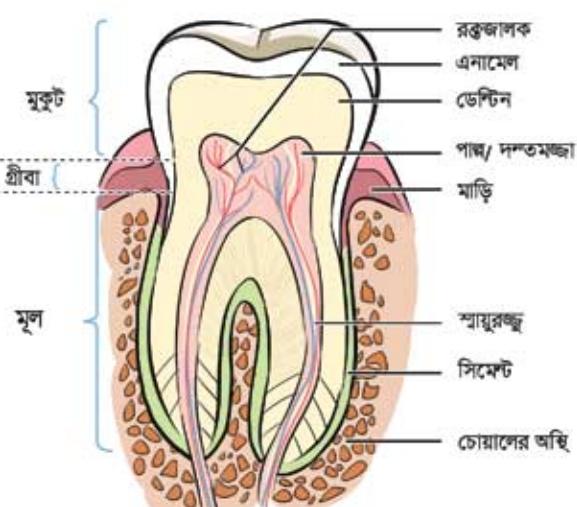
প্রতিটি দাঁত যেসব উপাদান দিয়ে গঠিত তা হলো:

(i) **ডেন্টিন (Dentine) :** দাঁত প্রধানত ডেন্টিন নামক শব্দ উপাদান দিয়ে গঠিত।

(ii) **এনামেল (Enamel) :** দাঁতের মুকুট অংশে ডেন্টিনের উপরিভাসে এনামেল নামক কঠিন উপাদান থাকে। এনামেল এবং ডেন্টিন ক্যালসিয়াম ফসফেট, ক্যালসিয়াম কার্বনেট এবং ক্লোরাইড দিয়ে তৈরি।

(iii) **স্ন্তমজ্জা (Pulp) :** ডেন্টিনের ভিতরের কাঁপা নরম অংশকে স্ন্তমজ্জা বলে। এর ভিতরে ধমনি, শিরা, ঝায় ও নরম কোষ থাকে। স্ন্তমজ্জার শাখায়ে ডেন্টিন অংশে পৃষ্ঠা ও অঙ্গীকেল সরবরাহ হয়।

(iv) **সিমেন্ট (Cement) :** সিমেন্ট নামক



চিত্র ৫.০৫: দাঁতের সমন্বয়

পাতলা আবরণ দাঁতের মূল অংশ ডেন্টিনকে আবৃত করে রাখে। এই সিমেন্টের সাহায্যে দাঁত মাড়ির সাথে আটকানো থাকে।

৪. গলবিল (Pharynx)

মুখগহ্বরের পরের অংশ গলবিল। মুখগহ্বর থেকে খাদ্যবস্তু গলবিলের মধ্য দিয়ে অন্ননালিতে পৌঁছে।

৫. অন্ননালি (Oesophagus)

গলবিল থেকে পাকস্থলী পর্যন্ত বিস্তৃত নালিটির নাম অন্ননালি। খাদ্যবস্তু এই নালির মধ্যে দিয়ে পাকস্থলীতে পৌঁছে।

৬. পাকস্থলী (Stomach)

অন্ননালি এবং ক্ষুদ্রাশ্রের মাঝখানে একটি থলির মতো অঙ্গ। এর প্রাচীর পুরু ও পেশিবহুল। পাকস্থলীর প্রাচীরে অসংখ্য গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থাকে। পাকস্থলীর পেশি সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্যবস্তুকে পিষে মণ্ডে পরিণত করে। গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে নিঃস্তু রস খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে।

৭. অন্ত (Intestine)

পাকস্থলীর পরের অংশ অন্ত। এটি একটি লম্বা প্যাঁচানো নালি। অন্ত দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত, ক্ষুদ্রান্ত ও বৃহদ্ব্র্ত।

(i) ক্ষুদ্রান্ত (Small Intestine)

পাকস্থলী থেকে বৃহদ্ব্র্ত পর্যন্ত বিস্তৃত লম্বা, প্যাঁচানো নলটিকে ক্ষুদ্রান্ত বলে। ক্ষুদ্রান্ত আবার তিনটি অংশে বিভক্ত, ডিওডেনাম, জেজুনাম ও ইলিয়াম। ক্ষুদ্রাশ্রের ডিওডেনামে পিন্তথলি থেকে পিন্তনালি এবং অঞ্চ্যাশয় থেকে অঞ্চ্যাশয় নালি এসে মিলিত হয়। পিন্তনালির মাধ্যমে ঘৃতের পিন্তরস এবং অঞ্চ্যাশয়ের অঞ্চ্যাশয় রস ডিওডেনামে এসে পৌঁছে। ক্ষুদ্রাশ্রের গায়ে আন্তিক গ্রন্থিও থাকে। ক্ষুদ্রাশ্রের অন্তঃপ্রাচীরে আঙুলের মতো প্রক্ষেপিত অংশ থাকে, এদের ভিলাস বলে। ভিলাস পরিপাককৃত খাদ্য উপাদান শোষণ করে।

(ii) বৃহদ্ব্র্ত (Large Intestine)

ইলিয়াম থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত মোটা নলাকৃতির অংশ হলো বৃহদ্ব্র্ত। বৃহদ্ব্র্ত তিনটি অংশে বিভক্ত, সিকাম, কোলন ও মলাশয়। সিকামের সাথে অ্যাপেনডিক্স নামক ক্ষুদ্র নলের মতো প্রবৃদ্ধি সংযুক্ত থাকে। বৃহদ্ব্র্তে মূলত পানি শোষিত হয়, মল তৈরি হয় এবং মল জমা থাকে।

(h) পায়ু (Anus)

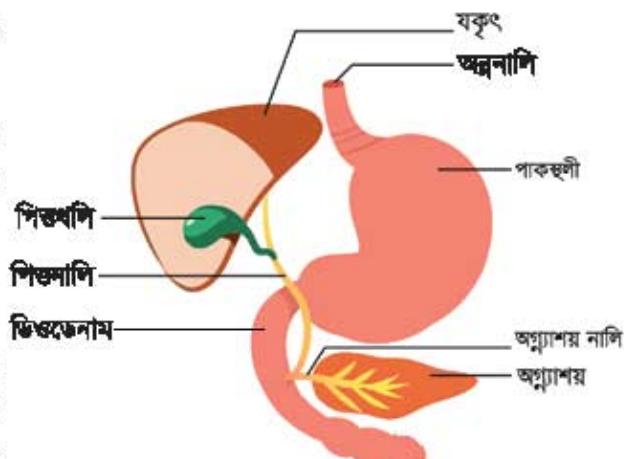
পৌষ্টিক নালির শেষ প্রান্তে অবস্থিত ছিদ্রপথই হলো পায়ু।

৫.৮.২ পৌষ্টিক অণ্ডি (Digestive glands)

যেসব অণ্ডির রস খাদ্য পরিপাকে অংশ নেয় তাদেরকে পরিপাকঅণ্ডি বা পৌষ্টিকঅণ্ডি বলে। মানবদেহে পৌষ্টিকঅণ্ডিগুলো হলো:

(a) শালাশিং (Salivary glands)

মানুষের তিন জোড়া শালাশিং আছে। দুই কানের সামনে ও নিচে এক জোড়া (প্যারোটিডঅণ্ডি), চোরাশের নিচে একজোড়া (সাব-যাঞ্জিলারি) এবং টিবুকের নিচে একজোড়া (সাব-গলুবুলঅণ্ডি)। এগুলো পৃথক পৃথক নালির মাধ্যমে মুখগহরে উন্মুক্ত হয়। শালাশিং থেকে নিঃসৃত রস, শালা (saliva) নামে পরিচিত। শালা রসে টায়ালিন নামক এনজাইম এবং পানি থাকে।



চিত্র ৫.১০: পৌষ্টিকঅণ্ডি

(b) যকৃৎ (Liver)

মধ্যাহ্নদার নিচে উদরগহরের উপরে পাকস্থলীর ডান পাশে যকৃৎ অবস্থিত। এটি মানবদেহের সবচেয়ে বড় অণ্ডি। এর রং লালচে ধৰেরি। যকৃতের ডান খণ্ডটি বাম খণ্ড থেকে আকারে কিছুটা বড়। প্রকৃতপক্ষে চারটি অসম্পূর্ণ খণ্ড নিয়ে যকৃৎ গঠিত। প্রতিটি খণ্ড কুসুম কুসুম লোবিউল দিয়ে তৈরি। প্রত্যেকটি লোবিউলে অসংখ্য কোৰ থাকে। এ কোৰ পিণ্ডরস (bile) তৈরি করে। পিণ্ডরস কারীয় পুরু সস্তন। যকৃতে বিভিন্ন রকম জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে, তাই একে ক্লায়াল গবেষণাগার বলা হয়।

যকৃতের নিচের অংশ পিণ্ডখলি বা পিণ্ডনালি সহলপ্র থাকে। এখানে পিণ্ডরস জমা হয়। পিণ্ডরস পাঢ় সবুজ বর্ণের এবং তিক্ত স্বাদবিশিষ্ট। পিণ্ডখলি পিণ্ডনালির সাহায্যে অঙ্গুশয় নালির সাথে মিলিত হয়। এটি যকৃৎ-অঙ্গুশয় নালির মাধ্যমে ডিওডেনামে প্রবেশ করে।



একক কাজ

কাজ: পৌষ্টিকত্ত্বের চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর এবং প্রেরিতে উপস্থাপন কর।

যকৃতের কাজ: যকৃৎ পিণ্ডরস তৈরি করে। পিণ্ডসের মধ্যে পানি, পিণ্ড-সবথ, কোলেস্টেরল ও খনিজ সবথ প্রধান। এই রস পিণ্ডখলিতে জমা থাকে। থেরোজনে ডিওডেনামে এসে পরোক্ষভাবে পরিপাকে অংশ নেয়। পিণ্ডসে কোনো উৎসেচক বা এনজাইম থাকে না। যকৃৎ উন্মুক্ত প্ল্যাকেজ নিজদেহে



গ্লাইকোজেনরূপে সঞ্চয় করে রাখে। পিন্ডরস খাদ্যের অম্লভাব প্রশমিত করে এবং ক্ষারীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই পরিবেশ খাদ্য পরিপাকের অনুকূল। কেননা আলিক পরিবেশে খাদ্য পরিপাক হয় না। পিন্ডরস চর্বিজাতীয় খাদ্যকে ক্ষুদ্র দানায় পরিণত করে, যা লাইপেজ সহযোগে পরিপাকে সহায়তা করে। অতিরিক্ত অ্যামাইনো এসিড যকৃতে আসার পর বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার মাধ্যমে ইউরিয়া, ইউরিক এসিড ও অ্যামোনিয়ারূপে নাইট্রোজেনয়ে বর্জ্য পদার্থ তৈরি করে এবং মেহজাতীয় পদার্থ শোষণে সাহায্য করে। রক্তে কখনো গ্লুকোজের মাত্রা কমে গেলে যকৃতের সঞ্চিত গ্লাইকোজেনের কিছুটা অংশ গ্লুকোজে পরিণত হয় এবং রক্তস্তরে মিশে যায়। এভাবে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রিত থাকে।

(c) অঞ্চ্যাশয় (Pancreas)

অঞ্চ্যাশয় পাকস্থলীর পিছনে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ মিশ্রগ্রন্থি। এটি একাধারে পরিপাকে অংশগ্রহণকারী এনজাইম ও রক্তের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন নিঃসৃত করে। অর্থাৎ অঞ্চ্যাশয় বহিঃক্ষরা ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির মতো কাজ করে। অঞ্চ্যাশয়রস অঞ্চ্যাশয় নালির মাধ্যমে যকৃৎ-অঞ্চ্যাশয়নালি দিয়ে ডিওডেনামে প্রবেশ করে।

অঞ্চ্যাশয় থেকে অঞ্চ্যাশয়রস নিঃসৃত হয়। অঞ্চ্যাশয়রসে ট্রিপসিন, লাইপেজ ও অ্যামাইলেজ নামক উৎসেচক থাকে। এসব এনজাইম শর্করা, আমিষ এবং মেহজাতীয় খাদ্যের পরিপাকে সহায়তা করে। তাছাড়াও অম্ল-ক্ষারের সাম্যতা, পানির সাম্যতা, দেহতাপ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে অঞ্চ্যাশয়ের একটি অংশ অতি প্রয়োজনীয় কিছু হরমোন, যেমন: গ্লুকাগন ও ইনসুলিন নিঃসরণ করে। গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় কাজে এ হরমোন দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(d) গ্যাস্ট্রিকগ্রন্থি (Gastric glands)

গ্যাস্ট্রিকগ্রন্থি পাকস্থলীর প্রাচীরে থাকে। এ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস (ট্রিপসিন, লাইপেজ, অ্যামাইলেজ) গ্যাস্ট্রিক রস বা পাচক রস নামে পরিচিত।

(e) আল্ট্রিকগ্রন্থি (Intestinal glands)

ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীরে ভিলাইয়ে আল্ট্রিকগ্রন্থি থাকে। এ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসের নাম আল্ট্রিক রস।

5.8.3 খাদ্য পরিপাক ক্রিয়া (Digestion of Food)

যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মানুষের পৌষ্টিক নালির অভ্যন্তরে জটিল, অন্তর্বর্ণীয়, অশোষণযোগ্য খাদ্য উপাদানগুলো নির্দিষ্ট উৎসেচক বা এনজাইম এবং প্রাণরস বা হরমোনের উপস্থিতিতে বিশ্লেষিত হয়ে শোষণযোগ্য এবং দ্রবণীয় সরল উপাদানে পরিণত হয়, তাকে পরিপাক বলে। এ প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রথমত সরল দ্রবণীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয় এবং পরবর্তী সময়ে কোষ আবরণীর ভিতর দিয়ে অতি সহজে কোষের ভিতরে প্রবেশ করে। সবশেষে রক্ত এই পরিপাককৃত সরল উপাদানগুলোকে দেহের বিভিন্ন অংশে সরবরাহ করে।

(a) মুখে পরিপাক

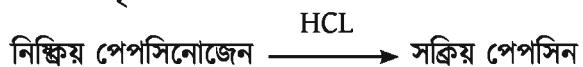
মুখগহ্বরে দাঁত ও জিহ্বার সাহায্যে খাদ্য চিবানোর ফলে খাদ্যবস্তু ছোট ছোট টুকরোয় পরিণত হয়। এ সময় লালাগ্রন্থি থেকে লালা নিঃসৃত হয়ে খাদ্যের সাথে মিশে যায়। লালা খাদ্যবস্তুকে গলাধংকরণে সাহায্য করে। লালায় টায়ালিন বা স্যালাইভারি অ্যামাইলেজ নামক উৎসেচক বা এনজাইম থাকে। এটি শ্বেতসারকে মলটোজে পরিণত করে। মুখগহ্বরে আমিষ বা স্লেহজাতীয় খাদ্যের কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না।

মুখগহ্বর থেকে খাদ্যব্র্য পেরিস্টালিসিস (Peristalsis) প্রক্রিয়ায় অন্ননালির মধ্য দিয়ে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। পৌষ্টিক নালিগাত্রের পেশির পর্যায়ক্রমিক সংকোচন ও প্রসারণের ফলে খাদ্যব্র্য সামনের দিকে অগ্রসর হয়। অন্ননালিতে খাদ্যের কোনো পরিপাক ঘটে না।

(b) পাকস্থলীতে পরিপাক

পাকস্থলীতে খাদ্য আসার পর অন্তঃপ্রাচীরের গ্যাস্ট্রিকগ্রন্থি থেকে গ্যাস্ট্রিক রস ক্ষরিত হয়। এই রসে প্রধান যে উপাদানগুলো থাকে তা হলো:

হাইড্রোক্লোরিক এসিড: হাইড্রোক্লোরিক এসিড খাদ্যের মধ্যে কোনো অনিষ্টকারী ব্যাকটেরিয়া থাকলে তা মেরে ফেলে, নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেনকে সক্রিয় পেপসিনে পরিণত করে এবং পাকস্থলীতে পেপসিনের সুষ্ঠু কাজের জন্য অঞ্চলীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে।



পেপসিন (Pepsin): এক ধরনের এনজাইম, যা আমিষকে ভেঙে দুই বা ততোধিক অ্যামাইনো এসিড দিয়ে তৈরি যোগ গঠন করে, যা পলি পেপটাইড নামে পরিচিত।



শর্করা এবং স্লেহজাতীয় খাদ্য সাধারণত পাকস্থলীতে পরিপাক হয় না। কারণ এদের পরিপাকের জন্য গ্যাস্ট্রিক রসে নির্দিষ্ট কোনো এনজাইম থাকে না।

পাকস্থলীতে খাদ্যব্র্য পৌঁছানো মাত্র উপরোক্ত রসগুলো নিঃসৃত হয়। পাকস্থলীর অন্বরত সংকোচন ও প্রসারণ এবং এনজাইমের ক্রিয়ার ফলে খাদ্য মিশ্র মণ্ডে পরিণত হয়। একে পাকমণ্ড বা কাইম (chyme) বলে। এই মণ্ড অনেকটা সুপের মতো এবং কপাটিকা ভেদ করে ক্ষুদ্রান্তে প্রবেশ করে।

(c) ক্ষুদ্রান্তে পরিপাক

পাকস্থলী থেকে পাকমণ্ড ক্ষুদ্রান্তের ডিওডেনামে প্রবেশ করে। এ সময় অঞ্চলীয় থেকে একটি ক্ষারীয় পাচকরস ডিওডেনামে আসে। এই পাচকরস খাদ্যমণ্ডের অঞ্চলাব প্রশমিত করে। পাচকরসের এনজাইম

দিয়ে শর্করা এবং আমিষ পরিপাকের কাজ চলতে থাকে এবং ব্রহ্মদার্থের পরিপাক শুরু হয়।

বক্তৃৎ থেকে পিণ্ডরস নির্মাণ হয়। এটি অন্নীয় অবস্থায় খাদ্যকে কারীয় করে পরিপাকের উপযোগী করে তোলে। পিণ্ড-স্বপ্ন ব্রহ্মদার্থের ক্ষুদ্র কণাগুলোকে পানির সাথে মিলতে সাহায্য করে। পিণ্ড-স্বপ্ন পিণ্ডরসের অন্যতম উপাদান। লাইপেজ নামক এনজাইমের কাজ যথার্থ সক্ষমতারের জন্য পিণ্ড-স্বপ্নের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এ স্বপ্নের সহশর্ত্রে ব্রহ্মদার্থ সারান্নের কেলার মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার পরিপন্থ হয়। ব্রহ্মবিক্রিয়ক লাইপেজ এই দানাগুলোকে কেবল ফ্যাটি এসিড এবং গ্লিসারলে পরিপন্থ করে।

লাইপেজ
ব্রহ্মদার্থ \longrightarrow ফ্যাটি এসিড + গ্লিসারল

অঞ্চলিক রসে অ্যামাইলেজ, লাইপেজ ও ট্রিপসিন নামক এনজাইম থাকে। আঙ্গীক রসে আঙ্গীক অ্যামাইলেজ, লাইপেজ, মলটেজ, ল্যাকটেজ ও সুক্লেজ ইভাদি এনজাইম থাকে। আঙ্গীক পরিপাককৃত আমিষ ক্ষুদ্রাঙ্গে ট্রিপসিনের সাহায্যে কেবল অ্যামাইলো এসিড এবং সরল পেপটাইডে পরিপন্থ হয়।

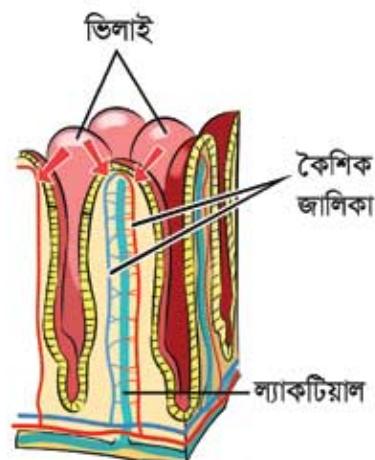
ট্রিপসিন
গলিপেপটাইড \longrightarrow অ্যামাইলো এসিড + সরল পেপটাইড

অ্যামাইলেজ ব্রেতসারকে সরল শর্করার পরিপন্থ করে।

অ্যামাইলেজ
ব্রেতসার \longrightarrow শুক্রোজ

পরিপাককৃত খাদ্য শোবধ: ক্ষুদ্রাঙ্গে সব ধরনের খাদ্যই সক্রূর্জনাবে নির্দিষ্ট এনজাইমের ক্রিয়ায় পরিপাক হয়ে সরল, শোষযোগ্য খাদ্য উপাদানে পরিবর্তিত হয়। ক্ষুদ্রাঙ্গের অন্তর্ধানটিরে অবস্থিত রক্তজালকসমূহ আঙ্গুলের মতো প্রক্ষেপিত অংশ থাকে। একে ভিলাই বলে, আর একবচনে বলে ভিলাস। প্রতিটি ভিলাসের মাঝখানে ল্যাকটিয়াল নামক লসিকা-জালক রক্তের কৈশিক নালি দিয়ে পরিবেষ্টিত থাকে। ভিলাই ভাঁজে ভাঁজে থাকায় ইলিয়ামের প্রাচীরগাছের আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং ব্যাপকভাবে পরিপাককার্য চলা সহিত হয়।

এসব রক্তনালি ক্ষুত্র হয়ে হেপাটিক শিরা গঠন করে। এই শিরা দিয়ে শোষিত রক্ত ব্রহ্মতে আসে। ব্রহ্মদার্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা ভিলাসের ল্যাকটিয়ালে শোষিত হওয়ার পর প্রথমে লসিকা দিয়ে বাহিত হয়ে রক্তপ্রাপ্ত হিসে। কোথে অনুগ্রহেশের পর পিণ্ড-স্বপ্ন ফ্যাটি এসিড থেকে পুনরায় পৃথক হয়ে যায়।



চিত্র ৫.১১: ইলিয়ামে স্বীকৃত খাদ্য ও ব্রহ্মদার্থের শোবধ

কৈশিক নালির মধ্যে রন্তে প্রবাহিত হওয়ার সময় নালির প্রাচীর ছাঁয়ে জলীয় পদার্থ বের হয়। এই জলীয় পদার্থকে লসিকা বলে। লসিকা খাদ্য উপাদান সরবরাহ করে কোষে পৌঁছে দেয় এবং দূষিত পদার্থ সংগ্রহ করে রন্তস্তোত্তে ফিরে আসে। শোষণের পর পাকমণ্ডের অবশিষ্টাংশ কোলনে পৌঁছে।

(d) বৃহদল্লে পরিপাক

কোলনে পাকমণ্ডের কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া বা পরিপাক ঘটে না। তবে খাদ্যের অসার অংশের সাথে যে পানি থাকে, তা এখানে শোষিত হয়। তাছাড়া থাকে কিছু আমিষ, লিপিড, লবণ এবং উদ্ভূত এনজাইম। এসব বস্তু থেকে বৃহদল্লে লবণ ও পানি শোষণ করে রন্তে স্থানান্তরিত করে। ফলে উচ্চিষ্ট খাদ্য ঘনীভূত হয়ে মলে পরিণত হয়। এই মল মলাশয়ে জমা থাকে এবং প্রয়োজনমতো পায়ুপথ দিয়ে বের হয়ে আসে।

আন্তিকরণ: শোষিত খাদ্যবস্তুর প্রোটোপ্লাজমে পরিণত বা রূপান্তরিত করার পদ্ধতি হলো আন্তিকরণ। এটা একটি গঠনমূলক বা উপচিতি প্রক্রিয়া। কোমের প্রোটোপ্লাজম নিঃসৃত এনজাইমের সহযোগিতায় সরল খাদ্য জটিল উপাদানে পরিণত হয়। যেমন অ্যামাইনো এসিড, ফ্লুকোজ, ফ্যাটি এসিড এবং ফ্লিসারল রন্তের সাহায্যে দেহের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে এবং এসব স্থানে প্রোটোপ্লাজম নিঃসৃত এনজাইমের প্রভাবে আমিষ, স্লেহ এবং শর্করা তৈরি হয়। এভাবে প্রোটোপ্লাজম কোমের ক্ষয়পূরণ ও গঠনে সহায়তা করে এবং তার ফলে দেহের বৃদ্ধি ঘটে।

5.9 আন্তিক সমস্যা

আন্তিক সমস্যার কারণে কখনো কখনো নিম্নলিখিত রোগ বা শারীরিক অসুবিধা দেখা দেয়। যেমন:

(a) অজীর্ণতা (Dyspepsia)

একে আমরা বদহজমও বলে থাকি। নানা কারণে বদহজম হয় বা হজমে ব্যাঘাত ঘটে। যেমন: পাকস্থলীতে সংক্রমণ, বিষগ্রস্তা, অঘ্যাশয় রোগ, থাইরয়েডের সমস্যা ইত্যাদি।

পেটের উপরের দিকে ব্যথা, পেট ফাঁপা, পেট ভরা মনে হওয়া, বুক জ্বালা করা, বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া, বুক ব্যথা, টক টেকুর উঠা— এগুলো অজীর্ণতার লক্ষণ। পাকস্থলী বা অন্ত্রের আলসারের কারণেও হজমে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। একে সাধারণ মানুষ গ্যাস্ট্রিক বলে থাকে, যদিও সঠিক নামটি হলো পেপটিক আলসার।

অজীর্ণতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যা করতে হবে তা হলো: অতি ভোজন না করা, আস্তে আস্তে ভালোভাবে চিবিয়ে খাওয়া, ধূমপান পরিহার করা, প্রয়োজনে অজীর্ণতার কারণ বের করে ডাঙ্কারের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ খাওয়া। মনে রাখতে হবে, বদহজম, পেপটিক আলসার প্রভৃতি সমস্যার সাথে অনেক সময় হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণের মিল থাকে। তাই চল্লিশোৰ্ধ্ব বয়সে যদি একদিন হঠাতে করে বদহজমের মতো অসুবিধা

শুধু হয় এবং প্রচলিত উষধে তার উপশম না হয়, তাহলে দেরি না করে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে। কারণ সেক্ষেত্রে তা বদহজম না হয়ে হার্ট অ্যাটাকও হতে পারে।

(b) আমাশয় (Dysentery)

Entamoeba histolytica নামক এক ধরনের প্রোটোজোয়া, সিগেলা (Shigella) নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি জীবাণুর সংক্রমণে আমাশয় হয়। ঘন ঘন মলত্যাগ, মলের সাথে শ্লেষ্মা বের হওয়া, পেটে ব্যথা, অনেক সময় শ্লেষ্মাযুক্ত মলের সাথে রস্ত যাওয়া এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য হজম না হওয়া আমাশয় রোগের লক্ষণ। আমাশয় হলে প্রয়োজনে পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়, কারণ সময়মতো চিকিৎসা না করা হলে মারাঞ্চক কিছু ঘটতে পারে।

এ রোগ প্রতিরোধে যা করতে হবে তা হলো: বিশুদ্ধ পানি পান করা, শাকসবজি ও ফলমূল উত্তমরূপে পানি দিয়ে ধৌত করা, মল ত্যাগের পর হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধোয়া, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা, খাওয়ার আগে হাত ও থালাবাসন ভালোভাবে ধূয়ে নেওয়া।

(c) কোষ্ঠকাঠিন্য (Constipation)

এটি কোনো বিশেষ ধরনের রোগ নয়। যখন কারো শক্ত পায়খানা হয় কিংবা দুই বা তারও বেশি দিন পায়খানা হয় না, এ অবস্থাকে বলা হয় কোষ্ঠকাঠিন্য। বিভিন্ন কারণে কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে, যেমন পায়খানার বেগ চেপে রাখলে, বৃহদল্লেখ অপাচ্য খাদ্যাংশ থেকে অতিমাত্রায় পানি শোষিত হলে, পৌষ্টিক নালির মধ্য দিয়ে খাদ্যের অপাচ্য অংশ ধীরে ধীরে গমনে মল থেকে বেশি পানি শোষিত হলে। আবার পরিশ্রম না করলে, আন্ত্রিক গোলযোগে, কোলনের মাংসপেশি স্বাভাবিকের তুলনায় ধীরে ধীরে সংকুচিত হলে, রাফেজ বা আঁশযুক্ত খাবার না খেলেও কোষ্ঠকাঠিন্য হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে বেড়ে যায়।

কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণে মল ত্যাগ কষ্টদায়ক হয়। ফলে পেটে অস্বস্তিকর অবস্থা, পেট ব্যথা ও নানা রকম আনুষঙ্গিক অসুবিধার সৃষ্টি হয়। দীর্ঘমেয়াদি কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে হার্নিয়াসহ বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। আবার পরিপাক নালির টিউমারসহ বিভিন্ন অসুখের লক্ষণ হিসেবে কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে। তাই কোষ্ঠকাঠিন্য হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

এ রোগ প্রতিকারে যা করতে হবে তা হলো: আঁশযুক্ত খাবার খাওয়া, প্রচুর পানি পান করা, নিয়মিত শাকসবজি, আপেল, নারকেল, খেজুর, আম, কমলা, পেঁপে, আনারস, কলা ইত্যাদি খাওয়া। নিয়মিত মল ত্যাগের অভ্যাস করা, হাঁটাচলার অভ্যাস গড়ে তোলা।

(d) গ্যাস্ট্রিক ও পেপটিক আলসার (Gastric and Peptic ulcer)

আলসার বলতে যেকোনো এপিথেলিয়াম বা আবরণী টিস্যুর একধরনের ক্ষত বোঝায়। পেপটিক আলসার বলতে খাদ্যনালির কোনো অংশের আলসার বোঝায়। সেটি যদি পাকস্থলীতে হয় তাহলে তাকে গ্যাস্ট্রিক আলসার, ডিওডেনামে হলে ডিওডেনাল আলসার বলা হয়। দীর্ঘদিন ধরে খাদ্যগ্রহণে অনিয়ম হলে

পাকস্থলীতে অঞ্চের আধিক্য ঘটে এবং অনেক দিন ধরে এ অবস্থা চলতে থাকলে এই অস্ত্র বা এসিড দিয়ে পাকস্থলী বা অন্ত্রে ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে পেপটিক আলসার হতে পারে। তবে চিকিৎসাবিজ্ঞানী রবিন ওয়ারেন (1951-বর্তমান) ও ব্যারি মার্শালের (1937-বর্তমান) গবেষণায় জানা গেছে, খাদ্যে অনিয়ম, ভাজাপোড়া খাবার খাওয়া, বিষঘৃতা বা উৎকর্ষ ইত্যাদি পেপটিক আলসারের নিয়মক হলেও অন্যতম প্রধান কারণ *Helicobacter pylori* (সংক্ষেপে *H. pylori*) নামের একটি ব্যাকটেরিয়া। এজন্য তাঁরা 2005 সালে যৌথভাবে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। আগে ভাবা হতো, পাকস্থলীর তীব্র হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে (pH 1.5-3.5) কোনো ব্যাকটেরিয়া টিকতে পারে না। তাঁর ধারণা প্রমাণ করার জন্য ব্যারি মার্শাল নিজে *H. pylori* ব্যাকটেরিয়া মিশ্রিত দ্রবণ পান করে পেপটিক আলসারে ভুগেছিলেন (উল্লেখ্য, এই ব্যাকটেরিয়া যে শুধু আলসারের জন্য দায়ী তাই নয়, এ থেকে পাকস্থলীর ক্যাস্টারও হতে পারে। তাই মার্শাল তাঁর নিজের জীবনের উপর মারাত্মক ঝুঁকি নিয়েছিলেন, যা অনুসরণীয় নয়)। পেপটিক আলসার রোগে সাধারণত পেটের ঠিক মাঝ বরাবর, নাভির একটু উপরে একঘেয়ে ব্যথা অনুভূত হয়। খালি পেটে বা অতিরিক্ত তেলজাতীয় খাদ্য খেলে ব্যথা বাঢ়ে। আলসার মারাত্মক হলে বমি হতে পারে। কখনো কখনো বমি এবং মলের সাথে রস্ত নির্গত হয়। এন্ডোস্কপি (Endoscopy) বা বেরিয়াম এক্স-রের মাধ্যমে এ রোগ নির্ণয় করা যায়।

এ রোগ থেকে দূরে থাকতে হলে যা করতে হবে তা হলো: নিয়মিত সহজপাচ্য খাদ্য গ্রহণ করা, অধিক তেল এবং মশলাযুক্ত গুরুপাক খাদ্য পরিহার করা। ফুটানো দুধ, পনির এবং কলা খেলে ভালো উপকার পাওয়া যায়। নিয়মিত খাদ্য গ্রহণ করে, কফি, সিগারেট ইত্যাদি উল্লেজক পদার্থ গ্রহণ থেকে বিরত থেকে, প্রয়োজনে ডাঙ্কারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা নিয়ে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। তবে মার্শাল ও ওয়ারেনের আবিষ্কার থেকে আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পেয়েছি তা হলো, যদি কেউ *H. pylori* দিয়ে সংক্রমিত হয়, তার ক্ষেত্রে উপরোক্ত নিয়ম পালনে রোগ পুরোপুরি ভালো হবে না। তখন পূর্ণ আরোগ্যের জন্য নিয়ম মেনে আহার করার পাশাপাশি চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক সঠিক ডোজে সঠিক অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ থেকে হবে।

(e) অ্যাপেনডিসাইটিস (Appendicitis)

পেটের ডান দিকের নিচে বৃহদন্ত্রের সিকামের সাথে অ্যাপেনডিস্ক যুক্ত থাকে। এটি আঙ্গুলের আকারের একটি থলে। অ্যাপেনডিস্কের সংক্রমণের কারণে অ্যাপেনডিসাইটিস হয়। এ রোগে প্রথমে নাভির চারদিকে ব্যথা অনুভব হয় এবং ব্যথা শুরু হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তলপেটের ডান দিকে সরে যায়। ক্ষুধামন্দ্যা, বমি, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়।

এ রোগের প্রতিকারে রোগীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাঙ্কার দেখাতে হবে। ডাঙ্কারের পরামর্শ অনুযায়ী রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি এবং প্রয়োজনে শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে অ্যাপেনডিস্ক অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে। অ্যাপেনডিস্কের সংক্রমণ মারাত্মক হলে এটি ফেটে যেতে পারে এবং রোগীর জন্য মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

(f) কৃমিজনিত রোগ

কৃমি পরজীবী হিসেবে পোষকদেহে বাস করে। মানবদেহ অনেক প্রজাতির কৃমির পোষক। বিশেষ করে মানুষের অন্ত্রে গোলকৃমি, সুতাকৃমি ও ফিতাকৃমি পরজীবী হিসেবে বাস করে। কৃমির কারণে পেটে ব্যথা, দুর্বলবোধ, বদহজম, পেটে অস্বস্তিবোধ, বমি বমি ভাব, অনিদ্রা, খাওয়ায় আরুচি, রোগীর চেহারা ফ্যাকাশে হওয়া, রস্তাল্পতা দেখা দেওয়া, হাত-পা ফুলে যাওয়া, পেট বড় হয়ে ফুলে উঠা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। শিশুর জ্বর হলে অনেক সময় মলের সাথে এমনকি নাক-মুখ দিয়ে কৃমি বেরিয়ে আসে।

রোগীর মল পরীক্ষা করে পেটে কৃমি আছে কি না তা জানা যায়। মল পরীক্ষায় কৃমির ডিম পাওয়া গেলে ডাঙ্কারের পরামর্শ অনুযায়ী কৃমিনশ্ক উষ্ণধ খেতে হয়।

কৃমি আক্রান্ত ব্যক্তি অথবা মাছির মাধ্যমে খাদ্যবস্তু দূষিত হয়। দূষিত খাদ্য কৃমি বিস্তারে সহায়তা করে। কাঁচা ফলমূল ধুয়ে খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা, খাবার আগে হাত ভালোভাবে ধোয়া, স্বাস্থ্যসম্ভত পায়খানা ব্যবহার করা, খালি পায়ে না হাঁটা এবং অল্প সিদ্ধ শাকসবজি বা মাংস না খাওয়া ইত্যাদি সাধানান্তা অবলম্বন করে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

(g) ডায়ারিয়া (Diarrhoea)

যদি দিনে অন্তত তিনবার পাতলা পায়খানা হয়, তবে তার ডায়ারিয়া হয়েছে বলে মনে করতে হবে। সব বয়সী মানুষের ডায়ারিয়া হতে পারে, তবে সাধারণত শিশুরা এতে দ্রুত কাহিল হয়ে পড়ে। ডায়ারিয়া হলে রোগীর দেহ থেকে পানি এবং লবণ বেরিয়ে যায়, দেহের পানি কমে যায়, রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে দেহে পানি এবং লবণের স্বল্পতা দেখা দেয়। এ সময় যথাযথ চিকিৎসা করা না হলে রোগী মারাও যেতে পারে।

ঘন ঘন পাতলা পায়খানা হওয়া, বারবার বমি হওয়া, খুব পিপাসা লাগা, মুখ ও জিহ্বা শুকিয়ে যাওয়া, দেহের চামড়া কুঁচকে যাওয়া, চোখ বসে যাওয়া ইত্যাদি ডায়ারিয়ার উপসর্গ। এ সময় রোগী খাবার বা পানীয় ঠিকমতো খেতে চায় না, শিশুর মাথার চাঁদি বা তালু বসে যায়। আস্তে আস্তে রোগী নিষ্টেজ হয়ে পড়ে।

দূষিত পানি পান করলে, বাসি-পচা, নোংরা খাবার খেলে, অপরিচ্ছন্ন থালা-বাসন ব্যবহার করলে, অপরিক্ষার হাতে খাবার খেলে এ রোগ বিস্তার লাভের আশঙ্কা বেশি থাকে।

ডায়ারিয়া রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে খাবার স্যালাইন খাওয়ানো শুরু করতে হবে। আজকাল খাবার সালাইনের প্যাকেট বাজারে পাওয়া যায়, প্যাকেটের গায়ে স্যালাইন বানানোর নিয়ম লেখা থাকে। ঐ নিয়ম অনুযায়ী স্যালাইন বানাতে হয়। বিশেষ প্রয়োজনে বাড়িতেও স্যালাইন বানানো যায়। তোমরা ইতোপূর্বে বাড়িতে কীভাবে খাবার স্যালাইন তৈরি করা যায় তা জেনেছ।

সম্প্রতি শস্য স্যালাইন নামে আর একটি স্যালাইন উভাবিত হয়েছে। এক লিটার পানি, 50 গ্রাম চালের ফর্মা-১৬, জীববিজ্ঞান- ৯ম-১০ম শ্রেণি

গুঢ়া, এক চিমটি লবণ মিশিয়ে বাড়িতে এ স্যালাইন তৈরি করা যায়। স্যালাইন ব্যবহারের সময় যে বিষয়গুলো মনে রাখা দরকার তা হলো: পাতলা পাইথানা বন্ধ না হওয়া পর্যবেক্ষণ রোগীকে স্যালাইন খাওয়াতে হবে, রোগীর বন্ধ হলেও স্যালাইন খাওয়া বন্ধ করা যাবে না, শিশু রোগীকে বুকের দুখ খাওয়াতে হবে। রোগীকে নিম্নমিত অন্যান্য খাবারও খেতে হবে। ডায়ারিয়া সেরে যাওয়ার পরও অস্তত এক সশ্রাহ রোগীকে বাড়িতি খাবার দিতে হবে।

ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া প্রভৃতি জীবাণু দ্বারা ডায়ারিয়া হতে পারে। রোটা ভাইরাস, ডায়ারিয়ার জন্য দর্শী জীবাণুগুলোর মধ্যে অন্যতম। বিশ্বব্যাপী রোটা ভাইরাসজনিত মোট মৃত্যুর ৪২ শতাংশ হয় হতারিম দেশগুলোতেই। উন্নত দেশগুলোতে এ রোগের বিস্তার আছে। অবে মৃত্যুর হার জুলনামূলকভাবে অনেক কম।



দলপত্র কাজ

কাজ: তোমরা দলবদ্ধ হয়ে প্রেরিককে খাবার স্যালাইন তৈরি কর। খাবার স্যালাইন খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা পোস্টোর পেগারে শিখে উপস্থাপন কর।

অনুশীলনী



সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

1. উত্তিদের খনিজ পুষ্টি কাকে বলে?
2. উত্তিদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় খনিজ পুষ্টি কয়টি?
3. আদর্শ খাদ্যশিল্পায়িত কী?
4. রক্তশূন্যতার কারণ কী?
5. গ্রাহকান্ত রোগ কেন হয়?



রাচনামূলক প্রশ্ন

1. চিত্তসহ দাঁতের পঠন বর্ণনা কর।
2. সুষম খাদ্যের বৈশিষ্ট্যগুলো সেখ।



বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

1. উচিসের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি মাক্রোনিউট্রিয়েট হিসেবে কাজ করে?
 - ক. দস্তা
 - খ. ক্রোরিন
 - গ. বোরল
 - ঘ. পটাশিয়াম
2. ফেরোসিস হয়-
 - i. নাইট্রোজেনের অভাবে
 - ii. সালফারের ঘাটতিতে
 - iii. লোহের অনুপস্থিতিতে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 - ক. i ও ii
 - খ. i ও iii
 - গ. ii ও iii
 - ঘ. i, ii ও iii

নিচের উকীলকাটি পক্ষে ৩ ও ৪ নম্বর ধারের উচ্চর সাও।

পাঁচ বৎসর বয়সী সানজানা স্কুলে তার বইয়ের সব লেখা বুঝতে পারে। তবে রাতের বেলা পড়তে বসলে সে বইয়ের লেখাগুলো ঠিকমতো সেখতে পায় না।

3. সানজানার দেহে কোন ডিটায়িনের অভাব রয়েছে?
 - ক. ডিটায়িন 'এ'
 - খ. ডিটায়িন 'বি'
 - গ. ডিটায়িন 'সি'
 - ঘ. ডিটায়িন 'ডি'
4. সানজানার রোগটি অভিযোগে অধিক পরিসাথে ধেতে হবে-
 - i. শৃঙ্খল
 - ii. গাজর
 - iii. মলা মাছ
 নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii	(খ) i ও iii	(গ) ii ও iii	(ঘ) i, ii ও iii
------------	-------------	--------------	-----------------

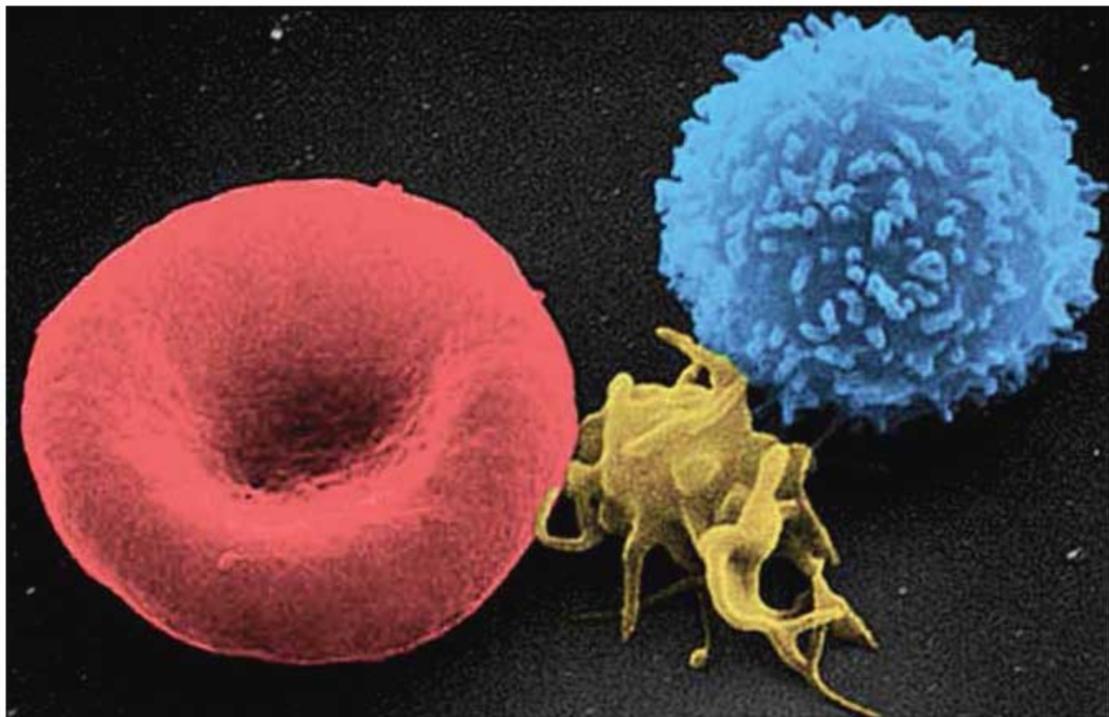


সূজনশীল প্রশ্ন

- ক. গ্রামহান দিনের অধিকাংশ সময় পর্বেশণার কাছে পর্বেশণাগারে সময় কাটান। এতে তার প্রজন্ম থেকে যাচ্ছে। অন্যদিকে তার হোটেলাই অবস্থা সেশের জাতীয় সুব ফুটবল ম্যাচের একজন পিপারিত খেলোয়াড়। সেজন্য ভাকে অভিযন্ত আনন্দ সময় ধরে শারীরিক কসরত ও খেলাখুলা করতে হয়।
 ক. কোন জাতীয় খাদ্য মেছে মাইক্রোজেন সরবরাহ করে?
 খ. উচ্চমানের আমিষ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।
 গ. অহিনের খাদ্যতালিকায় কোন ধরনের খীৰার অধিক খাকা সরকার? কারণ ব্যাখ্যা কর।
 ঘ. অহিনের খাদ্যতালিকার কোন ধরনের খীৰার রামহানের জন্য অযোজ্য নয়? বিপ্লবগুরুক ঘটামত দাও।
- ইংরাফন আলী লক ক্রলেন ভাব বাগানের পাহাড়সার স্থে ঘাসজাতীয় গাছের পাতা হলুদ হয়ে পেছে এবং কুল গাছের পাতা, কুল ও ঝুঁটি হয়ে যাচ্ছে। এ সমস্তা সমাধানে তিনি একজন উদ্যানতত্ত্ববিদের প্রশ়াঁপন হলেন। তিনি ভাকে ভাব বাগানে উভিদের প্রাণজনীয় অভ্যাবশ্যকীয় কিছু উপাদান সরবরাহের পরামর্শ দিলেন।
 ক. মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট কী?
 খ. উভিদের জন্য অভ্যাবশ্যকীয় উপাদান কী? ব্যাখ্যা কর।
 গ. ইংরাফন আলীর বাগানের ঘাসজাতীয় উভিদের সমস্যার কারণ ব্যাখ্যা কর।
 ঘ. উকীগুকের উদ্যানতত্ত্ববিদের পরামর্শ মূল্যায়ন কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জীবে পরিবহন



পরিবহন জীবদেহের একটি অতিপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, যা সবসময়েই ষষ্ঠে চলেছে। উজ্জিদে পানি ও খনিজ পরিবহন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, খাদ্য চলাচলও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। মাটি থেকে শ্রেণী করা পানি আর খনিজ সবগ মূল থেকে পাতায় পৌঁছানো যেমন গুরুত্বপূর্ণ, পাতায় প্রস্তুত করা খাদ্য উজ্জিদের বিভিন্ন অঙ্গে পরিবহনও ঠিক তেমনি সমান প্রয়োজনীয়। মানবদেহে পরিবহন প্রক্রিয়া উজ্জিদের মতো নয় কিন্তু উভয়েই পদার্থবিজ্ঞানের একই নিয়ম অনুসরণ করে।

উজ্জিদ আর মানবদেহের পরিবহন পদ্ধতি এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।



এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- উদ্ভিদে পরিবহনের ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উদ্ভিদ ও পানির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উদ্ভিদে পানি ও খনিজ পদার্থ পোষণ প্রক্রিয়া এবং এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সালোকসংশ্লেশের ফলে উৎপাদিত পদার্থের পরিবহন বর্ণনা করতে পারব।
- উদ্ভিদে পানি ও খনিজ পদার্থ পরিবহন এবং এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রম্বেদনের ধারণা ও ভাষ্পর্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রম্বেদনের হার নিয়ন্ত্রণে প্রভাবকের সূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- প্রম্বেদন একটি অতিপ্রয়োজনীয় অঘঙ্গল তা মূল্যায়ন করতে পারব।
- উদ্ভিদ প্রম্বেদনের পরীক্ষা করতে পারব।
- মানবদেহে সংবহনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রক্ত উপাদানের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন গুপ্তের রক্তের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রক্ত শুধু বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে রক্ত নির্বাচন করতে পারব।
- রক্তাদানের নিয়মাবলি এবং এর সামাজিক দায়বদ্ধতা বর্ণনা করতে পারব।
- মানবদেহে রক্ত সঞ্চালন কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারব।
- হৃৎপিণ্ডের পঠন ও কাজ বর্ণনা করতে পারব।
- হৃৎপিণ্ড নঠনগতভাবে যে এর কার্যক্রমের সাথে অভিযোজিত তা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- রক্ত সংরক্ষণে রক্তচাপের সূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- আদর্শ রক্তচাপ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কোলেস্টেরলের প্রকারভেদ, সীমা, উপকারিতা ও স্বাস্থ্যবুক্তি বর্ণনা করতে পারব।
- রক্ত সঞ্চালনে কোলেস্টেরলের সূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- রক্তে অশ্যাভাবিকতার কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- হৃৎপিণ্ড সংকর্কিত রোগের লক্ষণ, কারণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিশ্লেষণ করতে পারব।
- হৃৎপিণ্ডকে সুস্থ রাখার উপায় বিশ্লেষণ করতে পারব।
- বিশ্রামরুচি অবস্থায় এবং শরীরচর্চার পর রক্তচাপ ও পালসেট পরিমাপ করতে এবং দুই অবস্থানে পরিমাপকৃত রক্তচাপ ও পালসেট বিশ্লেষণ করতে পারব।
- সঠিকভাবে রক্তচাপ ও পালসেট পরিমাপ করতে পারব।
- হৃৎপিণ্ডকে সুস্থ রাখার অন্য নিজে সচেতন হব এবং অন্যকে সচেতন করতে পারব।

৬.১ উত্তিদ ও পানির সম্পর্ক

পানির অপর নাম জীবন। পানি ছাড়া জীব বাঁচতে পারে না। আমরা জানি, প্রোটোপ্লাজম জীবদেহের ভৌত ভিত্তি, এই প্রোটোপ্লাজমের শতকরা ৯০ ভাগই পানি। এ কারণেই পানিকে ফ্লুইড অফ লাইফ বলা হয়ে থাকে। পানির পরিমাণ কমে গেলে প্রোটোপ্লাজম সংকুচিত হয়ে যাবে পর্যন্ত যেতে পারে। তাছাড়া উত্তিদের দেহে যত বিপাকীয় বিক্রিয়া চলে, পানির অভাব হলে সেগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। উত্তিদেহে পানির প্রয়োজনীয় দিকগুলোর মধ্য উল্লেখযোগ্য হলো:

- (a) প্রোটোপ্লাজম সজীব রাখতে পানির বিকল্প নেই। একটি সংকুচিত প্রোটোপ্লাজমযুক্ত কোষকে বাঁচাতে চাইলে দেরি না করে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।
- (b) প্রশ্বেদন ও সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া চালু রাখতে পরিমাণমতো পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা দরকার। এজন্যই শুক্ষ মৌসুমে বড় বড় উত্তিদেও পানি সেচ দিতে হয়।
- (c) পানি একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্রাবক। বিপাকীয় অনেক বিক্রিয়ায় পানির গুরুত্ব অপরিসীম।
- (d) উত্তিদের কোষ বৃদ্ধি ও চলনে পানির ভূমিকা রয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে উত্তিদ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় পানি কোথায় এবং কীভাবে পায়? উত্তিদ প্রধানত মূলের মাধ্যমে মাটি থেকে পানি শোষণ করে। উত্তিদে ৩টি প্রক্রিয়া সম্মিলিতভাবে শোষণ কাজ সম্পাদন করে। প্রক্রিয়া তিনটি হলো ইমবাইবিশন, ব্যাপন এবং অভিস্রবণ।

(a) ইমবাইবিশন (Imbibition)

এক খন্দ শুকনা কাঠের এক প্রান্ত পানিতে ঢুবালে ঐ কাঠের খণ্ডটি কিছু পানি টেনে নেবে। আমরা জানি, কলয়েড জাতীয় শুকনা বা আধা শুকনা পদার্থ তরল পদার্থ শুষে নেয়, এজন্যই কাঠের খণ্ডটি পানি টেনে নিয়েছে। এ প্রক্রিয়াকে ইমবাইবিশন বলে। সেলুলোজ, স্টার্চ, জিলাটিন— এগুলো হাইড্রোফিলিক (পানিপ্রিয়) পদার্থ। এরা তরল পদার্থের সংস্পর্শে এলে তা শুষে নেয়, আবার তরল পদার্থের অভাবে সংকুচিত হয়ে যায়। কোষপ্রাচীর ও প্রোটোপ্লাজম কলয়েডধর্মী হওয়ায় ইমবাইবিশন প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করে স্ফীত হয়ে ওঠে। পানি শোষণের এটি একটি অন্যতম প্রক্রিয়া।

(b) ব্যাপন (Diffusion)

ঘরের এক কোণে কিছু সুগন্ধি টেলে দিলে তার সুগন্ধি সারা ঘরে ছড়িয়ে যায়। কারণ এর ক্ষুদ্র কণা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। এক গ্লাস পানিতে কিছু চিনি ছেড়ে দিলে কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্লাসের পানি মিষ্টি হয়ে যায়। এক্ষেত্রে চিনির অণু পানিতে ছড়িয়ে পুরো পানিকে মিষ্টি স্বাদযুক্ত করে তোলে। এই প্রক্রিয়াকে ব্যাপন বলে। এটি একটি ভৌত প্রক্রিয়া (Physical process)। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো দ্রব্যের

অপু বেশি ঘনত্বের এলাকা থেকে কম ঘনত্বের এলাকায় ছাড়িয়ে পড়ে তাকে ব্যাপন প্রক্রিয়া বলে। একই ভাগমাণ্ডা ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপে কোনো পদার্থের বেশি ঘনত্ববিশিষ্ট জ্বরণ থেকে কম ঘনত্বের স্ববন্ধের দিকে হাবকের প্রাপ্তি হওয়ার প্রায় ক্ষমতাকে ব্যাপন চাপ বলে। একই বায়ু চাপে কোনো একটি স্ববন্ধ ও হাবকের ব্যাপন চাপের পার্শ্বক্ষেত্রে ব্যাপন চাপ স্টেটিভ (Diffusion pressure deficit) বলে। গৌত্র মেসোফিল টিস্যুতে এই ব্যাপন চাপ স্টেটিভ ফলে পানির স্টেটিভ আছে, এমন কোষ পাশের কোষ থেকে পানি ঢেলে নেয়। এক কথায় উভিদের পানি শেষগে ব্যাপনের গুরুত্ব অপরিসীম।



একক কাজ

কাজ : ব্যাপন প্রক্রিয়ার পরীক্ষণ।

উপকরণ : একটি ছোট বাটি এবং আতর বা বেকোনো সুগন্ধি।

পদ্ধতি : ব্যাপন প্রক্রিয়াটি প্রমাণ করতে আতর বা সুগন্ধি বাটিতে ঢেলে পরবর্তী অবস্থা বর্ণনা কর।

(c) অভিস্রবণ (Osmosis)

অভিস্রবণ কী, সেটা কি তোমরা জান? তোমরা কি খেয়াল করেছ যে তোমার মা বখন পানিতে কিশমিশ ভিজিয়ে রাখেন, তার কিছুক্ষণ পর চুপসে থাকা কিশমিশগুলো কুলে টস্টসে হয়ে ওঠে। এ টস্টসে কিশমিশ যদি আবার ঘন চিনির স্ববন্ধে ভিজিয়ে রাখ, তাহলে দেখবে সেগুলো আবার চুপসে পেছে। কেন এমন হলো তা কি তোমরা ধারণা করতে পার? এটি একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় উভিদ মাটি থেকে পানি প্রহরণ করে। এ প্রক্রিয়াটি জীবস্ত কোষ ছাঢ়াও কৃতিমভাবে জ্বাবরেটারিজেও ঘটানো যায়। যদি দুটি ভিন্ন ঘনত্বের স্ববন্ধের মধ্যে এবং হাবক একই, একটি বৈষম্যভেদ পর্দা (Selectively permeable membrane) দিয়ে আলাদা করা হয়, তাহলে কিছুক্ষণের মধ্যেই দুটি স্ববন্ধের ঘনত্ব সমান হয়ে যাবে। একই স্ববন্ধ এবং হাবকমূলক দুটি ভিন্ন ঘনত্বের স্ববন্ধ একটি বৈষম্যভেদ পর্দা দিয়ে আলাদা করা হলে, হাবক তার নিম্ন ঘনত্বের স্ববন্ধ থেকে উচ্চ ঘনত্বের স্ববন্ধের দিকে প্রবাহিত হয়। হাবকের বৈষম্যভেদ পর্দা তেদ করে তার নিম্ন ঘনত্বের স্ববন্ধ থেকে উচ্চ ঘনত্বের স্ববন্ধের দিকে প্রবাহিত হওয়াকে অভিস্রবণ প্রক্রিয়া বলা হয়।



একক কাজ

কাজ : কোষ থেকে কোষে অভিস্রবণের পরীক্ষণ।

উপকরণ : একখন্ত আলু, বেল, পেট্রিডিস, পানি, চিনি।

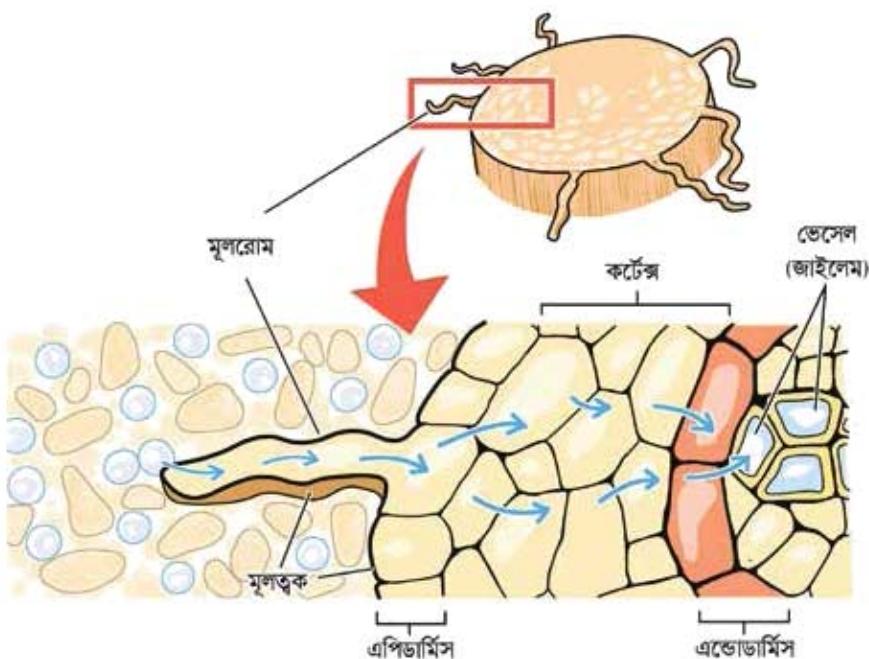
পদ্ধতি : আলু দিয়ে অসমোক্ষেকাপ বালাও। চিনির শরবৎ জেলে অভিস্রবণের প্রমাণ দাও।

৬.২ পানি ও খনিজ স্ববণ শোষণ

উদ্ভিদে পানি শোষণ ও খনিজ স্ববণ শোষণ কিম প্রক্রিয়ায় হয়। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা পানি শোষণ বিষয়টি সমর্পণ আপে জনব।

(a) পানি শোষণ

সাধারণভাবে উদ্ভিদ তার মূলরোমের মাঝে মাটির কৈশিক পানি (capillary water) শোষণ করে। প্রক্রিয়ার কলে পাতার কোষে ব্যাপন চাপ ঘাটতির সূচি হয়, এর কলে পাশের কোষ থেকে পানি এই কোষের দিকে ধাবিত হয়। একইভাবে গ্রীষ্মীয় কোষটিকে আবার ব্যাপন চাপ ঘাটতি সূচি হয় এবং তার পাশের বা নিচের কোষ থেকে পানি টেনে নেয়। এভাবে ব্যাপন চাপ ঘাটতি ক্রমশ মূলরোম পর্যন্ত



চিত্র ৬.০১: পানি শোষণ ও পরিবহন

বিস্তৃত হয় এবং একটি চোষক শক্তির সূচি হয়। এ চোষক শক্তির টানে মাটির কৈশিক পানি মূলরোমে চুকে পড়ে। মাটি থেকে মূলরোমে অভিস্রবণ ও ব্যাপন প্রক্রিয়ায় এ পানি প্রবেশ করে। এভাবে মূলরোম থেকে পানি মূলের কর্টেক্স (Cortex) প্রবেশ করে। এ কাজটিকে কোষ থেকে কোষাঙ্কে অভিস্রবণ (cell to cell osmosis) পদ্ধতি বলে। একইভাবে পানি অভ্যন্তরীক ও পরিচক্র হয়ে পরিবহন কলা গুচ্ছ (Vascular bundles) পেঁচে বায়। পানি একবার পরিবহন কলার পেঁচে গেলে তা জাইলেম কলার মাঝে উপরের দিকে এবং পাশের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। এভাবে পানি বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা হয়ে

উড়িদের পাতায় পৌঁছে যায়। এ কাজে যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া কাজ করে সেগুলো হলো, অভিস্রবণ ও প্রস্বেদন।

(b) খনিজ লবণ শোষণ

অধিকাংশ উড়িদ পানির সাথে কিছু পরিমাণ খনিজ লবণ শোষণ করে, কিছু লবণ মূলরোম দিয়ে শোষিত হলেও মূলত মূলের অগ্রভাগের কোষ বিভাজন অঞ্চলই শোষণ অঞ্চল হিসেবে কাজ করে। খনিজ লবণ শোষিত হয় আয়ন হিসেবে। শোষণ প্রধানত দুটি উপায়ে হয়ে থাকে, নিষ্ক্রিয় শোষণ ও সক্রিয় শোষণ।

নিষ্ক্রিয় শোষণ (Passive absorption): উড়িদের এ প্রক্রিয়ায় মূলরোম ইমবাইবিশন ও অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় লবণ শোষণ করে, কোনো বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন হয় না।

সক্রিয় শোষণ (Active absorption): সক্রিয় শোষণে খনিজ লবণ পরিবহনের জন্য কোষে উৎপন্ন বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন হয়।

6.2.1 উড়িদে পরিবহন

উড়িদে পরিবহন বলতে মাটি থেকে শোষিত পানি ও খনিজ লবণ এবং পাতায় প্রস্তুতকৃত খাদ্যের চলাচলকে বুঝায়। আমরা জানি, জাইলেম ভেসেলের মাধ্যমে পানি এবং খনিজ লবণ উড়িদের পাতায় পৌঁছায়। প্রস্বেদন টান, কৈশিক শক্তি এবং মূলজ চাপের ফলে কোষরস উড়িদের পাতায় পৌঁছে যায় বলে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন। এভাবে পাতায় পানি পৌঁছালে সেখানে খাদ্য প্রস্তুত হয়। প্রস্তুত খাদ্য উড়িদের বিভিন্ন এলাকায় পরিবহনের দায়িত্ব গ্রহণ করে ফ্লোয়েম টিস্যু। এ খাদ্য ফ্লোয়েমের সিভনলের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। উড়িদের বিভিন্ন জৈব যৌগ ফ্লোয়েম টিস্যুর মাধ্যমে বিপরীত দিকে একই সাথে চলাচল করে। উড়িদের নিচের দিকের যৌগগুলো নিচের দিকে, উপরে সংশ্লেষিত যৌগগুলো উপরের দিকে এবং উড়িদের মাঝামাঝি এলাকায় সংশ্লেষিত পদার্থগুলো উপরে বা নিচে যেকোনো দিকে প্রবাহিত হয়।

উড়িদে পরিবহনের প্রয়োজনীয়তা

পরিবহন অর্থ একস্থান থেকে অন্য স্থানে কোনো পদার্থের স্থানান্তর। পানি ও খনিজ লবণের চলাচলকে উড়িদে পরিবহন বলা হয়। উড়িদে পানি ও খনিজ দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তার কথা সব বিজ্ঞানীই স্বীকার করেছেন। এই পানি এবং খনিজ পদার্থ উড়িদের কাজে আসতে হলে সেগুলোকে অবশ্যই বিক্রিয়াস্থলে নিয়ে যেতে হবে। এজন্য পানি এবং খনিজ লবণ পরিবহন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মূলরোম দিয়ে পানি ও খনিজ লবণ শোষিত হয়ে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় কর্টেক্সের মধ্য দিয়ে জাইলেম ভেসেলে পৌঁছায় এবং প্রস্বেদন স্তোত্রের সাথে ধীরে ধীরে পাতায় গিয়ে পৌঁছে। সেখানে খাদ্য তৈরি হয়। পাতা থেকে তৈরি খাদ্য ফ্লোয়েমের সিভনল দিয়ে উড়িদের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে যায়। কখনো জাইলেম ভেসেল বা ফ্লোয়েমের সিভনল কোনো কারণে বন্ধ হয়ে গেলে উড়িদের মৃত্যু অবধারিত। এজন্য বলা যায় পরিবহন উড়িদে জীবনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম।

পানি ও খনিজ পদার্থের পরিবহন (Translocation of water and minerals)

আমরা ইতোপূর্বে অভিস্তুবণ ও ব্যাপন সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেয়েছি। অভিস্তুবণ প্রক্রিয়ার উভিদ মাটি থেকে মূল দিয়ে পানি শোষণ করে। মূলরোমের সাহায্যে প্রধানত এ কাজটি হয়। পাশাপাশি উভিদ মাটি থেকে প্রয়োজনীয় খনিজ পুষ্টি শোষণ করে। অবশ্য খনিজ পুষ্টি শোষণের পদ্ধতি পানি শোষণ পদ্ধতি থেকে আলাদা। এ বিষয়ে উচ্চতর প্রেগিন্টে তোমরা বিস্তারিত জানতে পারবে। কোষের ভিতরকার পানি এবং পানিতে জড়ীভূত খনিজ সবগুলকে একত্রে কোষরস (cell sap) বলে। এবার আমরা মূল থেকে উভিদের সর্বোচ্চ শাখায় এবং পাতায় কীভাবে কোষরস পৌঁছায় তা জানব।

কোষরসের আরোহণ (Ascent of sap)

মূল পানি ও খনিজ সবগুল শোষণ করে। এ কোষরস বিভিন্ন প্রক্রিয়ার প্রভাবে ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠতে থাকে। একই সাথে কোষরসের পার্শ্ব পরিবহনও চলতে থাকে। কোষরস পরিবহনকে দুভাগে ভাগ করা যায়, মাটিতে থাকা পানি ও খনিজ সবগুলো মূলরোম থেকে মূলের পরিবহন কলায় পৌঁছানো এবং মূলের পরিবহন কলা থেকে পাতায় পৌঁছানো। প্রথম ধাপে অভিস্তুবণ, ব্যাপন ও প্রবেদন টান ইত্যাদি পানি এবং খনিজ সবগুল শোষণ ও পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মূলরোম দিয়ে শোষিত পানি এবং খনিজ পদার্থ অভিস্তুবণ প্রক্রিয়ার মূলরোম থেকে পাশের কোষে যায়। এই কোষ থেকে তা পুনরায় তার পাশের কোষে যায়। এভাবে কোষ থেকে কোষে পানি এবং খনিজ পদার্থ চলতে চলতে একসময় মূলের পরিবহন টিস্যু হয়ে এবং কান্ডের পরিবহন কলা বেঞ্চে পাতার মেসোকিল কলায় পৌঁছায়।



একটি কাজ

কাজ: উভিদের রস উৎসোহন পরীক্ষণ।

উপকরণ: *Peperomia* উভিদ, একটি বোতল,
পানি ও স্যাফ্রানিন বা শাল কালি।

পদ্ধতি: একটি বোতলে কিছু পানি নিয়ে ভাতে
করেক ফৌটা স্যাফ্রানিন বা শাল কালি নাও। মূলসহ
একটি তাঙ্গা *Peperomia* উভিদ এমনভাবে স্থাপন
কর যেন মূলগুলো পানিতে ফুলে থাকে। এ অবস্থায়
বোতলটিকে করেক ঘন্টার জন্য রেখে দাও এবং
পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল ধারায় লেখ।



চিত্র 6.02: উভিদের রস উৎসোহন পরীক্ষা

6.2.3 সালোকসংশ্লেষণে উৎপাদিত পদার্থের পরিবহন

তোমরা আগেই জেনেছ যে উক্তির অভিস্রবণ পদ্ধতিতে পানি গ্রহণ করে। এ পানি জাইলেম ভেসেলের মাধ্যমে সুউচ্চ বৃক্ষের সর্বোচ্চ স্থানের পাতায়ও পৌঁছে যায়। পাতা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় এ পানি ব্যবহার করে। আলোর উপস্থিতিতে ক্লোরোপ্লাস্টে বায়ু থেকে গৃহীত CO_2 এবং মাটি থেকে গৃহীত পানির সংমিশ্রণে শর্করাজাতীয় খাদ্য উৎপন্ন হয়। এ উৎপন্ন খাদ্য উক্তিদের বিভিন্ন অংশে চলে যায়। উক্তিদের প্রতিটি কোষই এ খাদ্য ব্যবহার করে শুসন প্রক্রিয়ায় তার বিপাকীয় কাজ চালানোর প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান দেয়। এ কাজের পর যতটুকু খাদ্য অবশিষ্ট থাকে, সেগুলো উক্তিদের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে সঞ্চিত থাকে। বিভিন্ন ফল এবং বীজ ছাড়াও কাণ্ড (যেমন- গোল আলু), মূল (যেমন- মিষ্টি আলু) কিংবা পাতাতেও (যেমন- ঘৃতকুমারী) এই খাদ্য জমা থাকে। আমরা এবার দেখব সালোকসংশ্লেষণে উৎপন্ন খাদ্য কীভাবে উক্তিদেহের বিভিন্ন অংশে পরিবহিত হয়।

ফ্লোয়েমের মাধ্যমে পরিবহন (Phloem translocation)

উক্তিদের মূল এবং পাতা পরস্পর থেকে দূরে অবস্থান করায় খাদ্য চলাচলে একটি দ্রুত ও কার্যকর পরিবহনব্যবস্থা থাকা আবশ্যিক। এ কাজটি ফ্লোয়েমের সিভনল করে থাকে। ফ্লোয়েম পরিবহন কলাগুচ্ছের অন্যতম গুচ্ছ। আমরা জেনেছি যে পরিবহন কলাগুচ্ছে জাইলেমগুচ্ছ এবং ফ্লোয়েমগুচ্ছ থাকে। ফ্লোয়েমগুচ্ছে সিভনল, সঙ্গীকোষ, ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা ও বাস্টফাইবার থাকে। সিভনল এক ধরনের কেন্দ্রিকাবিহীন ও পাতলা প্রাচীরযুক্ত সজীব কোষ। লম্বালম্বিভাবে এরা একটির সাথে অন্যটি যুক্ত হয়ে উক্তিদেহে জালের মতো গঠন সৃষ্টি করে। দুটো কোষের মধ্যবর্তী অনুপ্রস্থ প্রাচীরটি স্থানে বিলুপ্ত হয়ে চালুনির মতো আকার ধারণ করে। এর ফলে খাদ্যব্রৈ সহজেই এক কোষ থেকে অন্য কোষে চলাচল করতে পারে। শীতকালে এ রন্ধ্রগুলোতে ক্যালোজ নামক রাসায়নিক পদার্থ জমা হয়ে রন্ধ্র ছেট হয়, তাই খাদ্য চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। গ্রীষ্মের আগমনে ক্যালোজ গলে যায়, তাই খাদ্য চলাচল বেড়ে যায়।

6.2.4 প্রস্বেদন (Transpiration)

পানি ছাড়া জীবন কল্পনা করা যায় না। উক্তির প্রধানত মূল দিয়ে তার প্রয়োজনীয় পানি শোষণ করে। শোষিত পানির অতি সামান্য অংশ উক্তিদের বিভিন্ন জৈবিক কার্যাবলির জন্য ব্যয় হয়। অবশিষ্ট পানি উক্তিদের বায়বীয় অংশ দিয়ে বাস্পাকারে বাইরে বের হয়ে যায়। সাধারণত স্থলজ উক্তি যে শারীরতত্ত্বীয় প্রক্রিয়া তার বায়বীয় অংশের মাধ্যমে বাস্পাকারে পানি বের করে দেয়, সেটাই প্রস্বেদন বা বাস্পমোচন প্রক্রিয়া। এ কাজটি তার বায়বীয় অংশের কোন অংশের মাধ্যমে ঘটে, তার ভিত্তিতে এদের তিনি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা: পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন, কিউটিকুলার প্রস্বেদন ও লেন্টিকুলার প্রস্বেদন।

(a) পত্রস্থীর অব্দেদন (Stomatal transpiration)

পাতায়, কচিকাণ্ডে, ফুলের বৃত্তি ও পাপড়িতে সূচি রক্ষিকোষ (Guard cell) বেষ্টিত এক ধরনের রক্ষ থাকে। এদেরকে পত্রস্থ (একবচন stoma, বহুবচন stomata) বলে। কোনো উদ্ভিদের মোট অব্দেদনের ৯০-৯৫% হয় পত্রস্থের মাধ্যমে।



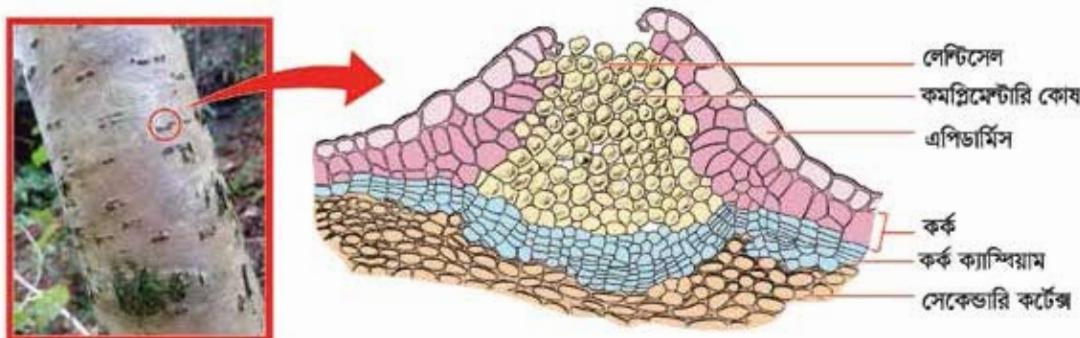
চিত্র ৬.০৩: একটি খেলা এবং
একটি বৃক্ষ পত্রস্থ

(b) কিউটিকুলার অব্দেদন (Cuticular transpiration)

উদ্ভিদের বাহ্যিকভাবে বিশেষ করে পাতার উপরে এবং
নিচে কিউটিনের আবরণ থাকে। এ আবরণকে কিউটিকুল বলে। কিউটিকুল জেড করে কিছু পানি
বাস্কাকারে বাইরে বেয়ে হয়। এ প্রক্রিয়াকে কিউটিকুলার অব্দেদন বলে।

(c) লেন্টিকুলার অব্দেদন (Lenticular transpiration):

উদ্ভিদে গৌণ বৃদ্ধি হলে কাণ্ডের বাকল ফেটে লেন্টিসেল নামক ছিদ্র সৃষ্টি হয়। লেন্টিসেলের ভিতরের
কোষগুলো আলাদাভাবে সঞ্চিত থাকে এবং এর মাধ্যমে কিছু পানি বাইরে বেরিয়ে যায়। একে লেন্টিকুলার
অব্দেদন বলে।



চিত্র ৬.০৪: একটি লেন্টিসেল

অব্দেদনের ফলে উদ্ভিদটি বাস্কাকারে অতিরিক্ত পানি মুছ করে আর এর ফলে সূর্ট টানে পানি শোষিত
হয়। এ অক্রিয়াটি অনেকগুলো প্রভাবকের উপর নির্ভরশীল। এদের মোটামুটিভাবে দুভাগে জাপ করা যায়,
বাস্তিক প্রত্যাবক ও অভ্যন্তরীণ প্রত্যাবক।

(a) বাহ্যিক প্রভাবক

(i) **তাপমাত্রা (Temperature):** তাপমাত্রার তারতম্যের সঙ্গে প্রস্বেদনের হারও ওঠা-নামা করে। অধিক তাপে পানি সহজেই বাষ্পে পরিণত হতে পারে বলে প্রস্বেদন প্রক্রিয়া ভুলান্তি হয়। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে বায়ুমণ্ডলের জলীয়বাক্ষ ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রস্বেদনের হারও দ্রুততর হয়। তাপমাত্রা কমে গেলে তাই স্বাভাবিক নিয়মেই প্রস্বেদনের হারও কমে যায়।

(ii) **আপেক্ষিক আর্দ্রতা (Relative humidity):** বায়ুতে জলীয়বাক্ষের পরিমাণ ও বায়ুর জলীয়বাক্ষ ধারণক্ষমতার আনুপাতিক হারকে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বলে। কোনো একটি এলাকার বায়ুমণ্ডলে অধিক জলীয়বাক্ষ থাকা সত্ত্বেও অধিক ধারণক্ষমতার জন্য তা শুক্র হতে পারে। আবার কম জলীয়বাক্ষ থাকা সত্ত্বেও বায়ুমণ্ডলের কম ধারণক্ষমতার জন্য এটি সিন্ত হতে পারে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম হলে বায়ু অসম্পূর্ণ থাকে ও জলীয়বাক্ষ গ্রহণ করতে পারে কিন্তু অধিক হলে বায়ু সম্পূর্ণ হওয়ার ফলে জলীয়বাক্ষ ধারণক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম থাকলে প্রস্বেদনের হার বেড়ে যায় এবং বেশি থাকলে হার কমে যায়।

(iii) **আলো (Light):** আলোর উপস্থিতিতে পত্ররন্ধ্র খুলে যায়, ফলে প্রস্বেদনের হার বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অন্ধকারে পত্ররন্ধ্র বন্ধ থাকায় এই প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। আলোর তারতম্যের জন্য পত্ররন্ধ্রের আকারেও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। ফলে প্রস্বেদনের হারও ওঠা-নামা করে। আলো উডিদেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধির মাধ্যমেও প্রস্বেদন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

(iv) **বায়ুপ্রবাহ (Wind):** প্রস্বেদনের ফলে উডিদের চারদিকের বায়ু সিন্ত হয়ে ওঠে, ফলে এই প্রক্রিয়ার হার কমতে থাকে। যখন বায়ুপ্রবাহ সম্পূর্ণ বায়ু দূরে সরিয়ে দেয় তখন এই হার আবার বৃদ্ধি পায়। বায়ুপ্রবাহের ফলে পত্রগুলো আন্দোলিত হয় এবং পত্ররন্ধ্রে চাপ পড়ে। ফলে অধিক হারে জলীয়বাক্ষ রন্ধ্রপথে বের হয়। এসব কারণে বায়ুপ্রবাহের তারতম্যে প্রস্বেদন হারেরও তারতম্য ঘটে। বায়ুচাপ বৃদ্ধিতে বাস্তীয়ভবন ক্রিয়া হ্রাস পায়, ফলে প্রস্বেদন কমে যায়। আবার বায়ুচাপ কমে গেলে বাস্তীয়ভবন প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পায় এবং প্রস্বেদনের হারও বেড়ে যায়।

(b) অভ্যন্তরীণ প্রভাবক

- পত্ররন্ধ্র:** পত্ররন্ধ্রের সংখ্যা, আয়তন, গঠন এবং অবস্থানের উপর প্রস্বেদন হারের তারতম্য ঘটে।
- পত্রের সংখ্যা:** পাতার সংখ্যা, আয়তন, গঠন এবং অবস্থানের উপর প্রস্বেদন হারের তারতম্য লক্ষ করা যায়।
- পত্রফলকের আয়তন:** পত্রফলকের আয়তন বড় হলে প্রস্বেদনের হার বেড়ে যায়। একইভাবে এ আয়তন কম হলে প্রস্বেদনের হারও কমে যায়।
- উডিদের বায়ব অঙ্গের আয়তন:** পাতা ও কাণ্ডসহ উডিদের বায়ব অঙ্গের কলেবের বৃদ্ধি পেলে প্রস্বেদনের হারও বেড়ে যায়।

এছাড়া কিউটিকলের উপস্থিতি, স্লিজি প্যারেনকাইমার পরিমাণ এন্টেদেন হাবের ভাগতম্য ঘটায়।



একক কাঞ্চ

কাঞ্চ: প্রশ্বেদন প্রক্রিয়ায় উডিন যে পানি বাষ্পাকারে বের করে দেয় তার পরীক্ষা।

উপকরণ: টবসহ একটি সতেজ উডিন, একটি কাচের বেলজার বা সেলোফেন ব্যাগ, সূতা বা ক্লিপ এবং পরিমাণযতো কিছু পানি।

পদ্ধতি: প্রথমেই টবসহ পাছটিকে টেবিলের উপর বসিয়ে দিতে হবে এবং টবে পরিমাণযতো পানি ঢেলে দিতে হবে। এবার কিছু পাতাসহ একটি শোধাকে সেলোফেন ব্যাগ দিয়ে মুক্ত সূতা দিয়ে বেঁধে বা ক্লিপ দিয়ে আটকে অথবা বেলজার দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। খেলাল রাখতে হবে যেন ক্ষিতিরের বাল্ক বের হতে বা বাইরের বাতাস ঢুকতে না পারে। এ অবশ্যই টবটি এক ঘণ্টা রেখে দিতে হবে।

পর্যবেক্ষণ: এক ঘণ্টা পর দেখা যাবে, সেলোফেন ব্যাগের ক্ষিতিরের পারে পানির কোটা জমে আছে এবং পুরো ব্যাগটি অব্যাহত হবে উঠেছে। কেন এমন হলো তা কি তোমরা বুঝতে পারছ?

সিদ্ধান্ত: যেহেতু সেলোফেন ব্যাগে অন্য কোনো পানি ঢেকার সুযোগ হিল না, তাই ঐ পানির কণাগুলো যে পাতা থেকেই বেরিবেছে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। এতে প্রমাণিত হলো যে উডিন তার বায়বীয় অঙ্গ দিয়ে পানি বাষ্পাকারে দেহের বাইরে বের করে দেয়।



চিত্র 6.05: প্রশ্বেদনের পরীক্ষা

সতর্কতা:

- টবের উডিনটি অবশ্যই সতেজ হতে হবে।
- সেলোফেন ব্যাগের মুখ ভালোভাবে বেঁধে বায়ুরোধী করতে হবে।

প্রশ্বেদন একটি অতি ধোজনীয় অবশ্য (Transpiration is a necessary evil)

প্রশ্বেদনের পুরুষ সকলকে বর্তমানে সকল বিজ্ঞানীই একমতে শোচেছেন বলে মনে করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় উপরে সজীব উডিন কোথের বিশাকীয় কার্যক্রম অনেকাংশে নির্ভরশীল। প্রশ্বেদনের ফলে

জাইলেমবাহিকায় টান পড়ে। এই টানের ফলে উড়িদের মূলরোম কর্তৃক শোষিত পানি এবং খনিজ লবণ পাতায় পরিবাহিত হয়। এ টানের ঘাটতি হলে পানি শোষণ করে যাবে এবং খাদ্য প্রস্তুতসহ অনেক বিপাকীয় কার্যক্রম শ্লথ হয়ে যাবে। প্রস্বেদনের ফলে পাতার মেসোফিলে ব্যাপন চাপ ঘাটতি সৃষ্টি হয়, যা পানি শোষণে সাহায্য করে। উড়িদ প্রস্বেদনের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত পত্রফলক দিয়ে শোষিত তাপশক্তি হ্রাস করে পাতার কোষগুলোর তাপমাত্রা সহনশীল পর্যায়ে রাখে।

অন্যদিকে, গুরুত্বপূর্ণ এই প্রক্রিয়াটি উড়িদের বহু ধরনের উপকার করলেও এর কিছু অপকারী ভূমিকাও রয়েছে। যেমন: পানি শোষণের চেয়ে প্রস্বেদনে পানি হারানোর হার বেশি হলে উড়িদের জন্য পানি এবং খনিজের ঘাটতি দেখা দিবে। এর ফলে উড়িদটির মৃত্যু হতে পারে। মাটিতে পানির ঘাটতি থাকলে শোষণ কম হবে কিন্তু প্রস্বেদন পূর্বের মতো চলতে থাকবে। এ অবস্থাকে ঠেকাতে প্রকৃতি শীত মৌসুমে বহু উড়িদের পাতা ঝরিয়ে দেয়। প্রস্বেদনের অভাবে প্রয়োজনীয় ব্যাপন চাপ ঘাটতি হবে না, ফলে অভিস্রবণ কম হবে।

এমতাবস্থায় বলা যায়, প্রস্বেদন কিছু ক্ষতিসাধন করলেও এই প্রক্রিয়া উড়িদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় একটি কার্যক্রম। বৈশিষ্ট্যের বৈপরীত্যের জন্য বিজ্ঞানী কার্টিস প্রস্বেদনকে ‘প্রয়োজনীয় ক্ষতি’ (Necessary Evil) নামে অভিহিত করেছেন। তবে সার্বিক বিচারে এটি উড়িদকে টিকে থাকার ক্ষেত্রে সুবিধা দেয় বলে এর অপকারী দিক থাকা সত্ত্বেও প্রস্বেদন প্রক্রিয়া বিবর্তিত হয়েছে।

৬.৩ মানবদেহে রক্ত সংবহন (Blood Circulation in human body)

রক্ত জীবনীশক্তির মূল। রক্তনালির মধ্য দিয়ে রক্ত দেহের সর্বত্র প্রবাহিত হয় এবং কোষে অক্সিজেন ও খাদ্য উপাদান সরবরাহ করে। ফলে দেহের সব কোষ সজীব এবং সক্রিয় থাকে। যে তত্ত্বের মাধ্যমে রক্ত প্রতিনিয়ত দেহের বিভিন্ন অঞ্চল ও অংশে চলাচল করে, তাকে রক্ত সংবহনতন্ত্র বলে। এ তত্ত্বে প্রবাহিত রক্তের মাধ্যমেই খাদ্য, অক্সিজেন এবং রক্তের বর্জ্য পদার্থ দেহের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবাহিত হয়।

মানবদেহে রক্তপ্রবাহ কেবল হৎপিণ্ড এবং রক্তনালিগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, কখনো এর বাইরে আসে না। এ ধরনের সংবহনতন্ত্রকে বন্ধ সংবহনতন্ত্র (Close circulatory system) বলা হয়। সারা দেহে রক্ত একবার সম্পূর্ণ পরিভ্রমণের জন্য মাত্র এক মিনিট বা তার চেয়েও কম সময় লাগে। বন্ধ সংবহনতন্ত্রের বড় সুবিধা হলো এ ব্যবস্থায়,

(a) রক্ত সরাসরি দেহের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছে।

(b) রক্তবাহী নালির ব্যাসের পরিবর্তনের মাধ্যমে দেহ কোনো বিশেষ অঞ্চলে রক্তপ্রবাহের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

(c) রক্ত বিভিন্ন অঙ্গে পরিসরণ করে মূল ফর্মেলাতে ফিরে আসে। অন্যান্য ভরের সূচনায় রক্ত সংবহনতন্ত্র বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হলেও এর গঠনশৈলী মোটামুটি সাধারণ।

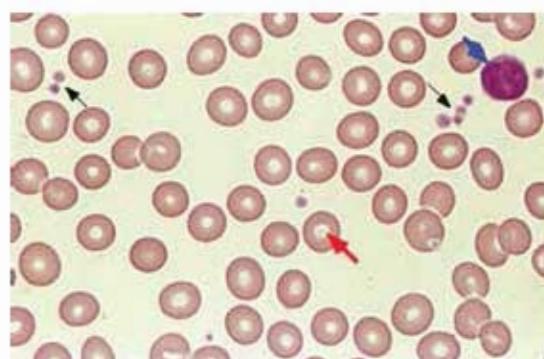
পরিবহনতন্ত্রকে সাধারণত দুটি অংশে ভাগ করা হয়, রক্ত সংবহনতন্ত্র (Blood circulatory system): ক্রতৃপিণ্ড, ধমনি, শিরা ও কৈশিকনালি নিয়ে গঠিত এবং জলিকাতন্ত্র (Lymphatic system): জলিকা, জলিকানালি ও জ্যাকটিনেলনালি নিয়ে গঠিত।

6.3.1 রক্ত (Blood)

রক্ত একটি অস্থায়, মুদু কারীয় এবং লবণ্যতন্ত্র ভরল পদার্থ। রক্ত ক্রতৃপিণ্ড, শিরা, উপশিরা, ধমনি, শাখা ধমনি এবং কৈশিকনালি পথে আবর্তিত হয়। সোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিন নামক রক্তজনক পদার্থ ধোকার কারণে রক্তের রং লাল দেখায়। হাতড়ের লাল অস্থিমজ্জাতে রক্তকণিকার জন্ম হয়।

রক্তের উপাদান

রক্ত এক ধরনের ভরল বোজক কলা। রক্তরস এবং কয়েক ধরনের রক্তকণিকার সমষ্টিয়ে রক্ত গঠিত।



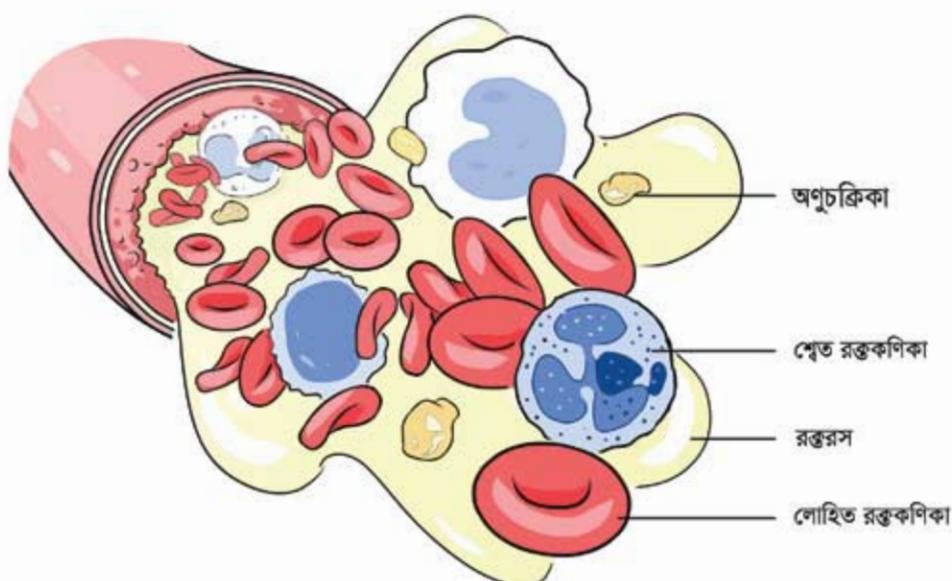
চিত্র 6.06: অধুনীকণ যত্নে দেখা রক্তের উপাদান।
সোহিত রক্তকণিকা, শেষ রক্তকণিকা ও অপুচক্রিকা
ব্যাকুলে লাল, নীল ও কালো রংজের পীর সিলে
নিরৈশিত

(a) রক্তরস (Plasma):

রক্তের বর্ষাইন ভরল অংশকে রক্তরস বলে। সাধারণত রক্তের শতকরা প্রায় 55 ভাগ রক্তরস। রক্তরসের অধিকাংশ পানি। এছাড়া বাকি অংশে কিছু প্রোটিন, জৈবযৌগ ও সামান্য অজৈব সবশ মৌলিক অবস্থায় থাকে। এর মধ্যে যে পদার্থগুলো থাকে তা হলো:

- (i) প্রোটিন, যারা অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন ও ফাইব্রিলোজেল
- (ii) ফ্লুকোজ
- (iii) সূরু সূরু চরিকণা
- (iv) খনিজ সবশ
- (v) সিটামিন
- (vi) হারমোন
- (vii) এন্টিবডি
- (viii) বর্জ্য পদার্থ ঘেমন: কার্বন ডাই-অক্সাইড, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড ইত্যাদি।

এছাড়া সামান্য পরিমাণে সোডিয়াম ক্রোরাইড, সোডিয়াম বাইকার্বোনেট ও অ্যামাইলো এসিড থাকে। আমরা খাদ্য হিসেবে যা প্রহ্ল করি তা পরিপাক হয়ে অহের পাত্রে শোষিত হয় এবং রক্তরসে ঘিশে



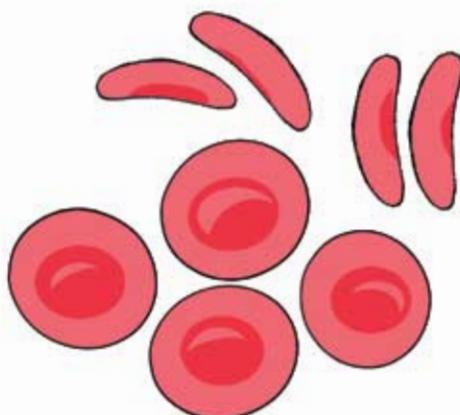
চিত্র 6.07: বিভিন্ন ধরনের রক্তকণিকা

দেহের সর্বত সঞ্চালিত হয়। এভাবে দেহকোষগুলো পুর্ণিম প্রয়োগ গ্রহণ করে দেহের পুর্ণিম সাধন এবং ক্ষমতাপূরণ করে।

(b) রক্তকণিকা (Blood corpuscles)

মানবদেহে তিনি ধরনের রক্তকণিকা দেখা যায়, লোহিত রক্তকণিকা (Red Blood Corpuscles), শ্বেত রক্তকণিকা (White Blood Corpuscles) এবং অণুচক্রিকা (Blood Platelets)। যদিও এগুলো সব কোষ, তবে রক্তের প্রাণমাত্র মধ্যে ভাসমান কোষের সাথে ফুলনা করে এসেরকে অনেক দিন আগে রক্তকণিকা নাম দেওয়া হয়েছিল, তখন অণুবীক্ষণ যজ্ঞ এখনকার মতো উপর ছিল না। সেই নাম এখনও প্রচলিত।

(i) **লোহিত রক্তকণিকা:** মানবদেহে তিনি ধরনের রক্তকণিকার মধ্যে লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এটি শ্বাসকার্যে অঙ্গীজেন পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লাল অস্থিমজ্জায় লোহিত রক্তকণিকা তৈরি হয়। এর পক্ষ আয় 120 দিন। মানুষের লোহিত রক্তকণিকার নিউক্লিয়াস থাকে না এবং দেখতে অনেকটা বি-অবঙ্গ বৃক্ষের মতো। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির রক্তে লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা প্রতি কিটোবিক মিলিলিটারে প্রায় 50 লক্ষ।



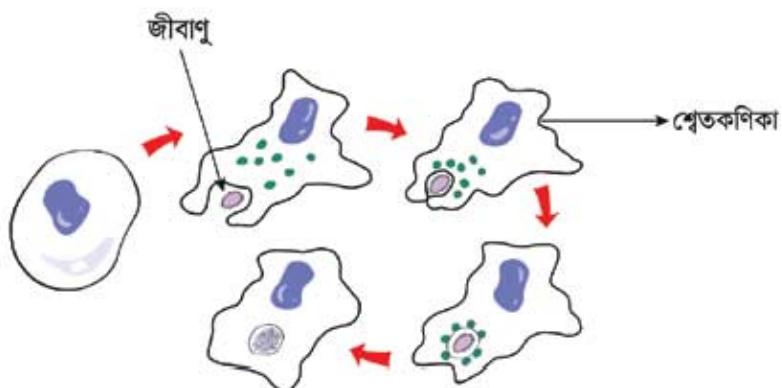
চিত্র 6.08: লোহিত রক্তকণিকা

এটি খেত রক্তকণিকার চেয়ে প্রায় 500 গুণ বেশি। পুরুষের ফ্লুনায় নারীদের রক্তে সোহিত রক্তকণিকা কম থাকে। ফ্লুনামূলকভাবে শিশুদের দেহে সোহিত রক্তকণিকার পরিমাণ বেশি থাকে। আমাদের জীবনের প্রতি যুদ্ধের সোহিত রক্তকণিকা ধৰ্মস হয়, আবার সমশ্পরিমাণে তৈরিও হয়। সোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিন অঙ্গীহিমোগ্লোবিন হিসেবে অঙ্গীজেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবহন করে।

হিমোগ্লোবিন: হিমোগ্লোবিন এক ধরনের রক্তকণিকায় এর উপস্থিতির কারণে রক্ত লাল দেখায়। রক্তে প্রয়োজনীয় পরিমাণ হিমোগ্লোবিন না থাকলে রক্তবল্পতা বা রক্তশূন্যতা (anemia) দেখা দেয়। বাংলাদেশের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জনসংঘী এ রোগে আক্রান্ত।

(ii) খেত রক্তকণিকা বা মালোসাইট

খেতকণিকার নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই। এগুলো হিমোগ্লোবিনবিহীন এবং নিউক্লিয়াসফুল বড় আকারের কোষ। খেত কণিকার গড় আবু ১-১৫ মিম। হিমোগ্লোবিন না থাকার কারণে এদের খেত রক্তকণিকা, ইংরেজিতে White Blood Cell বা WBC বলে। খেত কণিকার সংখ্যা RBC-এর ফ্লুনায় অনেক কম। এরা আয়িবার মতো দেহের আকারের পরিবর্তন করে। মালোসাইটেসিস প্রক্রিয়ার এটি জীবাণুকে ধৰ্মস করে।

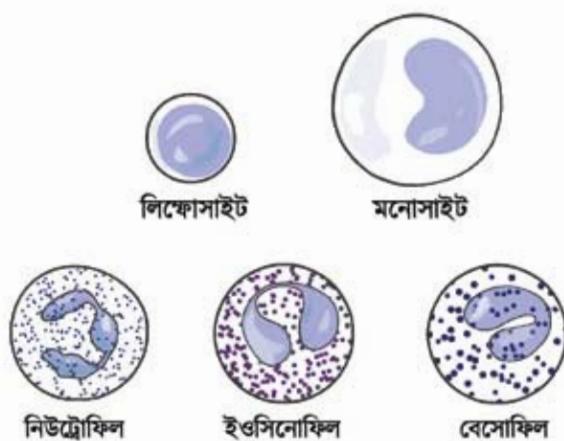


চিত্র ৬.০৭: খেত কণিকা মালোসাইটেসিস প্রক্রিয়ার জীবাণুকে ধৰ্মস করে থাকে

খেত কণিকাগুলো রক্তরসের মধ্যে নিমজ্জন করতে পারে। রক্ত আলিকার প্রাচীর ক্ষেত্রে চিস্ত করে চিস্তুর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। দেহ বাইরের জীবাণু ধারা আক্রান্ত হলে, দুটি খেত কণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। মানবদেহে প্রতি ঘনমিলিমিটার রক্তে ৪-১০ হাজার খেত রক্তকণিকা থাকে। অসুস্থ মানবদেহে এর সংখ্যা বেড়ে যায়। স্তন্যপায়ীদের রক্তকোষগুলোর মধ্যে শুধু খেত রক্তকণিকার DNA থাকে।

অকারকেস: গঠনগতভাবে এবং সাইটোপ্লাজমে দানার উপস্থিতি বা অনুস্থিতি অনুসারে খেত কণিকাকে অধিকার দৃষ্টান্তে ভাগ করা যায়, যথা (ক) অ্যান্থোসাইট বা দানাবিহীন এবং (খ) আনুসাইট বা দানাসূচৃ।

(ক) অ্যাঞ্চানুলোসাইট : এ ধরনের শ্বেত কণিকার সাইটোপ্লাজম দানাহীন ও স্বচ্ছ। অ্যাঞ্চানুলোসাইট শ্বেত কণিকা দুরক্ষয়ের; যথা- লিম্ফোসাইট ও মনোসাইট। দেহের লিম্ফনোড, টনসিল, প্লিয় ইত্যাদি অংশে এরা তৈরি হয়। লিম্ফোসাইটগুলো বড় নিউক্লিয়াসযুক্ত হোট কণিকা। মনোসাইট হোট, ডিষ্টাকার ও বৃক্কাকার নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট বড় কণিকা। লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি গঠন করে এবং এই অ্যান্টিবডির সাহা দেহে প্রবেশ করা রোগজীবাণু খুস্ত করে। এভাবে দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। মনোসাইট ফ্যালোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় রোগজীবাণুকে খুস্ত করে।



চিত্র ৬.১০: বিভিন্ন ধরার শ্বেত কণিকা

(খ) থানুলোসাইট : এদের সাইটোপ্লাজম সূচৰ দানাহুক্ত। থানুলোসাইট শ্বেত কণিকাগুলো নিউক্লিয়াসের আকৃতির ভিত্তিতে তিন ধরার যথা: নিউট্রোফিল, ইওসিনোফিল এবং বেসোফিল।

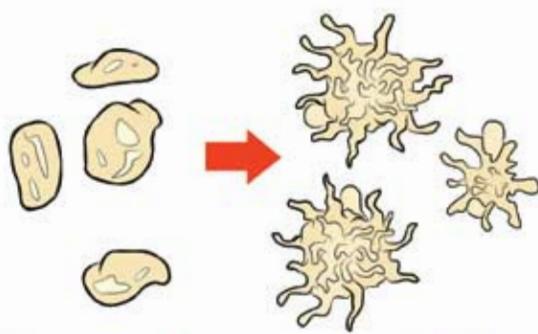
নিউট্রোফিল ফ্যালোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ভক্ষণ করে। ইওসিনোফিল ও বেসোফিল হিস্টামিন নামক রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত করে দেহে এলার্জি প্রতিরোধ করে। বেসোফিল হেপারিন নিঃসৃত করে রক্তকে রক্তবাহিকার ভিতরে জমাট বৌঢ়তে বাধা দেয়।

(ঢ) অপুচক্রিকা বা প্লেটেলেট

ইংরেজিতে এদেরকে প্লেইটেলেট (Platelet) বলে। এগুলো গোলাকার, ডিষ্টাকার অথবা রড আকারের হতে পারে। এদের সাইটোপ্লাজম দানাদার এবং সাইটোপ্লাজমে কোষ অভাণু- সাইটোকলিয়া, গল্পি বস্তু থাকে; কিন্তু নিউক্লিয়াস থাকে না। অনেকের মতে, অপুচক্রিকাগুলো সক্রূং কোষ নয়; এগুলো অস্থি মস্তকার বৃহদাকার কোষের ছিল অংশ।

অপুচক্রিকাগুলোর গড় আয়ু ৫-১০ দিন। পরিপূর্ণ মানবদেহে প্রতি ঘনমিলিমিটার রক্তে অপুচক্রিকার সংখ্যা আয়ু আড়াই লাখ। অসুস্থ দেহে এদের সংখ্যা আরও বেশি হয়।

অপুচক্রিকার অধান কাজ হলো রক্ত তক্ষন করা বা জমাট বোঝানোতে (blood clotting) সাহায্য করা। যখন কোনো রক্তবাহিকা বা কোনো টিসু



চিত্র ৬.১১: অপুচক্রিকা এবং তার আকার পরিবর্তন।

আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে কেটে থার, তখন সেবানকার অগুচক্রিকাগুলো সক্রিয় হয়ে উঠে অনিয়মিত আকার ধারণ করে এবং থ্রোপ্লাস্টিন (Thromboplastin) নামক পদার্থ তৈরি করে। এ পদার্থগুলো রক্তের প্রোটিন প্রোস্ট্যুলিনকে প্রমুখিতে পরিষ্ঠিত করে। প্রমুখ পরিষ্ঠী সময়ে রক্তসের প্রোটিন- ফাইব্রিলোজেনকে ফাইব্রিন জালকে পরিষ্ঠিত করে রক্তকে জমাট বাধায় কিংবা রাজ্ঞের তক্ষন ঘটায়। ফাইব্রিন একধরনের অস্বচ্ছীয় প্রোটিন, যা শুরু সূতার মতো জালিকা প্রস্তুত করে। এটি ক্ষত স্থানে জমাট বাধে এবং রক্তক্ষণ বন্ধ করে। তবে রক্ত তক্ষন প্রক্রিয়াটি আরও জটিল, এ প্রক্রিয়ায় জন্য আরও বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ এবং স্টিটামিন K ও ক্যালসিয়াম আয়ন জড়িত থাকে।

যদেও উপর্যুক্ত পরিমাপ অগুচক্রিকা না থাকলে রক্তপাত সহজে বন্ধ হয় না। কলে অনেক সময় মৌলীর প্রাপ্তনাশের আশঙ্কা থাকে।



একক কাজ

কাজ: নিচের ছক্টি খাতায় আঁক ও পূরণ কর।

লোহিত ও শ্বেত রক্তক্ষিকা মধ্যে পার্থক্য :

বৈশিষ্ট্য	লোহিত রক্তক্ষিকা	শ্বেত রক্তক্ষিকা
(a) নিউক্লিয়াস		
(b) আকার		
(c) হিমোগ্লোবিন		
(d) সংখ্যা		
(e) কাজ		

রক্তের কাজ

রক্ত দেহের পুরুষপূর্ণ উপাদান। এটি দেহের নানাবিধ কাজ করে, যেমন:

- (a) অক্সিজেন পরিবহন: লোহিত রক্তক্ষিকা অক্সিহিমোগ্লোবিনরূপে কোষে অক্সিজেন পরিবহন করে।
- (b) কার্বন ডাই-অক্সাইড অপসারণ: রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে কোষগুলোতে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়, রক্তরস সোডিয়াম বাই কার্বনেটরূপে তা সংগ্রহ করে নিয়ে আসে এবং নিয়ন্ত্রণ বাধুর সাথে ফুসফুলের সাহায্যে দেহের বাইরে বের করে দেয়।
- (c) খাদ্যসার পরিবহন: রক্তরস শুকোজ, অ্যামাইনো এসিড, চার্বিকলা ইত্যাদি কোষে সরবরাহ করে।

- (d) তাপের সমতা রক্ষা: দেহের মধ্যে অনবরত দহনক্রিয়া সম্পাদিত হচ্ছে। এতে করে বিভিন্ন অঙ্গে বিভিন্ন মাত্রার তাপ সৃষ্টি হয় এবং তা রক্তের মাধ্যমে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে দেহের সর্বত্র তাপের সমতা রক্ষা হয়।
- (e) বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন: রক্ত দেহের জন্য ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থ বহন করে এবং বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে সেসব ইউরিয়া, ইউরিক এসিড ও কার্বন ডাই-অক্সাইড হিসেবে নিষ্কাশন করে।
- (f) হরমোন পরিবহন: হরমোন নালিবিহীন প্রমিতে তৈরি এক ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ বা রস। এই রস সরাসরি রক্তে মিশে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন অঙ্গে সপ্তগ্রালিত হয় এবং বিভিন্ন জৈবিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- (g) রোগ প্রতিরোধ: কয়েক প্রকারের শ্বেত রক্তকণিকা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় দেহকে জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। অ্যান্টিবডি ও অ্যান্টিজেন উৎপাদনের মাধ্যমে রক্ত দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- (h) রক্ত জমাট বাঁধা: দেহের কোনো অংশ কেটে গেলে অগুচ্ছিকা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে এবং দেহের রক্তক্ষণ বন্ধ করে।

6.3.2 ব্লাড গ্রুপ বা রক্তের গ্রুপ

একজন আশঙ্কাজনক বা মুমুর্শু রোগীর জন্য রক্তের প্রয়োজন, তার রক্তের গ্রুপ ‘বি’ পজিটিভ। তোমরা এ রকম বিজ্ঞাপন প্রায়শই টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে পাও। রক্তের গ্রুপ বা ব্লাড গ্রুপ কী? কেনইবা ব্লাড গ্রুপ জানা প্রয়োজন? অসংখ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গবেষণার মাধ্যমে দেখা গেছে যে বিভিন্ন ব্যক্তির লোহিত রক্ত কণিকায় A এবং B নামক দুই ধরনের অ্যান্টিজেন (antigens) থাকে এবং রক্তরসে a ও b দুধরনের অ্যান্টিবডি (antibody) থাকে। এই অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবডির উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে মানুষের রক্তকে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করা যায়। একে ব্লাড গ্রুপ বলে। বিজ্ঞানী কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার 1901 সালে মানুষের রক্তের শ্রেণিবিন্যাস করে তা A, B, AB এবং O— এ চারটি গ্রুপের নামকরণ করেন। সাধারণত একজন মানুষের রক্তের গ্রুপ আজীবন একই রকম থাকে।

নিচের সারণিতে রক্তের গ্রুপের অ্যান্টিবডি এবং অ্যান্টিজেনের উপস্থিতি দেখানো হলো:

রক্তের গ্রুপ	অ্যান্টিজেন (লোহিত রক্তকণিকায়)	অ্যান্টিবডি (রক্তরসে)
A	A	b
B	B	a
AB	A, B	নেই
O	নেই	a, b

আমরা উপরের সারণিতে রক্ত বিভিন্ন অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবডির উপস্থিতি দেখেছি। এর ভিত্তিতে আমরা ক্লান্ত শুগেকে এভাবে বর্ণনা করতে পারি। যেমন:

শ্রুপ A: এ প্রেপির রক্তে A অ্যান্টিজেন ও b অ্যান্টিবডি থাকে।

শ্রুপ B: এ প্রেপির রক্তে B অ্যান্টিজেন ও a অ্যান্টিবডি থাকে।

শ্রুপ AB: এই প্রেপির রক্তে A ও B অ্যান্টিজেন থাকে এবং কোনো অ্যান্টিবডি থাকে না।

শ্রুপ O: এ প্রেপির রক্তে কোনো অ্যান্টিজেন থাকে না কিন্তু a ও b অ্যান্টিবডি থাকে।

দাতার লোহিত কপিকা বা কোষের কোষবিজ্ঞিতে উপস্থিত অ্যান্টিজেন যদি প্রাচীতার রক্তসঙ্গে উপস্থিত এমন অ্যান্টিবডির সংস্পর্শে আসে, যা উক্ত অ্যান্টিজেনের সাথে বিক্রিয়া করতে সক্ষম তাহলে, অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি বিক্রিয়া হবে এইটা বা রোগীর জীবন বিপন্ন হতে পারে। এজন্য সব শুগের রক্ত সবাইকে দেওয়া যাবে না। যেমন: তোমার রক্তের শুগ যদি হয় A (অর্ধাং লোহিত কপিকার বিজ্ঞিতে A অ্যান্টিজেন আছে) এবং তোমার বন্ধুর রক্তের শুগ যদি B হয় (অর্ধাং রক্তসঙ্গে B অ্যান্টিবডি আছে) তাহলে তুমি তোমার বন্ধুকে রক্ত দিতে পারবে না। যদি দাতা তাহলে তোমার A অ্যান্টিজেন তোমার বন্ধুর a অ্যান্টিবডির সাথে বিক্রিয়া করে বন্ধুকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে। তাই দাতার রক্ত যে অ্যান্টিজেনের থাকে তার সাথে মিলিয়ে ঘননভাবে প্রাচীতা নির্বাচন করতে হয় বেন তার রক্ত দাতার অ্যান্টিজেনের সাথে সঙ্কৰিত অ্যান্টিবডিটি না থাকে। এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে কোন শুগ কাকে রক্ত দিতে পারবে বা পারবে না, তার একটা ছক বানানো যাব।

দাতা									
শ্রুপ	O-	O+	B-	B+	A-	A+	AB-	AB+	
AB+									
AB-									
A+									
A-									
B+									
B-									
O+									
O-									

চিত্র 6.12: কোন শুগের রক্ত কাকে দেওয়া যাবে তার ছক

সারণি: ABO পদ্ধতিতে মানুষের রক্তের গ্রুপ অনুযায়ী দাতা ও গ্রহীতার তালিকা

রক্তের গ্রুপ	যে গ্রুপকে রক্ত দান করতে পারে	যে গ্রুপ থেকে রক্ত গ্রহণ করতে পারে
A	A, AB	A, O
B	B, AB	B, O
AB	AB	A, B, AB, O
O	A, B, AB, O	O

উপরের সারণি লক্ষ করলে দেখতে পারবে O গ্রুপের রক্তবিশিষ্ট ব্যক্তি সব গ্রুপের রক্তের ব্যক্তিকে রক্ত দিতে পারে। এদের বলা হয় সর্বজনীন রক্তদাতা (universal donor)। AB রক্তধারী ব্যক্তি যেকোনো ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ করতে পারে। তাই তাকে সর্বজনীন রক্তগ্রহীতা (universal recipient) বলা হয়।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে সর্বজনীন রক্তদাতা কিংবা সর্বজনীন রক্তগ্রহীতার ধারণা খুব একটা প্রযোজ্য নয়। কেননা, রক্তকে অ্যান্টিজেনের ভিত্তিতে শ্রেণিকরণ করার ক্ষেত্রে ABO পদ্ধতি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলেও রক্তে আরও অসংখ্য অ্যান্টিজেন থাকে, যেগুলো ক্ষেত্রবিশেষে অসুবিধার কারণ হতে পারে। যেমন: রেসাস (Rh) ফ্যাস্টের, যা এক ধরনের অ্যান্টিজেন। কারো রক্তে এই ফ্যাস্টের উপস্থিত থাকলে তাকে বলে পজিটিভ আর না থাকলে বলে নেগেটিভ। এটি যদি না মেলে তাহলেও গ্রহীতা বা রোগী আরও অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। তাই ABO গ্রুপের পাশাপাশি রেসাস ফ্যাস্টেরও পরীক্ষা করে মিলিয়ে দেখা চাই। অর্থাৎ রেসাস ফ্যাস্টেরকে বিবেচনায় নেওয়া হলে রক্তের গুণগুলো হবে A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+ এবং O-। নেগেটিভ গ্রুপের রক্ত যেহেতু রেসাস ফ্যাস্টের অ্যান্টিজেন নেই, তাই এটি পজিটিভ গ্রুপকে দেওয়া যাবে কিন্তু পজিটিভ গ্রুপের রক্ত নেগেটিভ গ্রুপকে দেওয়া যাবে না।

রক্তদান ও সামাজিক দায়বদ্ধতা

আঘাত, দুর্ঘটনা, শল্যচিকিৎসা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোনো কারণে অত্যধিক রক্তক্ষরণ হলে দেহে রক্তের পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে কমে যায়। রক্তশূন্যতা দূর করার জন্য এই ব্যক্তির দেহে রক্ত পরিসঞ্চালনের প্রয়োজন হয়। জরুরি ভিত্তিতে এই রক্তশূন্যতা দূর করার জন্য রোগীর দেহে অন্য মানুষের রক্ত দিতে হয়। অন্যকে রক্তদান করা বর্তমানে একটি সাধারণ ঘটনা। জরুরি অবস্থায় অন্য ব্যক্তির রক্ত সরাসরি বা ব্লাড ব্যাংকের মাধ্যমে সংগ্রহ করা রক্ত রোগীর দেহে প্রবেশ করানো হয়। কোনো ব্যক্তির শিরার মধ্য দিয়ে বাইরে থেকে অন্যের রক্ত প্রবেশ করানোর প্রক্রিয়াকে রক্ত সঞ্চালন (Blood transfusion) বলে। এটি একটি চমৎকার ফলপ্রদ ব্যবস্থা, যার ফলে রোগীর প্রাণ রক্ষা হয়। তবে কোনো অবস্থাতেই রোগীর রক্তের গ্রুপ ও প্রকৃতি পরীক্ষা না করে এক রোগীর দেহে অন্য কোনো ব্যক্তির বা ব্লাড ব্যাংকে রক্ষিত রক্ত প্রবেশ করানো উচিত নয়। ব্যতিক্রম হলে নানা জটিলতা সৃষ্টি হয়ে রোগীর জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা অনেকাংশে বেড়ে যায়। যেমন: রক্তকণিকাগুলোর জমাট বাঁধা, বিশ্লিষ্ট হওয়া, জন্সের প্রাদুর্ভাব এবং প্রস্তাবের সাথে হিমোলোবিন নির্গত হওয়া ইত্যাদি।

আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনায় আহতদের জন্য জরুরি ভিত্তিতে রক্তের প্রয়োজন হয়। মনে রাখতে হবে, এটি আমাদের সবার জন্য একটি সামাজিক দায়বদ্ধতা। যেহেতু রক্তের কোনো বিকল্প নেই, তাই এরূপ অবস্থায় অনেক সময় প্রচুর রক্তের প্রয়োজন হয় এবং অন্যের কাছ থেকে রক্ত সংগ্রহ করে এই জরুরি অবস্থা মোকাবেলা করতে হয়। এরূপ জরুরি পরিস্থিতিতে জনগণের সহযোগিতা প্রয়োজন হয়।

অন্যকে রক্তদান করা একটি মহৎ কাজ। এতে রক্তদাতার নিজের কোনো ক্ষতি হয় না। একজন সুস্থ মানুষের দেহ থেকে 450 মিলি রক্ত বের করে দিলে তেমন কোনো অসুবিধা হয় না। তার দেহ প্রতি সেকেন্ডে প্রায় 20 লক্ষ লোহিত রক্তকণিকা সৃষ্টি করতে পারে। দেখা গেছে, কোনো সুস্থ ব্যক্তি চার মাস পর পর রক্তদান করলে দাতার দেহে সামান্যতম কোনো অসুবিধা হয় না।

বর্তমানে রক্তদানে উদ্বৃদ্ধকরণে নানা রকম কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। যেমন: কোনো বিশেষ দিবসে বা বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানে রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন। এতে জনসাধারণের মাঝে রক্তদান সম্পর্কে ভান্ত ধারণা ও ভীতি অনেকাংশে হ্রাস পাচ্ছে। অতীতের তুলনায় মানুষ এখন রক্তদান এবং গ্রহণ সম্পর্কে অধিক আগ্রহী ও সচেতন।

6.4 হৎপিণ্ডের গঠন ও কাজ

6.4.1 হৎপিণ্ডের গঠন

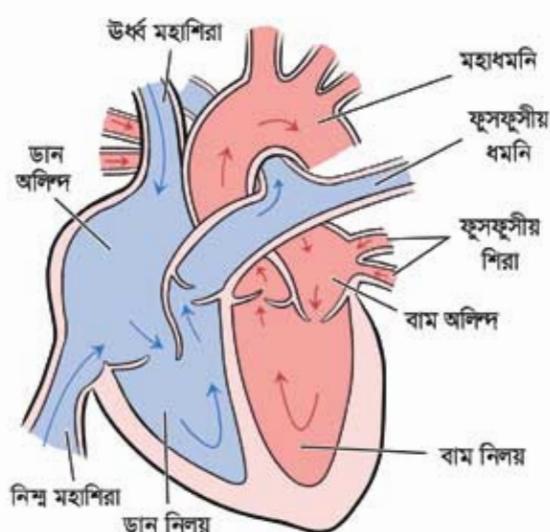
হৎপিণ্ড বক্ষ গহ্বরের বাম দিকে দুই ফুসফুসের মাঝখানে অবস্থিত একটি ত্রিকোণাকার ফাঁপা অঞ্চ। এটি হৎপেশি নামক এক বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি দিয়ে গঠিত। হৎপিণ্ড পেরিকার্ডিয়াম নামক পাতলা পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে। হৎপিণ্ড-প্রাচীরে থাকে তিনটি স্তর, বহিঃস্তর বা এপিকার্ডিয়াম, মধ্যস্তর বা মায়োকার্ডিয়াম এবং অন্তঃস্তর বা এন্ডোকার্ডিয়াম।

বহিঃস্তর (Epicardium): এটি মূলত যোজক কলা নিয়ে গঠিত। এই স্তরটিতে বিক্ষিপ্তভাবে চর্বি থাকে এবং এটি আবরণী কলা দিয়ে আবৃত।

মধ্যস্তর (Myocardium): এটি বহিঃস্তর এবং অন্তঃস্তরের মাঝখানে অবস্থান করে। দৃঢ় অনৈচ্ছিক পেশি দিয়ে এ স্তর গঠিত।

অন্তঃস্তর (Endocardium): এটি সবচেয়ে ভিতরের স্তর। হৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠগুলো অন্তঃস্তর দিয়ে আবৃত। এই স্তরটি হৎপিণ্ডের কপাটিকাগুলোকেও আবৃত করে রাখে। হৎপিণ্ডের ভিতরের স্তর ফাঁপা এবং চারাটি প্রকোষ্ঠে বিস্তৃত। উপরের প্রকোষ্ঠ দুটি নিচের দুটির চেয়ে আকারে ছোট। উপরের প্রকোষ্ঠ দুটিকে ডান এবং বাম অলিন্ড (right & left atrium) বলে এবং নিচের প্রকোষ্ঠ দুটিকে ডান এবং বাম নিলয় (right & left ventricle) বলে। অলিন্ড দুটির প্রাচীর তুলনামূলকভাবে পাতলা, আর নিলয়ের প্রাচীর পুরু। অলিন্ড এবং নিলয় যথাক্রমে আন্তঃঅলিন্ড পর্দা এবং আন্তঃনিলয় পর্দা দিয়ে পরস্পর পৃথক থাকে।

হৃৎপিণ্ডের উভয় অঙ্গিস এবং নিলয়ের মাঝে
যে ছিপথ আছে, তা খোলা বা বন্ধ করার
জন্য ভালত (valve) বা কপাটিকা থাকে। ডান
অঙ্গিস এবং ডান নিলয়ের মধ্যবর্তী ছিপথ তিনি
পাইলাবিশিষ্ট ট্রাইকাসপিড ভালত দিয়ে সুরক্ষিত।
একইভাবে বাম অঙ্গিস এবং বাম নিলয় দুই
পাইলাবিশিষ্ট বাইকাসপিড ভালত (মাইট্রিল ভালত
নামেও পরিচিত) দিয়ে সুরক্ষিত থাকে। মহাধমনি
ও ফুসফুসীয় ধমনির মুখে অর্থচক্রাকার কপাটিকা
থাকে। এদের অবস্থানের ফলে পাইল করা রক্ত
একই দিকে চলে এবং এক কোটি রক্তও উল্টো
দিকে কিরে আসতে পারে না।



চিত্র ৬.১৩: মানব হৃৎপিণ্ড

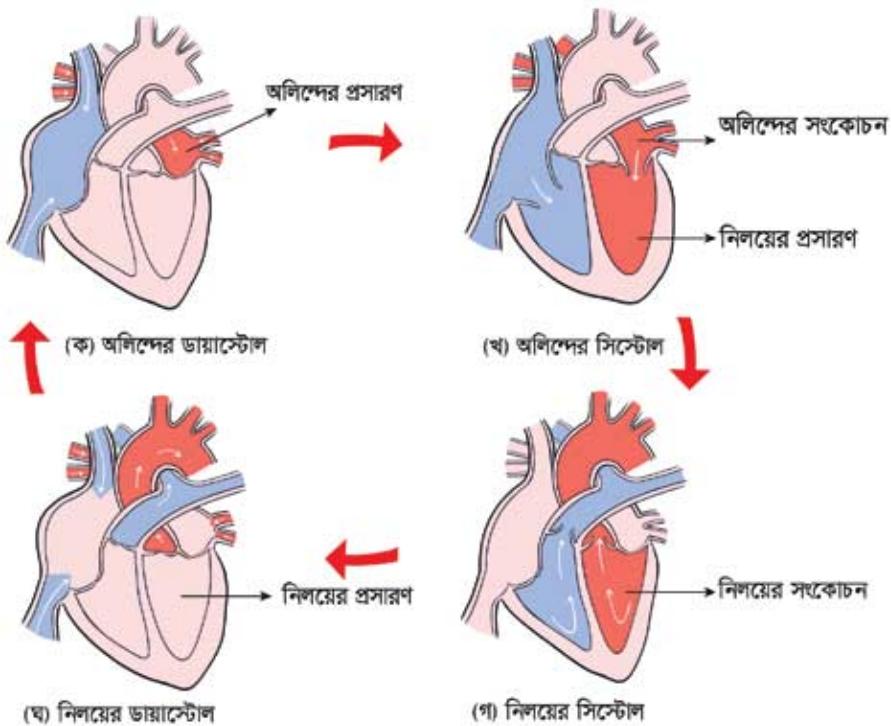
৬.৪.২ হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্ত সংকালন পদ্ধতি

আমরা আগেই জেনেছি যে হৃৎপিণ্ড একটি পাইলের মতো কাজ করে। হৃৎপিণ্ডের সংকোচন এবং
শ্রসারণ দিয়ে এ কাজ সম্পন্ন হয়। হৃৎপিণ্ডের অবিনাশ সংকোচন এবং শ্রসারণের মাধ্যমে সারা দেহে
রক্ত সংবহন পদ্ধতি অব্যাহত থাকে। হৃৎপিণ্ডের সংকোচনকে বলা হয় সিস্টোল এবং শ্রসারণকে বলা
হয় ডায়াস্টোল। হৃৎপিণ্ডের একবার সিস্টোল-ডায়াস্টোলকে একজো হৃৎসন্দন (heart beat) বলে।

অঙ্গিস দুটি প্রসারিত হলে শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে। উর্ধ্ব মহাশিলার
তিতর দিয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড সূত্র রক্ত ডান অঙ্গিসে প্রবেশ করে। ফুসফুসীয় বা পাইলোনারি শিরার
তিতর দিয়ে অক্সিজেন সূত্র রক্ত বাম অঙ্গিসে প্রবেশ করে।

অঙ্গিস দুটির সংকোচন হলে নিলয় দুটির পেশি প্রসারিত হয়। তখন ডান অঙ্গিস-নিলয়ের ছিপথের
ট্রাইকাসপিড ভালত খুলে আৱ এবং ডান অঙ্গিস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড সূত্র রক্ত ডান নিলয়ে প্রবেশ
করে। ঠিক এই সময়ে বাম অঙ্গিস এবং বাম নিলয়ের বাইকাসপিড ভালত খুলে আৱ তখন বাম অঙ্গিস
থেকে অক্সিজেন সূত্র রক্ত বাম নিলয়ে প্রবেশ করে। এর পরপরই ছিপগুলো কপাটিকা দিয়ে বন্ধ হয়ে
যায়। এর ফলে নিলয় থেকে রক্ত আৱ অঙ্গিসে প্রবেশ করতে পারে না।

বন্ধন নিলয় দুটি সংকুচিত হয়, তখন ডান নিলয় থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইডসূত্র রক্ত ফুসফুসীয় ধমনির
মাধ্যমে ফুসফুসে প্রবেশ করে। এখানে রক্ত পরিশেষিত হয়। ঠিক একই সময়ে বাম নিলয় থেকে
অক্সিজেনসূত্র রক্ত মহাধমনির মাধ্যমে সারা দেহে পরিবাহিত হয় এবং উভয় ধমনির অর্থচক্রাকৃতির
কপাটিকাগুলো বন্ধ হয়ে যায়। ফলে রক্ত পুনরাবৃত্তি নিলয়ে কিরে আসতে পারে না। এভাবে হৃৎপিণ্ড



চিত্র ৬.১৪ : হৃৎপিণ্ডের অন্তর্গত ও রক্ত সংকালন পদ্ধতি

পর্যাপ্তকার্যকলা সংকোচন এবং প্রসারণের ফলে রক্ত সংকালন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে।

হৃৎপিণ্ডের কাজ: রক্ত সংবেহন তত্ত্বের প্রধান অঙ্গ হৃৎপিণ্ড। এর সাহায্যেই সংবেহনতত্ত্বের রক্তপ্রবাহ সচল থাকে। হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠগুলো সম্পূর্ণ বিস্তৃত থাকার এখানে অক্সিজেনমূল্ক ও অক্সিজেনবিহীন রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে না।

৬.৪.৩ রক্তবাহিকা (Blood Vessel)

বেসর নালির ডিয়ে রক্ত প্রবাহিত বা সংকালিত হয়, তাকে রক্তনালি বা রক্তবাহিকা বলে। এসব নালিগুলো হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে রক্ত বাহিত হয় এবং দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে পুনরাবৃত্তি হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। পর্তন, আকৃতি এবং কাজের ভিত্তিতে রক্তবাহিকা বা রক্তনালি তিন ধরনের—
ধমনি, শিরা এবং কৈশিক জালিকা।

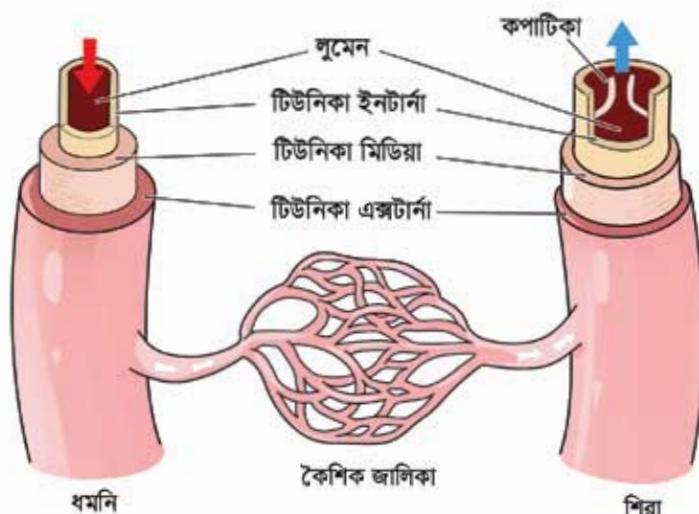
(a) ধমনি (Artery)

বেসর রক্তনালির মাঝামে সাধারণত অক্সিজেনসমূহ রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে সামাদেহে বাহিত হয় তাকে ধমনি বলে। ফুসফুসীয় ধমনি এর ব্যাতিক্রম। এই ব্যাতিক্রমধর্মী ধমনি হৃৎপিণ্ড থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইডসুত
রক্ত ফুসফুসে পৌছে দেয়।

ধমনির প্রাচীর তিন স্তরবিশিষ্ট, যথা-

- (i) টিউনিকা এক্সটের্না (Tunica externa): এটি তন্তুময় ঘোজক কলা দিয়ে তৈরি বাইরের স্তর।
- (ii) টিউনিকা মিডিয়া (Tunica media): এটি বৃত্তাকার অণৈজিক পোশি দিয়ে তৈরি মাঝের স্তর।
- (iii) টিউনিকা ইন্টার্না (Tunica interna): এটি সরল আবরণী কলা দিয়ে তৈরি ভিতরের স্তর।

ধমনির প্রাচীর পুরু ও স্থিতিস্থাপক। ধমনিতে কপাটিকা থাকে না, এর নালিপথ স্বচ্ছ। হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক সংকোচনের ফলে দেহে ছোট-বড় সব ধমনিতে রক্ত তরঙ্গের ঘটো প্রবাহিত হয়। এতে ধমনিগত সংকুচিত বা প্রসারিত হয়। ধমনির এই স্বীকৃতি এবং সংকোচনকে নাড়িপ্লনন বলে। ধমনির ভিতর রক্তপ্রবাহ, ধমনিগতের সংকোচন, প্রসারণ এবং স্থিতিস্থাপকভা নাড়িপ্লননের প্রধান কারণ। হাতের কজির ধমনির উপর হাত গেছে নাড়িপ্লনন অনুভব করা যায়।



চিত্র ৬.১৫: বিভিন্ন ধরনের রক্ত বাহিকা

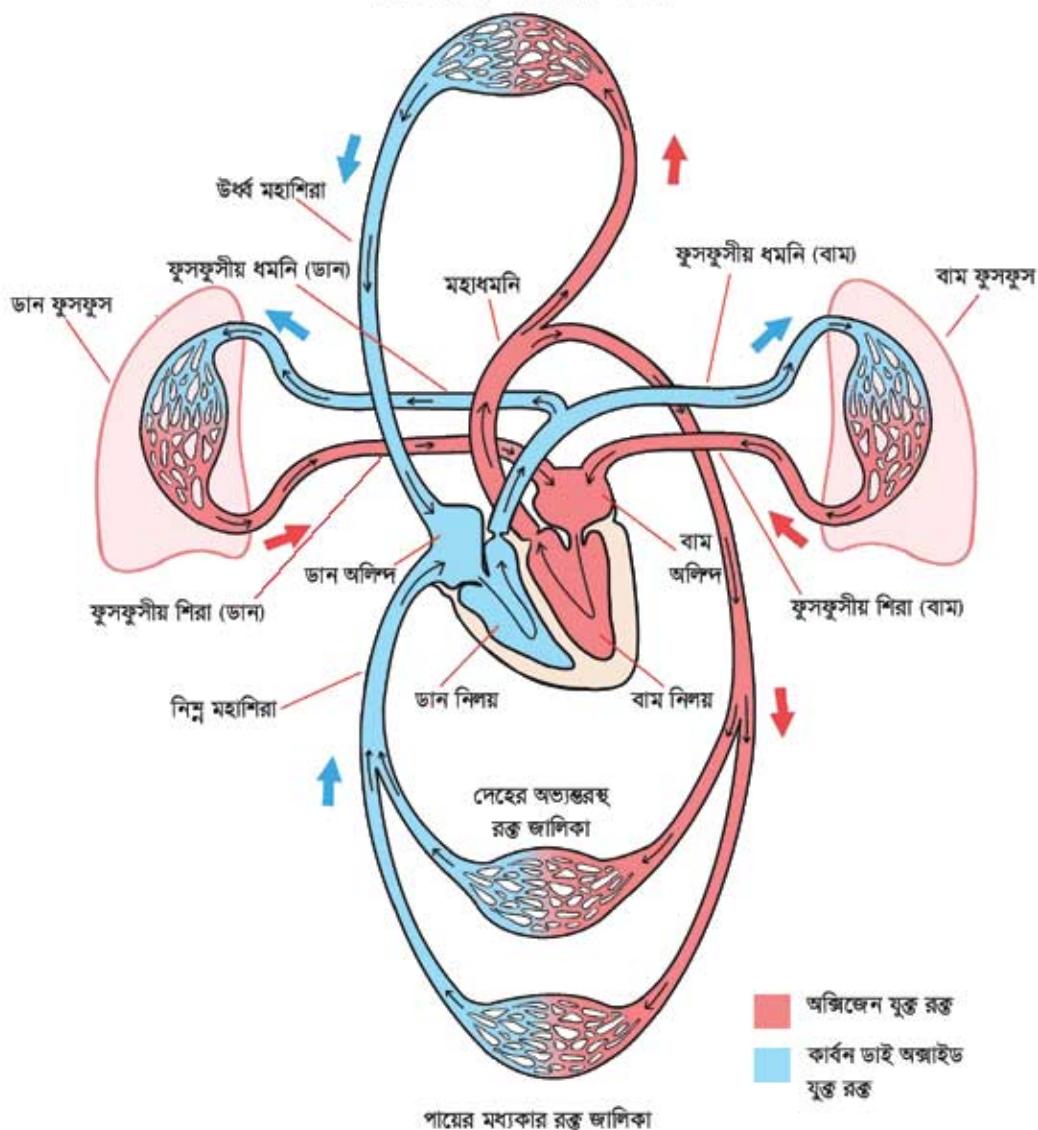
(b) শিরা (Vein)

যেসব নালি দিয়ে রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে তাদের শিরা বলে। এরা ধমনির মতোই সারা দেহে ছড়িয়ে থাকে। শিরাগুলো সাধারণত দেহের বিভিন্ন স্থানের কৈশিকনালি থেকে আরম্ভ হয় এবং এ রকম অসংখ্য নালি একত্রে সূর শিরা, উপশিরা, অতঃপর শিরা এবং মহাশিরার পরিপন্থ হয়ে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। শিরার প্রাচীর ধমনির মতো তিন স্তরবিশিষ্ট। শিরার প্রাচীর কম পুরু, কম স্থিতিস্থাপক ও কম পেশিময়। এদের নালিপথ একটু চওড়া এবং কপাটিকা থাকে। ফুসফুস থেকে হৃৎপিণ্ডে আসা শিরাটি ছাঢ়া অন্য সব শিরা কার্বন ডাই-অক্সাইডসমূহ রক্ত পরিবহন করে হৃৎপিণ্ডে নিয়ে আসে। ফুসফুসীয় শিরা অঙ্গিজেন সমূহ রক্ত ফুসফুস থেকে হৃৎপিণ্ডে পৌঁছে দেয়।

(c) কৈশিক জালিকা (Capillaries)

পেশিতন্ত্রতে ছলের মতো অতি সূক্ষ্ম রক্তনালি দেখা যায়। একে কৈশিক জালিকা বা কৈশিক নালি বলে। এগুলো একদিকে স্ফূর্তিম ধমনি এবং অন্যদিকে স্ফূর্তিম শিরার মধ্যে সহযোগ সাধন করে। ফলে ধমনি শাখা-শাখায় বিভক্ত হয়ে ছলে ছলে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর কৈশিক নালিতে পরিণত হয় এবং ইঙ্গেকটি কোষকে পরিবেষ্টন করে রাখে। এসের পাঁচির অভ্যন্তর পাতলা। এই পাতলা পাঁচির ডেস করে রাখে এবং স্বীকৃত সব বন্দু ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কোরে থাবে করে।

মাথা ও হাতের মধ্যকার রক্ত জালিকা



চিত্র ৬.১৬: মানবসহে রক্ত সংবহন



একক কাজ

কাজ: ধমনি ও শিরাৰ মধ্যে পার্শ্বক্য কৰ

বৈশিষ্ট্য	ধমনি	শিরা
(a) উৎপত্তি ও সমাপ্তি		
(b) রক্তপ্রবাহের দিক		
(c) রক্তের থক্কতি		
(d) প্রাচীর		
(e) ডিতৰেৱ নালিখণ্ঠ		
(f) কগাটিকা		
(g) অবস্থান		

6.4.4 রক্তচাপ (Blood Pressure)

রক্তপ্রবাহেৰ সময় ধমনিৰ পায়ে যে চাপ সৃষ্টি হয়, তাকে রক্তচাপ বলে। ক্রিপিঙ্গেৱ সংকোচন বা সিস্টোল অবস্থায় ধমনিৰ পায়ে রক্তচাপেৰ মাজা সর্বাধিক থাকে। একে সিস্টোলিক চাপ (Systolic Pressure) বলে। ক্রিপিঙ্গেৱ (থক্কতপকে নিলোৱে) অসারণ বা ভায়াস্টোল অবস্থায় রক্তচাপ সবচেয়ে কম থাকে। একে ডায়াস্টোলিক চাপ (Diastolic Pressure) বলে।

আদর্শ রক্তচাপ: চিকিৎসকদেৱ মতে, পরিষ্কত বয়সে একজন মানুষৰ আদর্শ রক্তচাপ (Blood pressure) সাধাৰণত $120/80$ মিলিমিটাৰ মানেৰ কাছাকাছি। রক্তচাপকে দুটি সংখ্যাৰ উজ্জেব কৰা হয়। প্ৰথমটি উচ্চমান এবং দ্বিতীয়টি নিম্নমান। রক্তেৰ উচ্চ চাপকে সিস্টোলিক (Systolic) চাপ বলে ধাৰ আদর্শ মান 120 মিলিমিটাৰেৰ নিচে। নিম্নচাপকে ডায়াস্টোলিক (Diastolic) চাপ বলে। এই চাপটিৰ আদর্শ মান 80 মিলিমিটাৰেৰ নিচে। এই চাপটি ক্রিপিঙ্গেৱ দুটি বিটোৱ মাঝামাঝি সময় রক্তনালিতে সৃষ্টি হয়। দুধৱদেৱ রক্তচাপেৰ পাৰ্শ্বক্যকে ধমনিঘাত বা নাড়িঘাত চাপ (Pulse pressure) বলা হয়। সাধাৰণত সুম্প



চিত্ৰ 6.17: নাড়ি বা পালস মেৰা

মিলিমিটাৰেৰ নিচে। এই চাপটি ক্রিপিঙ্গেৱ দুটি বিটোৱ মাঝামাঝি সময় রক্তনালিতে সৃষ্টি হয়। দুধৱদেৱ রক্তচাপেৰ পাৰ্শ্বক্যকে ধমনিঘাত বা নাড়িঘাত চাপ (Pulse pressure) বলা হয়। সাধাৰণত সুম্প

অবস্থায় হাতের কঙিতে রেট তথা হ্যাপ্সোনের মান প্রতি মিনিটে 60-100। হাতের কঙিতে হালকা করে চাপ দিয়ে ধরে পাশস রেট বের করা যায়। স্ফিগমোম্যানোমিটার (Sphygmomanometer) বা সক্রিয়ে বিপি যন্ত্রের সাহায্যে রক্তচাপ মাপা যায়। এই যন্ত্র দিয়ে ডায়াস্টোলিক ও সিস্টোলিক চাপ দেখে রক্তচাপ নির্ণয় করা যায়।



একক কাজ

কাজ: ভূমি ভোমায় বস্তু, ভাই, বোনের প্রতি মিনিটের নাড়িপ্লাস্ম পর্যন্ত কর। সৌজ্ঞে আসার পর পুনরায় তাদের নাড়িপ্লাস্ম গণনা কর। কোনো পরিবর্তন লক্ষ করছ কি? কেন এমন হলো তা ব্যাখ্যা কর।

উচ্চ রক্তচাপ (High blood pressure or hypertension)

উচ্চ রক্তচাপকে নীরব ঘাতক হিসেবে গণ্য করা হয়। সম্পত্তি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্রিপোর্টে বলা হয়েছে 2020 সালের মধ্যে স্ট্রোক ও করোনারি ধরনের ঝোপ হবে বিশ্বের এক অংশের অর্পণাধি এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে এর প্রকোপ ছড়িয়ে পড়বে মহামারী আকারে। কন্ট্রোল এবং স্ট্রাকচের অন্যত্বম প্রধান কারণ হলো উচ্চ রক্তচাপ।

উচ্চ রক্তচাপ কী? রক্ত চলাচলের সময় রক্তনালিশাত্ত্বে যে চাপ সৃষ্টি হয়, তাকে রক্তচাপ বলে। আর স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি রক্তচাপকে উচ্চ রক্তচাপ বলা হয়। একজন পূর্ববয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে সাধারণত সিস্টোলিক চাপ 120 মিলিমিটার পারদের লিচে এবং ডায়াস্টোলিক চাপ 80 মিলিমিটার পারদের লিচের মাঝাকে কাঙ্ক্ষিত আভা হিসেবে ধরা হয়। আর এই রক্তচাপ বর্ধন মাত্রাতিক্রিক হয় তখনই আমরা তাকে উচ্চ রক্তচাপ বলে ধরি।

উচ্চ রক্তচাপ ক্লিনিক কারণ: বাবা বা মায়ের উচ্চ রক্তচাপ থাকলে তার সন্তানদের উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এছাড়াও যারা স্নায়বিক চাপে (Tension) বেশি ভোগেন অথবা ধূমপানের অভ্যাস আছে, তাদের উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। দেহের উজ্জ্বল বেশি বেঙ্গে পেলে কিংবা লবণ এবং চর্বিযন্ত খাদ্য বেশি খেলে এমনকি পরিবারের সদস্যদের ডায়াবেটিস বা কোলেস্টেরলের পূর্ব ইতিহাস থাকলে উচ্চ রক্তচাপ দেখা দেয়। সম্মান প্রস্বের সময় খিচুনি রোগের (Eclampsia) কারণে মায়ের রক্তচাপ বৃদ্ধি পেতে পারে।

উচ্চ রক্তচাপের লক্ষণ: মাথাব্যথা, বিশেষ করে মাথার পেছন দিকে ব্যথা করা উচ্চ রক্তচাপের প্রাথমিক লক্ষণ। এছাড়া রোগীর মাথা ঘোরা, ঘাঢ় ব্যথা করা, বুক থক্কফড় করা ও দুর্বল বোধ করাও উচ্চরক্তচাপের লক্ষণ। অনেক সময় রোগীর নাক দিয়ে রক্ত পড়ে। উচ্চ রক্তচাপের রোগীর ভালো শুয়ে হয় না এবং অন্ত

পরিশ্রমে তারা হাঁপিয়ে ওঠে। ভয়ের ব্যাপার হলো, থার 50% ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপ হলে কোনো সংক্ষণ প্রকাশ পার না। তখন স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাক হয়ে থার কিছু বুঝে ওঠার আসেই।

রক্তচাপ নির্ণয় করা: রক্তচাপ মাপক যন্ত্র বা বিলি বজ্র দিয়ে রক্তচাপ মাপা হয়। রক্তচাপ মাপার শুরুতে গ্রোগীকে কম্পেক মিনিট নিরিবিলি পরিবেশে শান্তভাবে সোজা হয়ে শুয়ে থাকতে হবে। কমপক্ষে 15 থেকে 20 মিনিটের ব্যবধান রেখে রক্তচাপ নির্ণয় করা ভালো।



একটি কাজ

কাজ: রক্তচাপ মাপার কৌশল আয়োজন করে তোমার বন্ধুদের রক্তচাপ নিতের হকে উপস্থাপন কর।

শিক্ষার্থীর নাম	রক্তচাপ (সিস্টোল/ভায়াল্স্টোল)	মন্তব্য

উচ্চ রক্তচাপের প্রতিকার: উচ্চ রক্তচাপের প্রতিকারে টাটকা ফল এবং শীৱ-স্বজি খাওয়ার অভ্যাস করা উচিত। দেহের শুভন নিরূপণে রেখে শারীরিক পরিশ্রম করা বা ব্যায়াম করা প্রয়োজন। চর্বিজাতীয় খাদ্য এবং একটি খেকে বিরত থাকা ছাড়াও খাবারের সময় অভিযন্ত লবণ (কোচা লবণ) খাওয়া উচিত নয়। খুমশাল ভ্যাগ করা জরুরি। উচ্চ রক্তচাপ নিরূপণে না থাকলে মন্তিক্ষে রক্তক্ষরণ ঘটতে পারে, যা স্ট্রোক নামে পরিচিত।

কর্মসূক্ষ্মতা, স্বাস্থ্য, বয়স এবং গ্লোগের কারণে মানুষের রক্তচাপের মাত্রা কমবেশি হতে পারে। মোটা লোকদের শুভন কমানো, চর্বিজাতীয় খাদ্য কম খাওয়া, খাবারে কম লবণ দেওয়া ইত্যাদি নিরূপ যেনে চললে উচ্চ রক্তচাপ এড়ানো যায়। রক্তচাপ খুব বেশি হলে ডাঙ্গারের পরামর্শ অনুশাস্ত্র নিয়মিত উৎস সেবন করা উচিত।

6.4.5 কোলেস্টেরল (Cholesterol)

কোলেস্টেরল হাইড্রোকার্বন কোলেস্টেইন (Cholestane) থেকে উৎপন্ন একটি যৌগ। উচ্চপ্রেৰি প্রাণী কোষের এটি একটি শুরুতপূর্ণ উপাদান। কোলেস্টেরল লিপোপ্রোটিন নামক যৌগ সৃষ্টির মাধ্যমে রক্তে প্রবাহিত হয়। রক্তে তিনি ধরনের লিপোপ্রোটিন দেখা থাই।

(a) **LDL (Low Density Lipoprotein):** একে থারাপ কোলেস্টেরল বলা হয়, কারণ এটি হৃদরোগের বুঁকি বাড়ায়। সাধারণত আমাদের রক্তে 70% LDL থাকে। ব্যক্তিবিশেষে এই পরিমাণের পার্থক্য দেখা যায়।

(b) HDL (High Density Lipoprotein): একে সাধারণত ভালো কোলেস্টেরল বলা হয়। এটি হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়।

(c) ট্রাই-গ্লিসারাইড (Triglyceride): এই কোলেস্টেরল চর্বি হিসেবে রক্তের প্লাজমায় অবস্থান করে। ট্রাই-গ্লিসারাইড আমাদের খাদ্যের প্রাণিজ চর্বি অথবা কার্বোহাইড্রেট থেকে তৈরি হয়ে থাকে।

নিচের সারণিতে রক্তে কোলেস্টেরলের আদর্শ মান দেখানো হলো।

কোলেস্টেরলে প্রকার	মিলিমোল/লিটার
LDL	< 1.8
HDL	> 1.5
ট্রাই-গ্লিসারাইড	< 1.7

অধিক মাত্রার কোলেস্টেরল উপস্থিত এমন খাদ্যে মধ্যে মাখন, চিংড়ি, বিনুক, গবাদিপশুর যকৃৎ, ডিম, বিশেষ করে ডিমের কুসুম উল্লেখযোগ্য।

রক্তে উচ্চ কোলেস্টেরলের সমস্যা: দেহের অন্যান্য অঙ্গের মতো হৎপিণ্ডে অক্সিজেন এবং খাদ্যসার সরবরাহের প্রয়োজন হয়। হৎপিণ্ডের করোনারি ধমনিগাত্রে চর্বি জমা হলে ধমনিতে স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহে বিঘ্ন ঘটে, ফলে হৎপিণ্ড পর্যাপ্ত অক্সিজেন এবং খাদ্যসার না পাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রক্ত চলাচল কর্মে যাওয়ার কারণে বুকে ব্যথা অনুভূত হয়। এ অবস্থাকে অ্যানজিনা (Angina) বলা হয়। এছাড়া ধমনির গায়ে বেশি চর্বি জমা হলে রক্তপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় ফলে করোনারি হৃদরোগের আশঙ্কা অনেকগুণ বেড়ে যায়।

কোলেস্টেরলের কাজ: উপকারিতা ও স্বাস্থ্যঝুঁকি

কোলেস্টেরল কোষপ্রাচীর তৈরি এবং রক্ষার কাজ করে। প্রতিটি কোষের ভেদতা (Permeability) নির্ণয় করে বিভিন্ন দ্রব্যাদি কোষে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে। মানবদেহের জনন হরমোন এনড্রোজেন ও ইস্ট্রোজেন তৈরিতে সাহায্য করে। অ্যাডরেনাল গ্রন্থির হরমোন ও পিত্তুরস তৈরিতে কোলেস্টেরলের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কোলেস্টেরল পিণ্ড তৈরি করে। সূর্যালোকের উপস্থিতিতে চামড়ার কোলেস্টেরল থেকে ভিটামিন ‘ডি’ তৈরি হয়, যা রক্তের মাধ্যমে কিডনিতে গিয়ে ভিটামিন ‘ডি’র কার্যকর রূপে পরিণত হয় এবং আবার রক্তে ফিরে আসে। কোলেস্টেরল মাত্রা দেহের চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনকে (এ, ডি, ই এবং কে) বিপাকে সহায়তা করে। স্নায়ুকোষের কার্যকারিতার জন্য কোলেস্টেরল প্রয়োজন। দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার সাথে কোলেস্টেরল ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

গবেষণায় প্রমাণিত যে রক্তে উচ্চমাত্রায় কোলেস্টেরল হৎপিণ্ড এবং রক্ত সংবহনের বিশৃঙ্খলার সাথে জড়িত। কোলেস্টেরল পিন্তরসের অন্যতম উপাদান হলেও এটি একটি বর্জ্য পদার্থ এবং যকৃতের মাধ্যমে দেহ থেকে অপসারিত হয়। পিন্তরসে কোলেস্টেরোলের মাত্রা বেড়ে গেলে তা তলানির মতো পিন্তথলিতে জমা হয়। কোলেস্টেরলের এ তলানিই শক্ত হয়ে পিন্তথলির পাথর (Gallbladder stone) নামে পরিচিত হয়। উল্লেখ্য, কোলেস্টেরল ছাড়াও পিন্ত, ফসফেট, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি জমেও পিন্তথলির পাথর হতে পারে।

৬.৪.৬ অস্থিমজ্জা ও রক্তের অস্বাভাবিক অবস্থা: লিউকেমিয়া (Leukemia)

ভূগ অবস্থায় যকৃৎ এবং প্লীহায় লোহিত রক্ত কণিকা উৎপন্ন হয়। শিশুদের জন্মের পর থেকে লোহিত কণিকা উৎপন্ন শুরু হয়। লাল অস্থিমজ্জা হতে এই কণিকা উৎপন্ন হয়। এগুলো প্রধানত দেহে O_2 সরবরাহের কাজ করে। যদি কোনো কারণে অস্বাভাবিক শ্বেত কণিকার বৃদ্ধি ঘটে তাহলে রোগের লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। তখন অস্থিমজ্জা অত্যধিক হারে শ্বেত রক্তকোষ উৎপাদন করার কারণে পরোক্ষভাবে লোহিত রক্তকোষ এবং অণুচক্রিকার উৎপাদন কমে যেতে পারে। লিউকেমিয়াকে রক্তের ক্যান্সার বলা হলেও এটি আসলে রক্ত উৎপাদন-ব্যবস্থার অস্বাভাবিকতাজনিত একটি রোগ এবং এতে প্রধানত যে অঙ্গটি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় তা হলো অস্থিমজ্জা। লোহিত রক্তকোষের অভাবে অক্সিজেনের ঘাটতি হয়, যার ফলে রোগী দুর্বল বোধ করে, ফ্যাকাশে হয়ে যায় এবং শ্বাসকষ্ট হয়। অণুচক্রিকার অভাবে রক্ত জমাট বাঁধতে না পারার কারণে দাঁতের গোড়া ও নাকসহ শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক সময় কোনো আঘাত ছাড়াই অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ হয়। একই কারণে দেহস্তকে ছোট ছোট লাল বর্ণের দাগ দেখা দিতে পারে এবং পায়ের গিঁটে ব্যথা হয়ে ফুলে উঠতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার শ্রেণিবিভাগ অনুসারে অর্ধশতাধিক প্রকারের লিউকেমিয়া আছে, যার বেশির ভাগেই শ্বেত রক্তকোষের আধিক্য দেখা যায়। কিন্তু অধিক হারে শ্বেত রক্তকোষ উৎপন্ন হলেও সেগুলো আসলে ক্যান্সার কোষ এবং শ্বেতকোষের স্বাভাবিক কাজ, রোগ প্রতিরোধে অক্ষম। তাই লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি সহজেই বিভিন্ন রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হন। রোগ প্রতিরোধ-ব্যবস্থার অস্বাভাবিকতার কারণে দীর্ঘমেয়াদি জ্বর হতে পারে এবং লসিকা গ্রন্থি ফুলে যেতে পারে। এভাবে রক্তের তিন ধরনের কোষের প্রায় প্রতিটিরই স্বাভাবিক কাজ ঠিকমতো না করতে পারা এ রোগের লক্ষণ। তবে লিউকেমিয়ার প্রকারভেদ অনুসারে লক্ষণের তারতম্য হতে পারে।

চিকিৎসা : বর্তমানে প্রাথমিক অবস্থায় এ রোগ নির্ণয় করা গেলে এবং রোগীর সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে পারলে এ রোগ নিরাময় করা সম্ভব। সাধারণত ক্যান্সার কেমোথেরাপি এবং অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে এ রোগের চিকিৎসা করা হয়, অবশ্য প্রকারভেদ অনুসারে চিকিৎসার ভিন্নতা রয়েছে। একসময় লিউকেমিয়ার উন্নত চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। তবে বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন করা সম্ভব এবং দেশের বহু সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে ক্যান্সার কেমোথেরাপির ব্যবস্থা আছে।

৬.৫ রক্ত সংবহনত্বের কয়েকটি রোগ ও প্রতিকার

(a) হার্ট অ্যাটাক

যখন কারও হৃদযন্ত্রের কোনো অংশে রক্ত জমাট বাঁধার কারণে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় কিংবা বাধাগ্রস্ত হয়, তখন হৎপিণ্ডের কোষ কিংবা হৎপেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে মায়োকারডিয়াল ইনফ্রাকশন, করোনারি থ্রোমবিসিস ইত্যাদি সমস্যা সৃষ্টি হয়, যেগুলোকে একনামে হার্ট অ্যাটাক বলা হয়। বাংলাদেশে হৃদরোগ, বিশেষ করে করোনারি (coronary) হৃদরোগীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। হৎপিণ্ড রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন এবং খাবারের সারবস্তু অর্থাৎ পুষ্টিকর পদার্থ রক্তনালির মধ্য দিয়ে দেহের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে দেয়। নিজের কাজ সঠিকভাবে করার জন্য অর্থাৎ তার হৎপেশির অক্সিজেন এবং পুষ্টি অর্জনের জন্য হৎপিণ্ডের তিনটি প্রধান রক্তনালি আছে। এগুলোর মধ্যে অনেক সময় চর্বি জমে রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। ফলে প্রাণঘাতী রোগ হার্ট অ্যাটাক হয়। বর্তমান সময়ে হার্ট অ্যাটাকে শুধু 40-60 বছর বয়সী লোকেরাই আক্রান্ত হচ্ছে না, অনেক সময়ে তরুণরাও এ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

এ রোগের সাথে দেহের ওজন বেড়ে যাওয়ার সম্পর্ক রয়েছে। রক্তে প্লুকোজের মাত্রা অনিয়ন্ত্রিত থাকলে, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস যেমন অধিক তেলযুক্ত খাবার (বিরিয়ানি, তেহারি ইত্যাদি), ফাস্টফুড (বার্গার, বিফ বা চিকেন প্যাটিস ইত্যাদি) খাওয়া, অলস জীবনযাপন এবং শারীরিক পরিশ্রম না করার ফলে এই রোগ দেখা যায়। এ ছাড়াও সব সময় হতাশা, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও বিমর্শ থাকায় যেকোনো বয়সে এই রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

রোগের লক্ষণসমূহ: হার্ট অ্যাটাক হলে বুকে অসহনীয় ব্যথা অনুভূত হয়। বিশেষ করে বুকের মাঝখানে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব হয় যা, প্রাথমিকভাবে অ্যান্টাসিড ঔষধ খেলেও কমবে না। ব্যথা বাম দিকে বা সারা বুকে ছড়িয়ে যেতে পারে। ব্যথা অনেক সময় গলা এবং বাম হাতে ছড়িয়ে যায়। রোগী প্রচণ্ডভাবে ঘামতে থাকে এবং বুকে ভারি চাপ অনুভব করছে বলে মত প্রকাশ করে। রোগীর যদি আগে থেকে ডায়াবেটিস থাকে, তাহলে তার বুকে কোনো ব্যথা ছাড়াই হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। তাই রোগী কিছু বুঝে ওঠার আগেই সর্বনাশ হয়ে যায়। এজন্য ডায়াবেটিস রোগী কোনো অসুবিধা বোধ না করলেও নিয়মিত চিকিৎসকের কাছে গিয়ে চেক-আপ করাতে হবে।

প্রতিকার: এমন অবস্থা দেখা দিলে অবহেলা না করে যত তাড়াতাড়ি সন্তুর ইসিজি করিয়ে ডাঙ্কারের পরামর্শ নেওয়া দরকার। করোনারি হৃদরোগ এক মারাত্মক হৃদরোগ। এ রোগ থেকে বাঁচতে হলে কিছু নিয়ম মেনে চলা দরকার, যাতে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। যেমন: ধূমপান না করা এবং নিয়মিত ব্যায়াম করা বা হাঁটা, খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করা, কাঁচা ফল ও শাকসবজি বেশি বেশি খাওয়া। চর্বিযুক্ত খাবার না খাওয়া, ভাজা খাবার, মশলাযুক্ত খাবার, ফাস্টফুড না খাওয়া ইত্যাদি।

(b) বাতজ্বর (Rheumatic Fever)

স্ট্রেপটোকক্স (Streptococcus) অণুজীবের সংক্রমণে সৃষ্টি শ্বাসনালির প্রদাহ, ফুসকুড়িযুক্ত সংক্রামক জ্বর, টনসিলের প্রদাহ অথবা মধ্যকর্ণের সংক্রামক রোগ বাতজ্বরের উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। সাধারণত শিশুকালেই এ রোগের আক্রমণ শুরু হয় এবং দেহের অনেক অঞ্চলগুলি, বিশেষ করে হৎপিণ্ড আক্রান্ত হয়। হৎপিণ্ড যদি এ রোগে পূর্ণভাবে আক্রান্ত নাও হয়, হৎপেশি এবং হৎপিণ্ডের কপাটিকা বা ভালভ অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে হৎপিণ্ড যথাযথভাবে রক্ত পার্শ্ব করতে সক্ষম হয় না এবং দেহে রক্ত প্রবাহের পরিমাণ কমে যায়।

শুরুতেই রোগটি নির্ণীত না হলে বা সঠিক চিকিৎসা না হলে রোগের প্রকোপ বেড়ে যায় এবং ওজন হ্রাস, রক্তস্বচ্ছতা, ক্লান্তি, স্কুধামান্দ্য, চেহারায় ফ্যাকাশে ভাব ইত্যাদি দেখা দেয়। তখন রোগের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করার আর উপায় থাকে না। পরবর্তী সময়ে অস্থিসন্ধিতে ব্যথা, ফুলে ঘাওয়া এবং তকে লালচে রঙ দেখা দেয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এ রোগ শনাক্ত করা গেলে পেনিসিলিন জাতীয় ঔষধ যথাযথভাবে প্রয়োগে এ রোগের সংক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। অনেক চিকিৎসক আক্রান্ত ছেলেমেয়েদের প্রাপ্ত বয়সে না পৌঁছানো পর্যন্ত নিয়মিতভাবে পেনিসিলিন খাবার পরামর্শ দেন।

হৎপিণ্ডকে সুস্থ রাখার উপায়

মানুষ পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে থেকেই তার হৎপিণ্ড কাজ করা শুরু করে এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নির্দিষ্ট গতিতে চলতে থাকে। মানুষের বাঁচা-মরায় হৃদ্যন্তের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হৃদ্যন্ত সুস্থ রাখার জন্য সঠিক জীবনধারা (lifestyle) এবং খাদ্য নির্বাচনের প্রয়োজন রয়েছে। নানা ধরনের তেল বা চর্বিজাতীয় খাদ্য হৃদ্যন্তের কার্যক্রমকে ব্যাহত করে। রক্তের কোলেস্টেরল হৎপিণ্ডের রক্তনালিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে হৃদ্যন্তের ক্ষতি করে থাকে।

মাদক সেবন ও নেশা করলে হৃদ্যন্তের ক্রিয়া ও হৎপন্নন সাধারণ মান থেকে বৃদ্ধি পায়। ফলে মাদকসেবী কিছুটা মানসিক আনন্দ এবং প্রশান্তি পেলেও তার হৃদ্যন্তের অনেক ক্ষতি হয়। সিগারেটের তামাক অথবা জর্দার নিকোটিনের বিষক্রিয়া শরীরের অন্য অংশের মতো হৎপেশির ক্ষতি করে। সঠিক খাদ্য নির্বাচনের মাধ্যমে হৎপিণ্ডকে সুস্থ রাখা যায়। মেদ সৃষ্টিকারী খাদ্য যেমন তেল, চর্বি, অতিরিক্ত শর্করা পরিহার এবং সুষম খাদ্য গ্রহণ, প্রতিদিন পরিমিত ব্যায়াম এবং হাঁটা-চলার মাধ্যমে সুস্থ জীবন লাভ করা যায়।

ଅନୁଶୀଳନୀ



સરકિંસ ઉલ્લંઘ શિખ

1. प्रायोदय की?
 2. व्यापन काके बढ़े?
 3. अक्षरशिका कड़ प्रकार ओ की की?
 4. धमनिर काज की?
 5. उत्तरां बलते की बोकाय?



ବ୍ୟାଚନାମୂଳକ ପତ୍ର

- କ୍ଷେତ୍ରପାତ୍ର ମୁଦ୍ରାରେ ଉପାର୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ।
 - କ୍ଷେତ୍ରପାତ୍ର ମୁଦ୍ରାରେ ଶୋଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦାଓ ।



ବହୁନିର୍ଧାଚଳି ପ୍ରଶ୍ନ

1. ହର୍ଷପିଣ୍ଡକେ ଆସୁଥିବାରୀ ଶର୍ମିର ନାମ କୀ?
କ. ଏପିକାର୍ଡିଆମ ଖ. ମାରୋକାର୍ଡିଆମ
ଗ. ପେରିକାର୍ଡିଆମ ଘ. ଏଡୋକାର୍ଡିଆମ

2. ଆଜାକାତ ଶାନ୍ତିଜୀବି ବାଜାରର ଶମର ଟେଲିଟେଲେ କିଶମିଳ ଦେଖିବେ ପେଲ । ଏକେବେ କିଶମିଳ ଟେଲିଟେଲେ
ହୁଅର କାରଣ କୀ?
କ. ବ୍ୟାଗନ ଖ. ଶ୍ଲୋବଣ
ଗ. ଅଭିସରଣ ଘ. ଇମବାଈବିଶନ

নিচের উকীলকচি শক কর এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

নাম	রক্তের গুপ্ত
রাফিল	A
তামিয়	B
তাসমিয়া	AB
রাতুল	O

৩. সর্বজনীন রক্তদাতা বা শ্রেণীভার বাসন্ত বধিও বর্তমানে খুব একটা অবৈজ্ঞানিক নয়, তবু কীভু বাসন্ত অনুসারে তাক্ষিক বিবেচনার রাখিলের রক্তের প্রয়োজন হলে কার নিকট থেকে রক্ত নিতে পারবে?

- ক. তামিয় খ. তাসমিয়া
 গ. রাতুল ঘ. তামিয় ও রাতুল

৪. তাসমিয়া —

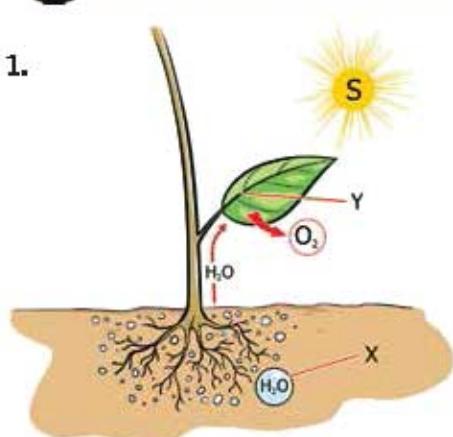
- (i) রক্তে A, B আণ্টিজেন বহন করে
 (ii) রাফিলকে রক্ত দান করতে পারবে
 (iii) তামিয়ের রক্ত থক্ষণ করতে পারবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii
 গ) ii ও ii ঘ) i, ii ও iii



সূজনশীল প্রশ্ন



১.

- ক. বৈষম্যগত পর্দা কী?
 খ. ইমবাইবিশন বলতে কী বুঝা?
 গ. চিত্রে S উপাদানটির অনুশন্ধি প্রক্রিয়াটিতে কীরূপ প্রক্রিয়া পড়বে ব্যাখ্যা কর।
 ঘ. চিত্রে X উপাদানটি যদি Y অঞ্চলে না পৌছায়, তাহলে উক্তিদের ক্ষেত্রে কী সমস্যা দেখা দিবে বিজ্ঞেষণ কর।

২. হাসান সাহেবের বয়স ৫০। তিনি একটি আর্থিক ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে ঢাকুরি করেন। কিছুদিন যাবৎ তিনি মাথাব্যথা, বুক ধড়কড় এবং অস্থিরতা অনুভব করছেন। অন্যদিকে তার ৭ বছর বয়সী মেয়ে ঘুনের গিঁটে ব্যথা, ফুলে যাওয়া, ত্বকে লালচে ভাব দেখা যাচ্ছে। তারা দুজন ডাক্তারের কাছে গেলে তিনি কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন।

ক. রস্ত কী?

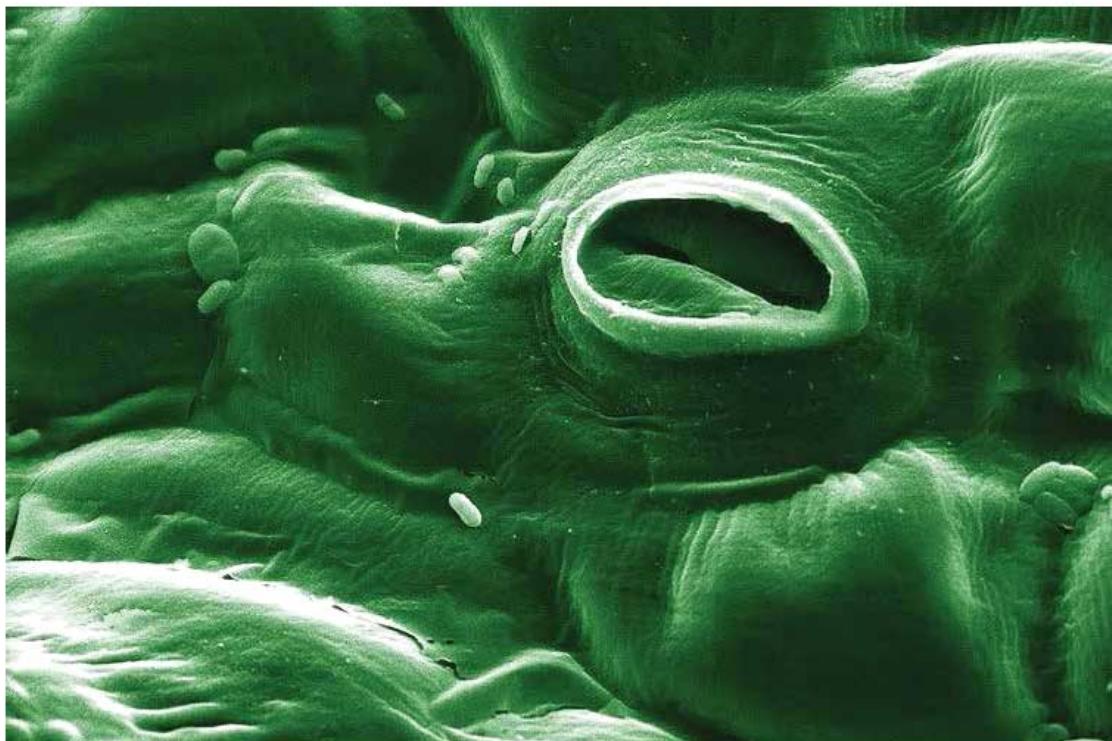
খ. শ্বেতকণিকা কীভাবে দেহকে রক্ষা করে? বুবিয়ে লেখ।

গ. হাসান সাহেবের সমস্যাগুলোর কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্বীপকে উল্লিখিত সমস্যা দুটির মধ্যে কোনটি অনিরাময়যোগ্য যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

সপ্তম অধ্যায়

গ্যাসীয় বিনিময়



এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সব জীবদেহেই গ্যাসীয় আদান-প্রদান ঘটে। গ্যাসীয় বিনিময় জীবের একটি শারীরবৃত্তীয় কাজ। তবে উদ্ধিদ ও প্রাণীর গ্যাসীয় বিনিময় প্রক্রিয়া ভিন্নতর। উদ্ধিদ ও মানবদেহের গ্যাসীয় বিনিময় প্রক্রিয়া এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

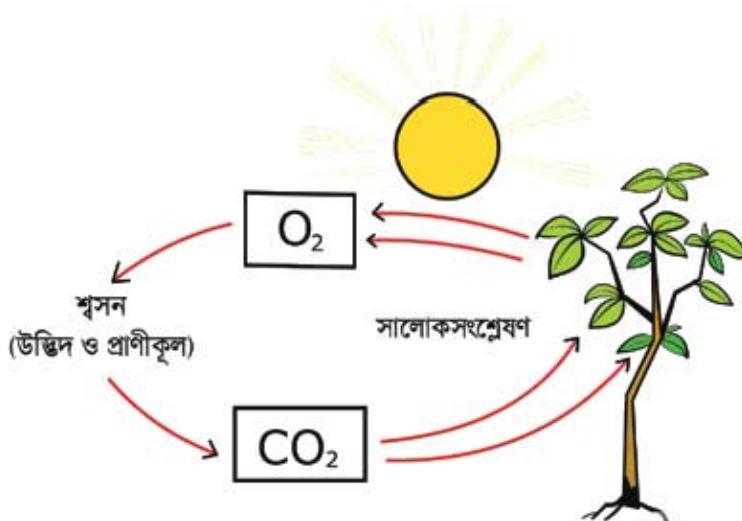


এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- উদ্দিদে গ্যাসীয় বিনিয়নের খারখা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মানুষের শ্বসনতন্ত্রের প্রধান অংশসমূহের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মূসমুসের গঠন ও কাজ বর্ণনা করতে পারব।
- মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া ও গ্যাসীয় বিনিয়ন বর্ণনা করতে পারব।
- শ্বসনতন্ত্রের রোগ লক্ষণ, কারণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকারের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- নিঃশ্বাসের সাথে নির্গত গ্যাসটির অকৃতি নির্ণয় করতে পারব।
- মূসমুসের চিত্র অঙ্কন করে চিহ্নিত করতে পারব।
- শ্বসনতন্ত্রের রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারব।

৭.১ উত্তিদে গ্যাসীয় বিনিময়

আমরা জানি যে উত্তিদের জীবনে সালোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis) এবং শ্বসন (Respiration) অভ্যন্তর পুরুষপূর্ণ দুটি প্রক্রিয়া। মূলত এই দুটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উত্তিদের গ্যাসীয় বিনিময় ঘটে থাকে। এই প্রক্রিয়া দুটি ঘটে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে। উত্তিদে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার জন্য বায়ু থেকে CO_2 গ্রহণ করে এবং O_2 জ্যাগ করে। অন্যদিকে শ্বসন প্রক্রিয়ায় জন্য O_2 গ্রহণ করে এবং CO_2 জ্যাগ করে। উত্তিদে গ্যাসীয় মতো খাস নেওয়ার জন্য কোনো বিশেষ অঙ্গ নেই, তবে পাতার স্টোমাটা ও পরিষ্কৃত কাণ্ডের বাকলে অবস্থিত লেন্টিসেলের (Lenticel) মাধ্যমে অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাসের বিনিময় ঘটে। তোমরা জান, দিলের বেলা বা পর্যাপ্ত আলোর উপস্থিতিতে সালোকসংশ্লেষণের হার অধিক হয়। সালোকসংশ্লেষণে উৎপাদিত অক্সিজেন গ্যাসের কিছু অংশ শ্বসন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার হয়। আবার শ্বসন প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের কিছু অংশ সালোকসংশ্লেষণে ব্যবহার হয়, তাই আদান-প্রদানকৃত অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ প্রায় সমান।



চিত্র ৭.০১: উত্তিদে গ্যাসীয় বিনিময়

রাতের বেলা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার আলোক পর্যায় বশ্য থাকে, তাই অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় না। অন্যদিকে দিবারাতি ২৪ ঘণ্টা শ্বসন প্রক্রিয়া সংস্থিত হয়, ফলে শ্বসন প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের উৎপাদন চলতে থাকে। এ জন্য বড় গাছের নিচে রাত্বিবেলা শুমালে শ্বাসকর্তৃ দেখা দিতে পারে।

উত্তিদে তার পরিবেশ থেকে প্রয়োজনীয় গ্যাস সংগ্রহ করে। উত্তিদের পাতা বেরকর বাতাস থেকে

অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস সংপ্রেহ করে, তেমনি মূল মাটি থেকে পানি পোষণ করে। পোষিত সেই পানির সাথে CO_2 এর বিকিন্তার ফলে O_2 গ্যাস উৎপাদন হয়, যা বায়ুমণ্ডলে চলে আস। এভাবে উত্তিদাতে গ্যাস বিনিয়ন চলতে থাকে।

7.2 घानव इसनात्त्व

অক্সিজেন জীবনধারণের অপরিহার্য উপাদান। কোনো ধাপীই অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারে না। মানবদেহে বাতাসের সাথে অক্সিজেন মূসফুসে প্রবেশ করে এবং রক্তের মাধ্যমে দেহের সব অংশে পৌছায়। দেহকোষে পরিপাক হওয়া খাদ্যের সাথে অক্সিজেনের বিক্রিয়া ঘটে, ফলে ভাপ এবং শক্তি উৎপন্ন হয়। এই ভাপ দেহকে উৎস রাখে এবং প্রয়োজনীয় শক্তি যোগায়।

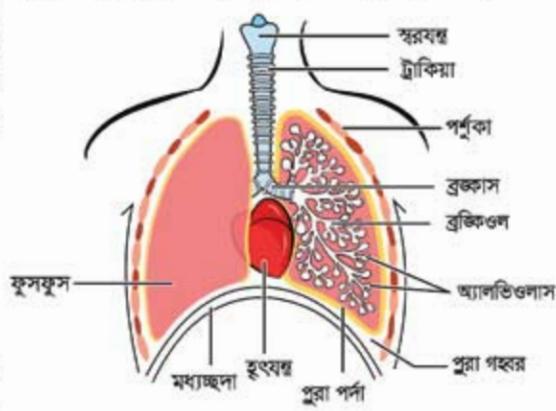
অঙ্গীজেন এবং আদম উৎপাদনের মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও পানি উৎপন্ন হয়। কর্তৃ উৎপাদনগুলোকে সুসমূহসে নিয়ে বাস। সেখানে অঙ্গীজেন শোষিত হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ছেড়ে দেয়। যে থ্রিয়া দিয়ে অঙ্গীজেন প্রাপ্ত এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড নিষ্কাশন করা হয়, তাকে শ্বাসকার্য বলে। যে জৈবিক থ্রিয়া প্রাপ্তির দেহের আদমসত্ত্বকে বায়ুর অঙ্গীজেনের সাথে জড়িত করে মজুত পর্যায়ে ব্যবহারবোগ্য পর্যায়ে রূপান্বিত এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড নিষ্কাশন করে, তাকে শ্বসন বলে। দেহের ভিতর গ্যাসীয় আদান-প্রদান একবার সুসমূহসে এবং পরে দেহের প্রতিটি কোষে পর্যামুক্যে সম্পাদিত হয়। শ্বসনের সরল বিক্রিয়াটি এভুকম:



সপ্তম প্রেশিটে তোমরা জেনেছ এখানে অক্সিজেন শ্রদ্ধণ এবং নিঃশ্বাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড দেহ থেকে বের করতেই হয়, তা না হলে আমাদের পক্ষে বেঁচে থাকা সত্ত্ব নয়, কারণ তিনি-চারি মিনিটের বেশি দেহে অক্সিজেনের সরবরাহ বন্ধ থাকলে মৃত্যু অনিবার্য। দেহের সচেতন, অচেতন উভয় অবস্থাতেই অবিরাম অক্সিজেন শ্রদ্ধণ এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের নির্গমন চলে। আর সাথে সাথে প্রতিনিয়ত দেহরক্ষার নালাবিধ থেকিয়াও চলতে থাকে, যার ফলে প্রাণী বেঁচে থাকে।

7.2.1 व्यासनात्मक (Respiratory system)

যে অঙ্গসূলোর সাহায্যে শ্বাসকার্য পরিচালিত হয়, সেগুলোকে একত্রে ক্ষমতাদণ্ড বলে। ক্ষমতাদণ্ডের



ठिक 7.02: यानव उत्तमज्ञ

সাথে সম্মত অঙ্গগুলো হলো: নাসারক্ষ এবং নাসাগৰ্ভ, গলনালি বা গলবিল, স্বরযন্ত্র, শ্বাসনালি বা ট্রাকিয়া, বায়ুনালি বা ব্রহ্মাস, ফুসফুস এবং মখ্যাঙ্গস।

(a) নাসারক্ষ ও নাসাগৰ্ভ (Nasal cavity)

শ্বসনভঙ্গের প্রথম অংশের নাম নাসিকা বা নাক। এটা মুখগহণের উপরে অবস্থিত একটি ঝিকোধাকার গহণ। নাক বা নাসিকার সাহায্যে কোনো বস্তুর সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ বুঝা যায়। এক বিশেষ খরচের মাধ্য এই অংশকে উল্লিপিত করে, যত্নে আমরা গন্ধ পাই। নাসিকা এমনভাবে বিবর্তিত হয়েছে যে সেটি প্রশ্বাসের সময় বাতাসকে ফুসফুসের অংশের উপরযোগী করে দেয়।

নাসাগৰ্ভ সামনে নাসিকাছিপ এবং পিছনে গলবিল পর্যন্ত বিস্তৃত। একটি পাতলা প্রাচীর দিয়ে এটি দু ভাগে বিভক্ত। এর সামনের অংশ লোমাবৃত এবং পিছনের অংশ প্রেক্ষা অস্তুতকারী একটি পাতলা গর্ভ দিয়ে আবৃত। আমদের খাস-প্রশ্বাসের সময় বায়ুতে বিদ্যমান ধূমিকগা, রোগজীবাদু এবং আবর্জনা থাকলে তা এই লোম এবং পর্দাতে আটকে যায়। এতে বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করার পূর্বে কিছু পরিমাণে নির্মল হয়ে যায়। এছাড়া শ্বসনের জন্য গৃহীত বায়ু নাসাগৰ্ভ দিয়ে যাওয়ার সময় কিছুটা উষ্ণ এবং আর্দ্ধ হয়। এর ফলে হঠাতে ঠাণ্ডা বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করে সাধারণত কোনো প্রকার অস্তি করতে পারে না।

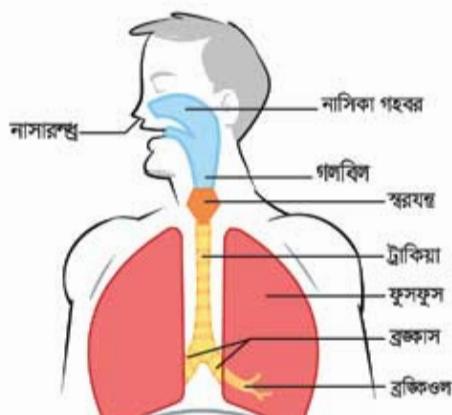
(b) গলবিল (Pharynx)

মুখ হাঁ করলে মুখগহণের পিছনে বে অংশটি দেখা যায়, সেটাই গলবিল। নাসাপথের পিছনের অংশ থেকে স্বরযন্ত্রের উপরিভাগ পর্যন্ত এটি বিস্তৃত। এর পিছনের অংশের উপরিভাগে একটি ছোট জিহ্বার মড়ো অংশ থাকে, এটাই আলাজিহ্বা (Soft palate)।

খাদ্য এবং পানীর প্রস্তাবকরণের সময় এটা নাসাপথের প্রস্তাবপথ বন্ধ করে দেয়। ফলে কোনো প্রকার খাদ্য নাসিকা পথে বাইরে আসতে পারে না। খাদ্যাহসের সময় ধাতুর পরিমাণে পিছিল পদার্থ নিঃসরণ করাও এবং আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সম্ভবত উদ্বিগ্নের স্বরযন্ত্রের বিবর্তনের সাথে আলাজিহ্বার উভয়বের একটা সম্পর্ক আছে, যেটি কেবল মানুষেই সবচেয়ে বেশি বিকশিত।

(c) স্বরযন্ত্র (Larynx)

এটা গলবিলের নিচে এবং শ্বাসনালির উপরে অবস্থিত। স্বরযন্ত্রের দুই ধারে দুটি শেশি থাকে। এগুলোকে (Vocal cord) বলে। স্বরযন্ত্রের উপরে একটি জিহ্বা আকৃতির ঢাকনা রয়েছে। একে উপজিহ্বা (Epiglottis) বলে। শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার সময় এটি থোলা থাকে এবং এ পথে বাতাস ফুসফুসে



চিত্র ৭.০৩: নাসাগৰ্ভ ও গলবিল

বাতাস্ত্রাত করতে পারে। খাবার সময় এই ঢাকনাটি স্বরব্যক্তির মুখ দেকে দের ফলে আহাৰ্য ছব্যাদি সদৃশীয় খাদ্যবালিতে প্রবেশ করে। খাস-প্রাথমিক এবং কোনো ভূমিকা নেই।

(d) শ্বাসনালি (Trachea)

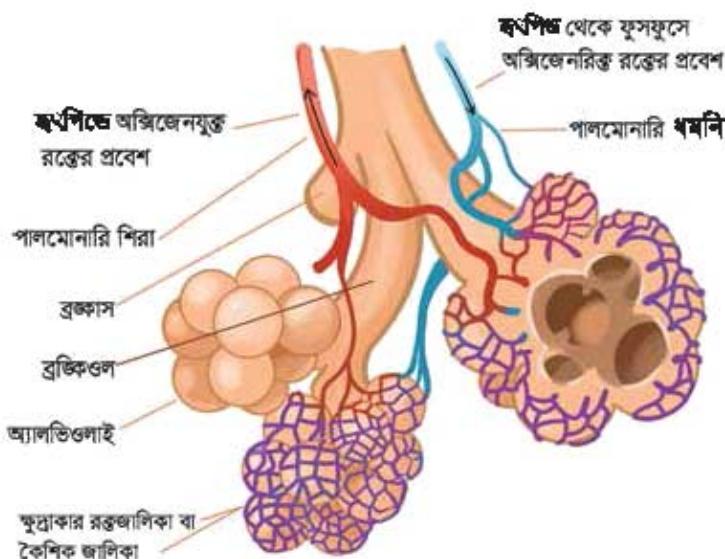
এটি শ্বাসনালির সামনে অবস্থিত একটি ফাঁপা নল। এই নালিটি স্বরব্যক্তির নিচের অংশ থেকে শুরু করে কিছু দূর নিচে গিয়ে দুটি বায়ুনলিকে সৃষ্টি হয়, এগুলো শ্বাসনালি। এর প্রাচীর কঙগুলো অসংকৃত বলায়াকার তরুণাস্থি ও পেশি দিয়ে গঠিত। এর অক্ষগীজ খিলি দিয়ে আৰুত। এ খিলিতে সূক্ষ্ম সোমশুষ্ক কোষ থাকে। এর ডিতর দিয়ে বায়ু আসা-বাতো করে। শ্বাসনালির ডিতর দিয়ে কোনো অপ্রয়োজনীয় বস্তুকণ প্রবেশ করলে সূক্ষ্ম সোমশুষ্ক সেগুলোকে প্লেচ্যার সাথে বাইরে বের করে দেয়।

(e) ব্রহ্মকাস (Bronchus)

শ্বাসনালি স্বরব্যক্তির নিম্নাংশ থেকে শুরু হয়ে ফুসফুসের নিকটবর্তী স্থানে গিয়ে ডান এবং বাম দিকে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়। এ শাখাগুলো যথাক্রমে বাম এবং ডান ফুসফুসে প্রবেশ করে। এগুলো ব্রহ্মকাস (একবচনে ব্রহ্মকাস) নামে পরিচিত। ফুসফুসে প্রবেশ কৰার পর ব্রহ্মকাস দুটি অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়। এগুলোকে অগুঞ্জাম শাখা (broncholic) বলে। এদের পঠনশৈলী শ্বাসনালির অনুরূপ।

(f) ফুসফুস (Lung)

ফুসফুস শ্বসনত্ত্বক্ষেত্রের প্রধান অঙ্গ। বক্ষপ্রস্থারের ডিতর হ্রদপিণ্ডের দুই পাশে দুটি ফুসফুস অবস্থিত। এটি শশজের ঘড়ো নরম এবং কোমল, হালকা লালচে রঁজের। ডান ফুসফুস তিন খণ্ডে এবং বাম



চিত্র 7.04: ফুসফুস যথস্থ বাহ্যিক

কুসফুস দুই খণ্ডে বিভক্ত। কুসফুস দুই তাঁজবিশিষ্ট পুরো নামক পর্দা দিয়ে আবৃত। দুই তাঁজের মধ্যে এক প্রকার রস নির্গত হয়। কলে শ্বাসক্রিয়া চলার সময় ফুসফুসের সাথে বক্ষগ্রাহের কোনো ঘর্ষণ হয় না। ফুসফুসে অসংখ্য বায়ুথলি বা বায়ুকোষ, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শ্বাসনালি ও রক্তনালি থাকে। বায়ুথলিগুলোকে বলে অ্যালভিওলস (Alveolus)। বায়ুথলিগুলো সুস্থ কুস্থ অশুক্রোম শাখাথালৈ মৌচাকের মধ্যে অবস্থিত। নাসাপথ দিয়ে বায়ু সরাসরি বায়ুথলিতে বাতাগ্রাহ করতে পারে। বায়ুথলি পাতলা আবরণী দিয়ে আবৃত এবং প্রতিটি বায়ুথলি কৈশিকনালিকা দিয়ে পরিবেষ্টিত। বায়ু প্রবেশ করলে এগুলো বেশুলের মতো ফুলে উঠে এবং পরে আপনা-আপনি সংকুচিত হয়। বায়ুথলি ও কৈশিক নালিকার গাত্র এত পাতলা যে এর ভিতর দিয়ে গ্যাসীয় আদান-প্রদান ঘটে।



একক কাজ

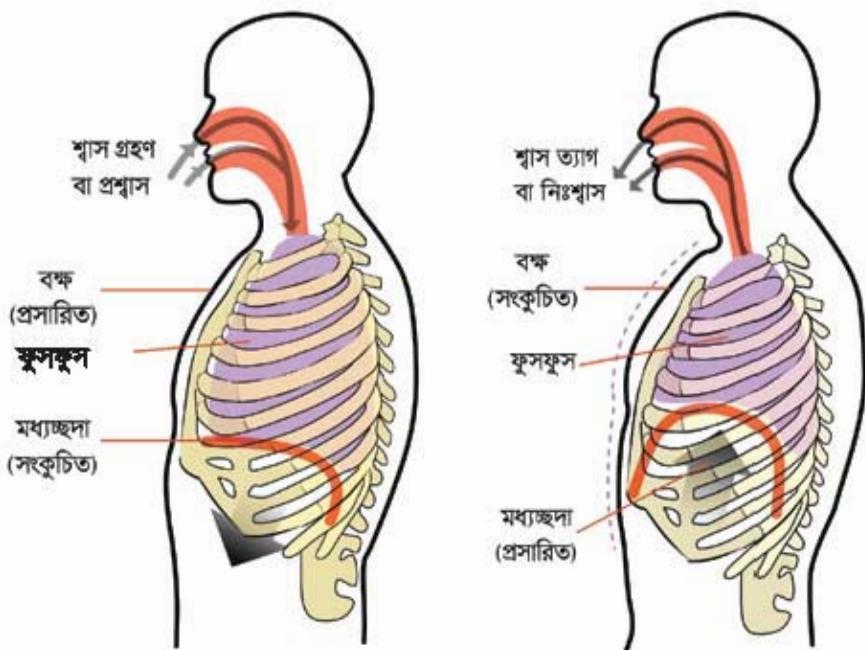
কাজ : ফুসফুসের চির অঙ্কন করে ঠিক্কিত কর।

(g) মধ্যজ্বল (Diaphragm)

বক্ষগ্রহর ও উদরগ্রহর পৃথককারী পেশিবহুল পর্দাকে মধ্যজ্বল বলে। এটি দেখতে অনেকটা প্রসারিত ছাতার মতো। মধ্যজ্বল সংকুচিত হলে নিচের দিকে নামে, তখন বক্ষগ্রহরের আয়তন বৃদ্ধি পায়। এটি প্রসারিত হলে উপরের দিকে উঠে এবং বক্ষ শ্বাসাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। মধ্যজ্বল প্রশ্বাস গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

7.2.2 শ্বাসক্রিয়া

শ্বাস-প্রশ্বাসের অভিগুলো কেবল গলবিলের দিকে খোলা, অন্য সবদিকে বন্ধ। কলে নাসাপথের ভিতর দিয়ে ফুসফুসের বায়ুথলি পর্যন্ত বাতাস নির্বিন্দে চলাচল করতে পারে। মাঝবিক উক্তজ্বল দিয়ে শ্বাসকার্য পরিচালিত হয়। মাঝবিক উক্তজ্বলের কারণে পিঙ্গুলাপিত্র মাসপেশি ও মধ্যজ্বল সংকুচিত হয়। কলে মধ্যজ্বল নিচের দিকে নেমে যায় এবং বক্ষগ্রহর প্রসারিত হয়। বক্ষগ্রহরের আয়তন বেড়ে গেলে বায়ুর চাপ কমে যায়, কলে ফুসফুসের ভিতরের বায়ুর চাপ বাইরের বায়ুর চাপের চেয়ে কমে যায়। বক্ষগ্রহরের ভিতর এবং বাইরের চাপের সমতা রক্তের জন্য প্রশ্বাস বায়ু ফুসফুসের ভিতর সহজে প্রবেশ করতে পারে। এই পেশি সংকোচনের পরগ্রাই পুনরায় প্রসারিত হয়। তাই মধ্যজ্বল পুনরায় প্রসারিত হবে উপরের দিকে উঠে যায় এবং বক্ষগ্রহরের আয়তন শ্বাসাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। এতে ফুসফুসের ভিতরের বায়ুর চাপ বেড়ে যায়, কলে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বায়ুসমূহ বাতাস নিষ্কাশনে বাইরে বের হবে যায়। এভাবে মানবদেহে প্রতিনিয়ত শ্বাসকার্য চলতে থাকে। মূলত এটা বহিষ্পন্ন।



চিত্র 7.05: শ্বাস গ্রহণ ও নিঃশ্বাস ত্যাগ

গ্যাসীয় বিনিয়ন

গ্যাসীয় বিনিয়ন বলতে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড বিনিয়নকে বুকায়। এটি মূলত বায়ু ও ক্লুসক্লুসের ক্ষেত্রালির ভিতরে ঘটে। সব ধরনের গ্যাসীয় বিনিয়নের মূলে রয়েছে ব্যাপন প্রক্রিয়া। গ্যাসীয় বিনিয়নকে দুটি পর্যায়ে জাপ করা হয়, অক্সিজেন শোষণ ও কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ।

অক্সিজেন শোষণ

ক্লুসক্লুসের বায়ুধলি বা আয়ামভিত্তি ও গ্রন্থের চাপের পার্থক্যের জন্য অক্সিজেন ব্যাপন প্রক্রিয়ার বক্তৃতা দ্বারেশ করে। ফ্লুসফ্লুস থেকে ধমনির গ্রন্থে অক্সিজেন প্রবেশ করার পর গ্রন্থে অক্সিজেন দূষণে পরিবাহিত হয়। সামান্য পরিমাপ অক্সিজেন রক্তবাসে দ্রব্যাকৃত হয়ে পরিবাহিত হয়। বেশির ভাগ অক্সিজেনই হিমোগ্লোবিনের সৌহার্দ অবশেষের সাথে হালকা বন্ধনের মাধ্যমে অক্সিহিমোগ্লোবিন নামে একটি অস্থায়ী যৌগ গঠন করে। অক্সিহিমোগ্লোবিন থেকে অক্সিজেন সহজে বিছিন্ন হতে পারে।

হিমোগ্লোবিন + অক্সিজেন \longrightarrow অক্সিহিমোগ্লোবিন (অস্থায়ী যৌগ)

অক্সিহিমোগ্লোবিন \longrightarrow স্ফুর্ত অক্সিজেন + হিমোগ্লোবিন

রক্ত কৈশিকনালিতে পেঁচার পর অক্সিজেন পৃথক হয়ে প্রথমে সোহিত রক্তকণিকার আবরণ ও পরে কৈশিকনালির পাটির তেজ করে সসিকাতে প্রবেশ করে। অবশেষে সসিকা থেকে কোষ আবরণ তেজ করে কোষে পেঁচে।

কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবহন

খাদ্য জ্বালণ বিক্রিয়া কোষে কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি করে। এই কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রথমে কোষ আবরণ তেজ করে আন্তঃকোষীয় ভর্তল ও লসিফাতে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে কৈশিকলালির পাঁচির তেজ করে রক্তরসে প্রবেশ করে। কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রধানত সোডিয়াম বাইকার্বোনেট (NaHCO_3) রূপে রক্তরসের মাধ্যমে এবং পটাশিয়াম বাই কার্বোনেট KHCO_3 রূপে সোডিই রক্তকণিকা দিয়ে পরিবাহিত হয়ে কুস্তুমে আসে, সেখানে কৈশিকলালি ও বায়ুযুগলি তেজ করে দেহের বাইরে নির্গত হয়।



একক কাজ

কাজ: নিঃখাসের সাথে নির্গত গ্যাসের প্রকৃতি নির্ণয়।

উপকরণ: দুটি টেস্টটিউব, একটি 10 mL ইনজেকশন সিরিঙ্গ (সূচ বাল্ব), দুটি প্লাস্টিকের নল (যার অন্তত একটি নল সিরিঝের মধ্যে বায়ুরোধী করে আটকানো যায়) এবং চুনের পানি।

পদ্ধতি: টেস্টটিউব দুটিতে সমপরিমাণ চুনের পানি নিতে হবে। তারপর দুটি টেস্টটিউবের প্রতিটির মধ্যে একটি করে নল এবনভাবে প্রবেশ করাতে হবে যাতে দুটি নলেরই এক প্রান্ত চুনের পানিতে ফুবে থাকে। এবার একটি নলের এক প্রান্ত সিরিঝের মুখে বায়ুরোধী করে আটকাতে হবে। তবে

আটকানোর আগে সিরিঝের পিস্টন ধায় পুরোটা টেনে 10 mL দাখ পর্যন্ত নিতে হবে। নলের সাথে সিরিঝ আটকানোর পর পিস্টন পুরোটা ঢেপে দিতে হবে। এর ফলে টেস্টটিউবের চুনের পানির মধ্যে বৃহদ সূচি হবে। একইভাবে আরও কয়েকবার বায়ু চালনা কর। অপর টেস্টটিউবে চুনের পানিতে ঢোবানো নলের উপরের ধান্তে মুখ সাপিয়ে খাস ছাড়তে থাক, খাস ছাড়ার সময় থাক ঢেপে ধরলে ভালো হয়। তবে খাস নেওয়ার সময় নল থেকে প্রতিবার মুখ সরিয়ে নাও। উভয় টেস্টটিউবের চুনের পানি ধায় 15 সেকেন্ড ধরে পর্যবেক্ষণ কর। টেস্টটিউব দুটির কোনোটিই পরিবর্তন না ঘটলে আরও 15 সেকেন্ড ধরে পরীক্ষা চালাতে থাক।



চিত্র 7.06: নিঃখাসের সাথে নির্গত গ্যাসের প্রকৃতি নির্ণীয়ক পরীক্ষা।

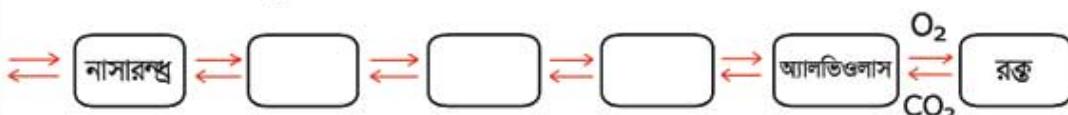
পর্যবেক্ষণ: একটি লক্ষ করলে দেখতে পাবে যে টেস্টটিউবের চুনের পানিতে শিখিজের মাঝমে সাধারণ বাতাস চালনা করা হয়েছে সেটিতে কোনো পরিবর্তন হয়নি। আর বেটিতে নিঃশ্বাস বায়ু চালনা করা হয়েছে, সেটি ঘোলা হয়ে দুধের মতো রং ধারণ করেছে।

সিদ্ধান্ত: নিঃশ্বাস বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের উপস্থিতির ফলে চুনের পানি ঘোলা হয়ে গেছে। কারণ নিঃশ্বাস বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ সাধারণ বাতাসের (বা আমরা থালাসের সাথে প্রহ্ল করি) ফুলনার বেশি থাকে। এজন্য সাধারণ বায়ু চালনা করার চুনের পানির কোনো পরিবর্তন হয়নি।



একক কাজ

কাজ : নিচের ছকটি পূরণ কর।



7.3 শ্বাসনালি-সংক্রান্ত রোগ

ফুসফুস শ্বাসনতঙ্গের একটি প্রযুক্তপূর্ণ অঙ্গ। ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে অনেক সময় এ অঙ্গটি নালাভাবে অক্রিয় হয়। বায়ুদূষণ এবং বিভিন্ন শর্কার ভাসমান কণা এবং রাসায়নিকের প্রভাবেও ফুসফুস অসুস্থ হতে পারে। অনেক সময় অঙ্গটা ও অসাবধানতার কারণে ফুসফুসে নানা জটিল রোগ দেখা দেয় এবং সংক্রমণ ঘটে। ফুসফুসের সাধারণ রোগগুলোর কারণ, লক্ষণ, প্রতিকার ও সাবধানতাগুলো জানা ধাকলে অনেক জটিল সমস্যা এমনকি ঘৃণনীয় অনেকাংশে কথানো যায়।

(a) আজমা বা হাঁপানি (Asthma)

আজমা সাধারণত রোগ প্রতিরোধ-ব্যবস্থার অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়ার ফলে হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোনো একটি বহিক্ষণ পদার্থ ফুসফুসে প্রবেশ করলে সেটিকে নিষ্ক্রিয় করতে দেহের প্রতিরোধ-ব্যবস্থার যেটুকু প্রতিক্রিয়া দেখানোর কথা, তার চেয়ে অনেক তীব্রভাবে প্রতিক্রিয়া ঘটলে আজমা হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই আজমা আক্রান্ত শিশু বা বাচ্চির বহশে হাঁপানি বা অ্যালার্জির ইতিহাস থাকে। এটি ছেঁয়াচে নয়, জীবাধুবাহিত রোগও নয়।

কারণ: যেসব খাবার থেলে এলার্জি হয় (চিংড়ি, গরুর মাংস, ইলিশ মাছ ইত্যাদি), বায়ুর সাথে ধোঁয়া, ধূলাবালি, ফুলের রেগু ইত্যাদি শ্বাস প্রহণের সময় ফুসফুসে প্রবেশ করলে হাঁপানি হতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে সাধারণত সর্দি কাশি থেকে হাঁপানি হওয়ার আশংকা থাকে। বছরের বিশেষ ঋতুতে বা ঋতু পরিবর্তনের সময় এ রোগ বেড়ে যেতে পারে।

অস্ফল

- হঠাতে শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়।
- শ্বাসকষ্টে দম বন্ধ হওয়ার মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়, ঠোঁট নীল হয়ে যায়, গলার শিরা ফুলে যায়।
- রোগী জোরে জোরে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করে, এ সময় বুকের ভিতর সাঁই সাঁই আওয়াজ হয়।
- ফুসফুসের বায়ুথলিতে ঠিকমতো অক্সিজেন সরবরাহ হয় না বা বাধাগ্রস্ত হয়, ফলে রোগীর বেশি কষ্ট হয়।
- কাশির সাথে কখনো কখনো সাদা কফ বের হয়।
- সাধারণত জ্বর থাকে না।
- শ্বাস নেওয়ার সময় রোগীর পাঁজরের মাঝে চামড়া ভিতরের দিকে চুকে যায়।
- রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে।

প্রতিকার

- চিকিৎসায় এ রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হয় না। তবে ঔষধ সেবনে রোগী কিছুটা আরাম বোধ করে।
- যেসব খাদ্য থেলে শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়, সেগুলো না খাওয়া।
- আলো-বাতাসপূর্ণ গৃহে বসবাস করা।
- যেসব জিনিসের সংস্পর্শ হাঁপানি বাড়ায় তা ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা। যেমন- পশুর লোম, কৃত্রিম আঁশ ইত্যাদি।
- ডাঙ্কারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা নেওয়া ও সাবধানতা অবলম্বন করা।
- ধূমপান, গুল, সাদা পাতা, জর্দা ইত্যাদির ব্যবহার পরিহার করা।
- শ্বাসকষ্টের সময় রোগীকে তরল খাদ্য খাওয়নো।

প্রতিরোধ

- স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করা।
- বায়ুদূষণ, বাসস্থান বা কর্মক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট হতে পারে, এমন সব বস্তুর সংস্পর্শ পরিহার করা।
- হাঁপানি রোগীর শ্বাসকষ্ট লাঘবের জন্য সবসময় সাথে ঔষধ রাখা ও প্রয়োজনমতো ব্যবহার করা।

এখানে লক্ষণীয় যে হাতুড়ে চিকিৎসকেরা অনেক সময় উচ্চমাত্রায় ক্ষতিক্ষারক স্টেরয়েড দিয়ে এর চিকিৎসা করে থাকে, যেটি উচ্চমাত্রায় প্রয়োগ করলে রোগীর কষ্ট তাৎক্ষণিকভাবে উপশম হলেও দীর্ঘমেয়াদি এবং অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যায়। তাই এ ধরনের চিকিৎসা বা চিকিৎসক থেকে দূরে থাকতে হবে।

(b) ব্রংকাইটিস (Bronchitis)

শ্বাসনালির ভিতরে আবৃত প্রদাহকে ব্রংকাইটিস বলে। ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে বিল্লিগাত্রে প্রদাহ হতে পারে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, সেঁতসেঁতে ধূলিকণা মিশ্রিত আবহাওয়া, ঠাণ্ডা লাগা এবং ধূমপান থেকেও এ রোগ হওয়ার আশংকা থাকে। একবার ব্রংকাইটিস হলে বারবার এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকে। সাধারণত শিশু এবং বয়স্ক ব্যক্তিরা এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। ধূমপান, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও দূষণ (যেমন কলকারখানার ধূলাবালি এবং ধোঁয়াময় পরিবেশ) এ রোগের কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়।

লক্ষণ

- কাশি, বুকে ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট হয়।
- কাশির সময় রোগী বুকে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করে।
- শস্ত খাবার খেতে পারে না।
- কাশির সাথে অনেক সময় কফ বের হয়। যদি কমপক্ষে একটানা 3 মাস কাশির সাথে কফ থাকে এবং এরকম অসুস্থতা পরপর 2 বছর দেখা যায়, তাহলে রোগীর ক্রনিক ব্রংকাইটিস হয়ে থাকতে পারে।

প্রতিকার

- ধূমপান, মদ্যপান, তামাক বা সাদাপাতা খাওয়া বন্ধ করা।
- ডাঙ্কারের পরমার্শ অনুযায়ী রোগীর চিকিৎসা করানো।
- রোগীকে সহনীয় উষ্ণতা ও শুষ্ক পরিবেশে রাখা।
- পুষ্টিকর তরল ও গরম খাবার খাওয়ানো। যেমন: গরম দুধ, স্যুপ ইত্যাদি।
- রোগীর পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া।

প্রতিরোধ

- ধূমপান ও তামাক সেবনের মতো বদ অভ্যাস ত্যাগ করা।
- ধূলাবালি ও ধোঁয়াপূর্ণ পরিবেশে কাজ করা থেকে বিরত থাকা।
- শিশু বা বয়স্কদের যেন মাথায় ঠাণ্ডা না লাগে সেদিকে নজর রাখা।

(c) নিউমোনিয়া (Pneumonia)

নিউমোনিয়া একটি ফুসফুসের রোগ। অত্যধিক ঠাণ্ডা লাগলে এ রোগ হতে পারে। হাম ও ব্রংকাইটিস রোগের পর ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া হতে দেখা যায়। শিশু এবং বয়স্কদের জন্য এটি একটি মারাত্মক রোগ।

কারণ: নিউমোকক্সাস (*Pneumococcus*) নামক ব্যাকটেরিয়া এ রোগের অন্যতম কারণ। এছাড়া আরও বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও ছত্রাকের আক্রমণে নিউমোনিয়া হতে পারে। এমনকি বিষম খেয়ে খাদ্যনালিস রস শ্বাসনালিতে চুকলে সেখান থেকেও নিউমোনিয়া হতে পারে।

লক্ষণ

- ফুসফুসে শ্লেষ্মা-জাতীয় তরল পদার্থ জমে কফ সৃষ্টি হয়।
- কাশি ও শ্বাসকষ্ট হয়।
- দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ বেশি জ্বর হয়।
- চূড়ান্ত পর্যায়ে বুকের মধ্যে ঘড়ঘড় আওয়াজ হয়, মারাত্মক শ্বাসকষ্ট হয়।

প্রতিকার

- ডাঙ্কারের পরামর্শ অনুযায়ী রোগীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- তরল ও গরম পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো।
- বেশি করে পানি পান করানো।

প্রতিরোধ

- শিশু ও বয়স্কদের যেন ঠাণ্ডা না লাগে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা।
- ধূমপান পরিহার করা।
- আলো-বাতাসপূর্ণ গৃহে বসবাস করা।
- রোগীকে সহনীয় উষ্ণতায় ও শুক্র পরিবেশে রাখা।

(d) যস্কা (Tuberculosis)

যস্কা একটি পরিচিত বায়ুবাহিত সংক্রামক রোগ। তবে ক্ষেত্রবিশেষে যস্কার জীবাণুস্ত ঢকের ক্ষেত্রে সংস্পর্শে এলে কিংবা সংক্রমিত গরুর দুধ খেয়েও কেউ এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। উল্লেখ্য, যেকোনো লোক, যেকোনো সময়ে এ রোগ দ্বারা সংক্রমিত হতে পারে। যারা অধিক পরিশ্রম করে, দুর্বল, সেঁতসেঁতে বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করে, অপুষ্টিতে ভোগে অথবা যস্কা রোগীর সাথে বসবাস করে, তারা এ রোগে সহজে আক্রান্ত হয়। আমাদের অনেকের ধারণা, যস্কা শুধু ফুসফুসের রোগ। আসলে ধারণাটা একেবারেই সঠিক নয়। যস্কা অন্ত, হাড়, ফুসফুস এরকম দেহের প্রায় যেকোনো স্থানে হতে পারে।

দেহে এ রোগের আক্রমণ ঘটলে সহজে এর লক্ষণ প্রকাশ পায় না। যখন জীবাণুগুলো দেহের রোগ প্রতিরোধক শ্বেত রস্তকণিকাকে পরাস্ত করে দেহকে দুর্বল করে, তখনই এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কারণ: সাধারণত *Mycobacterium tuberculosis* নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগ হয়। তবে *Mycobacterium* গণভূক্ত আরও কিছু ব্যাকটেরিয়া যন্মা সৃষ্টি করতে পারে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করলে অতি সহজে দেহে রোগ জীবাণুর বিস্তার ঘটে।

রোগ নির্ণয়: কফ পরীক্ষা, চামড়ার পরীক্ষা (MT test), সাইটো ও হিস্টোপ্যাথলজি পরীক্ষা এবং এক্স-রের সাহায্যে এ রোগ নির্ণয় করা যায়। তবে যন্মায় ঠিক কোন অঙ্গটি আক্রান্ত হয়েছে, তার উপরে নির্ভর করবে কোন পরীক্ষাটি করতে হবে। বর্তমানে রস্ত পরীক্ষার মাধ্যমে রোগটি নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা যায় কিনা তা নিয়ে গবেষণা চলছে। ইদানীং আমাদের দেশে রোগীর কফসহ বিভিন্ন নমুনায় যন্মা জীবাণু আছে কি না তা নির্ণয়ের জন্য DNA ভিত্তিক পরীক্ষা চালু হয়েছে।

লক্ষণ

- রোগীর ওজন কমতে থাকে, আস্তে আস্তে শরীর দুর্বল হতে থাকে।
- সাধারণত তিনি স্বচ্ছার বেশি সময় কাশি থাকে।
- খুসখুসে কাশি হয় এবং কখনো কখনো কাশির সাথে রস্ত যায়।
- রাতে ঘাম হয়, বিকেলের দিকে জ্বর আসে। দেহের তাপমাত্রা খুব বেশি বাড়ে না।
- বুকে পিঠে ব্যথা হয়।
- অজীর্ণ ও পেটের পীড়া দেখা দেয়।

প্রতিকার

- ডাঙ্কারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করা।
- এ রোগের চিকিৎসা দীর্ঘমেয়াদি। ডাঙ্কারের পরামর্শ অনুযায়ী রোগ নিবারণের নিয়মগুলো কঠিনভাবে মেনে চলা।
- প্রয়োজনে রোগীকে হাসপাতালে বা স্যানাটোরিয়ামে পাঠানো।
- রোগীর ব্যবহারের সবকিছু পৃথক রাখা।
- রোগীর কফ বা থুতু মাটিতে পুঁতে ফেলা।
- রোগীর জন্য উপযুক্ত চিকিৎসা ও পরিমিত পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা রাখা।
- ডাঙ্কারের নির্দেশ ব্যতীত কোনো অবস্থায় গুরুতর সেবন বন্ধ না করা।

প্রতিরোধ

- এ মারাত্মক রোগের আক্রমণ থেকে রেহাই পেতে হলে শিশুদের যন্মা প্রতিমেধক বিসিজি টিকা দিতে হবে। শিশুর জন্মের পর থেকে এক বছর বয়সের মধ্যে এ টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে

হয়। বিসিজি টিকা শিশুদের প্রাণঘাতী যক্ষা থেকে সুরক্ষা দিলেও বড় হয়ে গেলে তা সাধারণত আর কার্যকর থাকে না। তাই শিশু বয়সে টিকা দিলে তা আজীবন যক্ষা থেকে সুরক্ষা দেয় না।

- বর্তমানে দেশের বিভিন্ন টিকাদান কেন্দ্রে এ টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

(e) ফুসফুসের ক্যান্সার (Lung cancer)

সব ধরনের ক্যান্সারের মধ্যে ফুসফুস ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি। আমাদের দেশে পুরুষের ক্যান্সারজনিত মৃত্যুর প্রধান কারণ ফুসফুস ক্যান্সার।

ফুসফুস ক্যান্সারের অন্যতম প্রধান কারণ ধূমপান।

- বায়ু ও পরিবেশদূষণ এবং বাসস্থান অথবা কর্মক্ষেত্রে দূষণ ঘটতে পারে এমন সব বস্তুর (যেমন: এ্যাসবেস্টাস, আসেনিক, ক্রোমিয়াম, নিকেল, কঠিন ধাতুর গুঁড়া ইত্যাদি) সংস্পর্শে আসার কারণে ফুসফুসে ক্যান্সার হয়।
- যক্ষা বা কোনো ধরনের নিউমোনিয়া ফুসফুসে এক ধরনের ক্ষত সৃষ্টি করে যা পরবর্তীতে ক্যান্সারে রূপান্তরিত হয়।

লক্ষণ: ফুসফুস ক্যান্সারের প্রাথমিক লক্ষণগুলো যত দ্রুততার সাথে নির্ণয় করা যায় এবং চিকিৎসা প্রদান করা যায়, তত বেশি দিন বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। প্রাথমিক অবস্থায় যেসব লক্ষণ প্রকাশ পায় সেগুলো হলো:

- দীর্ঘদিন ধরে খুসখুসে কাশি ও বুকে ব্যথা।
- ভগ্নস্বর, ওজন হ্রাস এবং ক্ষুধামান্দ্য।
- হাঁপানি, ঘনঘন জ্বর হওয়া।
- বারবার ব্রংকাইটিস বা নিউমোনিয়া দিয়ে সংক্রমিত হওয়া।

রোগ নির্ণয়

প্রাথমিক অবস্থায় ক্যান্সারের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য থুথু বা শ্লেষা বিশ্লেষণ করা, বুকের এক্স-রে, সিটি স্ক্যান, এমআরআই ইত্যাদি করতে হয়। চূড়ান্ত রোগনির্ণয়ের জন্য সাধারণত সাইটো ও হিস্টোপ্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা করতে হয়।

প্রতিকার

- রোগের লক্ষণগুলো দেখা গেলে অন্তিবিলম্বে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া।
- রোগ নির্ণয়ের পর ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- প্রয়োজনে রেডিয়েশন থেরাপি প্রয়োগ করা, যেখানে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মাধ্যমে ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করা হয়।

প্রতিরোধ

বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্যালার প্রতিরোধে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, যথা:

- খুম্পান ও মদুপান না করা।
- অতিরিক্ত চর্বিজাতীয় খাদ্য না খাওয়া।
- নিয়মিত ব্যায়াম করা।
- গরিমালমতো শাকসবজি খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা।

অনুশীলনী



সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

1. কোথীয় খসন কাকে বলে?
2. ফুরার কাজ কী?
3. ভঁড়কাইটিস কী?
4. মখচুদার কাজ কী?
5. নিউমোনিয়া কেন হয়?



রচনামূলক প্রশ্ন

1. যত্কা রোগের অক্ষরগুলো লেখ।



বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

1. নিচের কোনটির সংক্রমণে ব্যাক্তি হয়?

ক. ভাইরাস	খ. ব্যাকটেরিয়া
গ. ছ্যাক	ঘ. প্রোটোজোয়া

২. উচিদের গ্রন্থীর বিনিয়নে সাহায্য করে—

I. স্টোমাটা

II. লেন্টিসেল

III. মূলরোম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

নিচের উকীগুটি পঞ্জে ৩ ও ৫ নং ঘন্টের উভয় মাত্র।

শারীরিক সূর্যলতার জন্য রিভা ভাস্কুলের শরণাপন হলো। ভাস্কুল তার মেছে রক্তের একটি বিশেষ কপিকার অপর্যাপ্ততার কথা জানান। ঘাটতি পুরণে ভাস্কুল তাকে পৃষ্ঠিকর খাবার ও শাকসবজি অধিক পরিমাণে খেতে পরামর্শ দিলেন।

৩. রিভার রক্তে কোনটির অভাব রয়েছে?

ক. লোহিত রক্তকণিকা

খ. শ্বেত রক্তকণিকা

গ. অগুচ্ছিকা

ঘ. রক্তরস

৪. বিশেষ কপিকাটি—

I. লৌহ উপাদান মুক্ত

II. অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে

III. কার্বন ডাই-অক্সাইড ধারণ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

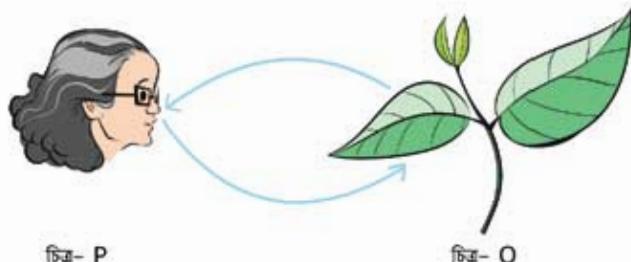
গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii



সূজনশীল প্রশ্ন

১.



ক. রক্তের কোন কপিকা অক্সিজেন বহন করে?

খ. ট্রাক্রিয়া বলতে কী বোবায়?

গ. চিরে P-এর সংঘটিত প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চিত্রে গ্যাস বিনিময়ের ক্ষেত্রে P ও Q একে অপরের উপর নির্ভরশীলতার বিষয়টি তোমার যুক্তির আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২. রাশেদ ও জামিল জাহাজ ভাঙা শিল্পে কাজ করেন। কাশি ও বুকে ব্যথাসহ অন্যান্য শারীরিক সমস্যায় ভোগায় উভয়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হন। ডাক্তার বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নিশ্চিত হন যে রাশেদের শ্বসন অঙ্গের কোষ বিভাজন অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে জামিলের রোগটি শ্বসন অঙ্গ ছাড়াও অস্ত ও হাড়ে বিস্তার লাভ করেছে।

ক. মধ্যচ্ছদা কী?

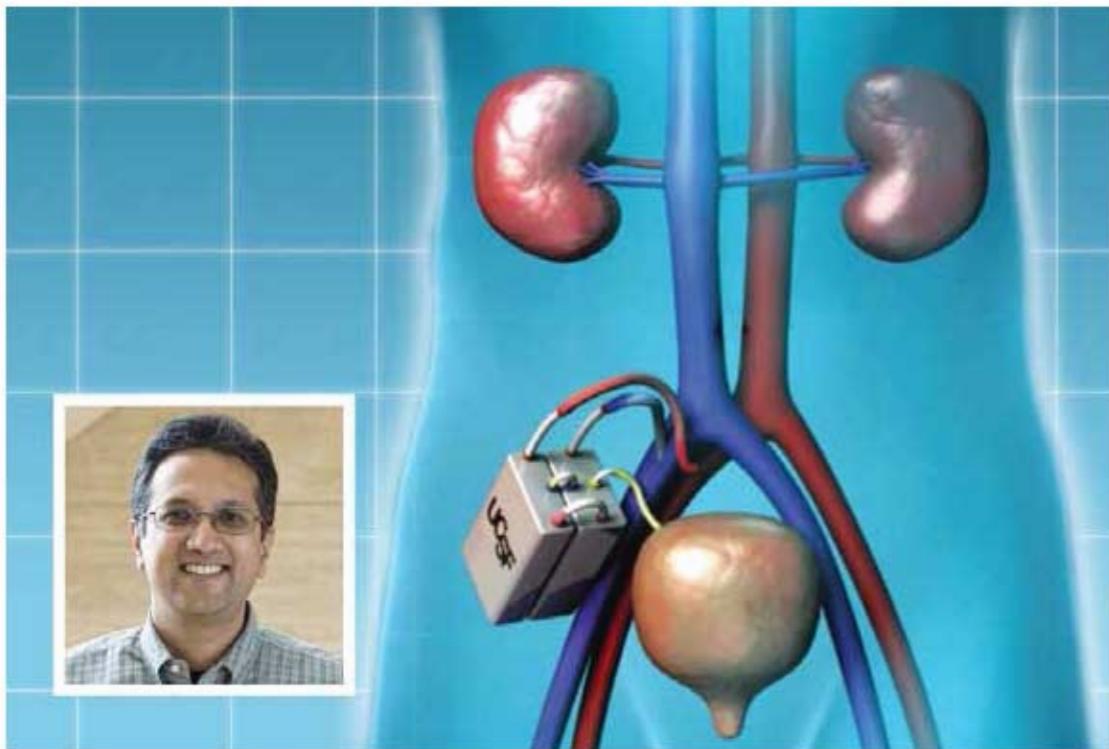
খ. বহিঃশ্বসন বলতে কী বোঝায়?

গ. রাশেদের দেহে রোগটি কীভাবে ছড়ায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রাশেদ ও জামিলের রোগ দুটির মধ্যে কেনাটির নিরাময় তুলনামূলকভাবে সহজতর— কারণ বিশ্লেষণ কর।

অষ্টম অধ্যায়

রেচন প্রক্রিয়া



শ্বেতোস ভিত্তিক অতিস্থাপনের উপযোগী কিডনি আবিকার করেছেন
বাংলাদেশের বিজ্ঞানি ড. শুভ রাম

জীবদ্দেহে কোথের ভিত্তিক অসংখ্য রাসায়নিক ক্ষিপ্রা ঘটে। এতে জীবদ্দেহের শারীরবৃত্তীয় কাঞ্চনগুলো
সুচারুত্বে সম্পাদিত হয়, জীব বেঁচে থাকে। রাসায়নিক ক্ষিপ্রার ক্ষেত্রে উৎপন্ন কিছু পদার্থ দেহের জন্য
অপরিহার্য আবার কিছু পদার্থ দেহের জন্য ক্ষতিকর। এই ক্ষতিকর পদার্থগুলো দেহ থেকে বের করে
দেওয়া খুবই জরুরি। মেমল শ্বেতোসের সময় ফ্লুকোজ জেনে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়, যাতে এই
কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবহন করে ফুসফুসে নিয়ে যায় এবং ফুসফুস থেকে দেহের বাইরে নির্গত হয়।
একইভাবে বৃক্ষ বা কিডনি নাইট্রোজেনস্টিটিত বর্জন ও অতিক্রিয় আর শরীর থেকে বের করে দেয়।

এ অধ্যায়ে দেহ থেকে বৃক্ষ কর্তৃক স্টেচিট বিভিন্ন ধরনের বর্জন পদার্থ নিষ্কাশন এবং বৃক্ষের নাম লোগ
সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।



ଏହି ଅଧ୍ୟାସ ପାଠ ଶେବେ ଆମରା-

- ମାନୁଷେର ବେଚନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତେ ପାରିବ ।
- ମାନୁଷଦେହେ ଉଥିଲା ବେଚନ ପଦାର୍ଥର ବର୍ଣନା କରନ୍ତେ ପାରିବ ।
- ବୃକ୍ଷର ଗଠନ ଓ କାଙ୍ଗ ବର୍ଣନା କରନ୍ତେ ପାରିବ ।
- ଲେନ୍ଦରର ଗଠନ ଓ କାଙ୍ଗ ବର୍ଣନା କରନ୍ତେ ପାରିବ ।
- ଅସମୀରେ ଶୁଣେଶନେ ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନିକା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତେ ପାରିବ ।
- ବୃକ୍ଷ ପାରିର ସୃତି ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ବର୍ଣନା କରନ୍ତେ ପାରିବ ।
- ବୃକ୍ଷ ବିକଳେର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ କରନ୍ତୀୟ ବର୍ଣନା କରନ୍ତେ ପାରିବ ।
- ବୃକ୍ଷର ସ୍ଥାଭାବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଜାଯା ରାଖନ୍ତେ ଡାଯାଲାଇସିସେର ଜ୍ଞାନିକା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତେ ପାରିବ ।
- ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ ଏବଂ ମରଣୋତ୍ତର ବୃକ୍ଷଦାନେର ଧାରପା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତେ ପାରିବ ।
- ମୁହଁନାଲିର ରୋଗ ଓ ସୁନ୍ଦର ଧାକାର ଟ୍ରେପାସ ବର୍ଣନା କରନ୍ତେ ପାରିବ ।
- ମରଣୋତ୍ତର ବୃକ୍ଷଦାନ ବିଷୟେ ଜନମତ ନିର୍ମଳେର ଏକଟି ଅନୁମାନ କାଙ୍ଗ କରନ୍ତେ ପାରିବ ।
- ମାନୁଷବୃକ୍ଷ ଓ ଲେନ୍ଦରର ଚିତ୍ର ଅଭିନ କରେ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତେ ପାରିବ ।
- ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ସୃତିର ଜଳ୍ପ୍ଯ ମରଣୋତ୍ତର ବୃକ୍ଷ ଦାନ ବିଷୟେ ପୋଷ୍ଟାର ଅଭିନ କରନ୍ତେ ପାରିବ ।
- ବୃକ୍ଷ ଓ ମୁହଁନାଲିର ସୁନ୍ଦରତା ରକ୍ଷାର ସଚେତନତା ସୃତି କରନ୍ତେ ଲିଫଲେଟ ଅଭିନ କରନ୍ତେ ପାରିବ ।
- ବୃକ୍ଷ ଓ ମୁହଁନାଲିର ସୁନ୍ଦରତାର ସଚେତନତା ସୃତି କରନ୍ତେ ପାରିବ ।
- ମରଣୋତ୍ତର ବୃକ୍ଷଦାନ ବିଷୟେ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ସୃତି କରନ୍ତେ ପାରିବ ।

৪.১ রেচন

রেচন মানবদেহের একটি জৈবিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দেহে বিপাক প্রক্রিয়ার উৎপন্ন নাইট্রোজেনস্টিড ক্ষতিকর বর্ণ পদার্থগুলো বের করে দেওয়া হয়। দেহের এই বর্জ্য পদার্থগুলো শরীরে কোনো কারণে জয়তে থাকলে নানা রকমের অসুখ দেখা দেয়, পরবর্তীতে যত্ন পর্যন্ত ঘটতে পারে। যে তরুণের মাধ্যমে দেহের বিষাক্ত পদার্থ নিষ্কাশিত হয়, তাকে রেচনতন্ত্র বলে। শরীরের অতিরিক্ত গানি, লবণ এবং জৈব পদার্থগুলো সাধারণত রেচনের মাধ্যমে দেহ থেকে বের করে দিয়ে বৃক্ত দেহের শারীরবৃক্ষীয় ভারসাম্য রক্ষা করে।

মানবদেহের রেচন অঙ্গ হলো কিছিনি অথবা বৃক্ত। আর বৃক্তের একক হলো নেফ্রন।

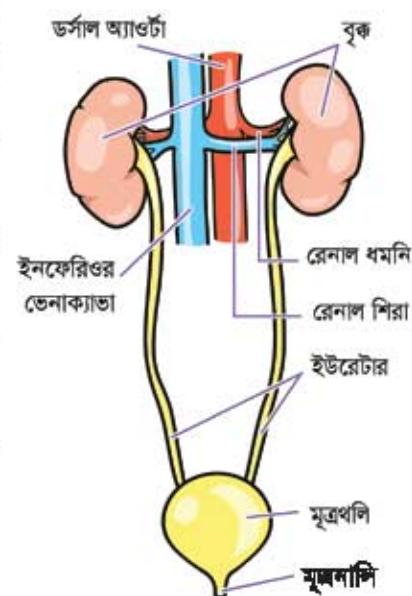
রেচন পদার্থ

রেচন পদার্থ বলতে মূলত নাইট্রোজেনস্টিড বর্জ্য পদার্থকে বোঝায়। মানবদেহের রেচন পদার্থ মূলের মাধ্যমে শরীর থেকে বের হয়ে আসে। মূলের আয় ৭০ ভাগ উপাদান হচ্ছে গানি। অন্যান্য উপাদানের মধ্যে আছে ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, ক্লিরটিনিন ও বিভিন্ন ধরনের লবণ। ইউরোক্রোম নামে এক ধরনের রঞ্জক পদার্থের উপস্থিতিতে মূলের রং হালকা হলুদ হয়। আমিদ-জাতীয় খাদ্য থেকে মূলের অপ্রত্যাবৃত্তি পৃষ্ঠা আবার ফলমূল এবং তরিতরকারি থেকে সাধারণত কার্যীয় মূল তৈরি হয়।

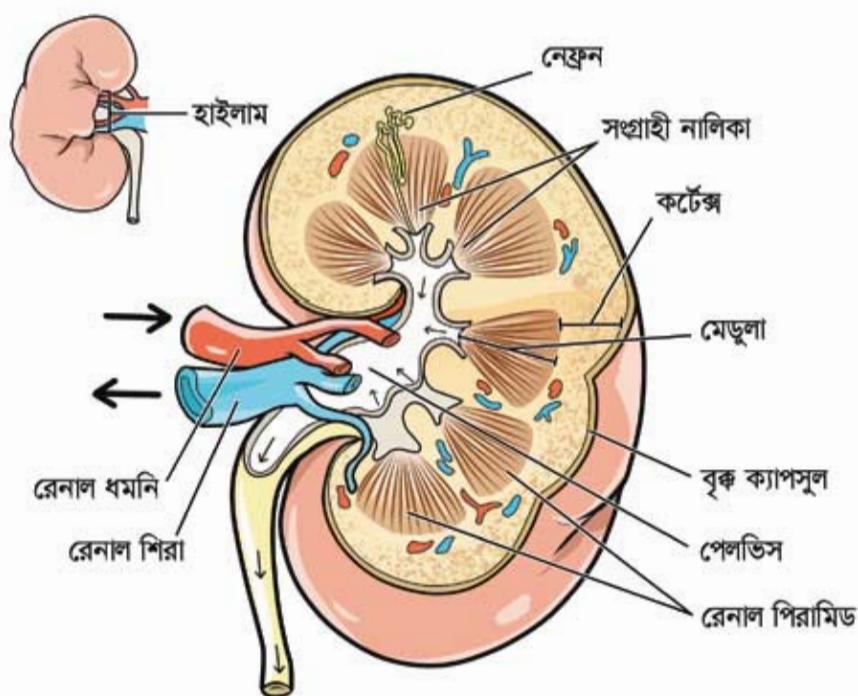
৪.২ বৃক্ত (Kidney)

মানবদেহের উদরগহণের পিছনে, মেরুদণ্ডের দুদিকে বক্ষগিরিতের নিচে পিঠ-সহলয় অবস্থায় দুটি বৃক্ত অবস্থান করে। প্রতিটি বৃক্ত দেখতে শিমবিটির মতো এবং এর গড় লালচে হয়। বৃক্তের বাইরের পার্শ্ব উভয় এবং তিতারের পার্শ্ব অবস্থাল হয়। অবস্থাল অংশের ভাঁজকে হাইলাস (Hilus) বা হাইলাম বলে। হাইলামের ভিতর থেকে ইউরেটার এবং রেনাল শিরা বের হয় এবং রেনাল থমনি বৃক্তে প্রবেশ করে। দুটি বৃক্ত থেকে দুটি ইউরেটার বের হয়ে মূলাশয়ে প্রবেশ করে। ইউরেটারের ফালেল আকৃতির প্রশংসন অংশকে রেনাল পেলাভিস বলে।

বৃক্ত সম্পূর্ণস্থাপে এক ধরনের তক্ষুময় আবরণ দিয়ে বেষ্টিত থাকে, একে রেনাল ক্যাপসুল বলে।



চিত্র ৪.১: মানব রেচনতন্ত্র



ଚିତ୍ର ୫.୦୨: ବୃକ୍କର ସଂହର୍ଷେନ

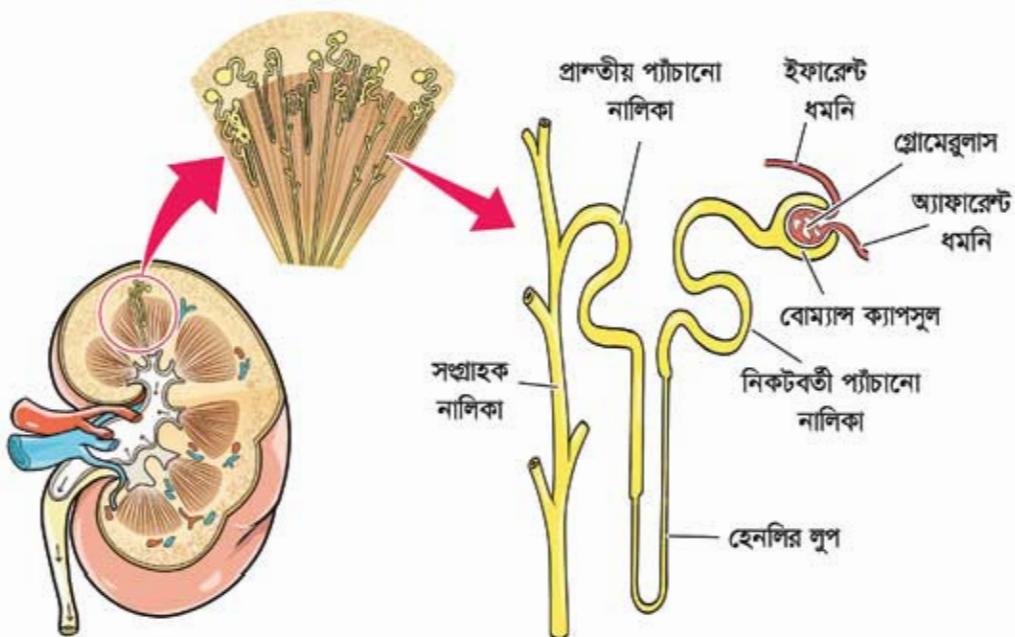
କ୍ୟାପସୁଲ-ସଂଲଗ୍ନ ଅଂଶକେ କଟେକ୍ସ ଏବଂ ଡିତରେ ଅଂଶକେ ମେଡୁଲା ବଲେ । ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷରେ ଯୋଜକ କଳା ଏବଂ ରଙ୍ଗବାହୀ ନାଲି ଦିଲେ ଗଠିତ । ମେଡୁଲାଯ ସାଧାରଣ ୮-୧୨ଟି ରେନାଲ ପିରାମିଡ ଥାକେ । ଏଦେର ଅନ୍ତଭାଗ ପ୍ରସାରିତ ହେଁ ରେନାଲ ପାପିଲା (Papilla) ଗଠନ କରେ । ଏସବ ପାପିଲା ସରାସରି ପେଲାଭିସ ଟ୍ର୍ୟୁଲ୍ ହୁଏ ।

ପ୍ରତିଟି ବୃକ୍କ ବିଶେଷ ଏକ ଧରନେର ନାଲିକା ଥାକେ, ଯାକେ ଇଟ୍ରିନିଫେରାସ ନାଲିକା ବଲେ । ପ୍ରତିଟି ଇଟ୍ରିନିଫେରାସ ନାଲିକା, ନେଫ୍ରନ, (Nephron) ଏବଂ ସଂଘାତକ ବା ସଂଘାତୀ ନାଲିକା (Collecting tubule)-ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରଥମ ଅଂଶେ ବିଭିନ୍ନ । ନେଫ୍ରନ ମୂଁ ତୈରି କରେ ଆବା ସଂଘାତୀ ନାଲିକା ରେନାଲ ପେଲାଭିସ ମୂତ୍ର ବହନ କରେ ।

ନେଫ୍ରନ

ବୃକ୍କର ଇଟ୍ରିନିଫେରାସ ନାଲିକାର କ୍ରମକାରୀ ଅଂଶ ଏବଂ କାଜ କରାର ଏକକକେ ନେଫ୍ରନ ବଲେ । ଯାନବଦେହର ପ୍ରତିଟି ବୃକ୍କ ପ୍ରାୟ 10-12 ଲକ୍ଷ ନେଫ୍ରନ ଥାକେ । ପ୍ରତିଟି ନେଫ୍ରନ ଏକଟି ରେନାଲ କରପୋସଲ (Renal corpuscle) ବା ମାଲପିଜିଲାନ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ରେନାଲ ଟିଟ୍ର୍ୟୁଲ (Renal tubule) ନିମ୍ନେ ଗଠିତ ।

ପ୍ରତିଟି ରେନାଲ କରପୋସଲ ଆବାର ଗ୍ଲୋମେରୁଲାସ (Glomerulus) ଏବଂ ବୋଯାଲ କ୍ୟାପସୁଲ— ଏ ଦୁଇ ଅଂଶେ ବିଭିନ୍ନ । ବୋଯାଲ କ୍ୟାପସୁଲ ଗ୍ଲୋମେରୁଲାସକେ ବେଟନ କରେ ଥାକେ । ଗ୍ଲୋମେରୁଲାସ ଏକଗୁଚ୍ଛ କୈଶିକ



চিত্র ৪.৩৩: একটি নেফ্রন

জালিকা দিয়ে তৈরি। রেনাল ধমনি থেকে সৃষ্টি অ্যাফারেন্ট আর্টেরিওল (Afferent arteriole) ক্যাপসুলের ভিতরে চুকে থাম ৫০টি কৈশিকনালিকা তৈরি করে। এগুলো আবার বিভিন্ন হয়ে সূক্ষ্ম রক্তজালিকার সৃষ্টি করে। এসব জালিকার কৈশিকনালিশুলো মিলিত হয়ে ইফারেন্ট আর্টেরিওল (Efferent arteriole) সৃষ্টি করে এবং ক্যাপসুল থেকে বেরিয়ে আসে।

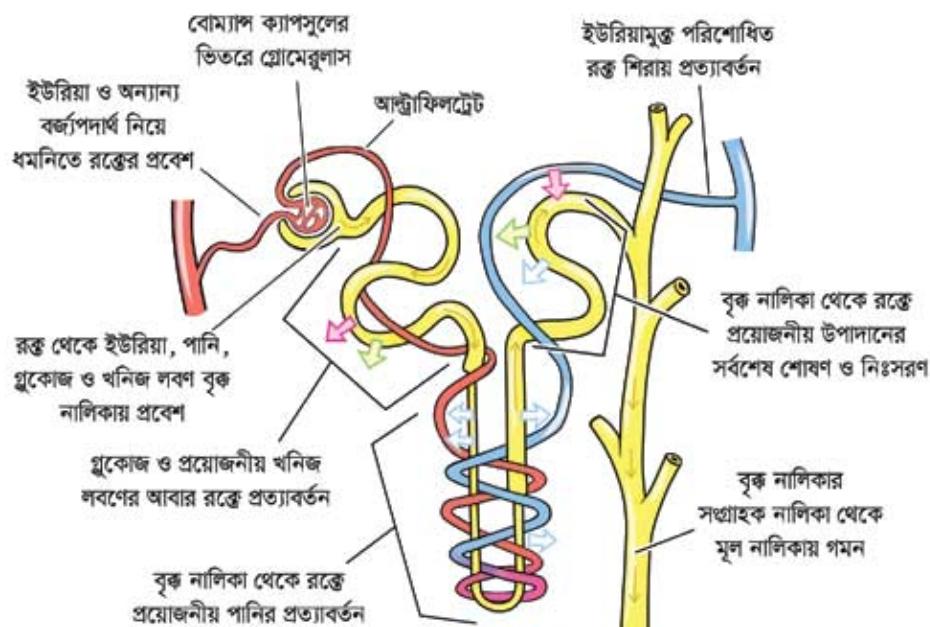
গ্রামেরুল ছাঁকনির মতো কাজ করে রক্ত থেকে পরিস্থিত তরঙ্গ উৎপন্ন করে। এই তরঙ্গকে বলে আন্ত্রিকিলাট্রেট। সেই আন্ত্রিকিলাট্রেট রেনাল টিউবুলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় আরও কয়েক মুক্ত শোষণ এবং নিঃসরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়। সবশেষে যে তরঙ্গটি পাখন্দা থাক, সেটিই মুক্ত, যা সংজ্ঞাহী নালিকার মধ্য দিয়ে ইউরেটার হয়ে মৃত্যুলিঙ্গে জমা হতে থাকে।

বোম্যাল ক্যাপসুলে অক্ষিয়দেশ থেকে সংজ্ঞাহী নালি পর্যন্ত বিস্তৃত চওড়া নালিকাটিকে রেনাল টিউবুল বলে। প্রতিটি রেনাল টিউবুল তৃতীয় গোকাদেশীয় বা নিকটবর্তী প্যাঁচালো নালিকা (Proximal convoluted tubule), হেনলি'-র দুপ (Henle's loop) এবং প্রান্তীয় প্যাঁচালো নালিকা (Distal convoluted tubule)।



একক কাজ

কাজ: মানববৃক্ষ এবং নেফ্রনের চিত্র অঙ্কন করে চিহ্নিত কর।



ଛିତ୍ର ୫.୦୫ ନେତ୍ରମେର କାର୍ଯ୍ୟଥାଳି

ସ୍ଵକ୍ଷେମ କାଜ

ଏକଜନ ବ୍ୟାଙ୍ଗାବିକ ମାନ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଥାର ୧୫୦୦ ମିଲିଲିଟାର ମୂତ୍ର ଜ୍ଯାଗ କରେ । ମୂତ୍ରେ ଇଟୁରିଆ, ଇଟୁରିକ ଏସିଡ, ଅୟାମୋନିଆ, କିର୍ଝେଟିନିମ ଇତ୍ୟାଦି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍‌ଘଟିତ ପଦାର୍ଥ ଥାକେ । ଏଗୁଳୋ ମାନବଦେହର ଜ୍ଯାମିତିକର । ଏଥର ଅନ୍ତରୋଜନୀୟ ଏବଂ କ୍ଷତିକର ବର୍ଜ୍ ପଦାର୍ଥ ମୂତ୍ରର ମାଧ୍ୟମେ ଅପ୍ସାରଣେ ବୃକ୍ ଅଭିନ୍ଦନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ପାଲନ କରେ । ବୃକ୍ ବା କିର୍ଝନିର ତିତରେର ନେତ୍ରନ ଏକଟି ଜଟିଲ ପାଞ୍ଜିଆର ମାଧ୍ୟମେ ହୃମାପତତାମେ ମୂତ୍ର ଉତ୍ସପନ କରେ । ଉତ୍ସପନ ମୂତ୍ର ସଂଶ୍ରାନ୍ତି ନାଲିକାର ମାଧ୍ୟମେ ସ୍ଵକ୍ଷେମ ପେଲାତିଲେ ପୌଛାଯି ଏବଂ ପେଲାତିଲେ ଥେକେ ଇଟୁରେଟାରେର ଫାନେଲ ଆକୃତିର ପ୍ରଶଂସନ ଅଂଶ ବେଳେ ଇଟୁରେଟାରେ ପ୍ରବେଶ କରେ । ଇଟୁରେଟାରେ ଥେକେ ମୂତ୍ର ମୂତ୍ରଥଳିତେ ଆସେ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟକାରେ ଜମା ଥାକେ । ମୂତ୍ର ନିଯୋ ମୂତ୍ରଥଳି ଏକଟି ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାଯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଲେ ମୂତ୍ର ଭ୍ୟାଗେର ଇଚ୍ଛା ଭ୍ୟାଗେ ଏବଂ ମୂତ୍ରଥଳିର ନିଚେର ଦିକେ ଅବଶ୍ୟକ ହିଂସପଦେ ମୂତ୍ରନାଳିର ମାଧ୍ୟମେ ଦେହର ବାହୀରେ ବେରିଯେ ଆସେ । ଏହାବେ ବୃକ୍ ବା କିର୍ଝନି ମାନବଦେହ ଥେକେ କ୍ଷତିକର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଜାଙ୍ଗୀୟ ପଦାର୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଜ୍ ଅପ୍ସାରଣ କରେ ।

ବୃକ୍ ମାନବଦେହେ ସୋଡ଼ିଆମ, ପଟାଶିଆମ, କ୍ରୋରାଇଡ ଇତ୍ୟାଦିର ପରିମାଣ ନିୟମାନ୍ତ୍ରଣ କରେ । ତାଛାଡାକ ମାନବଦେହର ଅନ୍ତର୍ଚାପ ନିୟମାନ୍ତ୍ରଣ, ପାନି, ଅମ୍ବ ଏବଂ କ୍ଷାରର ଭାବରୀମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ ।



ଏକକ କାଜ

କାଜ: ପରେର ପୃଷ୍ଠାର ଛକ୍ରେ ବର୍ଜ୍ ପଦାର୍ଥ ନିଷକାଶନେ କୋନ ଅତି କୀତାବେ ଅଂଶ ଦେଇ ତା ଲେଖ ।

বর্জ্য পদার্থ	অঙ্গ	মন্তব্য
কার্বন ডাই-অক্সাইড		
নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ		
ইউরিয়া, ইউরিক এসিড		
অতিরিক্ত পানি		

অসমোরেগুলেশনে বৃক্ষের ভূমিকা

যাবতীয় শারীরবৃত্তিক কাজ সফাদনের জন্য মানবদেহে পরিমিত পানি থাকা অপরিহার্য। মূলত মূঢ়ের মাধ্যমেই সবচেয়ে বেশি পানি দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। দেহের পানিসাম্য নিয়ন্ত্রণে বৃক্ষ প্রধান ভূমিকা পালন করে। বৃক্ষ নেফ্রনের মাধ্যমে পুনঃশোষণ প্রক্রিয়ায় দেহে পানির সমতা বজায় রাখে। ফ্লোমেরুলাসে রেচন বর্জ্য, পানি এবং অন্যান্য তরল পদার্থ পরিসুত হয়। বৃক্ষ অকার্যকর হয়ে গেলে দেহে পানি জমতে থাকে। চোখ-মুখসহ সারা শরীর ফুলে যেতে পারে, এমনকি উচ্চ রক্তচাপও সৃষ্টি হতে পারে। এগুলো প্রকৃতপক্ষে অসমোরেগুলেশন জনিত ত্রুটির লক্ষণ।

বৃক্ষে পাথর

নানারকম রোগের কারণে বৃক্ষ বা কিডনির স্বাভাবিক কাজে বিষ্ণ ঘটে। কিডনির প্রদাহ, প্রস্তাবে সমস্যা, কিডনিতে পাথর হওয়া এর মাঝে উল্লেখযোগ্য। কিডনির রোগের লক্ষণগুলো হলো শরীর ফুলে যাওয়া, প্রস্তাবে অতিরিক্ত প্রোটিন যাওয়া, রক্ত মিশ্রিত প্রস্তাব হওয়া, প্রস্তাবে জ্বালাপোড়া করা, ঘন ঘন প্রস্তাব হওয়া বা ক্ষেত্রবিশেষে প্রস্তাব বন্ধ হয়ে যাওয়া। মানুষের কিডনিতে ছোট আকারের পাথর জাতীয় পদার্থের সৃষ্টিই বৃক্ষ বা কিডনির পাথর হিসেবে পরিচিত। কিডনিতে পাথর সবারই হতে পারে, তবে দেখা গেছে, মেয়েদের থেকে পুরুষের পাথর হওয়ার আশঙ্কা বেশি। অতিরিক্ত শারীরিক ওজন, কিডনির সংক্রমণ, কম পানি পান করা ইত্যাদি বৃক্ষ বা কিডনিতে পাথর হওয়ার কারণ হতে পারে।

প্রাথমিকভাবে বৃক্ষে পাথর হলে তেমন সমস্যা ধরা পড়ে না। সমস্যা হয় যখন পাথর প্রস্তাব নালিতে চলে আসে এবং প্রস্তাবে বাধা দেয়। উপসর্গ হিসেবে কোমরের পিছনে ব্যথা হবে। অনেকের প্রস্তাবের সাথে রক্ত বের হয়। অনেক সময় কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। বৃক্ষের পাথরের চিকিৎসা নির্ভর করে পাথরের আকার এবং অবস্থানের উপর। সাধারণত অধিক পানি গ্রহণ এবং ওষধ সেবনে পাথর অপসারণ করা যায়। আধুনিক পদ্ধতিতে ইউরেটারোস্কোপিক কিংবা আল্ট্রাসনিক লিথট্রিপসি অথবা বৃক্ষে অন্ত্রোপচার করে পাথর অপসারণ করা যায়।

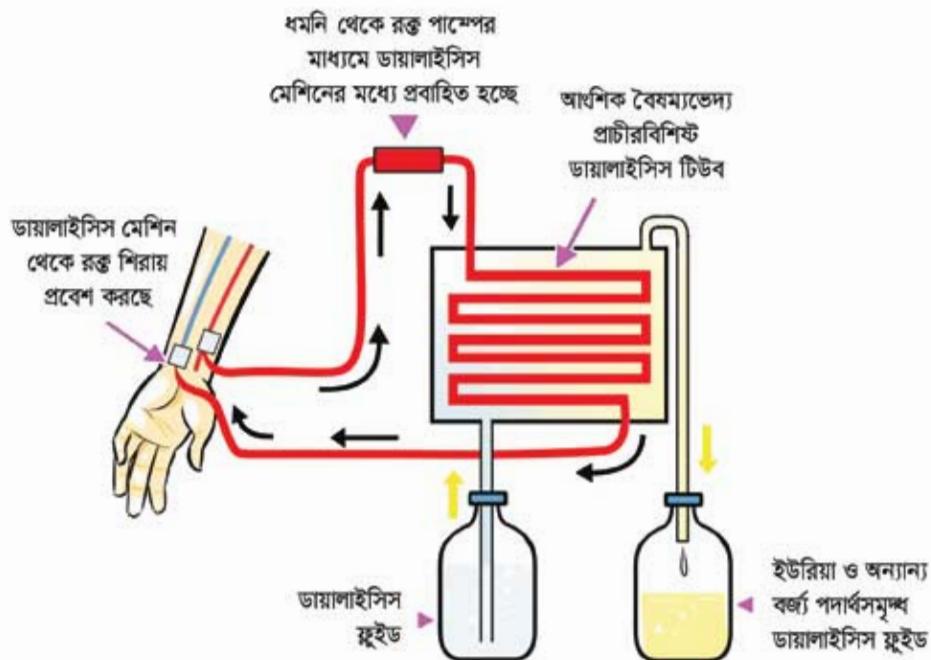
୪.୩ ବୃକ୍ଷ ବିକଳ, ଡାୟାଲାଇସିସ ଓ ପ୍ରତିଶ୍ଵାସନ

ନେଫ୍ରୋଇଟିସ, ଡାୟାବେଟିସ, ଉଚ୍ଚ ରଙ୍ଗଚାପ, କିଡ଼ନିତେ ପାଥର ଇତ୍ୟାଦି କାରଣେ କିଡ଼ନି ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଳ ହସ୍ତେ ଯାଉ । ଆକଞ୍ଚିକ କିଡ଼ନି ଅକେଜୋ ବା ବିକଳ ହେଉଥାର କାରଣଗୁଲୋ ହଲୋ କିନ୍ତୁ ଉପରେ ପାର୍ଶ୍ଵଅନ୍ତିରୀ, ମାର୍ଗବ୍ୟକ ଡାୟାରିଆ, ଅତିରିକ୍ତ ରଙ୍ଗକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ।

କିଡ଼ନି ବିକଳ ହଲେ ମୁହଁର ପରିମାଣ କମେ ଯାବେ । ରଙ୍ଗ ଛିଠୋଟିନିନ ବୃଦ୍ଧି ପାବେ । ତଥାନ ରଙ୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣ ହେୟାଦି ଅଗ୍ରସାରଥେର ଜନ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ପର ଗର ଗୋଲୀକେ ଡାୟାଲାଇସିସ କରା ହୁଏ ।

ଡାୟାଲାଇସିସ (Dialysis)

ବୃକ୍ଷ ସଂକ୍ଷର୍ତ୍ତ ଅକେଜୋ ବା ବିକଳ ହେଉଥାର ପର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାରେ ରଙ୍ଗ ପରିଶୋଧିତ କରାର ନାମ ଡାୟାଲାଇସିସ । ସାଧାରଣତ ଡାୟାଲାଇସିସ ମେଶିନେର ସାହାଯ୍ୟେ ରଙ୍ଗ ପରିଶୋଧିତ କରା ହୁଏ । ଏ ମେଶିନେର ଡାୟାଲାଇସିସ ଟିଉବଟିର ଏକ ପ୍ରାମ୍ପ ରୋଗୀର ହାତେର କଞ୍ଜିର ଧରନିର ସାଥେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାମ୍ପ ଏହାତେର କଞ୍ଜିର ଶିରାର ସାଥେ ସଂଯୋଜନ କରା ହୁଏ । ଧରନି ଥିଲେ ରଙ୍ଗ ଡାୟାଲାଇସିସ ଟିଉବରେ ଯଥ୍ୟ ଦିଲେ ପ୍ରବାହିତ କରାନ୍ତେ ହୁଏ । ଏଇ ପ୍ରାଚୀର ଆଧ୍ୟିକ ବୈସମ୍ୟଭେଦ ହେଉଥାର ଇଉରିଆ, ଇଟାରିକ ଏସିଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷତିକର ପଦାର୍ଥ ବାହିରେ ବେରିଯେ ଆମେ । ପରିଶୋଧିତ ରଙ୍ଗ ରୋଗୀର ଦେହର ଶିରାର ଯଥ୍ୟ ଦିଲେ ଦେହର ଡିକ୍ଟର ପୁନରାବ୍ଲେକ୍ ପ୍ରବେଶ କରେ । ଏଥାନେ ଉତ୍ତର୍କ୍ୟ, ଡାୟାଲାଇସିସ ଟିଉବଟି ଏମନ ଏକଟି ତରଳେର ଯଥ୍ୟେ ଝୁବାନ୍ତେ ଥାକେ, ଯାର ପଠଳ ରଙ୍ଗର ପ୍ଲାଜମାର



ତିମ୍ ୪.୦୫: ଡାୟାଲାଇସିସ

অনুরূপ হয়। এভাবে ডায়ালাইসিস মেশিনের সাহায্যে নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থ (ইউরিয়া এবং অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ) বাইরে নিষ্কাশিত হয়। তবে এটি একটি ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া।

প্রতিস্থাপন

যখন কোনো ব্যক্তির কিউনি বিকল বা অকেজো হয়ে পড়ে তখন কোনো সুস্থ ব্যক্তির কিউনি তার দেহে প্রতিস্থাপন করা যায়, তাকে কিউনি সংযোজন বলে। কিউনি সংযোজন দুভাবে করা যায়: কোনো নিকট আঞ্চীয়ের কিউনি অথবা কোনো মৃত ব্যক্তির কিউনি রোগীর দেহে প্রতিস্থাপন করা যায়। নিকট আঞ্চীয় বলতে বাবা, মা, ভাইবোন, মামা, খালাকে বোৰায়। মৃত ব্যক্তি বলতে ‘ব্ৰেন ডেড’ মানুষকে বোৰায়, যাঁর আর কখনোই জ্ঞান ফিরবে না কিন্তু তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গা কৃত্রিমভাবে জীবিত রাখা হয়েছে। মরণোত্তর চক্ষুদানের মতো মরণোত্তর বৃক্ষ দানের মাধ্যমে একজন কিউনি বিকল রোগীর জীবন বাঁচানো সম্ভবপর হতে পারে। মরণোত্তর সুস্থ কিউনি দানে মানবজাতির উপকার করা যায়।

পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ কিউনি অকেজো রোগী কিউনি সংযোজনের মাধ্যমে সুস্থ জীবন যাপন করছে। আমাদের দেশেও কিউনি সংযোজন কার্যক্রম সাফল্যের সাথে করা হচ্ছে। তবে আমাদের দেশে আইনগত জটিলতার কারণে রক্তের সম্পর্ক না থাকলে রোগীকে কিউনি দান করা যায় না, এজন্য অনেক সময় রোগী জরুরি কিউনি প্রতিস্থাপন থেকে বন্ধিত হন। একটি কিউনি কার্যক্রম থাকলেই সেটি দিয়ে জীবনধারণ করা সম্ভব, তাই একটি সুস্থ কিউনি প্রতিস্থাপন করে রোগের চিকিৎসা করা যায়। তবে দেখতে হবে যে টিস্যু ম্যাচ করে কি না। পিতামাতা, ভাইবোন এবং নিকট আঞ্চীয়ের কিউনির টিস্যু ম্যাচ হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

অস্বাস্থ্যকর জীবন যাপনে, দৈনিক অপর্যাপ্ত পানি পান করলে এবং অন্যান্য নানা কারণে মূত্রনালির রোগ দেখা দেয়। মূত্রনালির সংক্রমণ হলে মূত্রনালি জ্বালাপোড়াসহ নানা উপসর্গ দেখা দেয়। ডাঙ্কারের সত্ত্ব পরামর্শ এবং চিকিৎসা গ্রহণে অনেক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করা সম্ভব। আগে ধারণা করা হতো, সবার দৈনিক আট প্লাস পানি পান করা উচিত। তবে আধুনিক গবেষণায় দেখা যায়, পানি পানের স্বাভাবিক মাত্রা ব্যক্তি, লিঙ্গ, কাজের ধরন, শারীরিক অসুস্থিতার প্রকৃতি এবং আবহাওয়া ভেদে ভিন্ন হতে পারে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি পান করা ঠিক নয়। তাই পিপাসা পেলেই পানি পান করা উচিত।

সতর্কতা

অনেকে ডায়ারিয়া বা বমি হওয়া ছাড়াই গরমে ঘেমে গেলে, ক্লান্ত অবস্থায় কিংবা তেমন কোনো কারণ ছাড়াই খাবার স্যালাইন পান করে থাকেন। এটি একেবারেই ঠিক নয়, বিশেষ করে বয়স্ক মানুষের বেলায় ডায়ারিয়া বা বমি ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত খাবার স্যালাইন বিপদ ডেকে আনতে পারে। এমনকি ডায়ারিয়া বা বমি হলেও তাঁদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক সঠিক পরিমাণে স্যালাইন দিতে হবে। সাধারণ ক্লান্তি বা ঘামের ক্ষেত্রে লেবুর রস এবং সামান্য লবণমিশ্রিত শরবতই যথেষ্ট। ডায়াবেটিস

ନା ଥାକୁଲେ ଏତେ କିଛୁଟା ଚିନିଓ ସୋଗ କରା ଯେତେ ପାରେ ।



ଏକକ କାଜ

କାଜ: ମରଖୋତ୍ତର ବୃକ୍ଷଦାନେର ବିଷୟେ ପୋସ୍ଟାର ଅଭିନ କରେ ଯେଣିତେ ଉପମ୍ରାପନ କର ।

ମୂଳନାଶି ସୁନ୍ଦର ରାଖାଇ ଟୁପାଇ

ଶିଶୁଦେର ଟେଲିସିଲ ଏବଂ ଖୋସପାଇଁଛା ଥେବେ ସାବଧାନ ହେଲା ପ୍ରଯୋଜନ; କେବଳା ମେଥାନ ଥେବେ କିଡ଼ିନିର ଅସୁଖ ହତେ ପାରେ । ଡାକ୍ତାରେଟିସ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ନିୟମରେ ରାଖା ଉଚିତ । ଡାକ୍ତରିଙ୍ଗା ଓ ରକ୍ତକ୍ଷରଣ ଇତ୍ୟାଦିର ଝୁକ୍ ଚିକିତ୍ସା କରାତେ ହବେ । ଧୂମପାନ ଡ୍ୟାଗ କରା ଏବଂ ବ୍ୟାଧି ନିରାମରେର ଉଷ୍ଣ ସଥାସମ୍ଭବ ପରିହାର କରା ପ୍ରଯୋଜନ । ପରିମାଣମତୋ ପାନ ପାନ କରାତେ ହବେ । ସବଚେଷେ ବଢ଼ କଥା, ନିୟମ ମେନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରାତେ ହବେ ।



ଏକକ କାଜ

କାଜ: କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ଓ ମୂଳନାଶିର ସୁନ୍ଦରତା ରକ୍ତା କରା ଯାଏ ଦେ ବିଷୟେ ମନ୍ଦଗତଭାବେ ଲିଫଲେଟ ତୈରି କର ।

ଅନୁଶୀଳନୀ



ସର୍କିଳ ଉତ୍ସର ପ୍ରଶ୍ନ

1. ଡାଯାଲାଇସିସ କୀ?
2. ମାଲପିଞ୍ଜିଆନ ଅଙ୍ଗ କାକେ ବଲେ?
3. ପେଲାଭିସ କାକେ ବଲେ?
4. ମେଚନ ପଦାର୍ଥ ବଲାତେ କୀ ବୋବାଯା?
5. ବୁକ୍କେ ପାଥର ବଲାତେ କୀ ବୋବାର?



রচনামূলক প্রশ্ন

১. সূজনালি সুস্থ রাখার উপায়গুলো ব্যাখ্যা কর।



বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইউরিয়া কোথার ভৈরি হয়?

ক. বৃক্ষে খ. ঘৃতে গ. দেহকোষে ঘ. রেনাল ধমনিতে

২. কৃকে শারীর হওয়ার আশঙ্কা কয়ে—

- শারীরিক ওজন হ্রাস পেলে
- কম পানি পান করলে
- স্বল্প পরিমাণ আমিষ খেলে।

মিছের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্বীপকটি পঢ়ে ৩ ও ৫ বছর ধরের উভয় দাও।

ভাষি পানি ও অন্যান্য খাদ্য গ্রহণে নিয়মনীতি মেনে চলে না। ইদানীঁ তার মুভ্যের পরিমাণ কম হওয়াসহ কোমরের পিছনে ব্যথা হচ্ছে।

৩. ভাষির দেহে উচ্চ উপাসনটি কম হওয়ার কারণ—

- ধাত্র বেশি হওয়া
- কল কম হওয়া
- ব্যবস্থিত খাদ্য প্রহর্ষ।

মিছের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪. ভাষির শরীরের উচ্চ সমস্যার কারণ-

- শরীরে পানি আসা
- মুখনালির প্রদাহ
- প্রস্তাবের সাথে শর্করা যাওয়া

ନିଚେର କୋଣଟି ସାଧିକ?

କ. I ଓ II

ଘ. I ଓ III

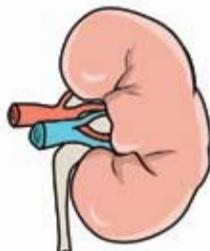
ଗ. II ଓ III

ଘ. I, II ଓ III



ସୂଜନଶୀଳ ପ୍ରଶ୍ନ

1.



ଚିତ୍ର: A

କ. ମେଡ୍ରଲା କୀ?

ଘ. ପ୍ରୋମେରୁଲ୍ସ ବଲକେ କୀ ବୋକାଇ?

ଗ. ଚିତ୍ର A କେ ଛାଁକନିର ସାଥେ ଫୁଲନା କରା ହେ କେଳ? ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର.

ଘ. ଚିତ୍ର A ବିକଳ ହଲେ କୀଭାବେ ଏଇ ପ୍ରତିରୋଧ-ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରହପ କରିବେ ମତ୍ତାମତ ଦାଓ।

ନବମ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରଦାନ ଓ ଚଲନ



ଅଭିକୁଳ ପରିବେଶେ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସଂଧାନ, ଆସ୍ତାବକ୍ଷା, ବର୍ଣ୍ଣବିସ୍ତାର— ଏହି ଧରନେର ଶାରୀରବୃତ୍ତୀୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ମାନୁଷ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାଶ୍ଵତ ଏକ ସ୍ଥାନ ଥେବେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ଯାଏ । ସେ ପରାମିତିତେ ଶାଶ୍ଵତ ନିଜ ଚେଟୀର ସାମଗ୍ରିକଭାବେ ଏକ ସ୍ଥାନ ଥେବେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ଯାଏ, ତାକେ ଏହି ଶାଶ୍ଵତ ଚଲନ ବଲେ । ସେ ତଥା ଦେହର କାଠମୋ ପଠନ କରେ, ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଦେଇ, ବିଭିନ୍ନ ଅଜାକେ ସାହିତେ ଆହାତ ଥେବେ ହଙ୍ଗମା କରେ ଏବଂ ଚଲନେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତାକେ କଞ୍ଚାଳିତତା ବଲେ ।

ଏ ଅଧ୍ୟାତ୍ମେ ଆମରା କଞ୍ଚାଳିତତାର ପଠନ, କାଜ ଏବଂ ଏଇ ମନ୍ଦମାନେକର୍ମ ସକଳକେ ଜାନତେ ପାଇବ ।



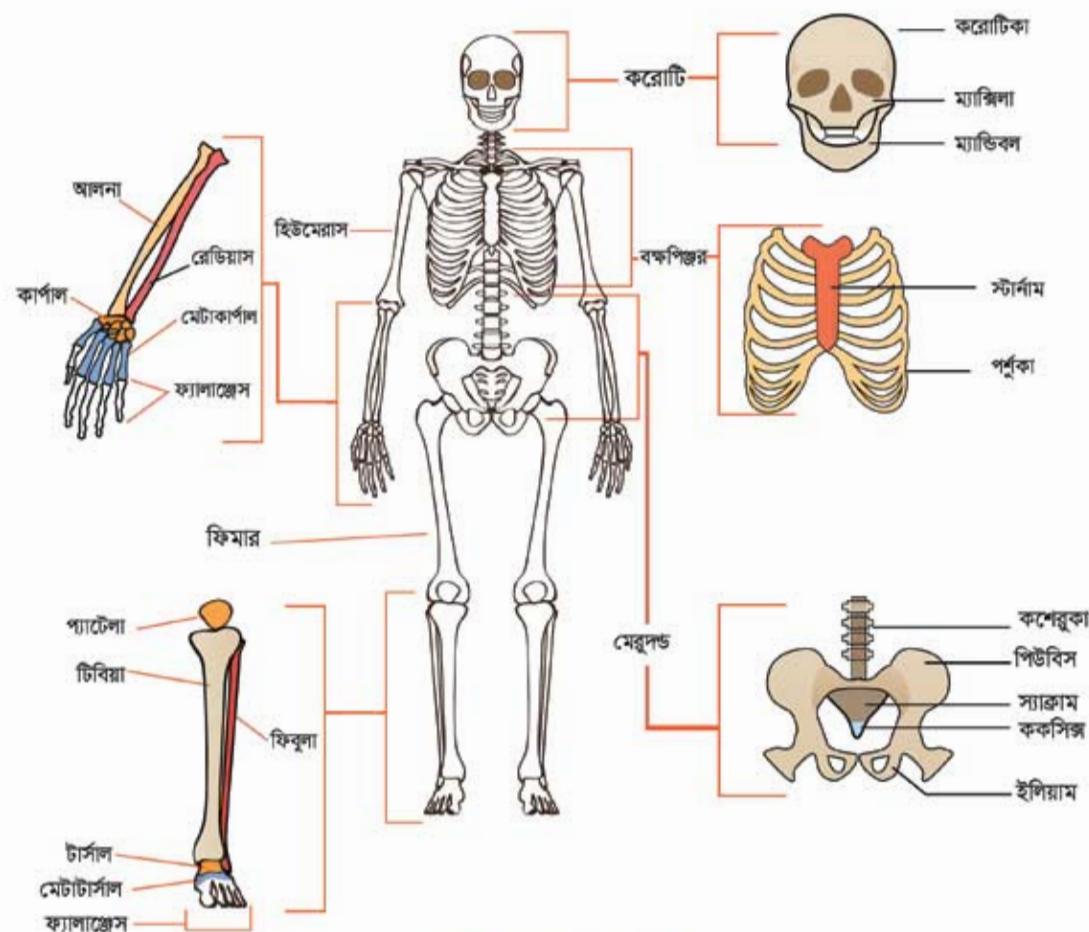
এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- মানবকর্জকালের বর্ণনা করতে পারব।
- দৃঢ়তা প্রদান এবং চলনে কর্জকালের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার অস্থি ও অস্থিসম্পর্ক কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পেশির হিমা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- টেনডন ও লিগামেন্টের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অস্টিওপোরোসিসের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার বর্ণনা করতে পারব।
- আর্ফাইটিসের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার বর্ণনা করতে পারব।
- অস্টিওপোরোসিস ও আর্ফাইটিসের কারণ অনুলক্ষণ করতে পারব।
- মানবকর্জকালের বিভিন্ন অংশের চিহ্ন অঙ্কন করে চিহ্নিত করতে পারব।
- অস্থির সুস্থিতা রক্ষার সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারব।

୨.୧ ମାନସକର୍କାଳେର ସାଧାରଣ ପରିଚିତି

ଏହାଟି ଦୂର ତୈରି କରାତେ ହଜେ ଅଧିକ ଏବଂ କାଠାମୋ ବାଲାତେ ହସ୍ତ ଆଶାଦେର ଦେହର କାଠାମୋ ହଜେ କରକାଳ (Skeleton)। ଲଧା, ଛୋଟ, ଚାଷ୍ଟା ଏବଂ ଅସମାନ ମୋଟ ୨୦୬ ଟି ଅନ୍ଧି ଦିଲ୍ଲେ ପୂର୍ବଦୟନ୍ତ ମାନୁଦେହର କରକାଳ ଗଠିତ ହସ୍ତ । ଶିଶୁର କରକାଳେ ଅନ୍ଧିର ସଂଖ୍ୟା ଆରା ବେଳି ଥାକେ । ଏହି ମାନସଦେହକେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଦେଇ । ହରପିଣ୍ଡ, ମୁସଫୁଲ, ପାକଷଳୀ, ଅଙ୍ଗ, ମନ୍ତ୍ରିକ— ଏହକମ ଦେହର କୋମଳ ଅଂଶଗୁରୁତ୍ୱରେ ଅନ୍ଧି ଦିଲ୍ଲେ ତୈରି ଆବରଣ ସୂରକ୍ଷିତ ରାଖେ ।

ଅନ୍ଧି ଦିଲ୍ଲେ ତୈରି ଶତ କାଠାମୋ ଛାଡ଼ା ଦେହର ଶିଥିତିଶୀଳ ଆକାର ସହିବ ନାହିଁ । ମାନସଦେହର ସବ ଅନ୍ଧି ଏବଂ ଏଦେର ସାଥେ ସଜ୍ଜୁକ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ମିଳେ କରକାଳ ତୈରି ହସ୍ତ । ଅନ୍ଧି ଏବଂ ତତ୍ତ୍ଵାନ୍ଧି ଦୁଟୋଟି କରକାଳେର



ଚିତ୍ର ୨.୦୧: ମାନସ କରକାଳ

অংশ। অস্থিসম্বিন্দি অস্থিতন্ত্রের অংশগুলোকে সংযুক্ত করে এবং অস্থির চলনে সাহায্য করে। অস্থিগুলো প্রতিক মাংসপেশি দিয়ে পরস্পর সংলগ্ন থাকায় ইচ্ছামতো অঙ্গ সঞ্চালন এবং চলাফেরা করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ অস্থি এবং তরুণাস্থি, পেশি, পেশিবন্ধনী এবং অস্থিবন্ধনী নিয়ে কঞ্জালতন্ত্র গঠিত।

মানবদেহের কঞ্জালতন্ত্রকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়, বহিঃকঞ্জাল এবং অন্তঃকঞ্জাল।

বহিঃকঞ্জাল (Exoskeleton): কঞ্জালের এ অংশগুলো বাইরে অবস্থান করে। নখ, চুল, কিংবা লোম এর অন্তর্ভুক্ত।

অন্তঃকঞ্জাল (Endoskeleton): কঞ্জাল বলতে আমরা আসলে শরীরের ভিতরকার অন্তঃকঞ্জালই বুঝি। কঞ্জালের এ অংশগুলো আমরা বাইরে থেকে দেখতে পাই না। অস্থি এবং তরুণাস্থি দিয়ে এই কঞ্জালতন্ত্র গঠিত।

9.1.1 দৃঢ়তা প্রদান এবং চলনে কঞ্জালের ভূমিকা

কঞ্জালের সাহায্যে নিম্নলিখিত কাজ সম্পন্ন হয়:

- দেহকাঠামো গঠন:** কঞ্জাল মানবদেহকে একটি নির্দিষ্ট আকার ও কাঠামো দান করে। এটি নিচের অঙ্গগুলোর সাথে উপরের অঙ্গগুলোর সংযুক্তি সাধন করে।
- রক্ষণাবেক্ষণ ও ভারবহন:** মস্তিষ্ক করোটির মধ্যে, মেরুরজ্জু মেরুদণ্ডের ভিতরে এবং হৎপিণ্ড ও ফুসফুস বক্ষগহ্বরে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকে। পেশিগুলো কঞ্জালের সাথে আটকে থাকে এবং দেহের ভারবহনে সাহায্য করে।
- নড়াচড়া ও চলাচল:** হাত, পা, স্কন্ধচক্র ও শ্রোণিচক্র নড়াচড়ায় সাহায্য করে। এ কাজে পেশিত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অস্থির সাথে পেশি আটকানোর ফলে অস্থি নাড়ানো সম্ভব হয় এবং আমরা চলাচল করতে পারি।
- লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদন:** অস্থিমজ্জা থেকে লোহিত রক্তকণিকা উৎপন্ন হয়।
- খনিজ লবণ সঞ্চয়:** ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ফসফরাস ইত্যাদি খনিজ লবণ অস্থি সঞ্চয় করে রাখে। এতে অস্থি শক্ত এবং মজবুত থাকে।

9.1.2 অস্থি, তরুণাস্থি এবং অস্থিসম্বিন্দি (Bone, Cartilage এবং Joint)

অস্থি (Bone)

অস্থি যোজক কলার বূপান্তরিত রূপ। এটি দেহের সবচেয়ে দৃঢ় কলা। অস্থির মাত্কা বা আন্তঃকোষীয় পদার্থ এক ধরনের জৈব পদার্থ দিয়ে গঠিত। মাত্কার মধ্যে অস্থিকোষগুলো ছড়ানো থাকে। একদিকে

অস্থির পুরাতন অংশ ক্ষয় হতে থাকে এবং অন্যদিকে অস্থির মধ্যে নতুন অংশ পঠন হতে থাকে। এই ভারসাম্য নষ্ট হলে অস্থির বিভিন্ন ধরনের গ্রোগ হয়। বয়স বাঢ়লে অবশ্য এমনিতেই ভারসাম্যটি হাড় কঙ্গের দিকে বেশি ঝুকে পড়ে। অস্থি মূলত ফসফরাস, সোডিয়াম, পটাশিয়াম এবং ক্যালসিয়ামের বিভিন্ন ধোপ দিয়ে তৈরি। এছাড়া অস্থিতে প্রায় 40-50 ভাগ পানি থাকে। জীবিত অস্থিকোষে 40% জৈব এবং 60% অজৈব গ্রোগ পদার্থ নিয়ে গঠিত। অস্থি বৃক্ষির জন্য ভিটামিন 'ডি' এবং ক্যালসিয়াম সমূক্ষ খাবার প্রয়োজন। এসব খাবারের অভাবে অস্থির চ্যান্সেলিক বৃক্ষি ব্যাহত হয়। সুর্যের আলো হতে অবস্থিত কোলেস্টেরলের এমন রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায়, যা যত্ন এবং বৃক্ষ আরও কিছু খারাবাহিক পরিবর্তনের পর ভিটামিন ডি সংপ্রেৰণ করে। তাই গর্ভাশত পরিয়াপ সুর্যালোকের সংশ্লিষ্ট আসা উচিত। আরা সবসময় ঘরে বসে থাকেন বা সারা শরীর আবৃত্তকারী পোশাক পরেন, তাদের ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

ত্বরণাস্থি (Cartilage)

ত্বরণাস্থি অস্থির মতো শক্ত নহ। এগুলো অপেক্ষাকৃত নরম এবং স্থিতিস্থাপক। এটি যোজক কলার ডিম্বরূপ। এর কোষগুলো একক বা জোড়ার জোড়ার খুব ঘনভাবে স্থিতিস্থাপক মাতৃকাতে বিস্তৃত থাকে। ত্বরণাস্থি কোষগুলো থেকে কঙ্কিন নামক এক ধরনের শক্ত, ইবনজহ রাসায়নিক বস্তু বের হয়। মাতৃকা কঙ্কিন দিয়ে গঠিত, এর বর্ণ হালকা নীল। জীবিত অবস্থায় ত্বরণাস্থি কোষের প্রোটোপ্লাজম খুব স্বচ্ছ এবং নিউক্লিয়াসটি গোলাকার থাকে। কঙ্কিলের মাঝে প্রত্যনির্দেশ ঘোষণা করে। এগুলোকে ক্যাপসুল বা ল্যাকিউনি বলে। এর ডিতর কঙ্কিলগ্লাস্ট বা কঙ্কিলসাইট থাকে। সব ত্বরণাস্থি একটি তক্ষুময় যোজক কলা নির্মিত আবরণী দিয়ে পরিবেষ্টিত থাকে, একে পেরিকঙ্কিয়াম বলে। এই আবরণটি দেখতে চকচকে সাদা, তাই আমরা সাধারণত ত্বরণাস্থিকে সাদা, মীলাক এবং চকচকে দেখতে পাই। আমাদের দেহে করেক রকম ত্বরণাস্থি আছে (যেমন কানের পিনার ত্বরণাস্থি)। ত্বরণাস্থি বিভিন্ন অস্থির সংযোগস্থলে, কিংবা অস্থির কিছু অংশে উপস্থিত থাকে।



একক কাজ

কাজ: অস্থি ও ত্বরণাস্থির মধ্যে পার্শ্বক্য কর।

অস্থিসংযোগ (Bonejoint বা Joint)

দুই বা ততোধিক অস্থির সংযোগস্থলকে অস্থিসংযোগ বলে। প্রতিটি অস্থিসংযোগ অস্থিগুলো একরকম স্থিতিস্থাপক রক্তবুর মতো বন্ধনী দিয়ে দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকে, ফলে অস্থিগুলো সহজে সঞ্চিহ্নল থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। সঞ্চিহ্নল বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনে সাহায্য করে।

আমাদের শরীরে সব অস্থিসম্বিং এক ব্রহ্ম নয়। এদের কোনোটি একেবারে অনড়, যেমন আক্ষঃকল্পেবুকীয় অস্থিসম্বিং, কোনোটি আবার সহজে সঞ্চালন করা যায়, যেমন হাত এবং পায়ের অস্থিসম্বিং।

সাইনোডিয়াল অস্থিসম্বিং (Synovial Joint):

একটি অস্থিসম্বিংতে দুটি মাঝ অস্থির বিহীনগুণে এসে যিলিত হয়ে একটি সরল সাইনোডিয়াল অস্থিসম্বিং পঠন করে। আর যখন দুয়ের অধিক অস্থি যিলিত হয়, তখন একে জটিল সাইনোডিয়াল অস্থিসম্বিং বলে।

সাইনোডিয়াল অস্থিসম্বিংর অংশগুলো হলো: তরুণাস্থিতে আবৃত অস্থিপ্রান্ত, সাইনোডিয়াল রস (Synovial fluid) এবং অস্থিসম্বিংকে দৃঢ়ভাবে আটকে রাখার জন্য অস্থিবন্ধনী বা লিগামেন্ট বেতিত একটি মজবুত আবরণী বা ক্যাপসুল। অস্থিসম্বিংতে সাইনোডিয়াল রস এবং তরুণাস্থি ধাকাতে অস্থিতে অস্থিতে ঘর্ষণ এবং তরঙ্গনিত ক্ষয় হ্রাস পায় ও অস্থিসম্বিং নড়াচড়া করতে কম শক্তি ব্যবহ হয়।

অস্থিসম্বিং করেক ধরানোর যেমন:

(a) নিশ্চল অস্থিসম্বিং (Fixed Joint): নিশ্চল অস্থিসম্বিংগুলো অনড়, অর্ধাং এপুলো নাড়ানো যায় না, যেমন করোটিকা অস্থিসম্বিং।

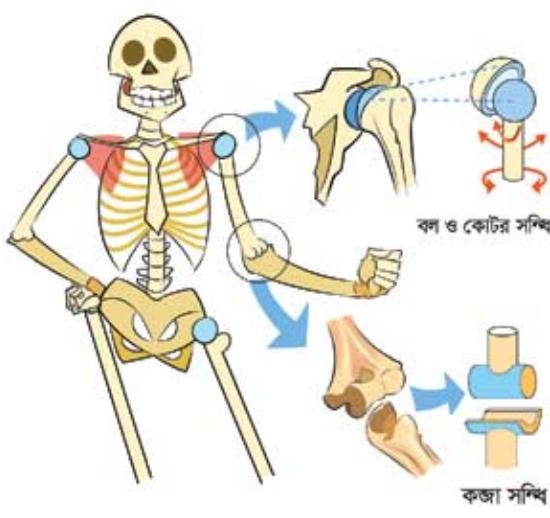
(b) দ্রুত সচল অস্থিসম্বিং (Slightly movable Joint): এসব অস্থিসম্বিং একে অন্যের সাথে সংযুক্ত থাকলেও সামান্য নাড়াচড়া করতে পারে, ফলে আমরা দেহকে সামনে, পিছনে এবং পাশে বাঁকাতে পারি। যেমন মেরুদণ্ডের অস্থিসম্বিং।

(c) পূর্ণ সচল অস্থিসম্বিং (Freely movable Joint): এ সকল অস্থিসম্বিং সহজে নড়াচড়া করানো যায়। এ জাতীয় অস্থিসম্বিংর মধ্যে বল ও কোটিরসম্বিং, কবজাসম্বিং প্রধান। সাইনোডিয়াল অস্থিসম্বিংই কেবল পূর্ণ সচল হতে পারে।

(i) বল ও কোটিরসম্বিং (Ball & Socket Joint): বল ও কোটিরসম্বিংতে সন্ধিস্থলে একটি অস্থির মাঝার মতো গোল অংশ অন্য



চিত্র ৯.০২ সাইনোডিয়াল সম্বিং



চিত্র ৯.০৩: বল ও কোটির এবং কবজা অস্থিসম্বিং

অস্থির কোটের এমনভাবে স্থগিত থাকে যেন অস্থিটি বাঁকানো, পাশে চালনা করা কিংবা সকল দিকে নাড়ানো সম্ভবপ্রয় হয়। এটি এক ধরনের সাইনেতিয়াল অস্থিসম্বিধি। উদাহরণ: কাঁধ এবং উরুসম্বিধি।

(ii) কংজা সম্বিধি (Hinge Joint): কংজা যেমন দরজার পাণ্ডাকে কাঠামোর সাথে আটকে রাখে, সেবুগ কংজার মতো সম্বিধি কংজা সম্বিধি বলে। যেমন: হাতের কনুই, জানু এবং আঙুলগুলিতে এ ধরনের সম্বিধি দেখা যায়। এসব সম্বিধি কেবল এক দিকে নাড়ানো যায়। এগুলোও সাইনেতিয়াল অস্থিসম্বিধির উদাহরণ।



একক কাঁজ

কাঁজ: মানবকঙ্কালের চির অংশ করে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

৯.২ পেশি

তোমরা সপ্তম শ্রেণিতে বিভিন্ন পেশি সম্পর্কে জেনেছ। অঙ্গস্তরীয় অঙ্গ এবং রক্তবালির গায়ের অনেকিক পেশি, হৃৎপিণ্ডের হৃৎপেশি এবং অস্থিগাত্রের সাথে লাগানো ঐচ্ছিক কংকাল পেশি নিয়ে পেশিতত্ত্ব পঠিত। পেশিতত্ত্ব বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাঁজ করে থাকে। যেমন:

- অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন, চলাফেরায় সহায়তা, অঙ্গবিন্যাস এবং ভারসাম্য রক্ষা করা।
- কংকালতরঙ্গের সাথে যৌথভাবে দেহের নির্দিষ্ট আকার গঠন করা।
- পেশিতে প্রাইকোজেন সঞ্চয় করে জীবিত জরুরি প্রয়োজনে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করা।
- বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হৃৎপেশির হৃৎপিণ্ডের স্থান এবং রক্ত সঞ্চালনের দায়িত্ব পালন করা।
- মসমূত্র জ্বাল, পরিপাকনালির মধ্য দিয়ে খাদ্যবস্তুর চলন প্রত্যক্ষ স্বরূপে কাঁজে ভূমিকা পালন।

৯.২.১ ঘানুবের চলনে অস্থি ও পেশির ভূমিকা

মানুষের চলনে অস্থি ও পেশির ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। অস্থি দেহের কাঠামো কংকাল গঠন করে, আর পেশিতত্ত্ব এই কাঠামোর উপর আঞ্চালন তৈরি করে। ঐচ্ছিক পেশি টেক্টন নামক দৃঢ় এবং স্থিতিস্থাপক এক ধরনের পেশি দিয়ে অস্থিকে আটকে রাখে। জ্বালবিক উভ্রেজনা পেশির মধ্যে উকীপনা জাগানোর ফলে পেশি সংকুচিত হয় আবার উকীপনা সরিয়ে দিলে পেশি পুনরায় শিথিল বা প্রসারিত হয়। এই সংকোচন এবং প্রসারণের সাহায্যে সংলগ্ন অস্থির নড়াচড়া সম্ভব হয়। এভাবে পেশি কোনো অঙ্গকে

প্রসারিত করে, কোনো অঙ্গকে ভাঁজ করে, কোনো অঙ্গকে উপরের দিকে উঠায়, কোনো অঙ্গকে নিচে নামায় বা কোনো অঙ্গকে প্রধান অঙ্গের চারপাশে, ডালে-বাঁয়ে ঘোরায়।

একটি উদাহরণ দিয়ে পেশির কার্যক্রম ব্যাখ্যা করা যাব। কনুই বাঁকা বা সোজা করতে হলে ঐচ্ছিক পেশি কীভাবে কাজ করে সেটি শুরু কর। কনুই বাঁকা করতে হলে ইচ্ছাধীন মাঝুর তাফ্ফনায় বাইসেপস পেশি সংকুচিত হয় এবং ট্রাইসেপস পেশি শিখিল হয়ে প্রসারিত হয়। কলে রেডিয়াস ও আলনাকে হিউমেরাসের কাছে নিয়ে আসে। কনুই সোজা করতে হলে ঠিক তার বিপরীত কার্যক্রমটি ঘটে, অর্থাৎ ইচ্ছাধীন মাঝুর তাফ্ফনায় ট্রাইসেপস পেশি সংকুচিত হয় এবং রেডিয়াস ও আলনাকে টেনে সোজা করে হিউমেরাসের সাথে প্রায় এক সরলরেখার নিয়ে আসে। এ সময় বাইসেপস পেশি শিখিল হয়ে প্রসারিত হয়। এভাবে বাইসেপস এবং ট্রাইসেপস পেশির সংকোচন এবং ঝুঁঁত হওয়ার মাধ্যমে আমরা কনুই ভাঁজ করতে আর খুলতে পারি। এভাবে দেহের বিভিন্ন পেশি কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন ঘটে।

৯.2.2 টেনডন (Tendon) ও লিগামেন্ট বা অস্থিবন্ধনী (Ligament)

আমরা জ্বোদের যখন বলি পেশি হাড়ের সাথে আটকে থাকে অথবা একটি হাড়ের সাথে অন্য হাড় বন্ধনীর সাহায্যে আটকে থাকে, তখন সেটি কীভাবে ঘটে তা নিয়ে জ্বোদের নিচয় কৌতুহল হয়। মাস্কপেশির প্রাক্তনাগ দাঢ়ি বা রক্ষুর মতো শক্ত হয়ে অস্থির গাঁওয়ের সাথে সংযুক্ত হয়। এই শক্ত প্রাক্তকে টেনডন বলে। টেনডন ঘন, খেত তন্তুয় বোজক টিসু দিয়ে গঠিত। এ ধরনের টিসুর অন্তর্কোষীয় পদার্থ বা যান্ত্রিক শাখা-প্রশাখাবিহীন খেততন্তু ছড়ানো থাকে। এরা গুচ্ছকারে এবং পরস্পর সম্বন্ধীয়ভাবে বিন্যুত থাকে। অনেকগুলো তন্তু একত্রে আটি বা বাতিল তৈরি করে। আটিগুলো একত্রে দলবদ্ধ হয়ে আটিগুচ্ছ তৈরি করে। আটিগুচ্ছগুলো আবার তন্তুয় টিসুগুচ্ছ বা আরিওলার টিসু দিয়ে বেষ্টিত হয়ে আঁকা বড় আটিতে প্রেসিবদ্ধ হয়। আরিওলার টিসুর দৈর্ঘ্য বরাবর টেনডনের মধ্যে অন্তর্লালি, সমিকানালি এবং মাঝু প্রবেশ করে। টেনডনের স্থিতিস্থাপকভা তুলনামূলকভাবে বেশ কম।



চিত্র ৯.৩৪: বাতু নাড়ার কাছে বাইসেপস ও ট্রাইসেপস পেশির বিপরীত ক্রিয়া পদ্ধতি

পেশি এবং টেনডনের সংযোগস্থলে টেনডন তন্তুগুলো পেশিতন্তুর সাথকোলেমায় সংযোজিত হয়। পেশি এবং টেনডনের সংযোগকে আরও শক্তিশালী করার জন্য টেনডনের আঁতিশুচ বেটেনকারী অ্যাগ্রিগুলার টিস্যু, পেশি বাণিল বা আঁতির আবরক টিস্যুর সাথে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ তৈরি করে। টেনডন বেশ শক্ত। অস্থি বা পেশির ভূলনায় টেনডনের তেজে বা ছিঁড়ে ঘাওয়ার সংক্ষেপ অনেক কম, তবে কোনোভাবে যদি তা ছিঁড়ে যায়, তাহলে সহজে জোড়া লাগে না। পেশিবন্ধনী পেশিথালে রক্তুর মতো শক্ত হয়ে অস্থির সাথে সংযুক্ত থাকে। পেশি অস্থির সাথে আবর্দ্ধ হয়ে দেহকাঠামো পঠনে, দৃঢ়তা দানে, অস্থিবন্ধনী গঠনে সাহায্য করে এবং চাপটানের (tensile strength) বিরুদ্ধে যাঞ্চিক প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

পাতলা কাপড়ের মতো কোমল অথচ দৃঢ়, স্থিতিস্থাপক বে বন্ধনী দিয়ে অস্থিগুলো পরম্পরার সাথে সংযুক্ত থাকে তাকে অস্থিবন্ধনী বা লিগামেন্ট বলে। লিগামেন্ট খ্রেততশু এবং শীততশু এই দুই ধরনের ইলাস্টিক তন্তু দিয়ে গঠিত। এতে গীতবর্ণের স্থিতিস্থাপক তন্তুর সংখ্যা বেশি থাকে। এর মধ্যে সরু, শারা-প্রশারা বিশিষ্ট জালাকারে বিন্দুত কর্তৃগুলো তন্তুণ ছফানো থাকে। এ তন্তুগুলো পুঁজাকারে না থেকে আলাদাভাবে অবস্থান কর। এদের স্থিতিস্থাপকতা ভূলনাযুক্তভাবে বেশি। ইলাস্টিক তন্তুগুলো ইলাস্টিন নামক প্রোটিন দিয়ে তৈরি। কজা যেমন গাঁজাকে দরজার কাঠামোর সাথে আঁতিকে রাখে। একইভাবে অস্থিবন্ধনী বা লিগামেন্ট হাড়কে আঁতিকে রাখে। এতে অজাতি সবদিকে সোজা বা বাঁকা হয়ে নড়াচড়া করতে পারে এবং হাড়গুলি স্থানচ্যুত ও বিচ্ছুরিত হয় না।



চিত্র ৯.০৫: টেনডন ও লিগামেন্ট



একক কাজ

কাজ: হকটি ধাতায় আঁক ও পুরণ কর।

বৈশিষ্ট্য	টেনডন	লিগামেন্ট
গঠন		
কাজ		
স্থিতিস্থাপকতা		

৯.৩ অস্থিসংক্রান্ত রোগ

(a) অস্টিওপোরোসিস (Osteoporosis)

তোমরা আগে জেনেছ, অস্থির গঠন এবং দৃঢ়তার জন্য ক্যালসিয়াম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অস্থির বৃদ্ধির জন্য চাই ভিটামিন এবং ক্যালসিয়াম-সমৃদ্ধ খাদ্য। অস্টিওপোরোসিস ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত একটি রোগ।

বয়স্ক পুরুষ ও নারীদের সাধারণত এ রোগটি হয়। যেসব বয়স্ক পুরুষ বহুদিন যাবৎ স্টেরওয়েডযুক্ত উষ্ণধ সেবন করেন, তাদের ও নারীদের মেনোপজ (রজ-নিবৃত্তি, অর্থাৎ মাসিক চিরতরে বন্ধ হয়ে যাওয়া) হওয়ার পর এ রোগ হওয়ার আশঙ্কা বেশি। যারা অলস জীবন যাপন করেন কিংবা কায়িক পরিশ্রম করেন, তাদেরও এ রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাছাড়া অনেক দিন ধরে আর্থ্রাইটিসে (অস্থিসম্বিত প্রদাহ) ভুগলে এ রোগ হওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশি হয়।

কারণ: দেহে খনিজ লবণ বিশেষ করে ক্যালসিয়ামের ঘাটতির কারণে এ রোগটি হয়। নারীদের মেনোপজ হওয়ার পর অস্থির ঘনত্ব এবং পুরুত্ব কমতে থাকে।

অঙ্কণ

- অস্থি ভঙ্গুর হয়ে যায়, ঘনত্ব কমতে থাকে,
- পেশির শক্তি কমতে থাকে,
- পিঠের পিছন দিকে ব্যথা অনুভব হয়,
- অস্থিতে ব্যথা অনুভব হয়।

রোগ নির্ণয়

ঘনত্বমাপক যন্ত্রের সাহায্যে অস্থির খনিজ পদার্থের এ রোগ নির্ণয় করা হয়। রোগের প্রাথমিক অবস্থায় তেমন কোনো উপসর্গ দেখা দেয় না। হঠাতে করেই সামান্য আঘাতে কোমর বা দেহের অন্যান্য কোনো অঙ্গের হাড় ভেঙ্গে যায়।

প্রতিকার

- পঞ্চশোর্ধ পুরুষ ও নারীদের দৈনিক 1200 মিলিগ্রাম (বা চিকিৎসক নির্দেশিত অন্য কোনো পরিমাণ) ক্যালসিয়াম গ্রহণ করা।
- ননিতোলা দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য গ্রহণ করা।
- কমলার রস, সবুজ শাকসবজি, সয়াব্রিজ ও ক্যালসিয়াম-সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া।

প্রতিরোধ

- যথেষ্ট পরিমাণে সূর্যালোকের সংস্পর্শে আসা।
- ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন 'ডি' সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করা।
- নিয়মিত ব্যায়াম করা (যদি কেউ ইতোমধ্যে অস্টিওপোরোসিসে আক্রান্ত হয় তাহলে ব্যায়াম করার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে)।
- সুষম ও আঁশ্যুন্ত খাবার গ্রহণ করা।

(b) রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস বা গেঁটেবাত (Rheumatoid Arthritis)

শতাধিক প্রকারের বাতরোগের মধ্যে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস অন্যতম। সাধারণত বয়স্করা এ রোগে আক্রান্ত হয়। কম বয়সী ছেলেমেয়েদের বেলায় গিঁটে ব্যথা বা যন্ত্রণা হওয়া রিউমেটিক ফিভার বা বাতজ্বর (rheumatic fever) জাতীয় অন্য রোগের লক্ষণ হতে পারে (ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। অস্থিসম্বিন্ধির অসুখের প্রকারভেদ অনুসারে চিকিৎসার পার্থক্য হয়। দুইজন ব্যক্তি দুটি ভিন্ন প্রকারের অস্থিসম্বিন্ধির অসুখে আক্রান্ত হলেও তাদের লক্ষণ আপাতদৃষ্টিতে একইরকম হতে পারে। সেক্ষেত্রে দুজনের ভিন্ন প্রকারের চিকিৎসা প্রয়োজন। এজন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ ছাড়া বাতের চিকিৎসা করা উচিত নয়। এতে উপকারের চেয়ে অপকার বেশি হতে পারে।

লক্ষণ

- অস্থিসম্বিন্ধি বা গিঁটে প্রদাহ বা ব্যথা হয়
- অস্থিসম্বিন্ধগুলো শক্ত হয়ে যায়
- অস্থিসম্বিন্ধি নাড়াতে কষ্ট হয়
- গিঁট ফুলে যায়।

প্রতিকার

বয়স্কদের বেলায় এ রোগ পুরোপুরি সারানো যায় না। তবে নিচের ব্যবস্থাগুলো নিলে কিছুটা উপশম হয়।

- অত্যধিক পরিশ্রম আর ভারী কাজ থেকে বিরত থাকা।
- যন্ত্রণাদায়ক গিঁটের উপর কুসুম গরম স্যাঁক নেওয়া।
- অস্থিসম্বিন্ধির নড়াচড়া ঠিক রাখতে হালকা ব্যায়াম করা।
- ডাঙ্কারের পরামর্শ অনুযায়ী বেদনা উপশমকারী ঔষধ সেবন ও সঠিক চিকিৎসা দিয়ে এ রোগের কষ্ট থেকে আংশিক পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

প্রতিরোধ

- চিকিৎসক নির্দেশিত পদ্ধতিতে নিয়মিত ব্যায়াম করা।
- সুব্রহ্মণ্য ও আংশমুক্ত খাদ্য প্রয়োগ করা।



একক কাজ

কাজ: তোমার এলাকায় পদ্ধতিশোর্ধ্ব মহিলাদের জীবনধারা, খাদ্যগ্রহণের তথ্য সংশ্রে কর। তাদের মধ্যে অস্টিওপোরোসিস ও আর্টিহিটিস এর কারণ অনুসন্ধান করে লিপিবদ্ধ কর।



অনুশীলনী



সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

1. অস্থিসংরোধ কাকে বলে।
2. কবকালের পাঁচটি কাজ উল্লেখ কর।
3. টেনডন ও লিগামেন্টের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।
4. সাইনোডিয়াল সংবিহী বৈশিষ্ট্য কী?
5. অস্থি ও তরুণাস্থির মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।



রচনামূলক প্রশ্ন

1. অস্টিওপোরোসিসের কারণ ও শক্তিশালী সেৰে।



বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি অধিক বৈশিষ্ট্য?

- ক. নিখিলস্থাপক খ. তত্ত্বময়
 গ. সূচৃ ঘ. নরম

২. টেলভেনের চিন্মু হচ্ছে—

- i. সাদা বর্ণের ও উজ্জ্বল
 ii. অশাখ ও তরঙ্গিত
 iii. তত্ত্বময় ও গুচ্ছাকার

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

উদ্বিগ্নকৃতি শক্তি ৩ ও ৫ নং প্রশ্নের উভয় দাও।

৬০ বছরের বয়সী বেগম হাত-পাহের ব্যথার জন্য ডেমন কাজ করতে পারেন না। চিকিৎসক বলেছেন তার শরীরে ক্যালসিয়ামের অভাবে অস্টিওপোরোসিস রোগ হয়েছে।

৩. বয়সী বেগমের উচ্চ রোগের লক্ষণ কোনটি?

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| ক. অধিক পুরুষ বেড়ে যাওয়া | খ. অধিক তচ্ছুর হয়ে যাওয়া |
| গ. কোমরে ব্যথা অনুভব করা | ঘ. শেশিশঙ্কি বাঢ়তে থাকা |

৪. বয়সী বেগমের উচ্চ রোগটি প্রতিরোধের উপায় হচ্ছে—

- i. রামেশ্জ্যুন্ত ধারার খাওয়া
 ii. অলসময় ছীন পরিহার করা
 iii. ভিটায়িন টি সুস্থ ধারণ কর খাওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

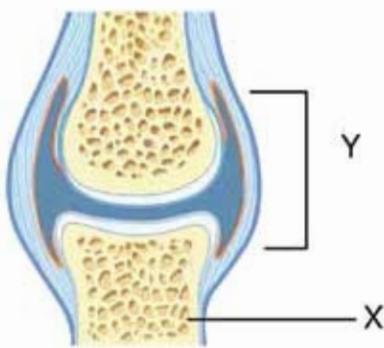


সূজনশীল প্রশ্ন

১. ১২ বছরের বিনিভা বেশ স্থান্তিকভী এবং চকচল অকৃতিতে। সে ভাবে সারা দিনের কার্যক্রমের অনেকটা সময় সৌভাগ্য, খেলাধুলা করে কাটার। একদিন সে সৌভাগ্যে শিয়ে পঞ্জে পেলে পায়ের লিপায়েটে আঘাত পায়।

- ক. অস্থি কী?
- খ. পেটেবাত বলতে কী বোবায়?
- গ. বিনিভার আঘাতপ্রাপ্ত অংশটি দরজার কজার সাথে ফুলনা করা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. বিনিভার কার্যক্রমটি সকলম করতে কীসের সময় অপরিহার্য— বিশ্লেষণ কর।

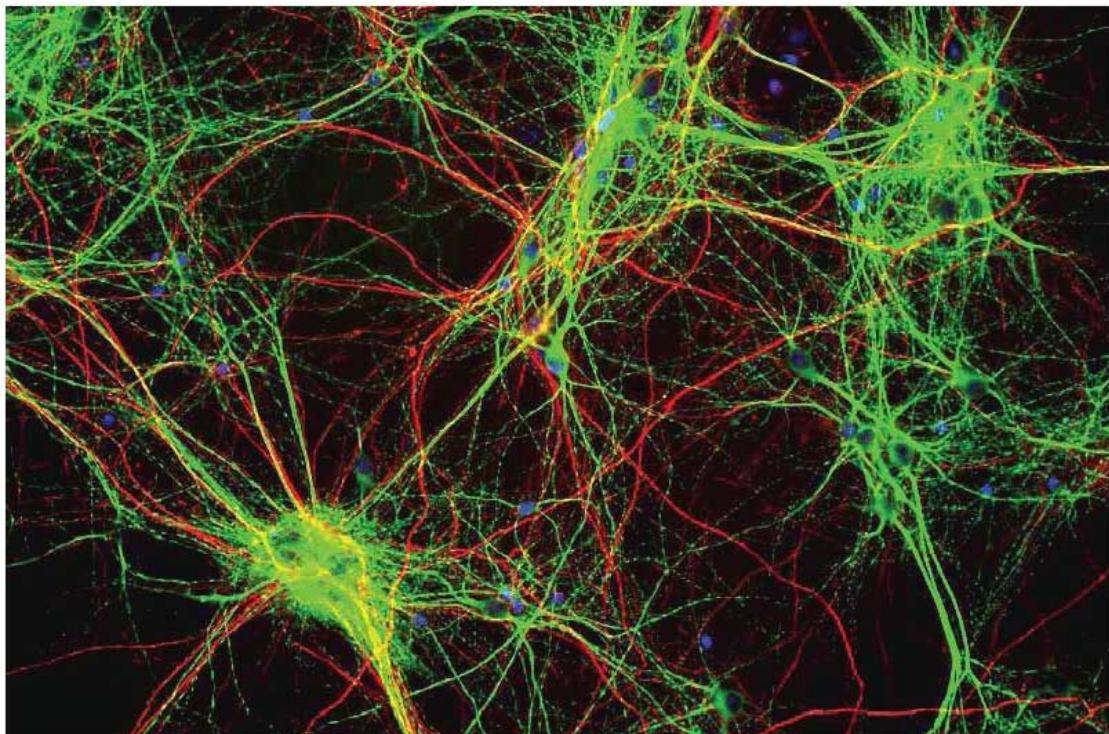
২.



- ক. টেনডন কী?
- খ. অস্টিওগ্লোরোসিস বলতে কী বোবায়?
- গ. চিয়ে দেহের X অংশটির কোধের গঠন ভিত্তি কেন? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. চিয়ে X ও Y উভয়ের সমষ্টি কার্যক্রম কীভাবে অঙ্গ সঞ্চালনে সূচিকো রাখে? বিশ্লেষণ কর।

দশম অধ্যায়

সমন্বয় (co-ordination)



ইন্দুরের মস্তিষ্কের নিউরন সেল

আমরা জানি, জীবদেহে শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া বিক্রিয়া অবিরামভাবে চলছে। এ কাজগুলো একযোগে চলে বলে এ কাজগুলোর মধ্যে সমন্বয় (co-ordination) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সমন্বয় না থাকলে জীবনে নানারকমের অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়।

উদ্দিদেহের বিভিন্ন কাজ যেমন: প্রজনন, সুস্থান, আঙ্কুরোদগম, বিপাক, বৃদ্ধি, চলন ইত্যাদি সকল শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার মধ্যে একধরনের সমন্বয় লক্ষ করা যায়। মানবদেহেও তেমনি বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় রয়েছে। উদাহরণ দেওয়ার জন্য মাঝুত্ত্ব এবং হরমোনের সমন্বয়ের কথা বলা যায়।

এ অধ্যায়ে উদ্দিদ ও মানবদেহে সংষ্টিত বিভিন্ন সমন্বয় প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।



এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- উদ্দিদের সমষ্টির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ধৰ্মীয় সমষ্টির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মানুষজনের প্রধান অংশসমূহের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সাধারণ নিউরনের পর্ণন ও কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রতিবর্তী প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আবেগ সংকলন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাপ্তির বা হরমোনের প্রধান কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাপ্তির বা হরমোনের অন্যান্যাবিকভাবের কারণ ও এটি থেকে সৃষ্টি প্রধান শারীরিক সমস্যাগুলো বর্ণনা করতে পারব।
- স্ট্রোকের কারণ ও লক্ষণ বর্ণনা করতে পারব।
- স্ট্রোকে ভাইস্কুল করণীয় ও প্রতিরোধের উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- মাঝবিক বৈকল্যজনিত শারীরিক সমস্যার লক্ষণ, কারণ ও প্রতিকার বর্ণনা করতে পারব।
- সমষ্টি কার্যক্রমে তামাক ও মাদকসমূহের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- হরমোনজনিত শারীরিক সমস্যা সৃষ্টির কারণ অনুসন্ধান করতে পারব।
- পোস্টার/লিফলেট অঙ্কন করে তামাক ও মাদক মধ্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারব।
- মানুষজনে তামাক ও মাদক মধ্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হব।

10.1 উক্তিদে সমন্বয়

প্রাণীর মতো উক্তিদের প্রতিটি কোষেও বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রম একযোগে এবং প্রতিনিয়ত চলতে থাকে। এ কাজগুলো একটি নিয়মশৃঙ্খলার মাধ্যমে সংঘটিত হয়, এ কারণে উক্তিদে জীবনে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কর্মকাণ্ডের সমন্বয় (co-ordination) অপরিহার্য। এ সমন্বয় না থাকলে উক্তিদে জীবনে বিভিন্ন রকমের অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়।

একটি উক্তিদের জীবনকালে সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জীবনচক্রের পর্যায়গুলো, যেমন অঙ্গুরোদগম, বৃদ্ধি ও বিকাশ, পুরুষায়ন, ফল সৃষ্টি, পূর্ণতা, সুস্থাবস্থা ইত্যাদি একটি সুশৃঙ্খল নিয়ম মেনে চলে। এসব কাজে আবহাওয়া এবং জলবায়ুজনিত প্রভাবকগুলোর গুরুত্বও লক্ষ করার মতো।

উক্তিদের বৃদ্ধি এবং চলনসহ বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজগুলো প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত জটিল এবং চলমান। তা সত্ত্বেও এ কাজ অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে বিশেষ নিয়ম মেনে সম্পন্ন হয়, একটি কাজ কোনোভাবেই অন্য কাজকে বাধা প্রদান করে না। লক্ষ-কোটি বছরের বিবর্তনের মাধ্যমে এমন সূক্ষ্ম সমন্বয় অর্জিত হয়েছে।

10.1.1 ফাইটোহরমোন

যে জৈব রাসায়নিক পদার্থ উক্তিদেহে উৎপন্ন হয়ে উক্তিদের বৃদ্ধি এবং বিকাশ, বিভিন্ন অঙ্গ সৃষ্টি ইত্যাদি কাজ নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে হরমোন বা প্রাণরস বলে। উক্তিদে হরমোনকে ফাইটোহরমোন (Phytohormones) বলা হয়। কেউ কেউ ফাইটোহরমোনকে উক্তিদে বৃদ্ধিকারক বস্তু (Plant growth substances) হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন। অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের মতে, যে রাসায়নিক বস্তুটি কোষে উৎপন্ন হয় এবং উৎপত্তিস্থল থেকে বাহিত হয়ে দূরবর্তী স্থানের কোষ বা কোষপুঁজের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে, সেটাই হচ্ছে হরমোন (Hormone)। উক্তিদের প্রতিটি কোষই হরমোন উৎপন্ন করতে পারে। এরা কোনো পৃষ্ঠিদ্রব্য নয় তবে স্কুদ্রমাত্রায় উৎপন্ন হয়ে উক্তিদের বিভিন্ন জৈবিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন: অক্সিন (Auxin), জিবেরেলিন (Gibberellin), সাইটোকাইনিন (Cytokinin), অ্যাবসিসিক এসিড (Abscisic acid), ইথিলিন (Ethylene) ইত্যাদি।

উল্লিখিত এসব হরমোন ছাড়াও উক্তিদে আরও কিছু হরমোন রয়েছে, যাদের আলাদা করা বা শনাক্ত করা যায়নি। এদের পেস্টুলেটেড হরমোন (Postulated hormones) বলে। এরা প্রধানত উক্তিদের ফুল ও জনন সংশ্লিষ্ট অঙ্গের বিকাশে সাহায্য করে। এদের মধ্যে ফ্লোরিজেন (Florigen) এবং ভার্নালিন (Vernalin) প্রধান। ধারণা করা হয়, ফ্লোরিজেন পাতায় উৎপন্ন হয় এবং তা পত্রমূলে স্থানান্তরিত হয়ে পত্রমুকুলকে পুক্ষমুকুলে বৃপ্তান্তরিত করে। তাই দেখা যায়, ফ্লোরিজেন উক্তিদে ফুল ফোটাতে সাহায্য করে। নিচে প্রধান ফাইটোহরমোনগুলো সফলকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

(a) অক্সিন

চার্লস ডারউইন এ হরমোন প্রথম আবিষ্কার করেন। যাকে কোল (Kogl) এবং হ্যাগেন স্নিট (Haagen Snit) পরিবর্তীতে অক্সিন নামে অভিহিত করেন। চার্লস ডারউইন উডিদের ভূগ্রমুকুলাবরণীর (Coleoptiles) উপর আলোর প্রভাব লক্ষ করেন। যখন আলো বাঁকাভাবে একদিকে লাগে, তখন ভূগ্রমুকুলাবরণী আলোর উৎসের দিকে বেঁকে যায়। অর্থাৎ অন্ধকারে এটি খাড়াভাবে বৃদ্ধি পায়। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হন যে ভূগ্রমুকুলাবরণীর অগ্রভাগে অবস্থিত এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ এর জন্য দায়ী। এই পদার্থটি অক্সিন নামক হরমোন। অক্সিন প্রয়োগ করা হলে শাখা কলমে মূল গজায় এবং অকালে ফলের ঝরে পড়া বন্ধ হয়। উডিদকোষে অক্সিনের পরিবহন নিম্নমুখীভাবে হয়। অক্সিনের প্রভাবে অভিস্রবণ এবং শ্বসন ক্রিয়ার হার বেড়ে যায়। বীজহীন ফল উৎপাদনেও এর ব্যবহার রয়েছে।

(b) জিবেরেলিন

ধানের বাকানি (Bakanae) রোগের জীবাণু এক ধরনের ছত্রাক যা ধানগাছের অতিবৃদ্ধি ঘটায়। এই ছত্রাক থেকে এক ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ নিষ্কাশিত হয়, যার প্রভাবে এরকম অতিবৃদ্ধি হয়ে থাকে। এই পদার্থটি জিবেরেলিন। অধিকাংশ জিবেরেলিন উডিদের পাকা বীজে থাকে, তবে চারাগাছ, বীজপত্র এবং পত্রের বর্ধিষ্ঠ অঞ্চলেও এটি দেখা যায়। এর প্রভাবে উডিদের পর্বমধ্যগুলো দৈর্ঘ্যে বেড়ে যায়, যার কারণে উডিদ কাণ্ডের অতিবৃদ্ধি ঘটে। এ জন্য খাটো উডিদে এই হরমোন প্রয়োগ করলে উডিদটি অন্যান্য সাধারণ উডিদ থেকেও অধিক লম্বা হয়ে যায়। ফুল ফোটাতে, বীজের সুপ্তাবস্থার দৈর্ঘ্য কমাতে এবং অঙ্কুরোদগমে এর কার্যকারিতা রয়েছে।

(c) সাইটোকাইনিন

এই ফাইটোহরমোন বা উডিদ হরমোনটি ফল, শস্য এবং ডাবের পানিতে পাওয়া যায়। কোনো কোনো উডিদের মূলেও এদের পাওয়া যায়। সাধারণভাবে এটি বিভিন্ন ঘনত্বে অক্সিনের সাথে যুক্ত হয়ে কোষ বিভাজনকে উদ্বিগ্নিত করে। এছাড়া কোষবৃদ্ধি, অঙ্গের বিকাশসাধন, বীজ এবং অঙ্গের সুপ্তাবস্থা ভঙ্গকরণে ও বার্ধক্য বিলম্বিতকরণে এ হরমোন ভূমিকা পালন করে। কোষ বিভাজনের সময় সাইটোকাইনিন হরমোনের প্রভাবে কোষের সাইটোকাইনেসিস ঘটে।

(d) ইথিলিন

এ হরমোনটি একটি গ্যাসীয় পদার্থ। এটি ফল পাকাতে সাহায্য করে। এই হরমোন ফল, ফুল, বীজ, পাতা এবং মূলেও দেখা যায়। ইথিলিন বীজ এবং মুকুলের সুপ্তাবস্থা ভঙ্গ করে, চারা গাছের কাণ্ডের বৃদ্ধি ঘটিয়ে চারা গাছকে লম্বা হতে সাহায্য করে, ফুল এবং ফল সৃষ্টির সূচনা করে। ইথিলিন পাতা, ফুল এবং ফলের ঝরে পড়া ত্বরান্বিত করে। কৃত্রিম উপায়ে ফল পাকাতেও এর ব্যবহার রয়েছে।

হরমোনের ব্যবহার

অক্সিন ও অন্যান্য কৃত্রিম হরমোন শাখাকলমে মূল উৎপাদনে সাহায্য করে। ইন্ডোল অ্যাসিটিক এসিড (IAA) নামক এক ধরনের অক্সিনের প্রভাবে ক্যামিয়ামের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। ফলে ক্যালাস নামক (Callus) এক ধরনের অনিয়ন্ত্রিত কোষগুচ্ছের সৃষ্টি হয় এবং ক্ষতস্থান পূরণ হয়। অক্সিন প্রয়োগ করে ফলের মোচন বিলম্বিত করা হয়। বীজহীন ফল উৎপাদনে অক্সিন ও জিবেরেলিনের ব্যবহার রয়েছে।

বৃদ্ধি (Growth)

উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ বিকাশের ক্ষেত্রে আলো এবং উষ্ণতার প্রভাব লক্ষণীয়। এর ফলে বিভিন্ন সংশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন উপাদান উৎপন্ন হয়ে নতুন অঙ্গের সৃষ্টি করে। আলোর উপস্থিতিতে সম্ভবত অক্সিন হরমোন নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় ফলে অন্ধকারের দিকে অক্সিনের ঘনত্ব বাঢ়ে। বিজ্ঞানীদের মতে, আলোর দিকে থাকা অক্সিন অন্ধকার দিকে চলে যায়, ফলে সেদিকে বৃদ্ধি বেশি হয় এবং আলোকিত অংশের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, কাজেই উদ্ভিদটি আলোর দিকে বেঁকে বৃদ্ধি পায়।

জ্বুমূল বা জ্বুকাণ্ডের অগ্রাংশ অভিকর্ষের উদ্দীপনা অনুভব করতে পারে। একে অভিকর্ষ উপলক্ষ্য (Geoperception) বলে। অভিকর্ষণের ফলে কোষের উপাদানগুলো নিচের দিকে স্থানান্তরিত হয়। এদের চাপ পড়ে পাশ্চায় কোষের প্রাচীরে। এর ফলে অভিকর্ষণীয় চলন দেখা যায়।

অনেক উদ্ভিদের পুক্ষ প্রস্ফুটন দিনের দৈর্ঘ্যের উপর অধিক নির্ভরশীল। যেমন চন্দ্রমল্লিকা একটি ছোটদিনের উদ্ভিদ। দীর্ঘ আলোক ঐসব উদ্ভিদে পুক্ষ উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটায়। উদ্ভিদে আলো-অন্ধকারের এ ছন্দ এক ধরনের জৈবিক ঘড়ি (biological clock)-এর উদাহরণ।

উদ্ভিদের আলো-অন্ধকারের ছন্দের উপর ভিত্তি করে পুক্ষধারী উদ্ভিদকে তিন ভাগে করা হয়:

- (a) ছোটদিনের উদ্ভিদ (Short Day Plant): পুক্ষায়নে দৈনিক গড়ে 8-12 ঘণ্টা আলো প্রয়োজন।
যেমন: চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া।
- (b) বড়দিনের উদ্ভিদ (Long Day Plant): পুক্ষায়নে দৈনিক গড়ে 12-16 ঘণ্টা আলো প্রয়োজন।
যেমন: লেটুস, বিঙ্গা।
- (c) আলোক নিরপেক্ষ উদ্ভিদ (Day Neutral Plant): পুক্ষায়নে দিনের আলো কোনো প্রভাব ফেলে না।
যেমন: শসা, সূর্যমুখী।

উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং পুক্ষায়নে আলোর মতো তাপ এবং শৈত্যেরও প্রভাব রয়েছে। দেখা গেছে অনেক উদ্ভিদের অঙ্গুরিত বীজকে শৈত্য প্রদান করা হলে তাদের ফুল ধারণের সময় এগিয়ে আসে। শৈত্য প্রদানের মাধ্যমে উদ্ভিদের ফুল ধারণ ত্বরান্বিত করার প্রক্রিয়াকে ভার্নালাইজেশন (Vernalization) বলে। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে উদ্ভিদের পুক্ষ সৃষ্টিতে উষ্ণতার প্রভাব পড়ে। শৈত্যের গম গরমকালে লাগালে ফুল আসতে বহু দেরি হয়। কিন্তু বীজ রোপণের পূর্বে 2° সেলসিয়াস থেকে 5° সেলসিয়াস উষ্ণতা

প্ৰযোগ কৰলে উডিদে স্বাভাৱিক পুকু প্ৰকৃতন ঘটে।

কাজেই তোমৰা দেখতে পাৰছ, আলো, অতিকৰ্ষ, তাল এ ধৰনেৰ উডিদে উডিদেৰ বৃথিকে প্ৰভাৱিত কৰে। এভাৱেই উডিদ ভাৱ শাৰীৰবৃত্তীয় বিভিন্ন কাজেৰ মধ্যে সমৰয় ঘটায়।

চলন (Movement)

উডিদ অন্যান্য জীবেৰ মতো অনুভূতি কৰতাসকাৰ। এজন্য অস্তৰণীণ বা বহি-উকীপক উডিদেহে যে উকীপনা সৃষ্টি কৰে, তাৰ কলে উডিদে চলন ঘটে। কতগুলো চলন উডিদেহেৰ বৃথিজনিত আৰাৰ কিছু চলন অস্তৰণীণ এবং পাৰিপার্শ্বিক উকীপকেৰ প্ৰভাৱে হয়ে থাকে। চলন যেভাৱেই হোক না কেন তা অবশ্যই কোনো না কোনো প্ৰভাৱকেৰ কাৱশে ঘটে থাকে।

উডিদ চলনকে প্ৰধানত দুভালে ভাগ কৰা যায়, সামগ্ৰিক চলন (Movement of locomotion) এবং বকুচলন (Movement of curvature)। উডিদেহেৰ কোনো অংশ যখন সামগ্ৰিকভাৱে প্ৰয়োজনেৰ ভাবিদে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন কৰে তাকে সামগ্ৰিক চলন বলে। যেমন, ছাঁক এবং উডিদ শ্ৰেণিৰ উডিদেৰ বৌলজনন কোৱে (Gametes) কিংবা জুল্পাৱে— এ ধৰনেৰ চলন দেখা বাব। ভাঙ্গড়া কিছু ব্যাকটেৰিয়া এবং কিছু শৈৰাল, যেমন:

Volvox, *Chlamydomonas* ও ডায়াটম শৈৰালে এই ধৰনেৰ চলন দেখা বাব। অন্যদিকে মাটিতে আৰম্ভ উন্নতপ্ৰেৰি উডিদ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচল কৰতে পাৰে না এবং এদেৱ অভিগুলো নানাভাৱে বেঁকে যায়। এ ধৰনেৰ চলনকে বকুচলন বলে। কাজেৰ আলোকমূল্যী চলন, মূলেৰ অশ্বকাৰমূল্যী চলন, আকৰ্ণী অবলম্বনকে পৌঁচিৱে ধৰা ইত্যাদি বকুচলনেৰ উদাহৰণ। সামগ্ৰিক চলন এবং বকুচলন আৰাৰ নানা ধৰনেৰ হয়। তাৰ মধ্যে ফটোট্ৰপিক চলন উল্লেখযোগ্য।



চিত্ৰ 10.01: উডিদেৰ আলোৰ প্ৰতি সাধা পদান

ফটোট্ৰপিক চলন বা ফটোট্ৰিপিজম (Phototropic movement or phototropism)

ফটোট্ৰপিক চলন এক ধৰনেৰ বকুচলন। উডিদেৰ কাণ্ঠ এবং শাৰ্থ-প্ৰশাৰ্থৰ সবসময় আলোৰ দিকে চলন ঘটে এবং মূলেৰ চলন সবসময় আলোৰ বিপৰীত দিকে হয়। কাজেৰ আলোৰ দিকে চলনকে পজিটিভ ফটোট্ৰপিজম এবং মূলেৰ আলোৰ বিপৰীত দিকে চলনকে নেগেটিভ ফটোট্ৰপিজম বলে।



একক কাজ

কাজ : শ্রেণিকক্ষের জানালায় টবসহ একটি উড়িদ রেখে এক সপ্তাহ পর্যবেক্ষণ কর এবং প্রাপ্ত ফলাফল মুক্তিসহ উপস্থাপন কর।



একক কাজ

কাজ : কয়েকটি অঙ্গুরিত ছোলা বীজের সাহায্যে মূলের কৃতিত্বীয় চলন পরীক্ষা কর ও প্রাপ্ত ফলাফল মুক্তিসহ উপস্থাপন কর।

10.2 প্রাণীর সমষ্টির প্রক্রিয়া

হরমোনাল প্রভাব

প্রাণীর প্রয়োজনীয় সমষ্টির কাজ সামুদ্রিক হরমোন দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। হরমোনের কারণে প্রাণী তার কার্যকলাপ অর্থাৎ নড়াচড়া বা আচরণের পরিবর্তন করে থাকে। এই বিষয়টি নিম্নে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রচুর গবেষণা হয়েছে। নারী ধরনের নালিহীন প্রশ্নি থেকে হরমোন নিঃসৃত হয়। নালিহীন প্রশ্নিগুলো একে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করে। আবার সামুদ্রিক নালিহীন প্রশ্নির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। কোনো কার্যক্রমে হরমোনকে বাদি কার্যকলার শাখিক ধরা হয়, তাহলে সার্বিকভাবে কোন শাখিক কোথাও, কতখন কাজ করবে, সেটি স্বেচ্ছাক ব্যবস্থাপক নিয়ন্ত্রণ করেন, সামুদ্রিক ডেফেন্স ব্যবস্থাপকের মতো হরমোনের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। উল্টো দিকে সামুদ্রিক বিকাশ এবং কাজের উপর রয়েছে হরমোনের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব।

প্রথমে ধারণা ছিল, সব হরমোনই বুবি উভেজক পদার্থ। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেছে সব হরমোন উভেজক নয়, এদের মধ্যে কিছু কিছু নিষেচকও আছে। হরমোন অতি অস্প পরিমাণে বিশেষ বিশেষ শারীরবৃত্তীয় কাজ বা পদ্ধতি সূচিত্বাবে নিয়ন্ত্রণ করে। এরা উভেজক বা নিষেচক হিসেবে দেহের পরিস্কৃত, বৃক্ষি এবং বিভিন্ন তিস্যুর কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যক্তির আচরণ, স্বভাব এবং আবেগপ্রবণতার উপরও হরমোনের প্রভাব অপরিসীম। এগুলো রক্তের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে উৎপত্তিস্থল থেকে দেহের

দূরবর্তী কোনো কোষ বা অঙ্গকে উদ্দীপিত করে। এজন্য এদেরকে কখনো কখনো রাসায়নিক দৃত (Chemical messenger) হিসেবেও অভিহিত করা হয়।

জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধনে নানা প্রাণী হরমোন ব্যবহার করে। পিংপড়া খাদ্যের খোঁজ পেলে খাদ্যের উৎস থেকে বাসায় আসার পথে এক ধরনের হরমোন নিঃসৃত করে, যাকে ফেরোমন বলে। এর উপর নির্ভর করে অন্য পিংপড়াগুলোও খাদ্য উৎসে যায় এবং খাদ্য সংগ্রহ করে বাসায় ফিরে আসে। এ কারণে পিংপড়াদের এক সারিতে চলাচল করতে দেখা যায়। খাদ্য শেষ হলে পিংপড়া ফেরোমন নিষ্ঠরণ বন্ধ করে দেয়, যা সহজেই বাতাসে উবে যায়, তখন অন্য পিংপড়া আর খাদ্য সংগ্রহে যায় না। কোনো কোনো পতঙ্গ ফেরোমন দিয়ে তার স্বপ্নজাতির সঙ্গীকে খুঁজে পেতে পারে। দেখা গেছে কোনো কোনো পতঙ্গ বাতাসে ফেরোমন নিঃসৃত করলে 2-4 কিলোমিটার দূর থেকে তার সঙ্গীরা আকৃষ্ট হয়। তোমরা হয়তো ফেরোমন ব্যবহার করে পোকা ধ্বংসের ফাঁদ তৈরি করার কথা শুনেছ। এ পদ্ধতিতে ফেরোমনের কারণে আকৃষ্ট হয়ে অনিষ্টকারী পোকা ফাঁদে এসে পানিতে ডুবে মারা যায়। অনিষ্টকারী পোকা দমনে এ পদ্ধতিটিই খুবই পরিবেশবান্ধব।

স্নায়বিক প্রভাব

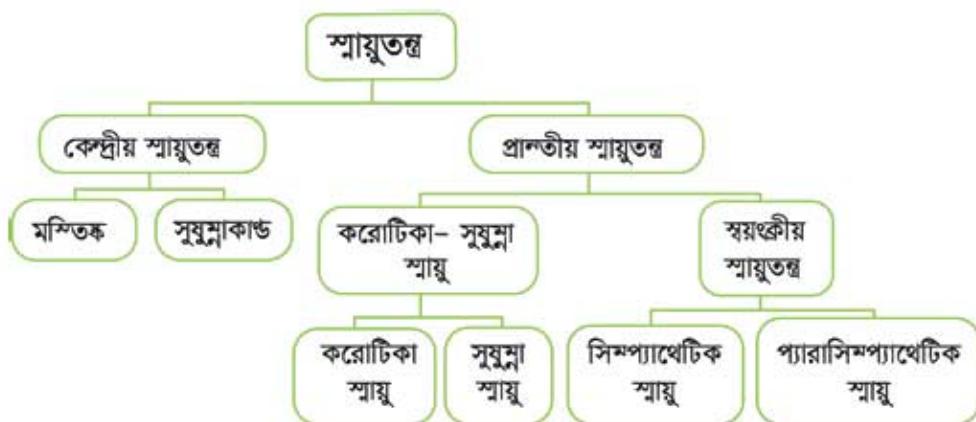
হাঁটাচলা, উঠাবসা, কথা বলা, চিন্তা করা, লেখা-পড়া করা, হাসিকাঙ্গা ইত্যাদি কাজ করার জন্য দেহের বিভিন্ন অঙ্গ অংশ নেয়। এ অঙ্গগুলোকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হলে একটি সমন্বয় ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। স্নায়ুতন্ত্র এবং হরমোনতন্ত্র মিলে দেহের এই কাজ পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ এবং সমন্বয় করে। যে তত্ত্বের সাহায্যে প্রাণী উত্তেজনায় সাড়া দিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে, দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সংযোগ রাখে, তাদের কাজে শৃঙ্খলা আনে এবং শারীরবৃত্তীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে, তাকেই স্নায়ুতন্ত্র বলে। আমাদের সারা শরীরের বিভিন্ন কাজের ভিতর সুসংবন্ধতা আনার জন্য লক্ষ লক্ষ কোষের কাজের সমন্বয় সাধন (Co-ordination) করতে হয়। দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কাজের সমন্বয় সাধনের জন্য স্নায়ুতন্ত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আমাদের দেহ চলে পরিবেশের উদ্দীপনায় সাড়া জাগানোর ফলে। দেহের বাইরের জগৎ হলো বাহ্যিক পরিবেশ এবং দেহের ভিতর হলো অভ্যন্তরীণ পরিবেশ। বাহ্যিক পরিবেশের উদ্দীপক হলো আলো, গন্ধ, স্বাদ এবং স্পর্শ— এগুলো আমাদের চোখ, কান, নাক, জিহ্বা এবং ত্বকের অনুভূতিবাহী স্নায়ুপ্রাণ্তে উদ্দীপনা জাগায়। আবার অভ্যন্তরীণ পরিবেশের উদ্দীপক হলো চাপ, তাপ এবং বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তু। এরা অভ্যন্তরীণ অঙ্গের কেন্দ্রমুখী প্রান্তে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। এই দুই ধরনের উদ্দীপকই অনুভূতি কিংবা কেন্দ্রমুখী স্নায়ুতে তাড়না সৃষ্টি করে। এই তাড়না মস্তিষ্কে পৌঁছে, মস্তিষ্ক সিদ্ধান্ত নিয়ে আজ্ঞাবাহী (বা মোটরস্নায়ু) এর মাধ্যমে পেশি কিংবা গ্রন্থিতে সাড়া জাগায় এবং কোনো কাজ করতে সাহায্য করে।

১০.৩ স্নায়ুতন্ত্র

স্নায়ুতন্ত্র দেহের বিভিন্ন অংশ এবং তন্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক করে, দেহের বিভিন্ন অংশে উদ্বিষ্টনা বহন করে এবং দেহের উদ্বিষ্টনাৰ সাড়া দিয়ে পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে।

শীঘ্ৰে স্নায়ুতন্ত্রের বিন্যাস ছকে দেওয়া হলো:



১০.৩.১ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central nervous system)

মস্তিষ্ক এবং মেরুমস্তক (বা সুষুম্নাকান্ত) দিয়ে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র গঠিত। মস্তিষ্ক করোটিকার মধ্যে সুরক্ষিত থাকে।

মস্তিষ্ক (Brain)

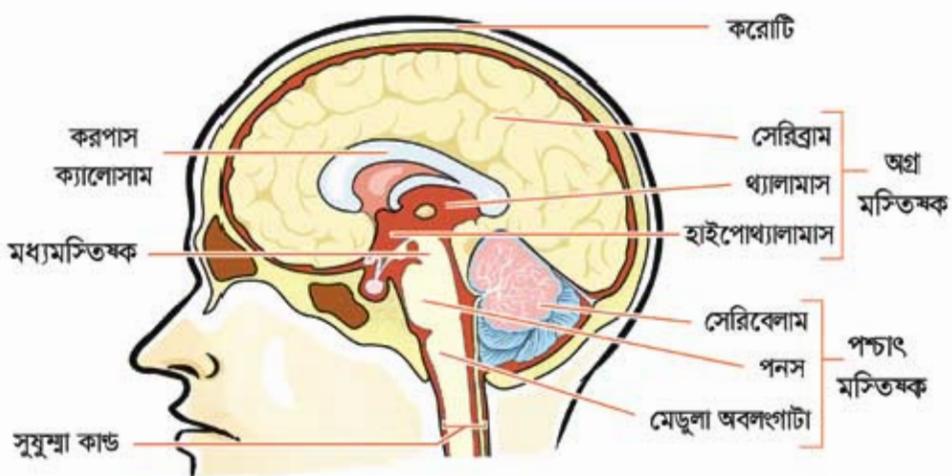
সুষুম্নাকান্তের শীর্ষে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যে স্থীর অংশে করোটিকার মধ্যে অবস্থান করে, তাকে মস্তিষ্ক বলে। মস্তিষ্ক স্নায়ুতন্ত্রের পরিচালক। মস্তিষ্ক তিনটি অংশে বিভক্ত— অগ্রমস্তিষ্ক, মধ্যমস্তিষ্ক এবং পচাংমস্তিষ্ক।

(a) অগ্রমস্তিষ্ক (Forebrain বা Prosencephalon)

মস্তিষ্কের মধ্যে অগ্রমস্তিষ্ক বা সেরিব্রাম সবচেয়ে বড় অংশ। সেরিব্রামকে পুরুষস্তিষ্কও বলা হয়ে থাকে। সেরিব্রামের ডান ও বাম অংশ দুটি সক্পূর্ণভাবে বিভক্ত। দুটি অংশের মাঝখালে বিভেদক খাঁজ থাকায় এ বিভক্তি ঘটে। এসের সেরিব্রাল হেমিস্ফের (Cerebral hemisphere) বলা হয়। সেরিব্রামের ডান ও বাম হেমিস্ফেরের মধ্যে খাঁজ থাকলেও এ দুটি অংশ একগুচ্ছ নিষ্ঠৱন দিয়ে সংযুক্ত থাকে, যার নাম কর্পোস ক্যালোসাম। বাম সেরিব্রাল হেমিস্ফের দেহের ডান অংশ এবং ডান সেরিব্রাল হেমিস্ফের দেহের বাম

অংশকে নিরূপণ করে। মন্ডিকের এ অংশটির উপরিভাগ তেজ হোলা। এটি মেনেনজেস নামক পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে। সেরিব্রামের বাইরের স্তরের নাম কর্টেজ। কর্টেজ অসংখ্য নিউরনের কোষদেহ দিয়ে গঠিত। এর রং খুসর। তাই কর্টেজের অপর নাম শ্রে ম্যাটার (Gray matter) বা খুসর পদার্থ। অপরদিকে, সেরিব্রামের গভীর স্তরটি গঠিত হয় ঐসব নিউরনের আক্রমণ দিয়ে, যা সাদা রংের মায়ালিন (myelin) আবরণে আবৃত। তাই সেরিব্রাল কর্টেজের গভীরে থাকে সাদা রংের স্তর বা হোয়াইট ম্যাটার (White matter)।

সেরিব্রাম হলো প্রত্যেক অংশ থেকে স্নায়ুতাঙ্গনা প্রাণপের এবং প্রত্যেক অংশে স্নায়ুতাঙ্গনা প্রেরণের উচ্চতর কেন্দ্র। দেহ সঞ্চালন ক্ষমতা প্রত্যেক কাজ ও অনুভূতির কেন্দ্র হলো সেরিব্রাম। এটি আমাদের চিন্তা, চেতনা, জ্ঞান, স্মৃতি, ইচ্ছা, বাকশঙ্কা ও ঝৌঝৌক পেশির কার্যকলাপ নির্মাণ করে। কোন উচ্চীগতের প্রতি কী ধরনের সাড়া দিবে, সে সিদ্ধান্ত প্রাণপে সহায়তা করে। সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষের অগ্রমন্ডিকের বিবরণ সর্বাধিক অগ্রগামী এবং সবচেয়ে বিকশিত।



চিত্র 10.02 মন্ডিকের সমন্বেদ

(b) মধ্যমন্ডিক (Midbrain বা Mesencephalon)

পচাঁ মন্ডিকের উপরের অংশ হলো মধ্যমন্ডিক। এটি অগ্র ও পচাঁ মন্ডিককে সংযুক্ত করে। মধ্যমন্ডিকের পিছনে অবস্থিত নলাকৃতি বৃহৎ অংশের নাম পনস (Pons)। এটি সেরিবেলাম ও মেডুলা অবলংগাটার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। বিভিন্ন পেশির কাজের সমন্বয়সাধন ও ভারসাম্য রক্ষা করা মধ্যমন্ডিকের কাজ। দর্শন ও শ্বেতের ক্ষেত্রেও রাখেছে মধ্যমন্ডিকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

(c) পচাঁমন্ডিক (Hindbrain বা Rhombencephalon)

এটি সেরিবেলাম, পনস ও মেডুলা অবলংগাটা নিয়ে গঠিত।

(i) **সেরিবেলাম (Cerebellum):** পনসের পৃষ্ঠাগুলি অবস্থিত খন্ডাংশটি সেরিবেলাম। এটি জান এবং বাম দুই অংশে বিভক্ত। এর বাইরের দিকে খুসর পদার্থের আবরণ এবং ডিউরের দিকে শ্বেত পদার্থ থাকে। সেরিবেলাম দেহের পেশির টাল নিয়ন্ত্রণ, চলন সম্বয় সাধন, দেহের ভারসাম্য রক্ষা, দোড়ানো এবং শাফালোর কাজে জড়িত পেশিগুলোর কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে।

(ii) **পনস (Pons):** মেডুলা অবলংগাটা এবং মধ্যমস্তকের মাঝখানে পনস অবস্থিত। এটি একগুচ্ছ মাঝুর সমষ্টিকে তৈরি।

(iii) **মেডুলা অবলংগাটা (Medulla Oblongata):** এটি মস্তিকের সবচেয়ে পিছনের অংশ। এর সামনের দিকে গ্রয়েছে পনস, পিছনের দিক সুমুজ্জ্বাকাণ্ডের উপরিভাগের সাথে যুক্ত।

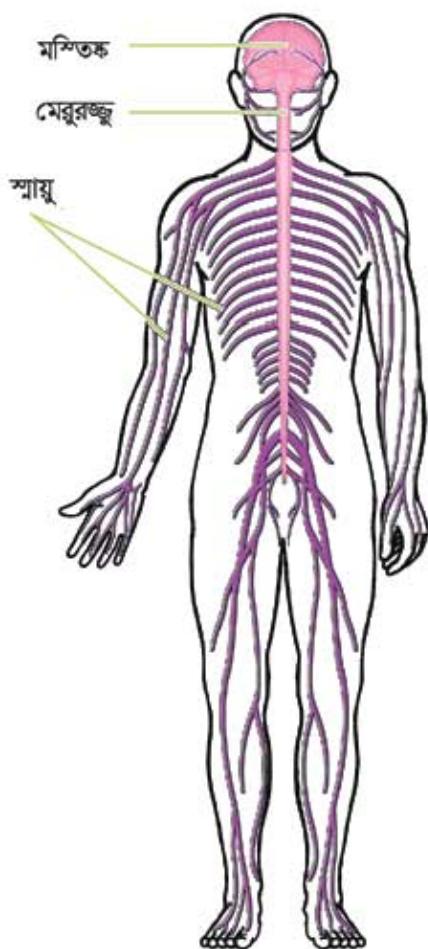
মোট বারো জোড়া করোটিক মাঝুর (Cranial nerves) মধ্যে মেডুলা অবলংগাটা থেকে আট জোড়া করোটিক মাঝুর উৎপন্ন হয়। এর মাঝুর খাদ্য প্লাইটকরণ, হৃৎপিণ্ড, সুসন্মুস, পলিল ইত্যাদির কিছু কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া এই মাঝুগুলো শ্বেত এবং ভারসাম্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে জড়িত।

মস্তিক থেকে বের হওয়া বারো জোড়া করোটিক মাঝুর মাধ্য, ঘাঢ়, মুখমণ্ডল, মুখগহ্যর, জিহ্বা, চোখ, নাক, কান ইত্যাদি অঞ্চলে বিস্তৃত। মাঝুগুলো সংবেদী, মোটর অধিবা যিষ্ঠ প্রকৃতির।

মেরুরক্ষু (Spinal cord)

মেরুরক্ষু করোটির পিছনে অবস্থিত কোরামেন ম্যাগনাম (Foramen magnum) নামক ছিঁড়ি থেকে কঠিদেশের কশেরুকা পর্যন্ত বিস্তৃত। মেরুরক্ষু বা সুমুজ্জ্বাকাণ্ড মেরুদণ্ডের কশেরুকার ডিউরের ছিঁড়িপথে সুরক্ষিত থাকে।

মেরুরক্ষুতে শ্বেত পদার্থ এবং খুসর পদার্থ থাকে। তবে এদের অক্ষমান মস্তিকের ঠিক উল্লেখ। অর্ধাংশ শ্বেত পদার্থ থাকে বাইরে আর ডিউরে থাকে খুসর পদার্থ। দুই কশেরুকার মধ্যবর্তী ছিঁড়ি দিয়ে মেরুরক্ষু



চিত্র 10.03: মানবের মাঝুত্তম

থেকে 31 জোড়া মেনুরাঞ্জীয় স্নায়ু (Spinal nerves) বের হয়। এসব ঘাড়, গলা, বুক, পিঠ, হাত ও পায়ের স্নায়ু। এসব স্নায়ু মিশ্র প্রকৃতির।

স্নায়ুকলা (Nervous tissue)

যে কলা দেহের সব ধরনের সংবেদন ও উচ্চীপনা প্রাপ্ত করে এবং তা পরিবহনের মাধ্যমে উচ্চীপনা অনুসারে উপর্যুক্ত প্রতিবেদন সূচি করে, সেটাই স্নায়ুটিস্যু বা স্নায়ুকলা। বহুসংখ্যক স্নায়ুকোষ বা নিউরনের সমন্বয়ে স্নায়ুটিস্যু গঠিত। নিউরনই স্নায়ুতরোর গঠন এবং কার্যক্রমের একক।

নিউরনের গঠন

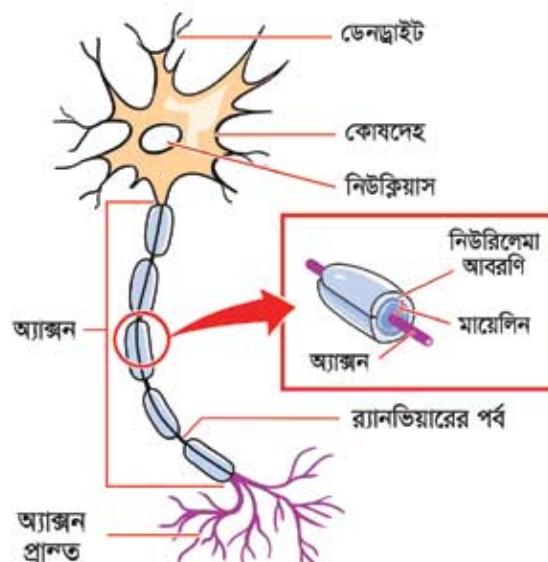
প্রতিটি নিউরন দুটি অংশ নিয়ে গঠিত— কোষদেহ এবং প্রলিখিত অংশ।

(a) কোষদেহ (Cell body): প্লাজমামেম্ব্রেন, সাইটোপ্লাজম আৰ নিউক্লিয়াস নিয়ে গঠিত নিউরনের পোলাকার, তাৱকাকার, অথবা ডিম্বাকার অংশ কোষদেহ বাবে পরিচিত। এখানে সাইটোপ্লাজমে মাইটোকণ্ড্ৰিয়া, গলজিবস্থু, সাইসোজোম, চাৰি, প্রাইকোজেন, রঞ্জক কণ্ঠাসহ অসংখ্য নিসল দানা থাকে।

(b) প্রলিখিত অংশ: কোষদেহ থেকে সৃষ্টি শাখা-প্রশাখাকেই প্রলিখিত অংশ বলে। প্রলিখিত অংশ দুধরনের:

(i) ডেনড্ৰন (Dendron): কোষদেহের চারদিকের শাখামুক্ত সূত্র প্রলিখিত অংশকে ডেনড্ৰন বলে। ডেনড্ৰন থেকে যে শাখা বের হয় তাদের ডেনড্ৰাইট বলে। একটি নিউরনে ডেনড্ৰন সংখ্যা শূণ্য থেকে শতাব্দিক পর্যন্ত হতে পারে। ডেনড্ৰাইট অন্য নিউরন থেকে স্নায়ু তাড়না প্রাপ্ত করে।

(ii) অ্যাক্সন (Axon): কোষদেহ থেকে উৎপন্ন বেশ সহা তস্কুটির নাম অ্যাক্সন। এর চারদিকে পাতলা আবরণটিকে নিউরিলেমা বলে। নিউরিলেমা এবং অ্যাক্সনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে মেহ পদার্থের একটি স্তৰ থাকে। একে মায়েলিন (Myelin) বলে। অ্যাক্সনের শেষ মাথা অ্যাক্সন টাৰমিনালে বিস্তৃত হয়ে থাকে, এবং এই টাৰমিনালগুলো দিয়ে সিন্যাপ্স মারফত অন্য নিউরনের ডেনড্ৰাইট স্নায়ু তাড়না প্রেরণ কৰা হয়।



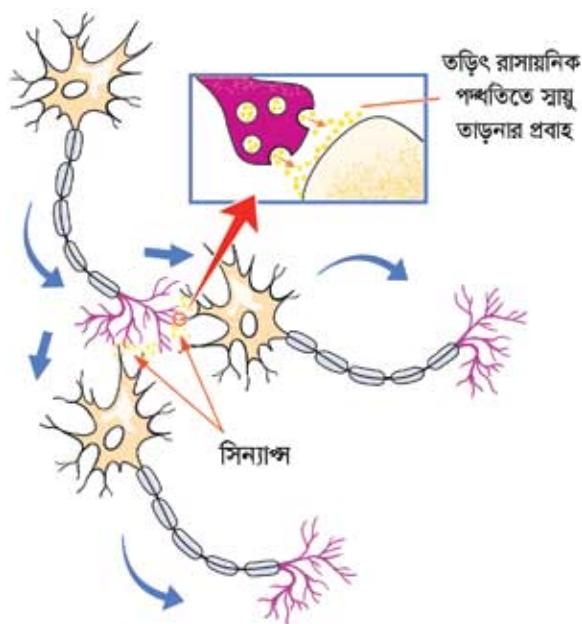
চিত্র 10.04: একটি নিউরন

বহুসংখ্যক আক্রমণ ও ডেনড্রাইট মিলিত হয়ে স্নায়ু গঠন করে।

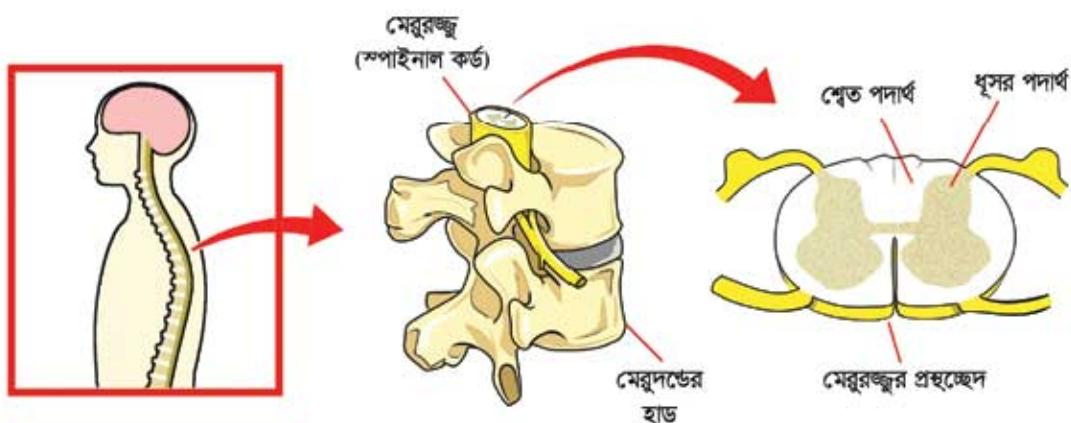
নিউরিলেমা আবরণটি অবিচ্ছিন্ন নয়। নিউরিট সূচক পর পর এটি সাথারণত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে। শুধু এই বিচ্ছিন্ন অংশে নিউরিলেমার সাথে আক্রমের প্রভাব সংপর্শ ঘটে। এই আবরণীবিহীন অংশগুলো র্যানভিয়ারের পর্ব (Node of Ranvier) নামে পরিচিত। আক্রমের মূল অঙ্কের আবরণীকে আক্রমেমা (Axolemma) বলে।

একটি নিউরনের আক্রমের টার্মিনালের সাথে বিভীষণ একটি নিউরনের ডেনড্রাইট সরাসরি যুক্ত থাকে না। এই সূচক কাঁকা সংযোগস্থলকে সিন্যাপস (Synapse) বলে। প্রকৃতপক্ষে পর পর অবস্থিত দুটি নিউরনের সম্পর্ক হলো

সিন্যাপস। আক্রম টার্মিনাল সিন্যাপসের মধ্য দিয়ে তড়িৎ রাসায়নিক (Electro chemical) পদ্ধতিতে স্নায়ু তাঢ়না প্রবাহিত হয়। সিন্যাপসে নিউরোহিটার নামক তরল পদার্থ থাকে। কোনো একটি নিউরনের মধ্য দিয়ে স্নায়ু তাঢ়না প্রবাহিত হয়ে সিন্যাপস অতিক্রম করে পরবর্তী নিউরনে বায়। অর্থাৎ এর ভিতর দিয়ে স্নায়ু উচ্চীশনা বা স্নায়ু তাঢ়না একদিকে পরিবাহিত হয়। মানুষের মস্তিষ্কে প্রায় একশত বিলিয়ন নিউরন রয়েছে এবং প্রতিটি নিউরন অন্য সাত থেকে দশ হাজার নিউরনের সাথে সিন্যাপস সংযোগ



চিত্র 10.05: স্নায়ু তাঢ়নার প্রবাহ



চিত্র 10.06: মেরুরক্ত পদ্ধতিতে

করে থাকে।

নিউরনের প্রধান কাজ উচ্চীগনা বহন করা। অনুভূতিবাহী বা সংবেদী নিউরন আহক অঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয় মাঝুতলে এবং মোটর বা আজ্ঞাবাহী নিউরন বেজীয় মাঝুতল থেকে কার্বকরী অঙ্গে উচ্চীগনা প্রেরণ করে।



একক কাজ

কাজ : একটি নিউরনের চিহ্ন এঁকে এর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

একটি টর্চ লাইট দিয়ে তোমার বন্ধুর চোখে আলো ফেল। সক্ষ করে দেখ, আলো ফেলার সঙ্গে সঙ্গে চোখের তারা ছোট হয়ে গেল। কেন এমন হলো? আলোর উচ্চীগনাজনিত তাড়না রেটিনা থেকে মন্তব্যকে পৌঁছালে এর নির্দেশে আইরিশের বৃত্তাকার বা গোলাকার পেশি সংকুচিত হয়। কলে চোখের তারা ছোট হয়ে যায়। উচ্চীগনার আকস্মিকভাবে স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার কলে তৎক্ষণাত্ম চোখ বন্ধ হয়ে যায়।

প্রতিবর্তী ক্রিয়া (Reflex action)

প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলতে উচ্চীগনার আকস্মিকভা এবং তার কারপে স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়াকে বোঝায়। হঠাৎ করে আলুলে সুচ ফুটলে অথবা হাতে গরম কিছু পড়লে আমরা মুক্ত হাতটি উচ্চীগনার স্থান থেকে সরিয়ে নিই, এটি প্রতিবর্তী ক্রিয়ার ফল। আমরা চাইলেও প্রতিবর্তী ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। প্রতিবর্তী ক্রিয়া মূলত সুস্থুরাকান্ত দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়, মন্তব্যক দিয়ে নয়। অর্থাৎ যেসব উচ্চীগনার প্রতিক্রিয়া মন্তব্যক দিয়ে না হয়ে সুস্থুরাকান্ত দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকে প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলে।

অসতর্কভাবে সেলাই করার সময় আলুলে সুচ ফুটলে তৎক্ষণিকভাবে হাত অন্তর সরে যৌগ্যার প্রতিবর্তী ক্রিয়াটি এভাবে ঘ্যাখ্যা করা যায়:

আলুলে সুচ ফুটার সময় আলুলের কলকে অবস্থিত সংবেদী নিউরন ব্যাখ্যা উচ্চীগনা প্রেরণ করে। এখানে দুক আহক অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

আলুলের কলক থেকে এ উচ্চীগনা সংবেদী নিউরনের অ্যাক্সেনের মাধ্যমে মাঝুকান্ডের ধূসর অংশে পৌঁছায়। মাঝুকান্ডের ধূসর অংশে অবস্থিত সংবেদী নিউরনের অ্যাক্সেন থেকে তড়িৎ রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে উচ্চীগনা মধ্যবর্তী বা রিলে নিউরনের মাধ্যমে মোটর বা আজ্ঞাবাহী মাঝু কোষের জেনেভাইটে প্রবেশ করে।

আজ্ঞাবাহী মাঝুর অ্যাক্সেনের মাধ্যমে এ উচ্চীগনা পেশিতে প্রবেশ করে।

আঙুলের দুকে অবস্থিত
সংবেদী নিউরনের ডেনড্রাইট
ব্যাথার অনুভূতি প্রহণ করে

অনুভূতিবাহী
সংবেদী নিউরনের
সংযোগকারী নিউরন

অ্যাক্সন

মেরুরজ্জুর প্রস্থচ্ছেদ

আজ্ঞাবাহী নিউরনের
কোষদেহ

পেশি
আজ্ঞাবাহী নিউরনের
পেশি-সংযুক্ত অ্যাক্সন প্রান্ত

- সংবেদী নিউরন
- সংযোগকারী নিউরন
- আজ্ঞাবাহী নিউরন

চিত্র 10.07: মানবদেহের প্রতিবর্তী চক্র

উদ্বীপনা স্পেশিতে পৌঁছালে পেশির সংকোচন ঘটে। ফলে উদ্বীপনাম্বল থেকে হাত মুক্ত আগনা-আপনি সহে যায়।

10.3.2 প্রাণীর মাঝুতজ্জ (Peripheral nervous system)

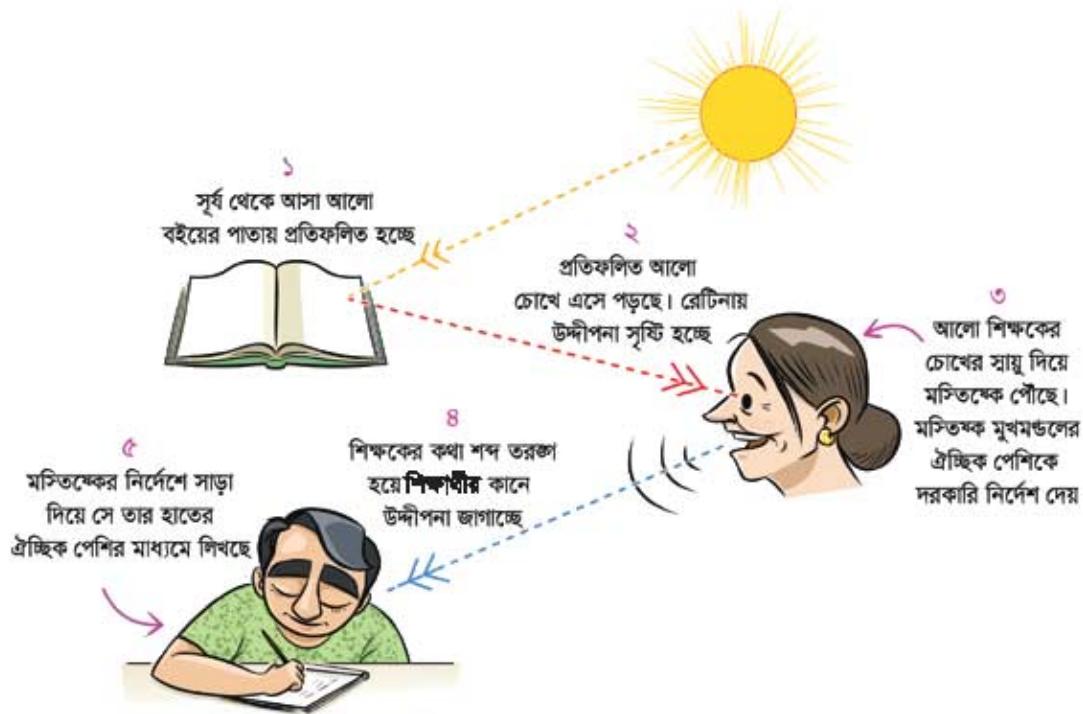
মস্তিষ্ক থেকে 12 জোড়া এবং মেরুরজ্জু বা সুস্মাৰকাণ্ড থেকে 31 জোড়া মাঝু বেৱে হয়ে আসে এবং সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর শাখায় বিভক্ত হয়ে সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। এগুলোকে একত্রে প্রাণীর মাঝুতজ্জ বলে। মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন কর্যাত্মিক মাঝু চোখ, নাক, কান, জিহ্বা, দাঁত, মুখমণ্ডল, হৎপিণ্ড, পাকস্থলী প্রভৃতি অঙ্গের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। মেরুরজ্জু থেকে উত্পন্ন মাঝুগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা করে এবং দেহের বাকি অংশ থেকে যাবতীয় অনুভূতি মস্তিষ্কে বয়ে নিয়ে যায়।

স্বয়ংক্রিয় মাঝুতজ্জ (Autonomic nervous system)

যেসব অঙ্গের উপর আমাদের কোনো নির্যাতন নেই, সেগুলো স্বয়ংক্রিয় মাঝুতজ্জ দিয়ে পরিচালিত ও নির্যাতিত হয়। দেহের ভিতরের অঙ্গগুলো, যেমন: হৎপিণ্ড, অঙ্গ, পাকস্থলী, অং্যাশয় ইত্যাদির কাজ স্বয়ংক্রিয় মাঝুতজ্জ দিয়ে পরিচালিত হয়। এসব তরঙ্গের কার্যকারিতার উপর মস্তিষ্ক ও মেরুরজ্জুর প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকায় এবং অনেকটা স্থায়ী এবং স্বতন্ত্রভাবে আপন কর্তব্য সম্পাদন করে।

উদ্বীপনা সংকলন (Transmission of Impulse)

গরুপর সংকুল অসংখ্য নিউরন তত্ত্বের ডিয়ে উদ্বীপনা বা তাড়না শেষ পর্যন্ত মস্তিকে পৌছায়। প্রতি সেকেণ্ডে এর বেগ আয় 100 মিটার তবে মাঝুর ধরনক্ষেত্রে এর তাৰতম্য হতে পারে। পরিবেশ থেকে বে সংকেত মাঝুর ডিয়ে প্রবাহিত হয়ে মস্তিকে পৌছে তাকে মাঝু তাড়না বা উদ্বীপনা বলে। নিউরনের কার্যকারিতার ফলে উদ্বীপনা প্রোজেক্সীয় অঙ্গগুলোতে সংকলিত হয়। এটি মাসপেশিতে সংকলিত হলে পৌধি সংকুচিত হয়ে সাড়া দেয়। ফলে প্রোজেক্সতো দেহের বিভিন্ন অংশ সংকলিত হয়। এই তাড়না অন্তিমে পৌছালে সেখানে রস ক্ষরিত হয়। অনুভূতিবাহী মাঝু উভেজিত হলে সেই উভেজনা মস্তিকের দিকে অগ্রসর হয়ে যত্নপূর্বোধ, স্পর্শজ্ঞান, দর্শন এ ধরনের অনুভূতি উপলব্ধি করায়।



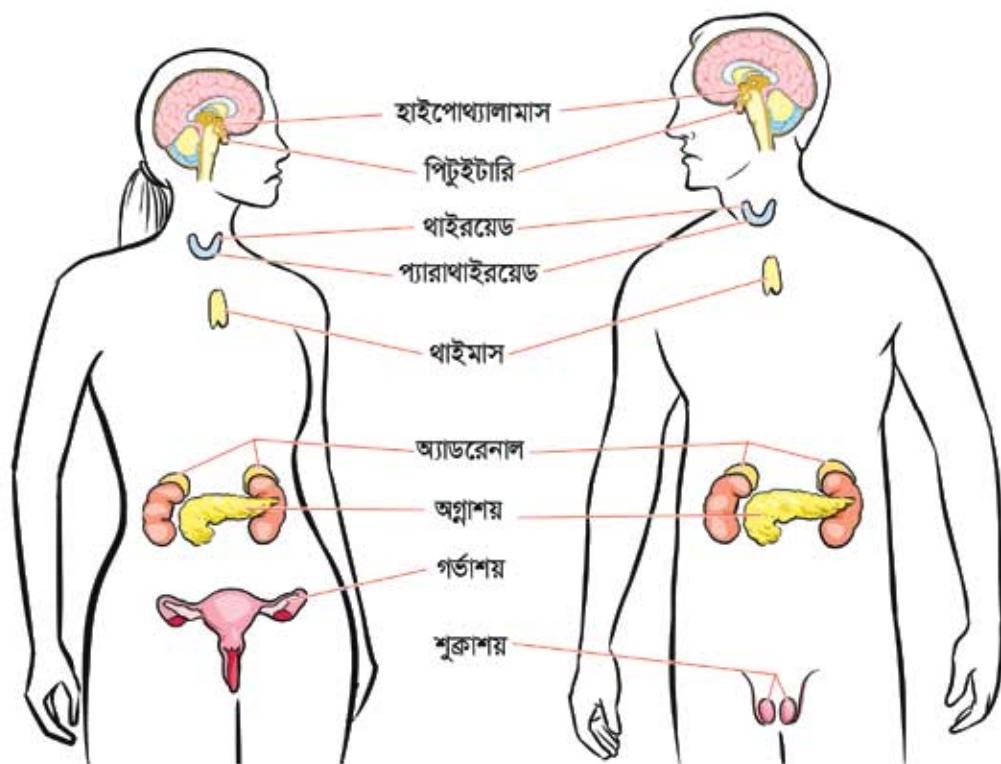
চিত্র 10.08: উদ্বীপনা সংকলন পথিক্রম

মাঝু তাড়না কীভাবে কাজ করে তা একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝানো যায়। মনে কর, শিক্ষক শুতলিপি দিচ্ছেন এবং জুড়ি শিখছে। একেন্ত্রে পুষ্টক থেকে প্রতিফলিত আলো শিক্ষকের চোখের বেটিনায় উদ্বীপনা জাগালে মাঝু তাড়নার সৃষ্টি হয়। এটা চোখের মাঝু দিয়ে মস্তিকের দৃষ্টিকেন্ত্রে পৌছে। সেখান থেকে এ তাড়না পর পর চিন্তাকেন্ত্র, স্মৃতিকেন্ত্র প্রভৃতি হয়ে মুখমণ্ডলের ঐচ্ছিক পেশিকে নির্দেশ দেয়। মুখের পেশি সংকুচিত প্রসারিত হয়ে হয়ে সাড়া দেয়। এখানে শিক্ষকের কথা বলার পেশিগুলো হলো প্রধান সাড়া অঙ্গ।

শিক্ষকের কথা বাতাসে শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি করে। এই শব্দ তরঙ্গ ছাত্রের কানের পর্দায় ডক্টোরনা জাগায়, যা শ্বেতগ্নায়ুর মাধ্যমে অস্তিক্রে প্রবণকেজে পৌছে। সেখান থেকে তাড়না ছাত্রের স্মৃতিকেজ, চিন্তাকেজ প্রভৃতি হস্তে মোটরগ্নায়ুযোগে ছাত্রের হাতের ঐচ্ছিক পোশিতে পৌছে। নির্দেশে সাড়া দিয়ে হাতের পেশি লিখতে থাকে। এখানে ছাত্রের পেশি হলো ধূধান সাড়া অঙ্গ।

১০.৪ হরমোন

মানুষ এবং বিভিন্ন প্রাণীর দেহে একধরনের বিশেব নালিবিহীন প্রাণ্য থাকে। এসব প্রাণ্য থেকে নিঃসৃত রস গঠনের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে দেহের বিভিন্ন শারীরবৃক্ষীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। নালিবিহীন প্রাণ্য নিঃসৃত এ ধরনের রসকে হরমোন বলে। হরমোন পরিবহনের জন্য শূধুক কোনো নালি নেই। হরমোন রক্তপ্রবাহনের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে নির্দিষ্ট স্থানকোষে পৌছে কোনোর প্রাপনাসায়নিক কার্যকলাপকে প্রভাবিত করে, জৈবিক কার্যবলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে। সুস্থ দেহের চাহিদা অনুসারে প্রাণ্য থেকে অবিরত ধারায় হরমোন নিঃসৃত হয়। তবে প্রয়োজন অপেক্ষা কম অথবা বেশি পরিমাণ হরমোন নিঃসৃত হলে শরীরে নানারকম অবাহিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।



চিত্র 10.09: মানবদেহের কয়েকটি মুখ্য নালিবিহীন প্রাণ্যের পরিচিতি, কাজ ও নিঃসৃত হরমোন

10.4.1 মানবদেহের কয়েকটি মুখ্য নালিবিহীন গ্রন্থির পরিচিতি, কাজ ও নিঃসৃত হরমোন

(a) পিটুইটারি গ্রন্থি (Pituitary gland)

পিটুইটারি গ্রন্থি বা হাইপোফাইসিস মস্তিষ্কের নিচের অংশে অবস্থিত। এটি মানবদেহের প্রধান হরমোন উৎপাদনকারী গ্রন্থি। কারণ একদিকে পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন সংখ্যায় যেমন বেশি, অপরদিকে অন্যান্য গ্রন্থির উপর এসব হরমোনের প্রভাবও বেশি। দেহের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নালিবিহীন গ্রন্থি হলেও এটি আকারে সবচেয়ে ছোট। এই গ্রন্থি থেকে গোনাডোট্রিপিক, সোমাটোট্রিপিক, থাইরয়েড উদ্দীপক হরমোন (TSH), এডরেনোকর্টিকোট্রিপিন ইত্যাদি হরমোন নিঃসৃত হয়। এটি অন্যান্য গ্রন্থিকে প্রভাবিত করা ছাড়াও মানবদেহের বৃদ্ধির হরমোন নির্গত করে।

(b) থাইরয়েড গ্রন্থি (Thyroid gland)

থাইরয়েড গ্রন্থি গলায় ট্রাকিয়ার উপরের অংশে অবস্থিত। এই গ্রন্থি থেকে প্রধানত থাইরক্সিন হরমোন নিঃসরণ হয়। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন থাইরক্সিন (Thyroxine) সাধারণত মানবদেহে স্বাভাবিক বৃদ্ধি, বিপাকীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। থাইরয়েডের আরেকটি হরমোন ক্যালসিটোনিন (calcitonin) ক্যালসিয়াম বিপাকের সাথে জড়িত।

(c) প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি (Parathyroid gland)

একজন মানুষের সাধারণত চারটি প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি থাকে, যার সবগুলোই থাইরয়েড গ্রন্থির পিছনে অবস্থিত। এই গ্রন্থি হতে নিঃসৃত প্যারাথরমোন (Parathormone) মূলত ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাসের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে।

(d) থাইমাস গ্রন্থি (Thymus gland)

থাইমাস গ্রন্থি গ্রীবা অঞ্চলে অবস্থিত। থাইমাস গ্রন্থি দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিকাশে সাহায্য করে। শিশুকালে এই গ্রন্থি বিকশিত থাকে পরে বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে ছোট হয়ে যায়। এই গ্রন্থি থেকে থাইমোসিন (thymosin) হরমোন নিঃসরণ হয়। পূর্ণবয়স্ক মানুষে সাধারণত এই হরমোন থাকে না, থাকলেও খুবই নিম্ন মাত্রায়।

(e) অ্যাডরেনাল বা সুপ্রারেনাল গ্রন্থি (Adrenal gland)

অ্যাডরেনাল গ্রন্থি কিডনির উপরে অবস্থিত। অ্যাডরেনাল গ্রন্থি দেহের অত্যাবশ্যকীয় বিপাকীয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এই গ্রন্থি মূলত কঠিন মানসিক ও শারীরিক চাপ থেকে পরিত্রাণে সাহায্য করে। অ্যাডরেনালিন (adrenalin) এই গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোনগুলোর একটি।

(f) আইলেটস অফ ল্যাংগারহানস (Islets of langerhans)

আইলেটস্ অফ ল্যাংগারহানস অঞ্চলশয়ের মাঝে অবস্থিত, এই কোষগুচ্ছ শরীরের শর্করা বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে। এর নালিহীন কোষগুলো ইনসুলিন (insulin) ও গ্লুকাগন (glucagon) নিঃসরণ করে যা রক্তের ফ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

(g) গোনাড বা জনন অঙ্গ গ্রন্থি

এটি মেয়েদের ডিম্বাশয় এবং ছেলেদের শুক্রাশয়ে অবস্থিত। জনন অঙ্গ থেকে নিঃসৃত হরমোন দেহের পরিণত বয়সের লক্ষণগুলো বিকশিত করতে ভূমিকা রাখে। এছাড়াও প্রাণীর জনন অঙ্গের বৃদ্ধির পাশাপাশি জননচক্র এবং যৌন আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। জনন অঙ্গ থেকে পরিণত বয়সের পুরুষ-দেহে টেস্টোস্টেরন (testosterone) এবং স্ত্রী-দেহে ইস্ট্রোজেন (estrogens) হরমোন উৎপন্ন হয়।

10.5 প্রাণরস বা হরমোনজনিত অস্বাভাবিকতা

(a) থাইরয়েড সমস্যা

সমুদ্রের পানিতে আয়োডিন থাকায় সামুদ্রিক মাছ মানুষের খাদ্যে আয়োডিনের অন্যতম মূল উৎস। আয়োডিনযুক্ত খাবার খেলে থাইরয়েড হরমোন তৈরি হয়। দেখা গেছে, সমুদ্র থেকে দূরে অবস্থিত এলাকা যেমন হিমালয়ের পাদদেশে নেপাল কিংবা বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে গলগণ্ড বা গয়টার রোগীর সংখ্যা অনেক বেশি। থাইরয়েড হরমোনের ঘাটতি হলে শিশুদের মানসিক বিকাশ বাধা পায়। গায়ের চামড়া খসখসে হয়, মুখমণ্ডল গোলাকার এবং চেহারায় স্বাভাবিক শিশুদের থেকে বৈসাদৃশ্য থাকে। আয়োডিনের অভাবে হরমোন এর উৎপাদন ব্যাহত হলে শিশুদের বৃদ্ধির বিকাশ কমে যায়। এই জন্য খাদ্যে আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়। এছাড়া কলা, ফলমূল, কচু, সামুদ্রিক মাছ ইত্যাদি খেলে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে পথও অধ্যায়ে আরও আলোচনা করা হয়েছে।

(b) বহুমুক্ত বা ডায়াবেটিস (Diabetes)

অঞ্চলশয়ের ভিতর আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহানস নামক এক ধরনের গ্রন্থি আছে, এই গ্রন্থি থেকে ইনসুলিন (Insulin) নিঃসৃত হয়। ইনসুলিন হলো এক ধরনের হরমোন, যা দেহের শর্করা পরিপাক নিয়ন্ত্রণ করে। অঞ্চলশয়ে যদি প্রয়োজনমতো ইনসুলিন তৈরি না হয় তবে রক্তে শর্করার পরিমাণ স্থায়ীভাবে বেড়ে যায়, প্রস্তাবের সাথে ফ্লুকোজ নির্গত হয়। এ অবস্থাকে বহুমুক্ত বা ডায়াবেটিস মেলিটাস (সংক্ষেপে: ডায়াবেটিস) বলে। ডায়াবেটিস প্রধানত দুই ধরনের, টাইপ-1 এবং টাইপ-2। টাইপ-1 এ আক্রান্ত রোগীর দেহে একেবারেই ইনসুলিন তৈরি হয় না। তাই নিয়মিতভাবে ইনজেকশনের মাধ্যমে ইনসুলিন নিতে হয়। অন্যদিকে টাইপ-2 রোগীর দেহে আংশিকভাবে ইনসুলিন তৈরি হয়। এক্ষেত্রে গ্রেড, অঞ্চলশয় কোষকে শরীরের জন্য পরিমিত ইনসুলিন তৈরিতে সাহায্য করে। তবে টাইপ-2 ডায়াবেটিসেও কোনো

না কোনো পর্যায়ে ইনসুলিনের স্থায়ী ঘাটতি হয়ে যেতে পারে কিংবা বিভিন্ন অসুখ বা চিকিৎসাপদ্ধতির অংশ হিসেবে সেই সব ঔষধ বন্ধ রাখতে হতে পারে, তখন ইনসুলিন ছাড়া উপায় থাকে না। এ রোগটি সাধারণত বংশগতি এবং পরিবেশের প্রভাবে হয়ে থাকে। এটি সংক্রামক বা ছেঁয়াচে রোগ নয়।

রক্ত ও প্রস্তাবে গ্লুকোজের মাত্রা পরিমাণের চেয়ে বেড়ে গেলে এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। লক্ষণগুলো হলো ঘন ঘন প্রস্তাব হওয়া, অধিক পিপাসা লাগা, ক্ষুধা বেড়ে যাওয়া, পর্যাপ্ত খাবার খাওয়া সত্ত্বেও দেহের ওজন কমতে থাকা, দুর্বল বোধ করা, চোখে কম দেখা, চামড়া খসখসে ও বুক্ষ হয়ে যাওয়া, ক্ষতস্থান সহজে না শুকানো ইত্যাদি।

পুরু ধারণা করা হতো কেবল বয়স্কদের এ রোগটি হয়। এ ধারণাটি সঠিক নয়। ছোট-বড় সব বয়সে এ রোগ হতে পারে। তবে যারা কায়িক পরিশ্রম করেন না, দিনের বেশির ভাগ সময় বসে কাজ করেন অথবা অলস জীবন ধাপন করেন, তাদের ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। তাছাড়া স্থূলকায় ব্যক্তিদের এ রোগ হওয়ার আশঙ্কা বেশি। যেহেতু এ রোগ বংশগত, তাই কোনো ব্যক্তির বাবা, মা, দাদা, দাদির এ রোগ থাকলে তার এ রোগ হওয়ার আশঙ্কা খুবই বেশি। বংশগতভাবে অনেক শিশুর দেহে ইনসুলিন উৎপাদন কম হয়, ফলে শিশুটি ইনসুলিন ঘাটতিজনিত অসুস্থিতায় ভুগতে থাকে।

ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা: রক্ত ও প্রস্তাব পরীক্ষা করে গ্লুকোজের মাত্রা নির্ণয়ের মাধ্যমে এ রোগ নির্ণয় করা যায়। চিকিৎসা করে ডায়াবেটিস রোগ একেবারে নিরাময় করা যায় না, কিন্তু এই রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। ডাঙ্কারদের মতে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনটি 'D' মেনে চলা অত্যাবশ্যক। এগুলো হলো: Discipline, Diet ও Dose।

(i) **শৃঙ্খলা (Discipline):** একজন ডায়াবেটিস আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য তার সুশৃঙ্খল জীবনব্যবস্থা মহোষধস্বরূপ। এছাড়া নিয়মিত এবং ডাঙ্কারের পরামর্শমতো পরিমিত খাদ্য গ্রহণ করা, নিয়মিত ব্যায়াম করা, রোগীর দেহের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও বিশেষভাবে পায়ের যত্ন নেওয়া, নিয়মিত প্রস্তাব পরীক্ষা করা এবং দৈহিক কোনো জটিলতা দেখা দিলে ডাঙ্কারের পরামর্শ নেওয়া।

(ii) **খাদ্য নিয়ন্ত্রণ (Diet):** ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপায় হলো খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করা, মিট্টিজাতীয় খাবার পরিহার করা ও ডাঙ্কারের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত এবং সময়মতো খাদ্য গ্রহণ করা। ডাঙ্কারের পরামর্শ অনুযায়ী খাবারের মেনু অনুসরণ করলে সুফল পাওয়া যায়। তবে যার ডায়াবেটিস নেই, তার মিট্টি খাওয়া বা না খাওয়ার সাথে ডায়াবেটিসের সম্পর্ক নেই।

(iii) **ঔষধ সেবন (Dose):** ডাঙ্কারের পরামর্শ ছাড়া কোনো ঔষধ সেবন করা উচিত নয়। ডাঙ্কার রোগীর শারীরিক অবস্থা বুকে ঔষধ খাওয়া বা ইনসুলিন নেওয়ার পরামর্শ দেন। সেই পরামর্শ অনুযায়ী রোগীকে নিয়মিত ঔষধ সেবন করতে হবে। ঠিকমতো চিকিৎসা না করা হলে রোগীর রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে কমে বা বেড়ে যায়। উভয় ক্ষেত্রেই রোগী বেহুশ হয়ে পড়তে পারে। এমনকি মৃত্যুও

হতে পারে। যদি ডায়াবেটিস রোগী হঠাত অজ্ঞান হয়ে যান, তখন তাকে বসিয়ে ফ্লুকোজ বা চিনির পানি খাইয়ে দিলে অনেক সময় খারাপ পরিণতি এড়ানো যেতে পারে।

(c) স্ট্রোক (Stroke)

মস্তিষ্কে রন্ধন সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটার কারণে স্নায়ুতন্ত্রের কাজে ব্যাঘাত ঘটলে তাকে স্ট্রোক বলে। স্ট্রোক হয় মস্তিষ্কে, হৎপিণ্ডে নয়; যদিও এ ব্যাপারে অনেকের ভুল ধারণা রয়েছে। মস্তিষ্কে রন্ধনশৰণ বা রন্ধনালির ভিতরে রন্ধন জমাট বেঁধে রন্ধন চলাচল বাধাগ্রস্ত হওয়া— এই দুইভাবে স্ট্রোক হতে পারে। এর মধ্যে রন্ধনশৰণজনিত স্ট্রোক বেশি মারাত্মক। সাধারণত উচ্চ রন্ধনচাপের কারণে মস্তিষ্কের রন্ধনশৰণ হতে পারে।

রোগের লক্ষণ: এই রোগের লক্ষণ হঠাত করেই প্রকাশ পায়। লক্ষণগুলো হলো: বমি হয়, প্রচণ্ড মাথাব্যথা হয়, কয়েক মিনিটের মধ্যে রোগী সংজ্ঞা হারায়, ঘাড় শক্ত হয়ে যেতে পারে, মাংসপেশি শিথিল হয়ে যায়, শ্বসন এবং নাড়ির স্পন্দন কমে যায়, মুখমণ্ডল লাল বর্ণ ধারণ করে। অনেক সময় অবশ্য খুব মারাত্মক উপসর্গ ছাড়াই শুধু মুখ বেঁকে যাওয়া বা অল্প সময়ের জন্য অজ্ঞান হয়ে গিয়ে আবার জ্ঞান ফিরে আসা— স্ট্রোকের এ জাতীয় লক্ষণ দেখা যায়। স্ট্রোক কর্তৃ মারাত্মক তা বলতে হলে অন্তত কয়েক দিন রোগীকে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন, সে সময়ে তাঁকে হাসপাতালে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে রাখতে হয়। তাই, স্ট্রোক হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হবে এবং যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে। উপর্যুক্ত চিকিৎসা করা হলে রোগী অনেক সময় বেঁচে যায়, তবে যদি রন্ধনশৰণজনিত স্ট্রোক হয়, তাহলে বাঁচার নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব নয়। রোগী যদি বেঁচে যায়, তাহলে কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিন পর সে তার সংজ্ঞা ফিরে পায়। তবে রোগী কিছুটা ছটফট করে এবং আস্তে আস্তে অসাড় হয়ে যাওয়া অঙ্গে দৃঢ়তা ফিরে আসে। জ্ঞান ফিরে এলেও বাক নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে রোগীর কথা জড়িয়ে যায়। পক্ষাঘাত বা অবশ হয়ে যাওয়া অঙ্গ (যেমন: হাত) সংলগ্ন পেশি নড়াচড়ায় শক্তি ক্রমশ ফিরে আসে কিন্তু হাত দিয়ে সূক্ষ্ম কাজ করার ক্ষমতা সাধারণত পুরোপুরিভাবে ফিরে আসে না। চিকিৎসার প্রাথমিক পর্যায়ে আরোগ্য লাভ দ্রুত হতে থাকে কিন্তু দুমাস পরে উন্নতি ক্রমশ করে আসে। হঠাত আক্রমণে যে স্নায়ু সাময়িকভাবে কার্যক্ষমতা হারায়, সেগুলো দ্রুত আরোগ্য লাভ করে এবং কার্যক্ষমতা ফিরে পায়। আর যেসব স্নায়ু সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেগুলোর কর্মক্ষমতা চিরতরে বিনষ্ট হয়ে যায়।

রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা: মস্তিষ্কে রন্ধনশৰণ বা রন্ধন জমাট বেঁধেছে কি না তা নির্ণয় করে এই রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। এই রোগটির সঠিক কারণ অনেক সময় নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। মস্তিষ্কের রন্ধনশৰণ বন্ধ করা সম্ভব নয়, তবে মস্তিষ্কে জমে থাকা রন্ধন অনেক সময় অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বের করার প্রয়োজন হতে পারে। রোগীর উচ্চ রন্ধনচাপ থাকলে তা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা, রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী সম্ভব হলে অস্ত্রোপচার করা যেতে পারে। রোগীকে উপর্যুক্ত শুশ্রূষা, মলমূত্

ত্যাগের সুব্যবস্থা করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, পথের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা দরকার। প্রয়োজনবোধে রোগীকে নলের সাহায্যে খাবার খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ফিজিক্যাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ এবং ফিজিওথেরাপিস্টের পরামর্শ মোতাবেক অবশ বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গ নির্দিষ্ট নিয়মে নড়াচড়া করানো দরকার, এতে ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গের অস্থিসম্বন্ধ শক্ত হয়ে যাওয়া রোধ করা সম্ভব হয়। রোগীর জ্ঞান ফিরে এলে নিজ প্রচেষ্টায় নড়াচড়া করতে উৎসাহিত করা উচিত।

প্রতিরোধের উপায়: ধূমপান পরিহার করা, যারা উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন, তাদের উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা, যারা ডায়াবেটিসে ভুগছেন তাদের নিয়মিত ঔষধ সেবন করা, দুশ্চিন্তামুক্ত, সুন্দর এবং স্বাভাবিক জীবন যাপন করা।

10.6 স্নায়বিক বৈকল্যজনিত শারীরিক সমস্যা

(a) প্যারালাইসিস (Paralysis)

শরীরের কোনো অংশের ঐচ্ছিক মাংসপেশি ইচ্ছামতো নাড়াতে পারার ক্ষমতা নষ্ট হওয়াকে প্যারালাইসিস বলে। সাধারণত মস্তিষ্কের কোনো অংশের ক্ষতির কারণে ঐ অংশের সংবেদন গ্রহণকারী পেশিগুলো কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। একজনের আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ প্যারালাইসিস হতে পারে, ফলে শরীরের একপাশে কোনো অঙ্গ অথবা উভয় পাশের অঙ্গের কার্যকারিতা নষ্ট হয়, যেমন, দুই হাত ও পায়ের প্যারালাইসিস।

কারণ: প্যারালাইসিস সাধারণত স্ট্রোকের কারণে হয়। এছাড়া মেরুদণ্ডের বা ঘাড়ের সুষুম্নাকাণ্ড আঘাত বা দুর্ঘটনাজনিত কারণে প্যারালাইসিস হতে পারে। স্নায় রোগ, সুষুম্নাকাণ্ডের কিংবা কশেরুকার ক্ষয় রোগও প্যারালাইসিসের কারণ হতে পারে।

(b) এপিলেপ্সি (Epilepsy)

এপিলেপ্সি মস্তিষ্কের একটি রোগ, যাতে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে খিঁচুনি বা কাঁপুনি দিতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এই রোগকে মৃগী রোগও বলা হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই রোগের কারণে আক্রান্ত ব্যক্তি হঠাতে করেই সাময়িকভাবে কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, শরীর কাঁপুনি ও খিঁচুনি দিতে দিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আগুন বা পানির সাথে এপিলেপ্সির লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু রোগাক্রান্ত অবস্থায় কোথাও পড়ে গেলে রোগী নিজ শক্তিতে উঠতে পারে না। এই কারণে এসব রোগীকে জলাশয় বা আগুন কিংবা অন্যান্য বিপজ্জনক বস্তু বা স্থান থেকে দূরে রাখতে হয়।

এপিলেপ্সির মূল কারণ এখনও সম্পূর্ণভাবে জানা যায়নি। স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগীদের মৃগী রোগ দেখা দেয়। মাথায় আঘাতের কারণে ম্যালিনজাইটিস, এনসেফালাইটিস, জন্মগত মস্তিষ্কের বিকৃতি, টিউমার ফর্মা-২৯, জীববিজ্ঞান- ৯ম-১০ম শ্রেণি

ইত্যাদি কারণেও এপিলেপ্সির উপসর্গ দেখা দেয়। এপিলেপ্সি যেকোনো বয়সে হতে পারে। কোনো কোনো এপিলেপ্সির কোনো দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিকর প্রভাব নেই, আবার কোনোটা মস্তিষ্কের স্থায়ী ক্ষতি করতে পারে। তাই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে এপিলেপ্সির ধরন নির্ণয় করে সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

(c) পারকিনসন রোগ (Parkinson's disease)

পারকিনসন রোগ মস্তিষ্কের অংশ এক অবস্থা, যেখানে হাতে ও পায়ের কাঁপুনি হয় এবং আক্রান্ত রোগীর নড়াচড়া, হাঁটাহাঁটি করতে সমস্যা হয়। এ রোগ সাধারণত ৫০ বছর বয়সের পরে হয়। তবে ব্যক্তিগত হিসেবে যুবক-যুবতীদেরও হতে পারে। এই ক্ষেত্রে রোগটি তার বহশে রয়েছে বলে ধরা হয়।

মাঝুকোষ বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করে থাকে, যার একটি হলো জোপামিন। জোপামিন শরীরের পেশির নড়াচড়ায় সাহায্য করে। পারকিনসন রোগাক্রান্ত রোগীর মস্তিষ্কে জোপামিন তৈরির কোষগুলো থীরে থীরে নষ্ট হয়ে যায়। জোপামিন ছাড়া ঐ মাঝুকোষগুলো পেশি কোষগুলোতে সংবেদন পাঠাতে পারে না। কলে মাসপেশি তার কার্যকারিতা হ্যারার। বরস বাড়ার সাথে সাথে পারকিনসনের কারণে রোগীর মাসপেশি আরও অকার্যকর হয়ে উঠে, কলে রোগীর চলাকেরা, দেখাদেখি ইত্যাদি কাজ করা কষ্টকর হয়ে পড়ে।

পারকিনসন রোগ সাধারণত থীরে থীরে থীকট ঝুপে দেখা দেয়। প্রাথমিক অবস্থায় রোগী হালকা হাত বা পা কাঁপা অবস্থায় থাকে। কলে চলাকেরা বিপ্লিত হয়। এছাড়াও চোখের পাতার কাঁপুনি, কোঁক্কাটিল্য, খাবার লিলতে কষ্ট হওয়া, সোজাসুজি হাঁটার সমস্যা, কখা বলার সমস্য মুখের বাচনভঙ্গি না আসা অর্থাৎ মুখ অন্দু থাকা মাসপেশিতে টান পড়া বা ব্যথা হওয়া, নড়াচড়ায় কষ্ট হওয়া, ঘেমন চেয়ার থেকে উঠা কিংবা হাঁটতে শুরু করার সমস্য অসুবিধে হওয়া— এই ধরনের নানা উপসর্গ দেখা দিতে শুরু করে।

ডাক্তারের পরামর্শে নিয়মিত ফিজিউথেরাপি প্রশংস, পরিমিত বাস্ত প্রশংস এবং সৃশৃঙ্খল জীবন বাধন করার মাধ্যমে রোগী অনেকটা সুস্থ থাকে।



একক কাজ

কাজ : ইয়মোনজনিত শায়ীরিক সমস্যা সূচির কারণ অনুসন্ধান কর এবং একটি অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন তৈরি কর।

10.7 সমন্বয় কার্যক্রমে তামাক ও মাদকদ্রব্যের প্রভাব

আমাদের দেশে সাধারণত তামাক, গাঁজা, ভাঁং, চরস, আফিম, মরফিন, কোকেন, মদ ইত্যাদি মাদকদ্রব্য হিসেবে পরিচিত। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কোকেন ও আফিম থেকে কৃত্রিম উপায়ে উষ্ণধ তৈরি করা হচ্ছে। এগুলোও নেশার উদ্দেশ্বে করে। যেমন: ঘুমের উষ্ণধ।

মানুষ কেন মাদকাস্ত্র হয় তার বহুবিধ কারণ রয়েছে। তার মাঝে মাদকদ্রব্যের প্রতি কৌতুহল, বন্ধুবান্ধব এবং সঙ্গীদের প্রভাব, নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের আগ্রহ, সহজ আনন্দ লাভের চেষ্টা, পরিবারে মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা, পারিবারিক কলহ এবং অশান্তি, বেকারত্ব, হতাশা, অভাব অন্টন, মাদকদ্রব্যের কুফল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা উল্লেখযোগ্য। তবে সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে ধারণা করা হচ্ছে যে মাদকাস্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হলো স্বাভাবিক সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কের ঘাটতি।

তামাক ব্যবহারে, জর্দা চিবিয়ে খেলে কিংবা ধূমপান করলে রস্তে নিকোটিনের মাত্রা বেড়ে যায়। নিকোটিন প্রাথমিকভাবে স্নায়ু কোষগুলোকে উদ্বিগ্নিত করে, পরবর্তীতে দেহে নিকোটিনের চাহিদা আরও বেড়ে যায়। নিকোটিনের এই চাহিদা মেটাতে জর্দা ব্যবহার বা ধূমপানের নেশায় মানুষ আস্ত্র হয়ে পড়ে। নিকোটিন গ্রহণে ধীরে ধীরে স্নায়ুকোষের কার্যকারিতা নষ্ট হতে থাকে। হাত, পা কিংবা মাথা অনৈচ্ছিকভাবে কাঁপতে থাকে। ফলে কোনো সূক্ষ্ম কাজ, যেমন সুইংের ছিদ্রে সুতা ঢেকানো, সোজা দাগ টানা, লেখালেখিতে ব্যর্থতাজনিত সমস্যা ইত্যাদি দেখা দেয়।

মাদকদ্রব্য ব্যবহারে স্নায়ুতন্ত্রের উপর অনেক বড় প্রভাব পড়ে। মাদকাশস্ত্রের কারণে একজন তার নিজস্ব ইচ্ছাশস্ত্রের কাছে হার মেনে নেশাদ্রব্য গ্রহণে বাধ্য হয়। নেশা বস্তুর কারণে তার চিন্তাশস্ত্র ক্রমে লোপ পায়। মাদকদ্রব্য ব্যবহারকারীরা কাজে মনোযোগ হারায়, সাধারণ জীবনযাপনে ব্যর্থ হয়। অতিরিক্ত নেশায় অচেতন্য অবস্থায় কোনো স্থানে পড়েও থাকতে পারে। মাদকাস্ত্র ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময় পর পর মাদক গ্রহণ করতে না পারলে তার মারাত্মক কষ্ট হয়, এমনকি শরীরে অনিয়ন্ত্রিত খিঁচুনিও হতে পারে। এ জন্য মাদকের অর্থ জোগাড় করতে সেই ব্যক্তি অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে।

মাদকাস্ত্র নিরাময় কেন্দ্রের সাহায্যে মাদকের নেশা থেকে বের হয়ে আসা সম্ভব। তবে এ কাজে পরিবারের সবার সহানুভূতি ও সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি।

মাদকাস্ত্রের কুফল

মাদকদ্রব্য সেবনের ফলে মানসিক, শারীরিক, সামাজিক ও আর্থিক ক্ষতিসাধন হয়।

এ অবস্থা থেকে পরিত্রাগের উপায়:

- পারিবারিকভাবে এবং সামাজিকভাবে স্বাস্থ্যকর সম্পর্কের পরিবেশ বজায় রাখা।
- নেতৃত্ব শিক্ষা কার্যক্রম প্রসার করা।

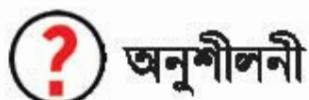
- বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
- অসৎ বন্ধুবাস্তব থেকে দূরে থাকা ও এর কুফল সম্পর্কে অবহিত করা।
- এ ব্যাপারে জনসচেতনতা গড়ে তোলা ও আইনের সঠিক প্রয়োগ করা।

মাদকাস্তুরের ঘৃণা বা অবহেলার চোখে না দেখে তাদেরকে সহানুভূতির সাথে ঐর্য সহকারে সমাজে পুনর্বাসন বা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থা করা উচিত। প্রয়োজনে মাদকাস্তু নিরাময় কেন্দ্রের সহযোগ শৈশ্বর করা অপরিহার্য। এ উদ্দেশ্যে 1990 সালে বাংলাদেশ মাদকস্তুর নিরোধ অধিদপ্তর নামে একটি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। দিন দিন এ অধিদপ্তরের কাছের পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদের কার্যক্রমের মধ্যে মাদকস্তুর আইন প্রয়োগ, নিরোধ, চিকিৎসা এবং পুনর্বাসন উল্লেখযোগ্য।



একক কাজ

কাজ : ভাষাক ও মাদকস্তুরের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে পোস্টার/লিফলেট অঙ্কন কর এবং প্রেরিতে উপস্থাপন করা।



অনুশীলনী



সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রয়োজনীয়

1. কাইটোহরমোন কী?
2. অভিকর্ষ উপলব্ধি কী?
3. স্নায়ুতন্ত্র কাকে বলে?
4. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র কী নিয়ে গঠিত?
5. প্যারালাইসিন কেন হয়?



রচনামূলক প্রশ্ন

- উদ্দিদের বৃক্ষিতে হরমোনের স্ফুরিকা আলোচনা কর।
- থাইরয়োড সমস্যার সক্রপেশে লেখ।



বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- থাইসাল এন্থি থেকে নিচ্ছত হরমোন কোনটি?

ক. থাইরজিন খ. প্যারাথাইরজিন
গ. থাইমোজিন ঘ. থাইরোট্রিপিন

- আইলেটস অক স্যাংগোরঙ্গানস—

i. শরীরের শর্করা বিপাকে সহায়তা করে
ii. ইনসুলিন হরমোন নিয়ন্ত্রণ করে
iii. দেহের বিপাকীর কার্যকলাপ নিরক্ষণ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

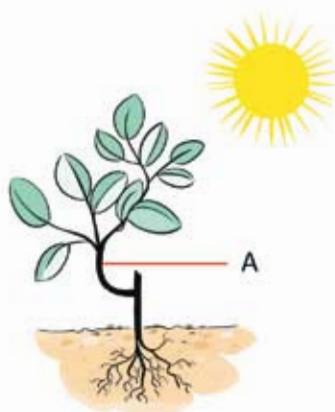
নিচের চিত্রের আলোকে ৩ ও ৪ নং ধরণের ফীড়র দাখ

- চিত্রে 'A'-এর ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য।

ক. আলোক দিকমুখীনতা খ. স্ফুরিক দিকমুখীনতা
গ. পানি দিকমুখীনতা ঘ. রাসায়নিক দিকমুখীনতা

- চিত্রে 'A' অংশটি সৃষ্টিতে কোনটি কাজ করে?

ক. অক্সিজেন খ. জিবেরোলিন
গ. সাইটোকাইনিন ঘ. অ্যাবসিসিক এসিড





সূজনশীল প্রশ্ন

১. অহনা বাখার সাথে কৃষি খামারে সুরক্ষে যেগুলো পরিসরের গাছ পর্যবেক্ষণ করে। সে দেখল, একটি করে আলো ক্লাপিয়ে ছেট ছেট চারা গাছ রাখা আছে এবং ঘরটি বেশ ঠাণ্ডা। সে আরও দেখল, কিছু ফলদ গাছের মূল সুটচে না, কিছু গাছে ছেট অবস্থার ফলগুলো কারে পড়চে।

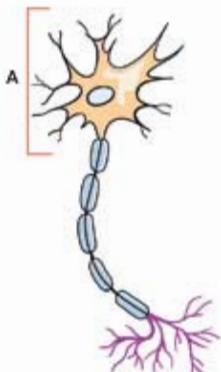
ক. বায়োলজিক্যাল ত্রুক কী?

খ. ভার্নালাইজেশন বলতে কী বোঝায়?

গ. টুকীপকে ফলদ গাছগুলোতে এনুগুণ সমস্যার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অহনাৰ দেখা গাছগুলো উন্নত পরিবেশে আখার কারণ বিশ্লেষণ কর।

২.



ক. প্রতিবর্তী ক্রিয়া কী?

খ. প্রাথরস কাকে বলে বুঝিয়ে দেখ।

গ. মানবদেহে টুকীপনা তৈরিতে চিত্রে 'A' চিহ্নিত অংশটির জুড়িকা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চিত্রের কোষটির পঠনপ্রকৃতি একটি সাধারণ কোষ অপেক্ষা ভিন্নতর— যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

একাদশ অধ্যায়

জীবের প্রজনন (Reproduction)



প্রজনন (Reproduction) জীবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জীব তার জীবক্ষণায় নিজের প্রতিবৃগ সৃষ্টির মাধ্যমে তার প্রজাতিকে বৃদ্ধির গ্রাণ্ডে। ভিন্ন ভিন্ন জীবের প্রজননের প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে প্রজনন প্রক্রিয়ায় বৈচিত্র্যগুলো লক্ষণীয়।

এই অধ্যায়ে সপুরুষক উত্তিদ এবং মানব প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।



এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- জীবে প্রজননের ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রজনন অঙ্গ হিসেবে ফুলের কাজ বর্ণনা করতে পারব।
- সপুষ্পক উদ্ভিদের জীবনচক্রের সাহায্যে উদ্ভিদের যৌন প্রজনন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাণীর অযৌন ও যৌন প্রজনন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রজননের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বহিঃ ও অস্ত্র নিষেকের পার্থক্য করতে পারব।
- ত্বক চিকিৎসের সাহায্যে মানুষের প্রজননের ধারণায়ুহ বর্ণনা করতে পারব।
- প্রজনন কার্যক্রমে হয়মোলের স্ফূর্তিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মানব জীবের বিকাশ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মানবদেহে এইডসের সংক্রমণের কারণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- দেহের প্রতিরোধ ব্যবস্থার উপর এইডসের ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- এইডস প্রতিরোধে পোল্টার/লিফলেট অস্কল করে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারব।
- এইডস রোগীদের প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ প্রদর্শন করব।

11.1 জীবে প্রজননের ধারণা ও গুরুত্ব

জীবের ক্ষেত্রে জন্ম হলে মৃত্যু অবধারিত। জীবের শুধু মৃত্যু হলে পৃথিবী থেকে একসময় সেসব প্রজাতির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয়নি, কারণ একদিকে পৃথিবীতে যেমন জীবের মৃত্যু ঘটছে, অন্যদিকে তেমনি প্রজননের মাধ্যমে জীবের জন্ম হচ্ছে। প্রজনন হচ্ছে এমন একটি শারীরতত্ত্বীয় কার্যক্রম, যার মাধ্যমে জীব তার প্রতিরূপ সৃষ্টি করে ভবিষ্যৎ বংশধর রেখে যায়। যে প্রক্রিয়ায় কোনো জীব তার বংশধর সৃষ্টি করে, তাকেই প্রজনন বলে।

প্রজনন প্রধানত দুই ধরনের— যৌন এবং অযৌন। সাধারণত নিম্নশ্রেণির জীবে যৌন প্রজনন হয় না, তবে কোনো কোনো নিম্নশ্রেণির জীব যৌন উপায়েও প্রজনন ঘটায়। উচ্চশ্রেণির অধিকাংশ উক্তিদ এবং উচ্চশ্রেণির সকল প্রাণী যৌন প্রজননের মাধ্যমে বংশধর সৃষ্টি করে। যৌন জননে দুটি বিপরীতধর্মী জননকোষ পরস্পরের সাথে মিলিত হয়। এ ক্ষেত্রে একটিকে পুঁ জননকোষ বা শুক্রাণু (sperm), অন্যটিকে স্ত্রী জননকোষ বা ডিম্বাণু (Egg) বলে। এই দুধরনের জননকোষ একই ফুলে বা একই দেহে সৃষ্টি হতে পারে। উক্ত উক্তিদে এ দুধরনের জননকোষ একই দেহে সৃষ্টি হয়। এরা সহবাসী (monoecious) উক্তিদ। যখন দুধরনের জননকোষ আলাদা দেহে সৃষ্টি হয় তখন সেই উক্তিদকে ভিন্নবাসী (diecious) উক্তিদ বলে।

জননকোষ সৃষ্টির পূর্ব শর্ত হলো, জনন মাতৃকোষকে অবশ্যই মিয়োসিস (Meiosis) পদ্ধতিতে বিভাজিত হতে হয়। তোমরা জান, এই বিভাজনের ফলে ক্রোমোজোমের সংখ্যা জনন মাতৃকোষের অর্ধেক হয়ে যায়। কাজেই যখন পুঁ ও স্ত্রী জননকোষ দুটি মিলিত হয়ে যে জাইগোট সৃষ্টি করে, তাতে ক্রোমোজোমের সংখ্যা আবার জনন মাতৃকোষের সমান হয়ে যায়। পরে এই জাইগোটটি মাইটোটিক কোষ বিভাজনের (Mitotic cell division) মাধ্যমে বারবার বিভাজিত হয়ে একটি নতুন জীবদেহ সৃষ্টি করে। এভাবে একটি জীব বহু জীবের জন্ম দিয়ে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় জীব তার ভবিষ্যৎ বংশধর সৃষ্টি করে বংশধারা রক্ষা করে।

প্রজনন না হলে জীবের অস্তিত্ব বিলোপ হয়ে যেত। ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত সকল জীব এভাবে বংশধর সৃষ্টি করে প্রজাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। তবে কী উপায়ে প্রজনন ঘটবে তা জীবের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। এ জন্যই নিম্নশ্রেণির জীব কোষ বিভাজনের মাধ্যমে জনন ঘটায় আবার উচ্চশ্রেণির জীবে জটিল প্রক্রিয়ায় যৌন জনন সংঘটিত হয়।

যৌন জনন, অযৌন জননের তুলনায় জটিল, শ্রমসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ একটি প্রক্রিয়া হওয়া সত্ত্বেও যৌন জনন বিবর্তনের ধারায় জীবজগতে নিজের স্থান করে নিয়েছে। কারণ এতে মিয়োসিস বিভাজনের ফলে খুব সহজে কোনো প্রজাতির এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে অচিন্তনীয় পরিমাণ জিনগত ফর্মা-৩০, জীববিজ্ঞান- ৯ম-১০ম শ্রেণি

বৈচিত্র্য সৃষ্টি হতে পারে। আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে দেখেছি এবং দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়েও দেখতে পাব যে এই বৈচিত্র্য কোনো প্রজাতিকে প্রতিকূল পরিবেশে টিকিয়ে রাখার জন্য অত্যন্ত সহায়ক। অপরদিকে অযৌন জননে অপ্ত্য জীবগুলো মাতৃজীবের (প্রায়) হুবহু অনুরূপ হয়, সে কারণে বৈচিত্র্য খুব কম থাকে। তুলনামূলকভাবে সরলতর জীবগুলো (যেমন: ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া ইত্যাদি) অযৌন জননের মাধ্যমে খুব কম সময়ে কম শক্তি ব্যয়ে অধিকসংখ্যক জীব জন্ম দিতে পারে বলে সেইসব জীবে প্রজননের এই প্রক্রিয়াটি এখনও টিকে আছে।

11.2 উত্তিদের প্রজনন

11.2.1 প্রজনন অঙ্গ: ফুল

প্রজননের জন্য রূপান্তরিত বিশেষ ধরনের বিটপ (Shoot) হলো ফুল। ফুল উচ্চশ্রেণির উত্তিদের প্রজনন অঙ্গ। আমরা জানি যে একটি আদর্শ ফুলের পাঁচটি স্তবকের মধ্যে দুটি স্তবক (পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক) প্রজননের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। এরা সরাসরি প্রজননে অংশ নেয়, অন্য স্তবকগুলো সরাসরি অংশ না নিলেও প্রজননে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করে। যে ফুলে এই পাঁচটি স্তবকই উপস্থিত থাকে তাকে সম্পূর্ণ ফুল বলে। যেমন জবা, ধূতুরা। এর যেকোনো একটি স্তবক না থাকলে সে ফুলকে অসম্পূর্ণ ফুল বলে। যেমন- লাউ, কুমড়া। বৃন্তযুক্ত ফুলকে সবৃন্তক যেমন-জবা, কুমড়া এবং বৃন্তহীন ফুলকে অবৃন্তক ফুল বলে যেমন— হাতীশুঁড়। যখন কোনো ফুলে পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক দুটোই উপস্থিত থাকে, তাকে উভলিঙ্গ ফুল (Bisexual flower) যেমন- জবা, ধূতুরা। পুংস্তবক বা স্ত্রীস্তবকের যেকোনো একটি অনুপস্থিত থাকলে তাকে একলিঙ্গ ফুল (Unisexual flower) যেমন লাউ, কুমড়া এবং দুটোই অনুপস্থিত থাকলে ক্লীব ফুল (Neuter flower) বলে।

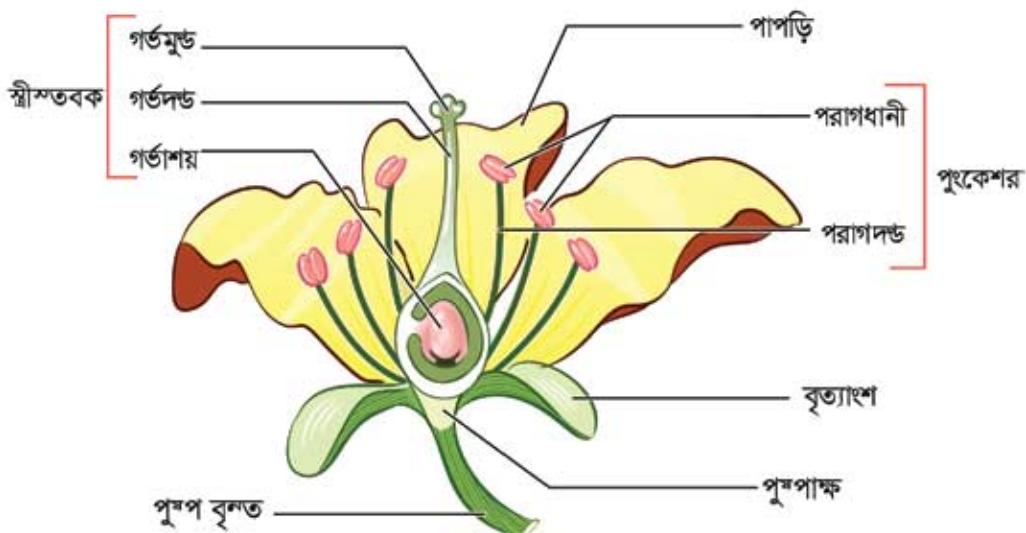
ফুলের বিভিন্ন অংশ

(a) পুক্ষাক্ষ (Thalmus): পুক্ষাক্ষ সাধারণত গোলাকার এবং ফুলের বৃত্তশীর্ষে অবস্থান করে। এর উপর বাকি চারটি স্তবক পরপর সাজানো থাকে।

(b) বৃতি (Calyx): ফুলের বাইরের স্তবককে বৃতি বলে। বৃতি খণ্ডিত না হলে সেটি যুক্তবৃতি, কিন্তু যখন এটি সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হয়, তখন তাকে বিযুক্তবৃতি বলে। এর প্রতিটি খণ্ডকে বৃত্যাংশ বলে। সবুজ বৃতি খাদ্য প্রস্তুত কাজে অংশ নেয়। এদের প্রধান কাজ ফুলের ভিতরের অংশগুলোকে রোদ, বৃদ্ধি এবং পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। তবে যখন বৃতি রং-বেরঙের হয়, তখন তারা পরাগায়নে সাহায্য করে অর্থাৎ পরাগায়নের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে এমন পোকামাকড়, পশু, পাখি ইত্যাদিকে আকর্ষণ করে।

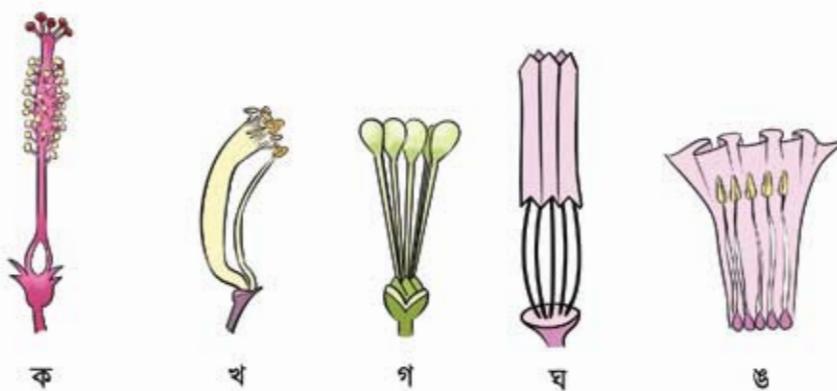
(c) দলমণ্ডল (Corolla): এটি বাইরের দিক থেকে দ্বিতীয় স্তবক। প্রতিটি খণ্ডকে দল বা পাপড়ি বলে। পাপড়িগুলি যুক্ত থাকলে যুক্তদল এবং আলাদা থাকলে বিযুক্তদল বলা হয়। পাপড়ি সাধারণত রঙিন হয়।

এরা ফুলের অভ্যাবশ্যকীয় অংশগুলোকে রোদ, বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে। উজ্জ্বল ঘনমতে রসের দলমণ্ডল পোকামাকড় ও পশুপাখি আকর্ষণ করে এবং পরাগায়নে সহায়তা করে। অনেক সময় ফুলের পাপড়ি কোনো কোনো পোকামাকড়কে বসে মধু থেকে সাহায্য করে। এসব কার্যক্রম চলাকালীন পরাগায়নের কাজটি হতে থাকে।



চিত্র 11.01: একটি ফুলের বিভিন্ন অংশ (লক্ষণস্তুতি)।

(d) পুঁত্তবক (Androecium): এটি ফুলের তৃতীয় স্তবক এবং একটি অভ্যাবশ্যকীয় অংশ। এই স্তবকের প্রতিটি অংশকে পুঁকেশর (stamen) বলে। একটি পুঁত্তবকে এক বা একাধিক পুঁকেশর থাকতে পারে। প্রতিটি পুঁকেশরের দুইটি অংশ যথা- পুঁদণ্ড বা পরাগদণ্ড (filament) এবং পরাগধানী বা পরাগধলি (anther)। পুঁকেশরের দণ্ডের যতো অংশকে পুঁদণ্ড এবং শীর্ষের ধলির যতো অংশকে পরাগধানী ধলি বলে। পরাগধানী এবং পুঁদণ্ড সংযোগকারী অংশকে বোজনী বলে। পরাগধানীর মধ্যে পরাগ উৎপন্ন হয়। এই পরাগেরেখে অঙ্গুরিত হয়ে পরাগনালি (Pollen tube) গঠন করে। এই পরাগ নালিকায় পুঁজনকোষ (Male gamete) উৎপন্ন হয়। পুঁজনকোষ সরাসরি জনন কাজে অংশগ্রহণ করে। কখনো পুঁত্তবকের পুঁদণ্ডগুলো পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হতে পারে। আবার পরাগধলিগুলোও কখনো পরস্পরের সাথে ঝুঁক থাকে। পরাগদণ্ড এক গুচ্ছ থাকলে তাকে একগুচ্ছ (Monadelphous), (বেমন: জবা), দুই গুচ্ছ থাকলে দ্বিগুচ্ছ (Diadelphous), (বেমন: মটুর) এবং বহুগুচ্ছ থাকলে তাকে বহুগুচ্ছ (Polyadelphous) পুঁত্তবক বলা হয়, (বেমন: শিমুল)। যখন পরাগধানী একগুচ্ছ থাকে, তখন তাকে সুতধানী বা সিনজেনেসিয়াস (Syngenesious), সুত অবস্থায় এবং পুঁকেশর দলমণ্ডলের সাথে সুত থাকলে তাকে দললাঘ (Epipetalous) পুঁত্তবক বলে (বেমন: খুতুরা)।



চিত্র-11.02: পুরুষশরের বিভিন্ন প্রকার সজ্জা (ক) একগুচ্ছ,
(খ) বিশুদ্ধ, (গ) বহুগুচ্ছ, (ঘ) সূত্রধানী অবং (ঙ) দললাভ

(c) **জীন্তবক (Gynoecium):** জীন্তবক বা পর্ণক্ষেপরের অক্ষযোন ফুলটির কেন্দ্রে। এটি ফুলের আর একটি অত্যাবশ্যকীয় স্তবক। জীন্তবক এক বা একাধিক গর্ভপত্র (Carpel) নিয়ে গঠিত হতে পারে। একটি গর্ভপত্রের তিনটি অংশ, যথা: পর্ণাশয় (Ovary), গর্ভদণ্ড (Style) এবং পর্ণমুণ্ড (Stigma)। যখন কতগুলো গর্ভপত্র নিয়ে একটি জীন্তবক গঠিত হয় এবং এরা সকূর্পভাবে পরস্পরের সাথে মুক্ত থাকে, তখন তাকে যুক্তগর্ভপত্রী (Syncarpous), আর আলাদা থাকলে বিমুক্তগর্ভপত্রী (Polycarpous) বলে। গর্ভাশয়ের ভিতরে এক বা একাধিক ডিম্বক বিশেষ নিরামে সজিত থাকে। এসব ডিম্বকের মধ্যে জীৱাণুনকোষ বা ডিম্বাপু সৃষ্টি হয়। এই ডিম্বাপুই পুন্তবকের মডেল সরাসরি জননকাজে অংশগ্রহণ করে।



একক কাজ

কাজ: ফুলের বিভিন্ন স্তবক পর্যবেক্ষণ।

উপকরণ: একটি ফুল, ড্রেড, চিমটা, ব্লাটিং পেপার।

পদ্ধতি: ফুল সংগ্রহ করে এর বেকোনো একটির বিভিন্ন অংশ আলাদা করে ব্লাটিং পেপারে সজিতে রাখ।



একক কাজ

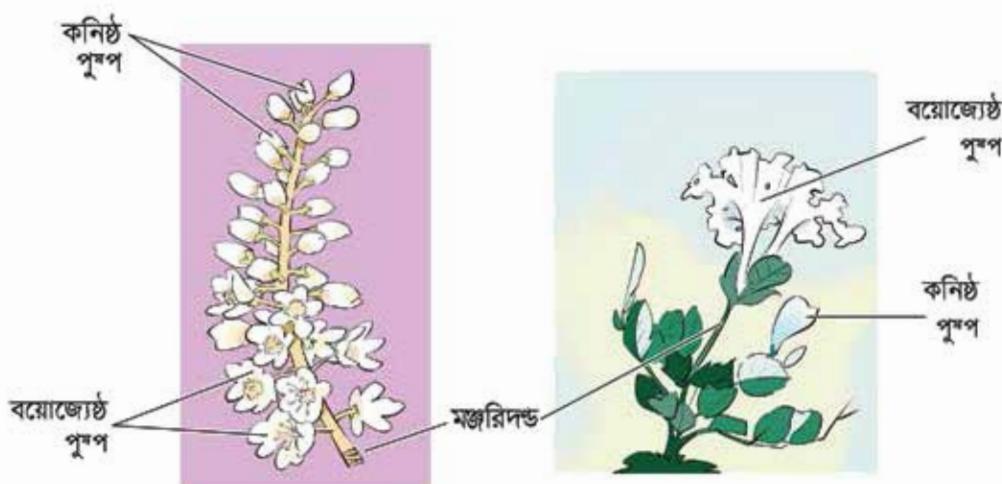
কাজ: গর্ভাশয়ের প্রস্থানেছেদ পর্যবেক্ষণ।

উপকরণ: একটি পরিষ্কৃত ফুল, ড্রেড, সরল অপুরীকৃত যত্ন।

পদ্ধতি: ফুল থেকে গর্ভাশয় আলাদা করে নিয়ে ড্রেড দিয়ে প্রস্থানেছেদ করা এবং অপুরীকৃত যত্নে পরীক্ষা করা। যা যা দেখলে তা খাতার দেখ।

পুক্ষমঞ্চরি (Inflorescence)

পুক্ষমঞ্চরি জোমরা সবাই দেখেছে। অনেক গাছের ছেট একটি শাখায় ফুলগুলো বিশেষ একটি নিয়মে সাজানো থাকে, ফুলসহ এই শাখাকে পুক্ষমঞ্চরি বলে। যে শাখায় ফুলগুলো সজ্জিত থাকে, তাকে মঞ্চরিদণ্ড বলে। এ শাখার বৃদ্ধি অসীম হলে অনিয়ত (recemose) পুক্ষমঞ্চরি এবং পুক্ষ উৎপাদনের ফলে বৃদ্ধি থেমে গেলে তাকে নিয়ত (cymose) পুক্ষমঞ্চরি বলে। পরাগায়নের জন্য পুক্ষমঞ্চরির পুরুষ অনেক বেশি।



চিত্র 11.03: (ক) অনিয়ত পুক্ষমঞ্চরি, (খ) নিয়ত পুক্ষমঞ্চরি

প্রজননের প্রধান দুটি ধাপ হচ্ছে যথাক্রমে পরাগায়ন ও নিষেক। নিচে এ দুটি বিষয়ে সকলকে আলোচনা করা হচ্ছে।

11.2.2 পরাগায়ন (pollination)

পরাগায়নকে পরাগায়ন সংবোধণ বলা হয়। পরাগায়ন ফুল এবং বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়ার পূর্বশর্ত। ফুলের পরাগায়নী থেকে পরাগায়নের একই ফুলে অথবা একই জাতের অন্য ফুলের গর্ভযুক্ত স্থানান্তরিত হওয়াকে পরাগায়ন বলে। পরাগায়ন দুটোয়ের, অ-পরাগায়ন এবং পর-পরাগায়ন।

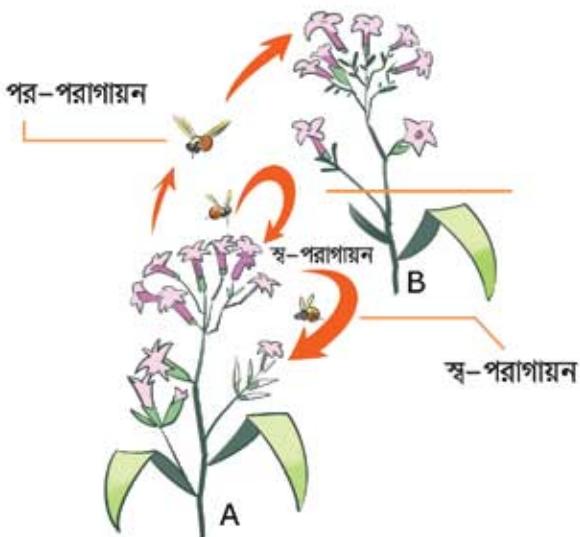
(a) অ-পরাগায়ন: একই ফুলে বা একই গাছের ভিন্ন দুটি ফুলের মধ্যে অধন পরাগায়ন ঘটে, তখন তাকে অ-পরাগায়ন বলে। সরিষা, ধূতুরা ইত্যাদি উদ্ভিদে অ-পরাগায়ন ঘটে থাকে।

অ-পরাগায়নের ফলে পরাগায়নের অগভর কর হয়, পরাগায়নের জন্য বাহকের উপর নির্ভর করতে হয় না এবং পরাগায়ন নিশ্চিত হয়। এর ফলে নতুন যে উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, তাতে বৈশিষ্ট্যেরও কোনো পরিবর্তন

আসে না এবং কোনো একটি প্রজাতির চরিত্রগত বিশুদ্ধতা বজায় থাকে। তবে এতে জিনগত বৈচিত্র্য কম থাকে। এই বীজের থেকে অন্য লেওয়া নতুন গাছের অভিযোগন ক্ষমতা কমে যায় এবং অচিরেই প্রজাতির বিশুদ্ধি ঘটে।

(b) পর-পরাগায়ন: একই প্রজাতির দুটি ডিম উভিসের ফুলের মধ্যে যখন পরাগ সংবোগ ঘটে, তখন তাকে পর-পরাগায়ন বলে। শিমুল, পেঁপে ইত্যাদি গাছের ফুলে পর-পরাগায়ন হতে দেখা যায়।

পর-পরাগায়নের ফলে নতুন চরিত্রের সৃষ্টি হয়, বীজের অন্তর্ভুক্তিসমের হার বৃদ্ধি পায়, বীজ অধিক জীবনশক্তিসম্পন্ন হয় এবং নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়। দুটি ডিম পুরুসক্ষম গাছের মধ্যে পরাগায়ন ঘটে, তাই এর ফলে যে বীজ উৎপন্ন হয় তা নতুন গুরুসক্ষম হয় এবং বীজ থেকে যে গাছ জন্মায় তাও নতুন গুরুসক্ষম হয়। এ কারণে এসব গাছে নতুন বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। তবে এটি বাহকনির্ভর প্রক্রিয়া হওয়ায় পরাগায়নের নিচেরতা থাকে না, এতে প্রচুর পরাগরেপুর অপচয় ঘটে। কলে প্রজাতির বিশুদ্ধতা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।



চিত্র 11.04: স্ব-পরাগায়ন ও পর-পরাগায়ন



চিত্র 11.05: পতঙ্গপরাগী ফুল

পরাগায়নের আধ্যাত্ম

পরাগ স্থানান্তরের কাজটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো না কোনো মাধ্যমের মাধ্যা হয়ে থাকে। যে মাধ্যম পরাগ বহন করে পর্যবেক্ষ পর্যবেক্ষ নিয়ে যায়, তাকে পরাগায়নের মাধ্যম বলে। বায়ু, পানি, কীট-পতঙ্গ, পাখি, বাদুড়, শামুক এবং কৃষি মানুষ এ ধরনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে থাকে। যথু থেকে অথবা সুন্দর রঙের আকর্ষণে পতঙ্গ বা প্রাণী ফুলে ফুলে ঘূরে বেড়ায়। এ সময়ে ঐ ফুলের পরাগরেপু বাহকের পায়ে লেগে থায়। এই বাহকটি যখন অন্য ফুল পিয়ে বসে তখন পরাগ পরবর্তী ফুলের পর্যবেক্ষে লেগে থায়। এভাবে পরাগায়ন ঘটে। পরাগায়নের মাধ্যমগুলোর সাহায্য পেকে ফুলের পাঁচনে কিছু পরিবর্তন লক করা যায়।

পতঙ্গ পরাগী ফুল বড়, ঝজিল ও অধুনাত্মিক এবং পরাগরেপু ও পর্যবেক্ষ আঠালো ও সুগন্ধযুক্ত হয়, যেমন: জবা, কুমড়া, সরিষা ইত্যাদি।

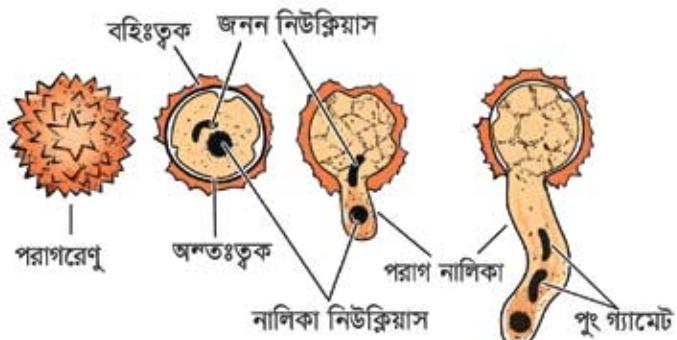
বালিপরাণী ফুল হালকা এবং মধুখন্ধিহীন। এসব ফুলে সুগন্ধ নেই। এরা সহজেই বাতাসে ঝেতে পারে। এদের পর্ণমুড় আঠাশো এবং শাখাবিত, কখনো পাশকের মতো। ফুলে বাতাস থেকে পরাগরেশ্বৰ সহজেই সংগ্রহ করে নিতে পারে, বেমন: ধান। পানিপরাণী ফুল আকারে ক্ষুদ্র এবং হালকা। এরা সহজেই পানিতে ভাসতে পারে। এসব ফুলে সুগন্ধ নেই। ছীপুলের বৃক্ষ সহ কিন্তু পুঁগুলের বৃক্ষ ছোট। পরিষত পুঁপুল বৃক্ষ থেকে খুলে পানিতে ভাসতে থাকে এবং জী পুলের কাছে পৌঁছালে সেখানেই পরাগায়ন ঘটে, বেমন: পাতাশোলা।

প্রাণিপরাণী ফুল মোটায়িটি বড় ধরনের হয়, তবে ছোট হলে ফুলগুলো পুক্ষমণ্ডিতে সাজানো থাকে। এদের রং আকর্ষণীয় হয়। এসব ফুলে গন্ধ থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে, বেমন: কদম্ব, শিয়ুল, কচু ইত্যাদি।

পুঁ গ্যামেটোকাইটের উৎপত্তি (Microsporogenesis)

পরাগরেশ্বৰ পুঁ-গ্যামেটোকাইটের প্রথম কোষ। পরাগ মাতৃকোষতি (2n) মিলেসিস বিভাজনের মাধ্যমে চারটি অপজ্য পরাগ কোষ (n) সৃষ্টি করে। পূর্ণতাত্ত্বিক পরাপর পরাগশলিতে থাকা অবস্থায়ই পরাগরেশ্বর অঙ্গুলোদাসম শুরু হয়। পরাগরেশ্বর নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রিকাটি মাইটোটিক পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়। এ বিভাজনে একটি বড় কোষ এবং একটি ক্ষুদ্র কোষ সৃষ্টি হয়। বড়কোষটিকে নালিকোষ (Tube cell) এবং ছোট কোষটিকে জেনারেটিভ কোষ (Generative Cell) বলে।

নালিকোষ বড় হলে পরাগনালি (Polen tube) এবং জেনারেটিভ কোষটি বিভাজিত হয়ে সূচি পুঁজনল কোষ (Male gametes) উৎপন্ন করে। জেনারেটিভ কোষের এ বিভাজন পরাগরেশ্বরে অথবা পরাগনালিতে সংবটিত হতে পারে।



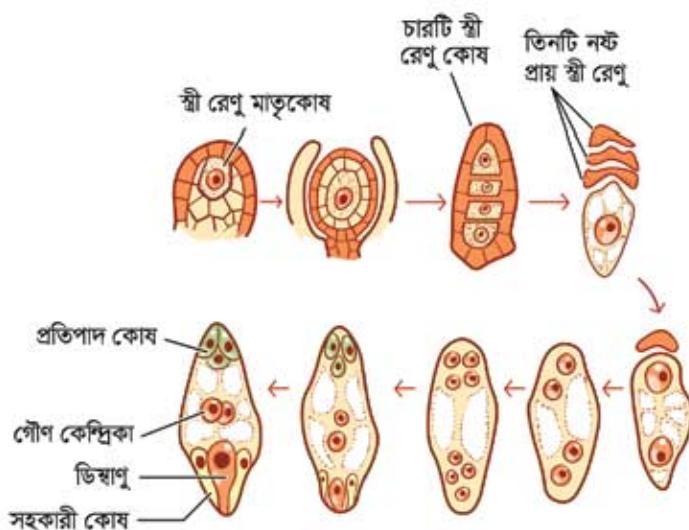
চিত্র 11.07: পুঁ-গ্যামেটোকাইট উৎপত্তির বিভিন্ন ধাপ



চিত্র 11.06: প্রাণিপরাণী ফুল।

ছী-গ্যামেটোফাইট উৎপত্তি (Megasporogenesis)

অৃথগোষ্ঠক কলায় (Nucellus tissue) ডিম্বকরন্ত্রের কাছাকাছি একটি কোষ আকারে সামান্য বড় হয়। এর প্রোটোগ্লাজম ঘন এবং নিউক্লিয়াসটি ভুলনামূলকভাবে বড়। এ কোষটি বিরোজন বিভাজনের (Meiosis) মাধ্যমে চারটি হ্যাপ্লয়েড (n) কোষ সৃষ্টি করে। সর্বনিম্ন কোষটি ছাঢ়া বাকি তিনটি কোষ বিন্দু হয়ে থায়। সর্বনিম্ন এই বড় কোষটি বৃদ্ধি পেয়ে ক্রমশ ঝুঁতুলিতে পরিণত হয়। এ কোষটির নিউক্লিয়াস হ্যাপ্লয়েড (n)। এই নিউক্লিয়াসটি বিস্তৃত হয়ে দুটি নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। এ নিউক্লিয়াস দুটি ঝুঁতুলির দুই মেরুতে অবস্থান নেয়। এবার এ দুটি নিউক্লিয়াসের প্রতিটি পর্যপর দুবার বিস্তৃত হয়ে চারটি করে নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে।

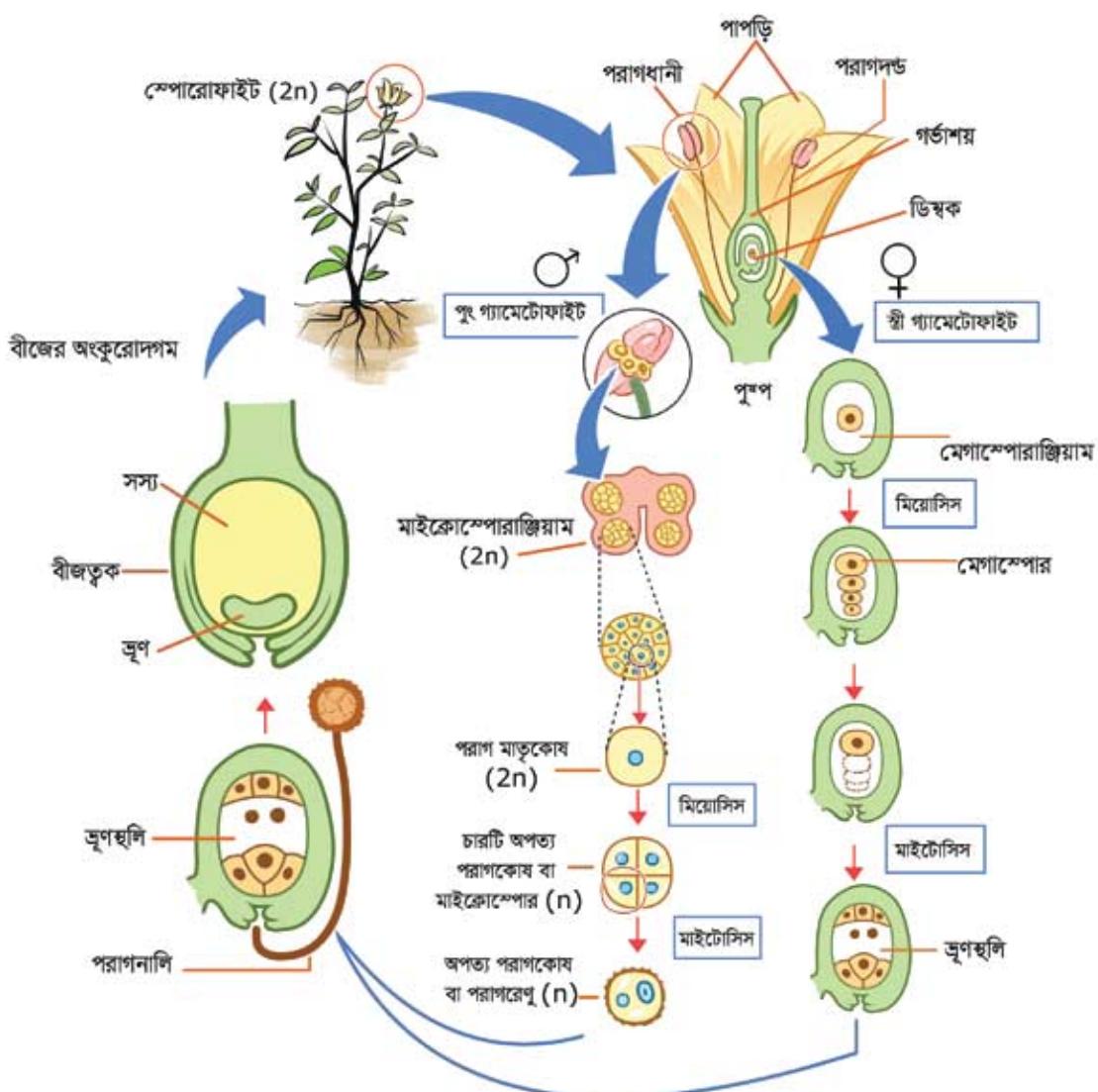


চিত্র 11.08: ছী-গ্যামেটোফাইট উৎপত্তির বিভিন্ন ধাপ

এর পরবর্তী ধাপে দুই মেরু থেকে একটি করে নিউক্লিয়াস ঝুঁতুলির কেন্দ্রস্থলে এসে পরিষ্পরের সাথে মিলিত হয়ে ডিপ্লয়েড ($2n$) গৌণ নিউক্লিয়াস (Secondary nucleus) সৃষ্টি করে। দুই মেরুর নিউক্লিয়াসগুলো সামান্য সাইটোগ্লাজম সহকারে কোষের সৃষ্টি করে। ডিম্বকরন্ত্রের দিকের কোষ তিনটিকে পর্যবর্ত্ত (Egg apparatus) বলে। এর মাঝের কোষটি বড়। একে ডিম্বাণু (Egg) এবং অন্য কোষকে সহকারী কোষ (Synergids) বলা হয়। পর্যবর্ত্তের বিপরীত দিকের কোষ তিনটিকে প্রতিপাদ কোষ (Antipodal cells) বলে। এভাবেই ঝুঁতুলির গঠনশক্তিগ্রাস শেষ হয়।

11.2.3 নিষেক (Fertilization)

পরাগায়নের ফলে পরাগরেণ্ডু গর্ভপত্রের গর্ভযুক্তে (Style) পরিষ্কৃত হয়। এরপর পরাগনালিকা ঝুঁতুলাশ্ব হয়ে গর্ভদণ্ড তেল করে এবং কিছু তরল পদার্থ শোষণ করে শৈষিত হয়ে উঠে। এক সময় এ



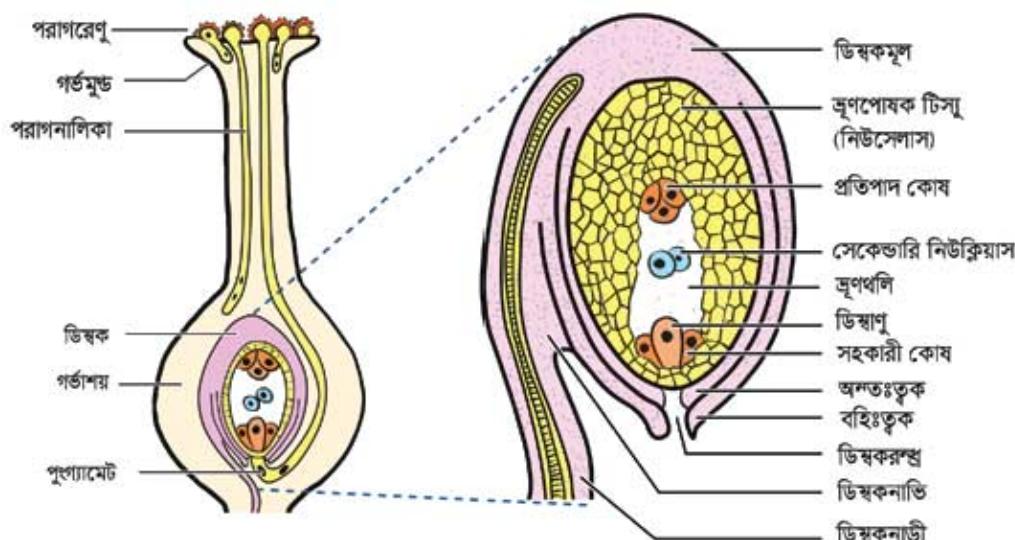
চিত্র 11.09: সম্পূর্ণকাং উত্তিসের জীবন চক্র

স্কীট অঞ্চলগতি ফেটে পুঁজনন কোষ দুটি ভূগহলিতে স্থূল হয়। এর একটি ডিহাইড্রেশন সাথে মিলিত হয়ে **জাইগোট (Zygote)** তৈরি করে। অপর পুঁজনন কোষটি শৌধ নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয়ে **ট্রিপ্লোড (3n)** সম্ম কোষের (Endosperm cells) সৃষ্টি করে।

আব একই সময়ে দুটি পুঁজনন কোষের একটি ডিহাইড্রেশন এবং অপরটি শৌধ নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয়। এ ঘটনাকে **বিনিষেক (Double fertilization)** বলা হয়।

নতুন স্পোরোফাইট গঠন (Development of new sporophyte)

জাইপোট কোষটি স্পোরোফাইটের প্রথম কোষ। এর প্রথম বিভাজনে দুটি কোষ সৃষ্টি হয়। একই সাথে সঙ্গের পরিস্কৃটনও ঘটতে শুরু করে। জাইপোটের বিভাজন অনুপ্রস্থে (Transversely) ঘটে। ডিম্বকরণ্তরের দিকের কোষকে ডিম্বি কোষ (Basal cell) এবং ভূগর্থলির কেন্দ্রের দিকের কোষটিকে এপিক্যাল কোষ (Apical cell) বলা হয়। একই সাথে এ কোষ দুটির বিভাজন চলতে থাকে। ধীরে ধীরে এপিক্যাল কোষটি একটি ভূগ পরিষ্কত হয়। একই সাথে ডিম্বি কোষ থেকে ভূগ্রাক (Suspensor) গঠন করে। ক্রমশ বীজপত্র, ভূগ্রাক এবং ভূগ্রাকভের সৃষ্টি হয়। ক্রমাগতে গৌণ নিউক্লিয়াসটি সম্প্রস্তুত করে। এই সম্য কোষগুলো ট্রিলিয়েড অর্ধাং এবং নিউক্লিয়াসে $3n$ সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। পরিষ্কত অবস্থায় ডিম্বকটি সম্য ও ভূগ্রাক বীজে পরিষ্কত হয়। এ বীজ অক্ষুরিত হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ স্পোরোফাইটের সৃষ্টি করে।



চিত্র 11.10: ডিম্বকের গঠন ও নিম্নেক প্রক্রিয়া

অতএব দেখা গেল, একটি সংগৃহক উদ্ভিদের জীবলচক্রে স্পোরোফাইট এবং গ্যামেটোফাইট নামে সৃষ্টি পর্যায় একটির পর একটি চক্রাকারে চলতে থাকে।

কলের উৎপত্তি

আমরা কল বলতে সাধারণত আম, কাঁচাল, শিলু, কলা, আঙুর, আপেল, পেঁয়াজ, সফেদা ইত্যাদি সুস্থিত ফলগুলোকে বুঝি। শাউ, কুমড়া, বিঞা, পাঁচ ইত্যাদি সবজি হিসেবে খাওয়া হলেও ধৰ্মতপক্ষে এগুলো সবই ফল। নিবিক্ষুকরণ প্রক্রিয়া শেষ হলেই ফল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। নিবিক্ষুকরণ প্রক্রিয়া পর্যাপ্ত হে উকীলনার সৃষ্টি করে, তার কারণে ধীরে ধীরে এটি ফলে পরিষ্কত হয় এবং এর ডিম্বকগুলো বীজে

রূপান্তরিত হয়। নিষিক্তকরণের পর গর্ভাশয় এককভাবে অথবা ফুলের অন্যান্য অংশসহ পরিপূর্ণ হয়ে যে অঙ্গ গঠন করে, তাকে ফল বলে।

শুধু গর্ভাশয় ফলে পরিণত হলে তাকে প্রকৃত ফল বলে, যেমন: আম, জাম। গর্ভাশয়সহ ফুলের অন্যান্য অংশ পূর্ণ হয়ে যখন ফলে পরিণত হয়, তখন তাকে অপ্রকৃত ফল বলে, যেমন: আপেল, চালতা ইত্যাদি। সব প্রকৃত এবং অপ্রকৃত ফলকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন: সরল ফল, গুচ্ছ ফল এবং ঘোগিক ফল।

11.3 প্রাণীর প্রজনন

প্রাণিগতে দুই ধরনের প্রজনন দেখা যায়, অযৌন প্রজনন (Asexual reproduction) এবং যৌন প্রজনন (Sexual reproduction)।

অযৌন প্রজনন: নিম্নশ্রেণির প্রাণীতে অযৌন প্রজনন ঘটে। মুকুলোদগম (Budding), বিভাজন, খণ্ডায়ন ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতিতে অযৌন প্রজনন হয়।

যৌন প্রজনন: যে প্রক্রিয়ায় দুইটি বিপরীত লিঙ্গের প্রাণী পুঁ ও স্ত্রীজনন কোষ বা গ্যামেট (Gamete) উৎপন্ন করে এবং তাদের নিষেকের মাধ্যমে প্রজনন ঘটায় ও সন্তান-সন্ততি উৎপন্ন করে, তাকে যৌন প্রজনন বলে।

11.3.1 নিষেক (Fertilization)

যৌন প্রজননের জন্য নিষেক প্রয়োজন। এটি একটি জৈবিক প্রক্রিয়া। যৌন প্রজননে ডিস্কাগু এবং শুক্রাগুর মিলনকে নিষেক বলে। শুক্রাগু সক্রিয়ভাবে ডিস্কাগুতে প্রবেশ করে এবং এদের নিউক্লিয়াস দুটি পরস্পর একীভূত হয়। একীভূত হয়ে যে কোষটি উৎপন্ন হয়, তাকে জাইগোট বলে। নিষেক ক্রিয়া সংঘটিত করার জন্য কিছু সময় লাগে। ডিস্কাগু এবং শুক্রাগু উভয়ই হ্যাপ্লয়েড (n) অর্থাৎ এক প্রস্থ ক্রোমোজোম (Chromosome) বহন করে। জাইগোট ডিপ্লয়েড ($2n$) বা দুই প্রস্থ ক্রোমোজোমবিশিষ্ট। স্ত্রী ও পুঁ উভয় জননকোষের পূর্ণতা প্রাপ্তি নিষেকের পূর্বশর্ত।

নিষেক প্রক্রিয়া বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। প্রাকৃতিকভাবে একই প্রজাতির পরিণত শুক্রাগু এবং ডিস্কাগুর মধ্যে এটি সংঘটিত হয়। নিষেক সাধারণত অপরিবর্তনশীল। একবার নিষিক্ত হলে ঐ ডিস্কাগুকে পুনরায় নিষিক্ত করা যায় না। নিষেক দুই ধরনের: বহিঃ নিষেক (External Fertilization) এবং অন্তঃ নিষেক (Internal Fertilization)।

(a) বহিঃ নিষেক: যে নিষেক ক্রিয়া প্রাণিদেহের বাইরে সংঘটিত হয় তা বহিঃ নিষেক নামে পরিচিত। এ ধরনের নিষেক সাধারণত পানিতে বাস করে এমন সব প্রাণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যেমন:

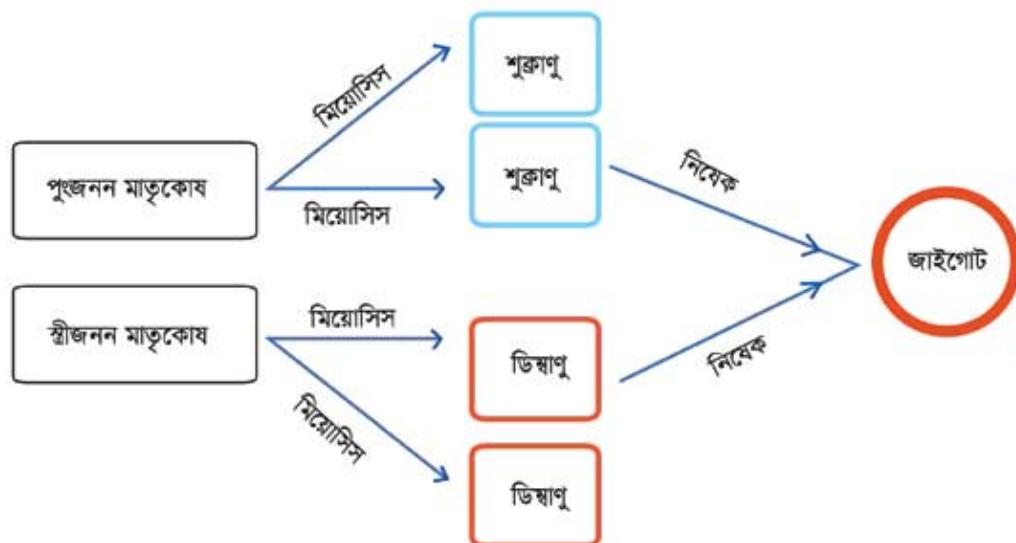
বিভিন্ন ধরনের মাছ, ব্যাট প্রভৃতি। তবে এর ব্যক্তিগত রুপেছে, যেমন: হাঙর।

(b) অন্তঃ নিষেক: জীবদেহের জননালো সংস্থাত নিষেক অন্তঃ নিষেক নামে পরিচিত। সাধারণত শারীরিক প্রয়োগের মাধ্যমে পুরুষ প্রাণী তার শূক্রাণু জী জননালো প্রবেশ করিয়ে এ ধরনের নিষেক ঘটায়। অন্তঃ নিষেক ডাঙায় বসবাসকারী অধিকাংশ প্রাণীর অন্তর্ম বৈশিষ্ট্য।

নিষেকের ক্ষেক্ষণ মৌলিক ধাপগুলো

নিষেক অন্তে ডিপ্লায়েড ক্রোমোজোম সংখ্যাকে পুনরুৎপাদিত করে, ডিম্বাণুকে পরিষ্কৃটনের জন্য সক্রিয় করে তোলে, ক্রোমোজোম কর্তৃক বহনকৃত পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্যগুলোকে একত্রিত করে ভূমির স্থিতি নির্ধারণ করে।

নিচে ব্রুকচিত্রের সাহার্যে মানুষের প্রজননের ধাপগুলো দেখানো হলো:



চিত্র 11.11: মানব প্রজননের বিভিন্ন ধাপ (ব্রুকচিত্র)

বংশবিক্রিকার এবং বংশ রক্ষার জন্য প্রক্রিয়া অঙ্গস্ত প্রয়োজন। এ প্রক্রিয়ায় মাতৃগর্ভে ভূমির সৃষ্টি হয় এবং সম্পূর্ণ জন্ম নেও। মানুষ একগুচ্ছ বিশিষ্ট প্রাণী অর্থাৎ প্রজননের জন্য জী ও পুরুষে পৃথক পৃথক অঙ্গ বর্তমান।

11.3.2 মানব প্রজননে হরযোনের ভূমিকা

ইতোমধ্যে তোমরা জেনেছ যে হরযোন এক ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ; যা নালিহীন প্রক্রিয়া থেকে নিঃসৃত হয়। এটি রাসায়নিক দৃত হিসেবে সরাসরি রক্তের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে

এবং দেহের বিভিন্ন বিপাকীয় ও শারীরবৃত্তীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে এবং বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটাতে সাহায্য করে। হরমোন নির্দিষ্ট অথচ স্বল্পমাত্রায় নিঃসৃত হয়ে নানাবিধ শারীরবৃত্তীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে বেশি বা কম নিঃসরণ হলে দেহের বিভিন্ন কাজের ব্যাঘাত ঘটে। দেহে নানা রকম অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়।

আমাদের শরীরে নিম্নলিখিত গ্রন্থিগুলো প্রজনন-সংক্রান্ত হরমোন নিঃসরণ করে:

- (i) পিটুইটারি গ্রন্থি (Pituitary gland)
- (ii) থাইরয়েড গ্রন্থি (Thyroid gland)
- (iii) অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি (Adrenal gland)
- (iv) শুক্রাশয়ের অনালগ্রন্থি (Testis)
- (v) ডিম্বাশয়ের অনালগ্রন্থি (Ovary)
- (vi) অমরা (Placenta)।

পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে বিভিন্ন ধরনের বৃদ্ধি উদ্দীপক হরমোন এবং উৎপাদক হরমোন নিঃসৃত হয়। এ হরমোনগুলো জননগ্রন্থির বৃদ্ধি, ক্ষরণ এবং কাজ নিয়ন্ত্রণ করে, মাতৃদেহে স্তনগ্রন্থির বৃদ্ধি এবং দুধ ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া এগুলো জরায়ুর সংকোচন নিয়ন্ত্রণ করে। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে থাইরক্সিন নিঃসৃত হয়। এ হরমোন দৈহিক এবং মানসিক বৃদ্ধি, যৌনলক্ষণ প্রকাশ এবং বিপাকে সহায়তা করে। অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত কিছু হরমোন যৌনাঙ্গা বৃদ্ধি ও যৌনলক্ষণ প্রকাশে সহায়তা করে। শুক্রাশয় থেকে নিঃসৃত টেস্টোস্টেরন ও অ্যাড্রোজেন শুক্রাণু উৎপাদন, দাঢ়ি-গোঁফ গজানো, গলার স্বর পরিবর্তন ইত্যাদি যৌনলক্ষণ প্রকাশে সহায়তা করে। ডিম্বাশয় থেকে নিঃসৃত ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন হরমোন মেয়েদের নারীসূলভ লক্ষণগুলো সৃষ্টি, ঝাতুচক্র নিয়ন্ত্রণ এবং গর্ভাবস্থায় জরায়ু, ভ্রূণ, অমরা ইত্যাদির বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া ডিম্বাণু উৎপাদনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অমরা থেকে নিঃসৃত গোনাডোট্রিপিন ও প্রোজেস্টেরন ডিম্বাশয়ের অনাল গ্রন্থিকে উভেজিত করে এবং স্তনগ্রন্থির বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে।

মানবশিশু জন্মগ্রহণের সময় তাদের প্রজননতন্ত্র অপরিণত অবস্থায় তাকে। শিশু তার বাল্যকাল অতিক্রম করে কৈশোর এবং তারুণ্যে উপনীত হয়। কৈশোর এবং তারুণ্যের সন্ধিকালই হলো বয়ঃসন্ধিকাল। এ সময় ছেলেমেয়েদের দৈহিক, মানসিক এবং যৌন বৈশিষ্ট্যগুলোর বিকাশ ঘটে। তাদের প্রজননতন্ত্রের অঙ্গগুলোর বৃদ্ধি এবং বিকাশ ঘটতে শুরু করে। হরমোন এসব কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাদের দেহের বাইরে এবং ভিতরে পরিবর্তন ঘটে, যেমন: ছেলেদের গোঁফ-দাঢ়ি গজায়, গলার স্বর পরিবর্তন হয় এবং কাঁধ চওড়া হয়।

বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের দেহে যেসব পরিবর্তন দেখা যায় তা হলো: দেহস্থক কোমল হয়, চেহারায় কমনীয়তা বৃদ্ধি পায় এবং ঝাতুম্বাব বা মাসিক হয়। বয়ঃসন্ধিকাল থেকে মেয়েদের নির্দিষ্ট সময় পরপর

রন্তম্বাব হয়। একে মাসিক বা ঝতুম্বাব বলে। বয়ঃসন্ধিকালের 1-2 বছর পর মেয়েরা প্রজনন ক্ষমতা লাভ করে। সাধারণত 40-50 বছর বয়স পর্যন্ত মেয়েদের ঝতুম্বাব চক্র চলতে থাকে। এরপর ঝতুম্বাব চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। একে মেনোপাজ (Menopause) বা রজনিবৃত্তিকাল বলে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বিষয়টি মনে রাখা দরকার, গর্ভাবস্থায় মেয়েদের রন্তম্বাব সাময়িক বন্ধ থাকে। সন্তান প্রসবের প্রায় দেড় মাস পর আবার স্বাভাবিক রন্তম্বাব শুরু হয়।

বিয়ে একটি সামাজিক, ধর্মীয় এবং পারিবারিক বন্ধন। বিয়ের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ প্রচেষ্টায় একটি পরিবার গড়ে ওঠে। তাঁরা দুজনে নির্দিষ্ট মেলামেশা করতে পারে। তাদের মাঝে প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিয়ের ব্যাপারে একটি নির্দিষ্ট বয়সসীমা মেনে চলা দরকার। মেয়েদের 20 বছর বয়সের আগে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়। বাল্যবিবাহের ফলে মেয়েরা অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ করে। এর ফলে গর্ভবতী মা এবং সন্তান উভয়েরই ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক সম্পর্কের মাধ্যমে পুরুষের শুক্রাণু স্ত্রী প্রজনন অঞ্চলে প্রবেশ করে। শুক্রাণুতে লেজ থাকে। যা তাকে সাঁতরিয়ে স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের ভিতর প্রবেশ করতে সাহায্য করে। পরিণত শুক্রাণু এবং ডিস্কাগুর মিলন ঘটে স্ত্রীর ডিস্কাগুলিতে। এ মিলনকে নিষেক বলে। তবে জেনে রাখা প্রয়োজন, একটি শুক্রাণু দিয়ে একটিমাত্র ডিস্কাগু নিষিক্ত হয়। এভাবে মানবদেহের ভিতরে অন্তঃ নিষেক ঘটে। এ বিশেষ পদ্ধতিতে শুক্রাণুর একপ্রস্থ ক্রোমোজোম (n) ও ডিস্কাগুর একপ্রস্থ ক্রোমোজোমের (n) মিলন ঘটে, ফলে দুই প্রস্থ ক্রোমোজোমের ($2n$) সমন্বয়ে জাইগোট (Zygote) উৎপন্ন হয়।

11.3.3 ভূগের বিকাশ

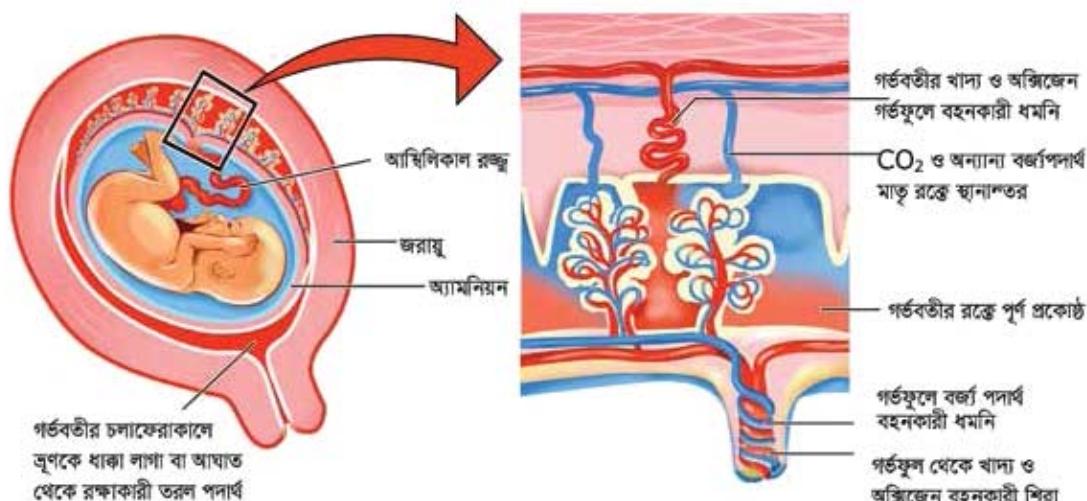
নিষিক্ত ডিস্কাগু ধীরে ধীরে ডিস্কাগুলি বেয়ে জরায়ুর দিকে অগ্রসর হয়। এ সময় নিষিক্ত ডিস্কাগুর কোষ বিভাজন বা ক্লিভেজ (cleavage) চলতে থাকে। কোষ বিভাজনের শেষ পর্যায়ের গঠনুক্ত ভূগুণ ডিস্কাগুলি থেকে জরায়ুতে পৌঁছায়। এ পর্যায়ে ভূগুণকে ব্লাস্টোসিস্ট (Blastocyst) বলে। জরায়ুতে এর পরে যে ঘটনাবলির অবতারণা হয়, তা ভূগুণ গঠনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ব্লাস্টোসিস্টের পরবর্তী পর্যায়গুলো সম্পন্ন হওয়ার জন্য ভূগুণকে জরায়ুর প্রাচীরে সংলগ্ন হতে হয়। জরায়ুর প্রাচীরে ভূগের এ সংযুক্তিকে ভূগুণ সংস্থাপন (Implantation) বা গর্ভধারণ বলে। জরায়ুর অন্তঃগাত্রে সংলগ্ন অবস্থায় ভূগুণটি বাড়তে থাকে এবং ধীরে ধীরে মানবশিশুতে পরিণত হয়। জরায়ুর অন্তঃগাত্রে ভূগের সংস্থাপন হওয়ার পর থেকে শিশু ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত সময়কে গর্ভাবস্থা বলে। এ সময় মাসিক বা রজচক্র বন্ধ হয়ে যায়। সাধারণত 38-40 সপ্তাহ পর্যন্ত গর্ভাবস্থা বিদ্যমান থাকে।

অমরা (Placenta)

যে বিশেষ অঞ্চলের মাধ্যমে মাতৃ জরায়ুতে ক্রমবর্ধমান ভূগুণ এবং মাতৃ জরায়ু-টিস্যুর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাকে অমরা বা গর্ভফুল বলে। ভূগুণ জরায়ুতে পৌঁছানোর 4-5 দিনের মধ্যে সংস্থাপন সম্পন্ন হয়।

ক্রমবর্ধমানশীল ঝুঁপের কিছু কোষ এবং মাতৃ জরায়ুর অস্তিত্বের কিছু কোষ মিলিত হয়ে ডিশাকার ও রক্তনালিসমূহ এই অমরা তৈরি করে। নিষেকের 12 সপ্তাহের মধ্যে অমরা গঠিত হয়। এভাবে ঝুঁপ এবং মাতৃ জরায়ুর অস্তিত্বের মধ্যে একটি অবিজ্ঞপ্ত অস্থায়ী অঙ্গ তৈরি হয়। প্রসবের সময় অমরা দেহ থেকে নিষ্কাশ্য হয়ে যায়।



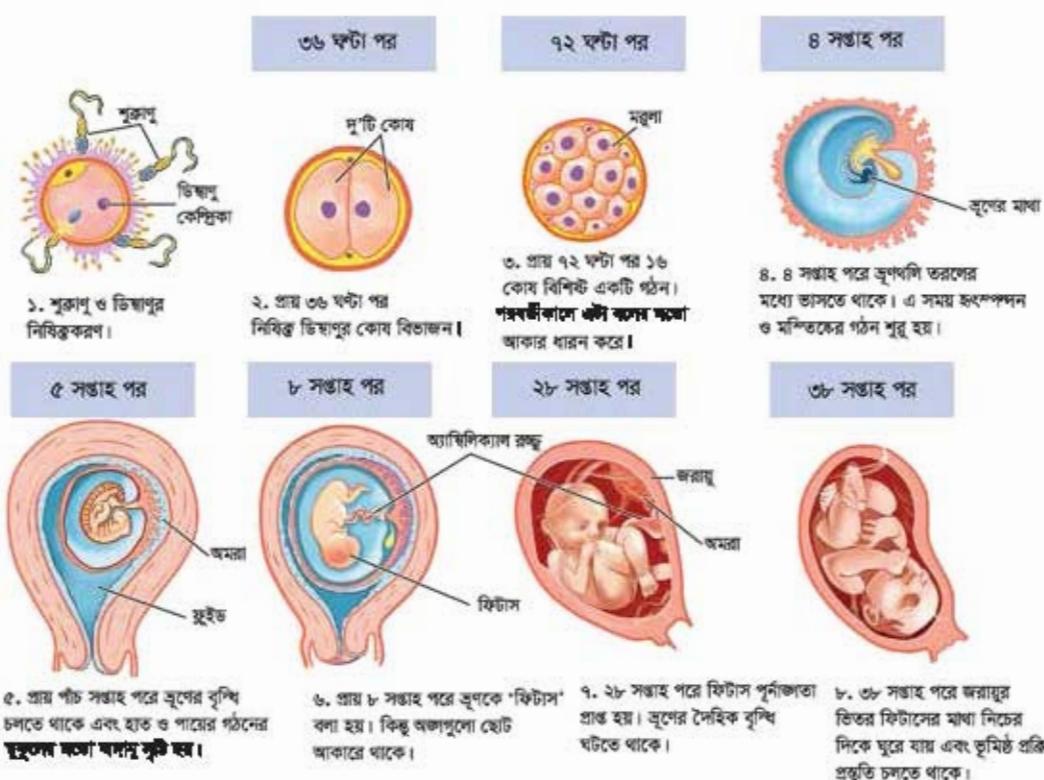
চিত্র 11.12: মাতৃগর্ভে অমরা ও ঝুঁপ

অমরার সাহায্যে ঝুঁপ জরায়ুর পার্শ্বে সংস্থাপিত হয়। ঝুঁপের বৃশির জন্য আমের দরকার। শর্করা, আমিষ, মেহ, পানি এবং খনিজ শব্দে ইত্যাদি অমরার মাধ্যমে মাদ্যের রক্ত থেকে ঝুঁপের রক্তে প্রবেশ করে। অমরা অনেকটা যুমকুলের মতো কাজ করে। অমরার মাধ্যমে ঝুঁপ মাদ্যের রক্ত থেকে অক্সিজেন ধারণ এবং ঝুঁপ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইডের বিনিময় ঘটে। অমরা একই সাথে ঝুঁপের মতো কাজ করে। বিপাকের কলে থেকে বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন হয় তা অমরার মাধ্যমে ঝুঁপের দেহ থেকে অপসারিত হয়। অমরা কিছু পুরুষপূর্ণ হরমোন তৈরি করে। এ হরমোন ঝুঁপের রক্তপ্রবেক্ষণ ও তার স্বাভাবিক গঠনে সাহায্য করে।

অমরাতে প্রচুর রক্তনালি থাকে। অমরা, আবিশিকাল কর্ত থার্মো স্টুপের সাথে যুক্ত থাকে। একে নাড়িও বলা হয়। এটা মূলত একটি নালি, যার ভিতর দিয়ে মাতৃদেহের সাথে ঝুঁপের বিভিন্ন পদার্থের বিনিময় ঘটে। গর্ভবত্ত্বায় অমরা থেকে এমন কঠপূলো হরমোন নিঃসৃত হয়, যা মাতৃদুর্দশ উৎপাদন এবং প্রসব সহজ করতে সহায়তা করে।

झুঁপ আবরণী (Foetal membranes)

প্রত্যেক প্রজাতিতে ঝুঁপের জন্য মাতৃদেহের ভিত্তি সহজ, স্বাভাবিক এবং নিরাপদ পরিবর্ষনের ব্যবস্থা হিসেবে ঝুঁপের চারদিকে কঠপূলো বিলি বা আবরণ থাকে। এগুলো ঝুঁপের পৃষ্ঠা, প্যাসীয় আদান-প্রদান,



চিত্র 11.13: শূরুর বৃদ্ধি ও বিকাশ

বর্জ্য নিষ্কাশন ইত্যাদি কাছে সহজে করে। শূরু আবরণীগুলো ক্রমবর্ধনশীল শূণকে রক্ষা করে এবং অতিশুরুতপূর্ণ কাছ নিয়ন্ত্রণে অংশ নেয়।

শূরু মাতৃগতি পড়ে প্রায় 40 সপ্তাহ অবস্থান করে। এই একই সময়ে পর্যবেক্ষণ মায়োর অপ্র পিটুইটারি ও অমরা থেকে হরমোন নিঃসরণ শুরু হয়। প্রসবের পূর্বে অমরায় নির্দিষ্ট ব্যবস্থানে সংকুচিত হতে থাকে এবং ব্যাথা-বেদনার সূচি হয়। এই ক্রমবর্ধমান বেদনাকে প্রসববেদনা (Labour pain) বলে। প্রসবের পোর্চের শূরুর বাইরের পর্দাগুলো ফেঁটে যায়। এর ভিতরের তরল বাইরে নির্গত হয়। এক পর্দারে শিশু ভূমিত হয়।

11.4 প্রজনন-সংক্রান্ত রোগ

11.4.1 এইচিস (Acquired Immune Deficiency Syndrome বা AIDS)

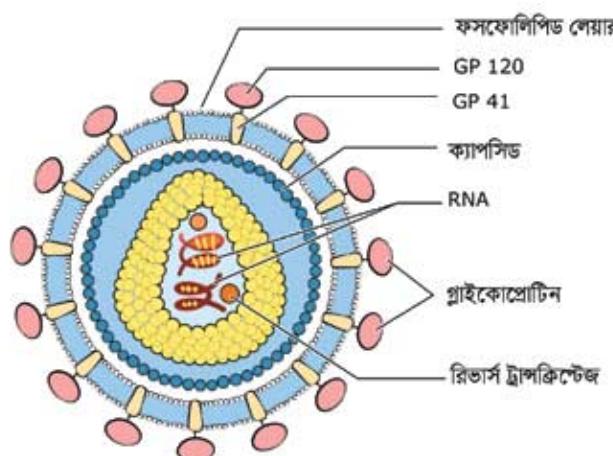
বর্তমান বিশ্বে এইচিস একটি মারাত্মক ঘাতক ব্যাধি হিসেবে পরিচিত। 1981 সালে রোগটি আবিষ্কৃত হয়। Acquired Immune Deficiency Syndrome-এর শব্দগুলোর আন্দোলন দিয়ে এ রোগটির নামকরণ

করা হয়েছে AIDS। UNAIDS-এর এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে সারা বিশ্বে বর্তমানে প্রায় 2 কোটি 30 লাখের বেশি লোক AIDS-এর জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত। এর মধ্যে প্রায় 40 শতাংশ হলো নারী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জন্য অনুযায়ী, প্রায় 164 টি দেশে এই রোগের বিস্তার ঘটেছে। Human Immune Deficiency Virus সংকেতে HIV ভাইরাসের আক্রমণে এইডস হয়। এই ভাইরাস খেত রক্ত কোষের ক্ষতিসাধন করে এবং এ কোষের এন্টিবডি তৈরিসহ রোগ প্রতিরোধ-সঠাফান্ত কাজে বিষ ঘটায়। কলে খেত রক্ত কোষের সংখ্যা (বিশেষ করে CD4 জাতীয় খেত রক্তকোষ) ও এন্টিবডির পরিমাণ কমপ্ল কমতে থাকে। এই ভাইরাস মানবদেহে সৃষ্টি অবস্থায় অনেক দিন থাকতে পারে। এই ভাইরাসের আক্রমণে রোগীর দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিনষ্ট হয়ে দ্বারা বলে রোগীর মৃত্যু অনিবার্য হয়ে পড়ে। কারণ এইডস রোগীর রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করার মতো কোনো উৎস এখনও আবিষ্কার হয়নি।

এইডস রোগের কারণ

নিম্নলিখিত কারণে একজন সুস্থ ব্যক্তি এই ঘাতক রোগ দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন। যেমন:

- (i) এইডস আক্রান্ত পুরুষ বা মহিলার সাথে অনিয়াপদ যৌনমিলনের মাধ্যমে এ রোগ হয়।
- (ii) দুর্বলাভনিত রক্তক্রিপ, প্রস্বজনিত রক্তক্রিপ, বড় আঙ্গোপচার, রক্তশূন্যতা, ধ্যালাসেমিয়া, ক্যালার ইভ্যাদি ক্ষেত্রে সেহে রক্ত পরিসরালন প্রয়োজন হয়। এ অবস্থার এইডস রোগে আক্রান্ত রোগীর রক্ত সূক্ষ্ম ব্যক্তির দেহে সঞ্চালন করলে এইডস রোগ হয়।
- (iii) এইডসে আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে সরাসরি সম্ভালে রোগটি ছড়ায় না। ব্যক্তির সাথে যৌনমিলনের মাধ্যমে মাঝের এইডস হতে পারে এবং আক্রান্ত মাঝের গর্ভের সম্ভাল তখন এইডস রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এ রোগে আক্রান্ত মাঝের দুধ শিশু পান করলে সে শিশুও এইডসে আক্রান্ত হতে পারে।
- (iv) HIV জীবাণুযুক্ত ইনজেকশনের সিরিজ, সুচ, দস্ত চিকিৎসার যন্ত্রপাতি এবং অপারেশনের যন্ত্রপাতির ব্যবহারের মাধ্যমেও সুস্থ ব্যক্তি এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এমনকি সেলুনে একই ভ্রেত একাধিক ব্যক্তি ব্যবহার করলে তার মাধ্যমেও রোগটি ছড়াতে পারে।



চিত্র 11.14: HIV ভাইরাসের পর্ণ

(v) এইভসে আক্রান্ত ব্যক্তির কোনো অঙ্গ অথবা ব্যক্তির দেহে প্রতিষ্ঠাপন করলে এ রোগ সংক্রমিত হয়।

এইভস রোগের সম্পর্ক

রোগ জীবাণু সুস্থ দেহে প্রবেশ করার প্রায় ৬ মাস পরে এই রোগের লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। তখন এর প্রকাশ অত্যন্ত মৃদু থাকে এবং কিছুদিনের মধ্যেই মিলিয়ে যায়। তারপর কয়েক মাস থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত রোগী আপাতদৃষ্টিতে সুস্থ থাকে কিন্তু তার দেহের মধ্যে এইভসের ভাইরাস সংখ্যাবৃদ্ধি করতে থাকে। ভাইরাস ঘর্ষণে সংখ্যার বৃদ্ধি পেলে হঠাত করেই অসুস্থ মারাত্মকভাবে ফিরে আসে। তখন আর বেশি কিছু করার থাকে না। এর আগে সেই ব্যক্তি যে এইভস রোগের বাহক তা বোবা যুশ্কিল। এইভসের লক্ষণগুলো হলো:

- ছুত রোগীর উজ্জ্বল কমতে থাকে।
- এক মাসেরও বেশি সময়ব্যাপী একটানা জ্বর থাকে অথবা জ্বর জ্বর ভাব দেখা দেয়।
- এক মাস বা তারও বেশি সময় ধরে পাতলা পায়খানা হয়।
- অনেক দিন ধরে শুকনো কাণি হতে থাকে।
- ঘাঢ় এবং বগলে ব্যথা অনুভব হয়, মুখমণ্ডল খসখসে হয়ে যায়।
- মুখমণ্ডল, চোখের পাতা, নাক ইত্যাদি অঙ্গ হঠাত ফুলে যায় এবং সহজে এই ফোলা করে না।
- সারা দেহে চুলকানি হয়।

এইভস রোগ প্রতিরোধের উপায়

তোমরা ইতিমধ্যে এই রোগ সম্পর্কে জেনেছ। এসো এগুলো মনে আছে কি না তা পরীক্ষা করে নেওয়া যাক।

- এইভস প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কী?
- এই রোগ বিস্তারের কারণগুলো থেকে বিরত থেকে রোগটি প্রতিরোধ করা কি সম্ভব? তোমরা প্রতিরোধের উপায়গুলো বোর্ড লেখ ও একটি সংক্ষিপ্তসার তৈরি কর।



একক কাজ

কাজ : তোমরা ৫ জন করে এক একটি দলে ভাগ হয়ে এইভস প্রতিরোধের বিষয়ে পোস্টার/লিপিবদ্ধ অঙ্কন কর।

অনুশীলনী



সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- মানুষকে এক সিলাবিশিষ্ট প্রাণী বলা হয় কেন?
- জরায়ু কী? এর আয়োজনীয়তা কী?
- অমরা কী? অমরার কাজ কী?
- এইডস রোধে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত?
- প্রজনন-সংক্রান্ত হরযোনগুলোর কাজ ব্যাখ্যা কর।



রচনামূলক প্রশ্ন

- মূলকে উচ্চিদের প্রজনন অঙ্গ বলা হয় কেন? বর্ণনা কর।
- এইডস রোপের কারণ, সম্পর্ক ও প্রতিকার বর্ণনা কর।



বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- কোন মূলে বিশুদ্ধ পরামর্শদত্ত থাকে?

ক. জ্বা	খ. মটর
গ. শিমুল	ঘ. সূর্যমুখী
- বাহুপরাণী মূল—
 - আকারে বড় হয়
 - গর্ভমূভবৃত্ত হয়
 - মধুপ্রিণি অনুপস্থিত থাকে

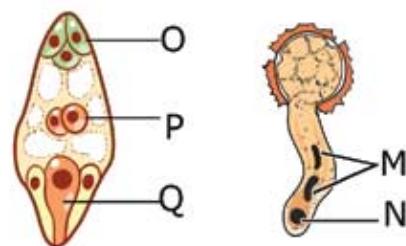
চিকিৎসকটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i এ ii | খ. i এ iii |
| গ. ii এ iii | ঘ. i, ii এ iii |

উদ্বিগ্নক লক কর এবং ৩ এ ৪ নম্বর থার্মের উত্তর দাও

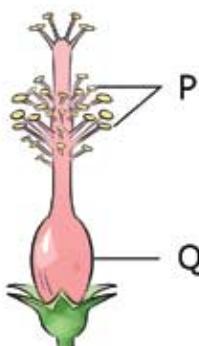
৩. চিকিৎসকের কোন অংশটি পরিবর্তিত হয়ে বীজ হব?

- | | |
|------|------|
| ক. N | খ. O |
| গ. P | ঘ. Q |
৪. সম্মত সৃষ্টিতে চিকিৎসকের কোন অংশটি ভূমিকা রাখে?
- | | |
|----------|----------|
| ক. M এ Q | খ. M এ P |
| গ. M এ N | ঘ. N এ P |



স্মরণশীল প্রশ্ন

১.



- ক. পরাগাঞ্চি কী?
 খ. অনিয়ত পুরুষমণিরি বলতে কী বোঝায়?
 গ. P অংশটি এই ফুলে অনুগম্বিত থাকলে পরাগাঞ্চের ফেড্রে কী ঘটবে ব্যাখ্যা কর।
 ঘ. Q চিহ্নিত অংশটি কীভাবে প্রজাতিকে রক্ষা করে স্থুলিসহ তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

2. 12 বছরের হৃদয় ছেটবেলা থেকে সুরেলা কর্তৃ গান গায়। ইদানীং কিছু দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনের পাশাপাশি তার গলার স্বর মোটা হয়ে গেছে। তাই তার মা চিকিৎসকের কাছে গেলে তিনি বললেন, এ সময়ে শিশুদের মধ্যে এরূপ পরিবর্তন ঘটাই স্বাভাবিক।

ক. অমরা কী?

খ. AIDS-কে ঘাতক রোগ বলা হয় কেন?

গ. হৃদয়ের এই সময়ের ঘটনাগুলো ঘটার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. হৃদয়ের এই সময়ে পরিবারের বড়দের তার প্রতি করণীয় ভূমিকাগুলো ব্যাখ্যা কর।

ବାଦ୍ୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ
ଜୀବେର ବଂଶଗତି ଓ ବିବର୍ତ୍ତନ



ମାନୁଷ, ଶିଳ୍ପାଳି, ଖରାଂତୋଟି ଓ ମ୍ୟାକାକ ବାନଙ୍ଗର ଖୁଲିର ଫୁଲନାମୂଳକ ଛବି

ମାତା-ପିତାର ଆକୃତି ଓ ଅକୃତିଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟାବଳି ବଂଶୋନ୍ତରୟେ ସମ୍ଭାନ-ସମ୍ଭାନୀତେ ସଂଗ୍ରହିତ ହୁଏ । ମାତାପିତା ଥିବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ଭାନେ କୀମେର ମାଧ୍ୟମେ କୀଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ତା ଆମରା ଏ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନରେ ଜୀବନରେ ପାଇବାର । ଏ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଆମର ଜୀବନରେ ଯେ ଜୀବଜ୍ଞଗତେର ମଧ୍ୟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରେସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ତାରା ତାଦେର ପୂର୍ବପୁରୁଷ (Ancestor) ଥିବା ଉଚ୍ଛ୍ଵାସ ହୁଏ ବିବର୍ତ୍ତନ ବା କ୍ରମବିକାଳେର ମାଧ୍ୟମେ କ୍ରମାଗତ ପରିବାରିତ ଓ ବୃଦ୍ଧାନ୍ତରିତ ହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପ ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ।



এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- বংশগতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বংশপ্রকল্পরায় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বহনকারী উপাদানসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বংশপ্রকল্পরায় স্থানান্তর ব্যাখ্যা করতে পারব।
- DNA অঞ্চিত ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বংশগতির তথ্য স্থানান্তরে ডিএনএ (DNA)-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- DNA টেস্টের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- লিঙ্গ নির্ধারণে পুরুষের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জেনেটিক ডিসঅর্ডারের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারব।
- বিবর্জনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিবর্জনের গ্রাহকিক নির্বাচন মতবাদ বর্ণনা করতে পারব।
- প্রজাতির টিকে থাকার বিবর্জনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- যা-বাৰাৰ সাথে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যমূলক বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্ণয় করতে পারব।
- আমদের জীবনে ডিএনএ (DNA) টেস্টের অবদান উপস্থিতি করতে পারব।

12.1 জীবের বংশগতি

পৃথিবীর সব জীব তার নিজস্ব চারিত্বিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলো পরবর্তী প্রজন্মে আর অবিকল স্থানান্তর ও পরিস্কৃতি হয়। পৃথিবীর সব জীবের ক্ষেত্রেই এই প্রাকৃতিক নিয়ম পর্যবেক্ষণ। তাই আমরা ধানগাছের বীজ থেকে ধানগাছ, আমের বীজ থেকে আমগাছ, পাটের বীজ থেকে পাটগাছ অন্যান্যে দেখি। এভাবেই বংশানুক্রমে প্রজন্মির বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। পিতামাতার বৈশিষ্ট্যগুলো বংশানুক্রমে সম্ভান সম্ভানির দেহে সঞ্চালিত হওয়ার প্রক্রিয়াই হলো “বংশগতি” (Heredity)। বংশগতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা ও গবেষণা করা হয় বংশগতিবিদ্যা (Genetics) নামের জীববিজ্ঞানের বিশেষ শাখায়।

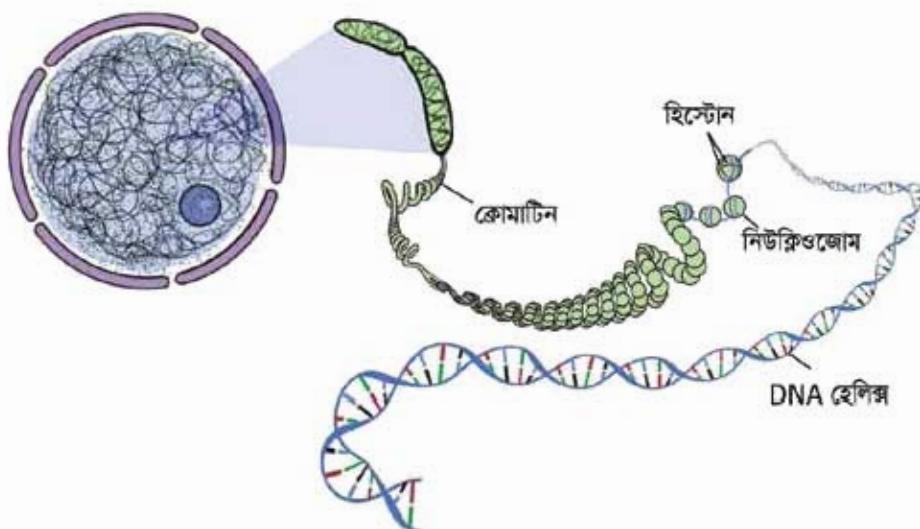


একক কাজ

কাজ : মা-বাবার সাথে তোমার সামুদ্র্য ও বৈসামুদ্র্যমূলক বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করে ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন কর।

12.1.1 বংশগতিকর্তৃ চারিত্বিক বৈশিষ্ট্য বহনকারী উপাদান (বংশগতিবস্তু)

যাতাপিতার বৈশিষ্ট্যবলি তাদের সম্ভান সম্ভানিতে সঞ্চালিত হয় বংশগতিবস্তুর (Hereditary material) মাধ্যমে। এগুলো হলো ক্রোমোজোম, জিন, ডিএনএ (DNA) এবং আরএনএ (RNA)। নিচে এগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।



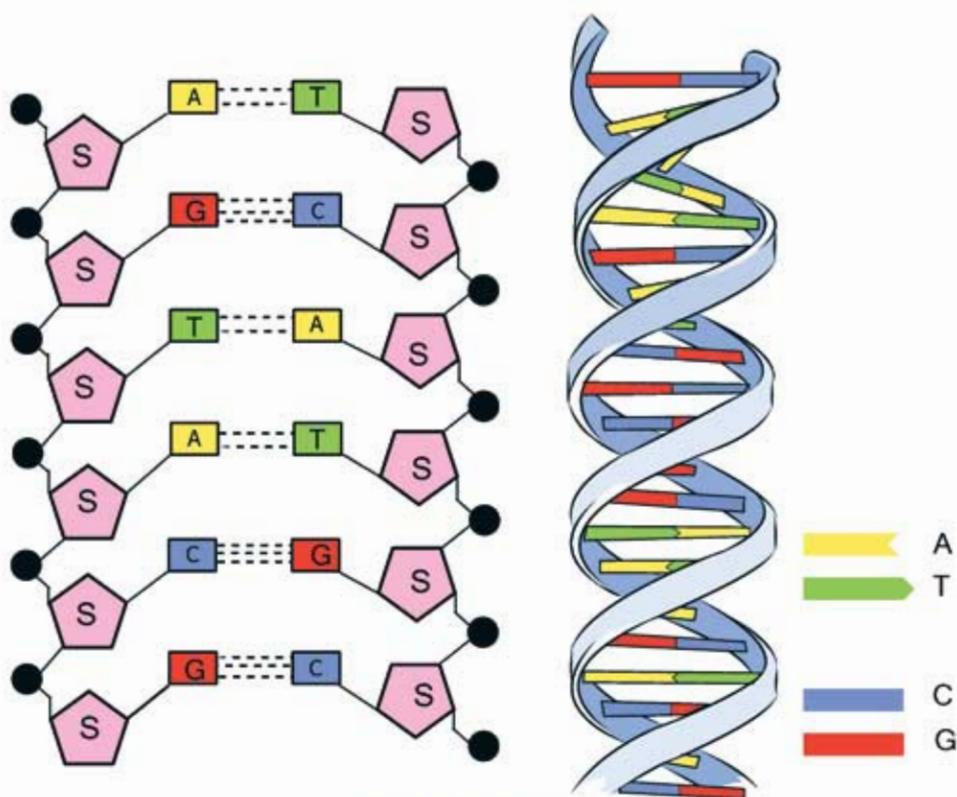
চিত্র 12.01: নিউক্লিওজোলের ভিতরে ক্রোমোজোমের অবস্থান

a) ক্রোমোজোম (Chromosome)

বংশগতির প্রথান উপাদান হচ্ছে ক্রোমোজোম। তোমরা জান, এটি নিউক্লিওসের নিউক্লিওপ্লাজমে বিস্তৃত এবং সূক্ষ্মাকার ক্রোমাটিন দিয়ে গঠিত। বিজ্ঞানী Strasburger (1875) প্রথম ক্রোমোজোম আবিক্ষা করেন। অঙ্গাতির বৈশিষ্ট্যগুলো ক্রোমোজোম এবং ডিপ্লাইড (দুই সেট ক্রোমোজোম, যার একসেট পিতা থেকে আসে এবং আর একসেট মাতা থেকে আসে) সংখ্যা 2 হতে 1600 পর্যন্ত হতে পারে। একটি ক্রোমোজোম দৈর্ঘ্যে সাধারণত 3.5 থেকে 30.0 মাইক্রন এবং প্রশংস্ত 0.2 থেকে 2.0 মাইক্রন হয়ে থাকে। (1 মাইক্রন = 1/1000 মিমি)। ক্রোমোজোমের কাজ হলো মাতাপিতা থেকে জিন (যা জীবের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে) সংরক্ষণ করে বহন করে নিরে যাওয়া। মানুষের চোখের রং, চুলের ধরুণ, চামড়ার পাঁচল ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য ক্রোমোজোম কর্তৃক বাহিত হয়ে বংশগতির ধারা অঙ্কুশ রাখে। এ কারণে ক্রোমোজোমকে বংশগতির ভৌতিকিতা (Physical basis of heredity) বলে আখ্যায়িত করা হয়।

b) ডিএনএ (DNA)

ক্রোমোজোমের প্রথান উপাদান ডিএনএ হলো ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড (Deoxyribo Nucleic Acid)। এটি সাধারণত দুই সূত্রবিশিষ্ট পলিনিউক্লিওটাইডের সর্পিলাকার গঠন। একটি সূত্র অন্যটির



চিত্র 12.02: ডিএনএ

পরিপূরক। এতে পাঁচ কার্বনযুক্ত শর্করা, নাইট্রোজেলষ্টিত বেস বা ক্ষার (এডিনিল, গুয়ানিল, সাইটোসিল ও থাইমিন) এবং অজেব কসকেট থাকে। এই তিনটি উপাদানকে একত্রে 'নিউক্লিওটাইড' বলে। DNA ক্রোমোজোমের স্থায়ী গদার্থ। মার্কিন বিজ্ঞানী Watson এবং ইংরেজ বিজ্ঞানী Crick 1953 সালে প্রথম DNA অণুর আবল হেলিক্স (Double helix) বা দ্বিসূরী কাঠামোর বর্ণনা দেন এবং এ কাজের জন্য তাঁরা নোবেল পুরস্কার পান। নাইট্রোজেন বেসগুলো দুখরনের, পিউরিন এবং পাইরিমিডিন। এডিনিল (A) ও গুয়ানিল (G) বেস হলো পিউরিন এবং সাইটোসিল (C) ও থাইমিন (T) বেস হলো পাইরিমিডিন। একটি সূত্রের এডিনিল (A) অন্য সূত্রের থাইমিন (T)-এর সাথে দুটি হাইড্রোজেন বন্ড দিয়ে যুক্ত (A=T) থাকে এবং একটি সূত্রের গুয়ানিল (G), অন্য সূত্রের সাইটোসিলের (C) সাথে তিনটি হাইড্রোজেন বন্ড দিয়ে যুক্ত (G=C) থাকে। অর্থাৎ এই বন্ধন সর্বদা একটি পিউরিন এবং একটি পাইরিমিডিনের মধ্যে হয়ে থাকে। সুতরাং দুটি সূত্রের একটি অন্যটির পরিপূরক কিন্তু এক রূক্ষম নয়। হেলিক্সের প্রতিটি পূর্ণ ঘূর্ণন 34 Å (Angstrom) দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এবং একটি পূর্ণ ঘূর্ণনের মধ্যে 10টি নিউক্লিওটাইড থাকে। সুতরাং পার্শ্ববর্তী দুটি নিউক্লিওটাইডের দূরত্ব (উপর থেকে নিচে) $3.4 \text{ Å} (1 \text{ Å} = 10^{-10} \text{ মিটার})$ ।

DNA-এর দুটি পলিনিউক্লিওটাইড সূত্র বিপরীতভাবে (Antiparallel) অবস্থান করে। অনেকটা প্যাচানো সিডির ধাপের মতো, কারণগুলো শারিতভাবে (Flat) প্রথম অক্ষের সাথে লম্বভাবে অবস্থান করে। অর্থাৎ DNA অণুর বাইরের দিকের দুটি (প্রথম অক্ষ) পর পর সুগার এবং কসকেট দিয়ে গঠিত এবং এদের ভিতরের দিকে N₂ বেস অবস্থান করে। অক্রূত কোষেও DNA সূত্র সুতার মতো কিন্তু আদি কোষের DNA সাধারণত গোলাকার হয়ে থাকে এবং এর দৈর্ঘ্য কয়েক মাইক্রন থেকে কয়েক সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। এটি হাজার হাজার নিউক্লিওটাইডের বা নিউক্লিক এসিডের সমষ্টিতে গঠিত। DNA ভবল হেলিক্সের বাস সর্বত্র 20Å। DNA ক্রোমোজোমের প্রধান উপাদান এবং বংশগতির রাসায়নিক ভিত্তি (Chemical basis of heredity)। DNA-ই জীবের চারিত্বিক বৈশিষ্ট্যের অক্রূত ধারক এবং বাহক, যা জীবের চারিত্বিক বৈশিষ্ট্য সরাসরি বহন করে মাতাপিতা থেকে তাদের বংশধরে নিয়ে আসে।



দলগত কাজ

কাজ: DNA-এর অঙ্কন নির্বাচন

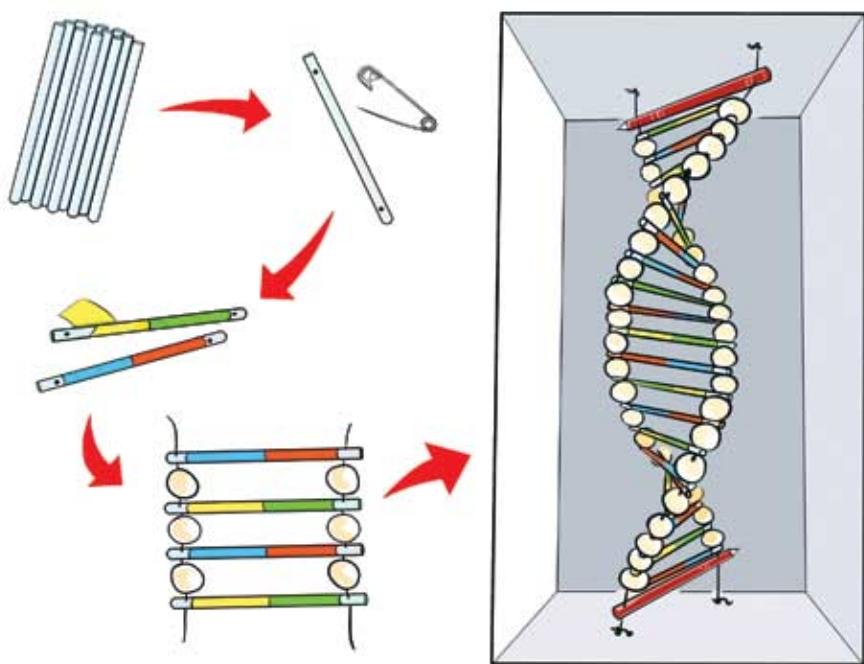
অঙ্কনার উপকরণ: 1m সাধারণ লোহার ভার, 2টি পুরুলো বল প্যানেল কলম, 40টি 1.5 cm ব্যাসের গুঁতি, 7/প্রতি প্লাস্টিকের (তরল পান করার) জিয়েকিং স্ট্রি, সাল, নীল, হলুদ এবং সবজ রক্তের কাগজ, আঠা, কাঁচি এবং একটি খালি জ্বুতার বাজি।

কাজের ধারা

- এই যত্নের জন্য 40টি 1.5 cm ব্যাসের গুঁতির দরকার হবে। যদি জোগাঢ় করা কঠিন হয়

তাহলে এক কাপ ময়দার মাঝে আধা কাপ সবথ মিশিয়ে একটু পানি দিয়ে মাথিয়ে 1-1.5 cm খাসের 40 থেকে 50টি গোল বল তৈরি করে টুথ পিক দিয়ে মাঝখানে ফুটো করে নাও। এগুলো শুকিয়ে নিলেই পুত্তির মতো ব্যবহার করা যাবে। ডিএনএ মডেলে এই পুত্তিগুলো হবে ফসফেট।

২. প্রতিটি ড্রিফিং স্ট্রিকে সমান তিন ভাগে কেটে 20 থেকে 25 টুকরা করে নাও। প্রতিটি টুকরা ৪ থেকে 9 cm লম্বা হওয়ার কথা। এগুলো হবে ডিএনএ মডেলে নিউক্লিওটাইড।
৩. মোট সেক্ষটি-শিল দিয়ে স্ট্রিঙের টুকরাগুলোর দুই পাশে সমান্তরালভাবে ফুটো কর।
৪. রঙিন কাগজগুলো 2 cm চওড়া করে ফিতার মতো কেটে নাও।
৫. এবাবে ফিতার মতো কেটে রাখা রঙিন কাগজগুলো থেকে প্রথমে সবুজ কাগজ 3 cm করে কেটে নিয়ে আঁতা দিয়ে স্ট্রিঙের উপর এমনভাবে পাঁচিয়ে সাগাও যেন স্ট্রিঙের ঠিক মাঝখান থেকে একপাশে 2 cm সবুজ রংয়ের কাগজে দেকে যায়। এবাবে মাঝখান থেকে অন্য পাশে হলুদ রংয়ের কাগজ একইভাবে আঁতা দিয়ে পাঁচিয়ে দাও। এভাবে স্ট্রিঙের টুকরার অর্ধেকগুলোর (10/12 টি) মাঝখানে সবুজ ও হলুদ রংয়ের কাগজ দিয়ে মুক্তিয়ে দাও। সবুজ অংশটুকু A এবং হলুদ অংশটুকু T নিউক্লিওটাইড ধরে নিলে স্ট্রিঙের একেকটি টুকরা হবে একেকটি বেল পেয়ার।



চিত্র 12.03: ডিএনএ মডেল তৈরির বিভিন্ন ধাপ

6. একইভাবে বাকি অর্ধেক (10/12 টি) স্ট্রয়ের টুকরার মাঝখানের অংশটুকু নীল এবং লাল কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে নাও। এখানে নীল অংশটুকু C এবং লাল অংশটুকু G নিউক্লিওটাইড ধরে নিলে স্ট্রয়ের একেকটি টুকরা হবে একেকটি CG বেস পেয়ার। মনে রাখতে হবে অবশ্যই সবুজ রঙের সাথে শুধু হলুদ কাগজ এবং নীল রঙের সঙ্গে শুধু লাল কাগজ লাগাতে হবে, এর ব্যতিক্রম হতে পারবে না।

7.1 m তারকে দুই টুকরা করে একটি পুরোনো বলপয়েন্ট কলমের দুপাশে 7-8 cm জায়গা রেখে বেঁধে নাও।

8. এবাবে বলপয়েন্ট কলমের সাথে বেঁধে রাখা দুটি তার একটি স্ট্রয়ের টুকরার দুপাশের ফুটো দিয়ে চুকিয়ে নাও।

9. স্ট্রটি বলপয়েন্ট কলমের কাছাকাছি টেনে নিয়ে তার দুটি দিয়ে দুটি পুঁতি (কিংবা তোমার তৈরি গোলক) চুকিয়ে নামিয়ে আনো।

10. এভাবে একবার একটি স্ট্রয়ের টুকরা এবং তারপর দুপাশে দুটি পুঁতি চুকাতে থাকো। ঢোকানোর সময় বিভিন্ন রংয়ের বেস পেয়ারের একটি সুন্দর সমন্বয় করার চেষ্টা কর।

11. সবগুলো স্ট্রয়ের টুকরা এবং পুঁতি চুকানো শেষ হওয়ার পর অন্য মাথায় তার দুটি দ্বিতীয় বলপয়েন্ট কলমটিতে বেঁধে নাও। বাড়তি তারটিকে কেটে ফেলে দাও।

12. প্রকৃত ডি.এন.এতে প্রতি দশটি বেস পেয়ারে একবার ঘূর্ণন হয়। এখানে যেহেতু 20 টির মতো বেস পেয়ার আছে, তাই দুইবার ঘূর্ণন হতে হবে। কাজেই দুই পাশের দুটি বল পয়েন্ট কলম দুই হাতে ধরে দুটি পূর্ণ পাক দাও। দেখবে এটি ডি.এন.এর চমৎকার একটি মডেল হয়েছে।

13. কল্পনা করে নাও স্ট্রয়ের হলুদ অংশ A, কাজেই সবুজ হচ্ছে T। একইভাব নীল অংশ C এবং লাল অংশ G নিউক্লিওটাইড। পুঁতি কিংবা তোমার তৈরি গোলকগুলো হচ্ছে ফসফেট। দুটি গোলকের মাঝখানে স্ট্রয়ের বাকি অংশটুকু হচ্ছে শর্করা।

14. মডেলটিকে পাকাপাকিভাবে রক্ষা করার জন্য খালি জুতোর বাত্রের ভিতরে বলপয়েন্ট কলম দুটি উপরে এবং নিচে (দুটি পূর্ণ ঘূর্ণনসহ) বেঁধে নাও।

মন্তব্য

সবকিছু ঠিকঠাক করে থাকলে তোমার হাতে এখন আছে DNA-এর একটি মডেল, যাতে প্রায় 20/22 টি বেস পেয়ার রয়েছে। বিভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেটি লক্ষ কর। বিভিন্ন কোণে মডেলটির উপর আলো ফেললে কেমন ছায়া পড়ে তা দেখ। এটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ রোজালিস্ট

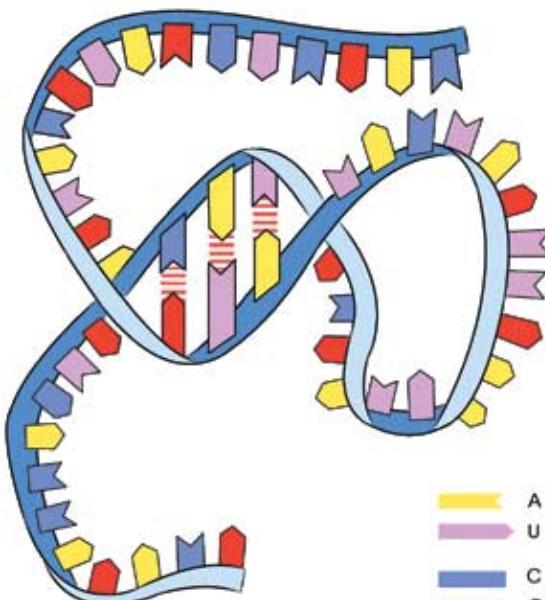
ফ্রাঙ্কলিন (1920-1958) বিভিন্ন কোণে DNA অণুর উপর এক্স-রে ফেলে তার হায়ার ছবি তুলেছিলেন এবং তাঁর তোলা সেই ছবিগুলো বিশ্লেষণ করে DNA-এর গঠন আবিক্ষার করেন জেমস প্রয়াটসন (1928-বর্তমান) এবং ফ্রাঙ্কলিস ক্লিক (1916-2004)। এজন্য এই দুইজন 1962 সালে নোবেল পুরস্কার পান।

সীমাবদ্ধতা

এই ঘড়েলটি আসল DNA-এর মতো হলেও বিভিন্ন পরিধান ও রাসায়নিক প্রুপের আকারগত অনুপাত এখানে রাখিত হয়নি।

(c) আরএনএ (RNA)

RNA হলো রাইবোনিউক্লিক এসিড (Ribonucleic Acid)। অধিকারণ RNA-তে একটি পলিউক্লিওটাইডের সূত্র থাকে। এতে পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট রাইবোজ শর্করা, অজৈব ক্ষসফেট এবং নাইট্রোজেন বেস (এডিনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন এবং থাইমিনের পরিবর্তে ইউরাসিল) থাকে। RNA ভাইরাসের ক্রোমোজোমে স্থায়ী উপাদান হিসেবে RNA পাওয়া যায়। কিন্তু কিছু বিচ্ছিন্নতাক ভাইরাসের ক্ষেত্রে (যেমন— TMV, Tobacco Mosaic Virus) DNA অনুপস্থিত। অর্থাৎ যে সমস্ত ভাইরাস DNA দিয়ে গঠিত নয় তাদের নিউক্লিক এসিড হিসেবে থাকে RNA। এসব ক্ষেত্রে RNA-ই বংশপতির বস্তু হিসেবে কাজ করে।



চিত্র 12.04: আরএনএ

(d) জিন (Gene)

জীবের সব দৃশ্য এবং অদৃশ্যমান লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী এককের নাম জিন। এর অবস্থান জীবের ক্রোমোজোমে। ক্রোমাজোমের যে স্থানে জিন অবস্থান করে, তাকে লোকাস (Locus) বলে। সাধারণত একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য একটি নির্দিষ্ট জিন থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাধিক জিন প্রিলিভডাবে একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সহায়তা করে। আবার কোনো কোনো সময় একটি জিন একাধিক

বৈশিষ্ট্যও নিয়ন্ত্রণ করে। বিভিন্ন গবেষণার তত্ত্ব থেকে জানা গেছে, জিনই বংশগতির নিয়ন্ত্রক। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে দিস্ত্রিক DNA নিজের হুবহু অনুলিপি করতে পারে। আবার, DNA থেকে প্রয়োজনীয় সংকেতের অনুলিপি নিয়ে RNA সাইটোপ্লাজমের রাইবোজোমে আসে এবং সেই সংকেত অনুসারে সেখানে প্রোটিন তৈরি হয়। সুকেন্দ্রিক কোষের ক্ষেত্রে সেই প্রোটিন প্রথমে জমা হয় এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে। সেখান থেকে গলজি বস্তু এবং ভেসিকলগুলোর দ্বারা সেই প্রোটিনে নানাবিধি পরিবর্তন হয় এবং তা উপযুক্ত স্থানে বাহিত হয়। প্রাককেন্দ্রিক কোষে অবশ্য সরাসরি প্রোটিনগুলো গন্তব্যে পৌঁছায়। প্রোটিনগুলোই মূলত নির্ধারণ করে প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোর গতি-প্রকৃতি এবং তা থেকেই পরিবেশের সাপেক্ষে নির্ধারিত হয় জীবের বৈশিষ্ট্যাবলি। কোনো জীবের গঠন থেকে আচরণ পর্যন্ত সবই এই বৈশিষ্ট্যগুলোর আওতায় পড়ে। তাই বলা যায়:

DNA → RNA → প্রোটিন → বৈশিষ্ট্য।

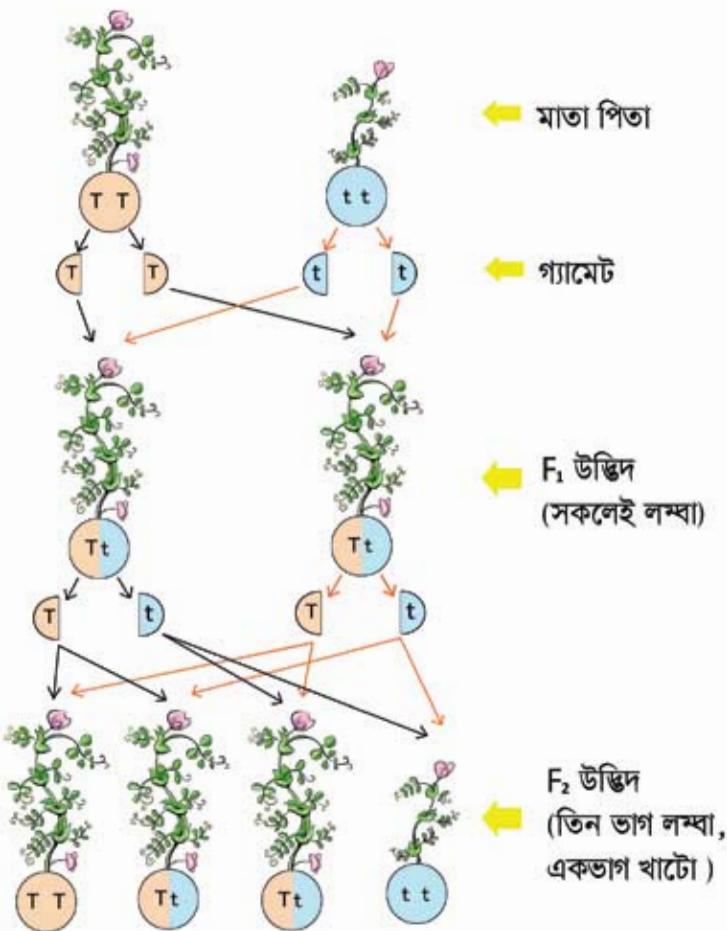
বিভিন্ন জীবে জিনের সংখ্যা এক নয়। তবে একই প্রকৃতির জীবে তা প্রায় সবসময় একই থাকে। জিনগুলো সাধারণ নিয়মে ক্রোমোজোমের DNA অনুসূত্রের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পৃথক ও রৈখিকভাবে পরপর সাজানো থাকে।

একই জিনের বিভিন্ন সংকরণ একই ধরনের বৈশিষ্ট্যকে বিভিন্ন রূপে বা মাত্রায় প্রকাশ করতে পারে। যেমন: মটরশুটির উচ্চতা নির্ধারিত জিনের লম্বা সংকরণটি হলো T এবং খাটো সংকরণটি হলো t। যখন এ দুটি একত্রে থাকে (Tt), তখন লম্বা হওয়ার বৈশিষ্ট্যটিই প্রকাশ পায়। তাই t-এর সাপেক্ষে T কে প্রকট (dominant) বলে এবং T-এর সাপেক্ষে t কে বলে প্রাচল (recessive)। যখন কোনো জীবে জিনের দুটি সংকরণই প্রাচল হয়, কেবল তখনই প্রাচল বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ পায়। যেমন: শুধু tt হলেই মটরশুটি খাটো হয়।

গ্রেগর জোহান মেডেল 1866 সালে মটরশুটি নিয়ে গবেষণাকালে বংশগতির ধারক ও বাহকরূপে যে ফ্যাক্টরের (factor) কথা উল্লেখ করেছিলেন সেটি আজ ‘জিন’ রূপে পরিচিত হয়েছে। গ্রেগর জোহান মেডেলকে বংশগতিবিদ্যার জনক বলা হয়।

মাতা-পিতার বৈশিষ্ট্য উত্তিরের বংশধরদের মধ্যে কীভাবে প্রকাশ পায়, সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানী গ্রেগর জোহান মেডেল মটর গাছ নিয়ে পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যবান তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন।

মেডেল একটি লম্বা ও একটি খাটো মটর গাছ নিয়ে কৃত্রিম উপায়ে লম্বা গাছের পরাগরেণু খাটো গাছের গর্ভমুণ্ডে এবং খাটো গাছের পরাগরেণু লম্বা গাছের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তর করে এদের প্রজনন ঘটান। অন্য কোনো পরাগরেণু যাতে আসতে না পারে, সেজন্য তিনি যথাযথ ব্যবস্থা নেন। যেহেতু লম্বা গাছের জিন প্রকট, তাই এ থেকে উৎপন্ন বীজ বুনে দেখা গেল সব গাছই লম্বা হয়েছে; কোনো খাটো গাছ নেই। এই গাছগুলোতে কোনো খাটো গাছের জিন বাহক হিসেবে রয়ে গেছে কি না পরীক্ষা করার জন্য এদের



চিত্র 12.05: মেডেলের পরীক্ষা

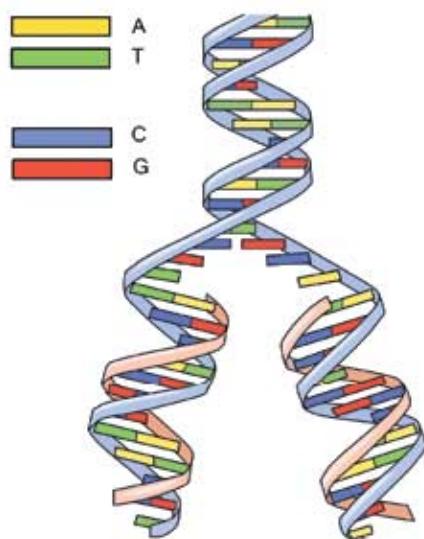
একটি পাহাকে স্বপ্নোগ্যনের মাধ্যমে প্রজনন ঘটিয়ে তা থেকে উৎপন্ন বীজ বুনে দেখা গেল যে এতে লম্বা ও খাটো দুরকমের গাছই রয়েছে, যার মধ্যে তিন ভাগ গাছ লম্বা এবং এক ভাগ গাছ খাটো।

মেডেলের এই তত্ত্ব উত্তিদ ও প্রাণীর সুপ্রজননে প্রয়োগ করা হয়। কাঞ্জিত বৈশিষ্ট্যসম্পর্ক উত্তিদ বা প্রাণীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত যৌন প্রজনন ঘটিয়ে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পর্ক বংশধর সৃষ্টি করা হয়। এদের মধ্যে থেকে কাঞ্জিত বৈশিষ্ট্য বেছে নিয়ে সুপ্রজননের মাধ্যমে কাঞ্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তিদ ও প্রাণী সৃষ্টি করা হয়। বর্তমানে উন্নত জ্ঞানের শস্য উৎপাদনের এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

DNA অনুলিপন (DNA replication)

এই প্রক্রিয়ার একটি DNA অণু থেকে আরেকটি নতুন DNA অণু তৈরি হয় বা সংক্রান্ত হয়। DNA অর্ধ-রক্ষণশীল পদ্ধতিতে অনুলিপিত হয়। এই পদ্ধতিতে হাইড্রোজেন বন্ধন ভেঙে গিয়ে DNA সূত্র

দুটি আলাদা হয়ে যায়। তখন কোথের ডিগ্নের
ভাসমান নিউক্লিওটাইডগুলো থেকে A-এর সাথে
T, T আর সাথে A, C-এর সাথে G এবং
G-এর সাথে C যুক্ত হয়ে সূত্রদুটি তার পরিপূর্ণ
(Complementary) নতুন সূত্র তৈরি করে।
DNA এর দুটি সুজের ডিগ্নের একটি পুরাতন সূত্র
হয়ে যায়, তার সাথে একটি নতুন সূত্র যুক্ত হয়ে
পরিপূর্ণ DNA অণুর সৃষ্টি হয়। এজাবে সৃষ্টি DNA
এর প্রতিটিতে অর্ধেক পুরাতন এবং অর্ধেক নতুন
সূত্র থাকায় একে অর্ধ-অক্ষণশীল পদ্ধতি বলে।
১৯৫৬ সালে Watson ও Crick যি ধরনের DNA
অনুলিপন প্রক্রিয়ার অস্তিব করেন।



চিত্র 12.06: ডিএনএ অনুলিপন



একক কাজ

কাজ : শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীদের বড় কাগজে রঙিন পেনিল দিয়ে ডিএনএ অঙ্কন করে প্রদর্শনের
জন্য শ্রেণিকক্ষে টানিয়ে দিতে বলবেন।

12.1.2 ডিএনএ টেস্ট

বর্তমান শতাব্দীতে ডিএনএ প্রযুক্তির গুরুত্ব এবং এর ব্যবহার চিকিৎসাবিজ্ঞান, কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসমূহ এবং
ঔষধশিল্পে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। প্রাচলিত সাক্ষ-প্রমাণ ও প্রত্যক্ষদর্শীনির্ণয় বিচারব্যবস্থার
পাশাপাশি আজ বাহ্যিকদেশেও সুবিচার পাওয়ার এক নতুন উপায় হচ্ছে এই ডিএনএ টেস্ট।

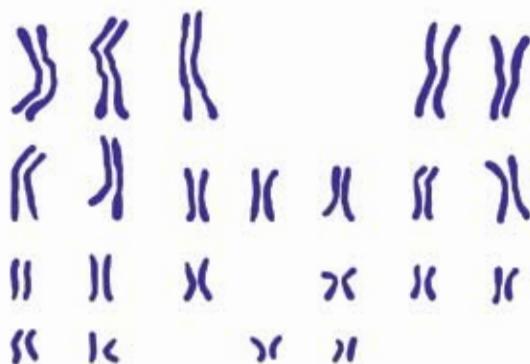
ডিএনএ টেস্টের বিজ্ঞানভিত্তিক এক ব্যবহারিক পদ্ধতিকে বলা হয় ডিএনএ ফিলার প্রিস্টিঃ। এ ধরনের
প্রক্রিয়াগুলোর ডিএনএ টাইপিং, ডিএনএ টেস্টিং ইত্যাদি নামও প্রচলিত আছে। ডিএনএ টেস্ট সুসংক্ষেপ
করার জন্য প্রথম প্রয়োজন জৈবিক নমুনা। ক্ষেত্রের হাঙ্গ, সৰ্প, চুল, রস্ত, লালা, বীর্ধ বা তিসু ইত্যাদি মূল্যবান
জৈবিক নমুনা হতে পারে। অপরাধস্থল কিংবা অপরাধের শিকার এমন ক্ষেত্রে কাছ থেকে সংগ্রহ করা
জৈবিক নমুনার ডিএনএ নকশাকে (DNA profile) সম্বেদভাজনের কাছ থেকে নেওয়া রক্ত বা জৈবিক
নমুনার ডিএনএ নকশার সাথে তুলনা করা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রথমে নমুনা থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়
ডিএনএ আলাদা করে নিতে হয় এবং একাধিক সীমাবদ্ধ এনজাইম (restriction enzyme) দিয়ে
ডিএনএগুলো কেটে ছোট ছোট করা হয়। তারপর এক বিশেষ পদ্ধতিতে (ইলেক্ট্ৰোফোরেসিস

(electrophoresis) ঘারা এগারোজ বা পলিএক্সিলামাইড (জেল) ডিএনএ ট্রাকরোগুলো তাদের দৈর্ঘ্য অনুসারে বিভিন্ন ব্যাড আকারে আলাদা করা হয়। এরপর এক ধরনের বিশেষ নাইট্রোসেলুলোজ কাগজে রেডিও অ্যাকটিন আইসোটাপ ডিএনএ প্রোবের সাথে হাইভিডাইজ করে এবং-রে ফিল্মের উপর রেখে অটোরেডিওফার পদ্ধতিতে দৃশ্যমান ব্যাডের সারিগুলো নির্ণয় করা হয় এবং অপরাধস্থল থেকে প্রাপ্ত নমুনার সাথে সন্দেহভাজন নমুনার খিল ও অধিল চিহ্নিত করে তুলনা করা হয়। এই পদ্ধতিটিকে ডিএনএ ফিল্মের প্রিপিং বলা হয়। বর্তমানে পলিমারেজ চেইন বিক্রিয়া (Polymerase chain reaction) বা পিসিআর (PCR) পদ্ধতিতে আরও নিম্নলভাবে অল্প নমুনা ব্যবহার করে নির্ভুলভাবে শনাক্তকরণ করা সম্ভব হচ্ছে।

12.2 মানুবের শি঳্প নির্ধারণ

মানুষ এবং অন্যান্য স্তনুপায়ী প্রাণীতে প্রায় একই পদ্ধতিতে শি঳্প নির্ধারণ হয়। মানবদেহে ক্রোমোজোম সংখ্যা 46টি বা 23 জোড়া। এর মধ্যে 22 জোড়া বা 44টিকে অটোজোম (Autosome) এবং 1 জোড়াকে সেক্স-ক্রোমোজোম (Sex chromosome) বলা হয়। অটোজোমগুলো শারীরবৃক্ষীয়, প্রুণ এবং দেহ গঠন ইত্যাদি কার্যাদিতে অংশগ্রহণ করে। শি঳্প নির্ধারণে এদের কোনো ভূমিকা নেই। সেক্স ক্রোমোজোম দুটি একা (X) এবং গুরাই (Y) নামে পরিচিত। শি঳্প নির্ধারণে একা মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

২২ জোড়া অটোজোম



নারীদের জিপ্লাইট কোষে দুটি সেক্স ক্রোমোজোমই X ক্রোমোসোম অর্থাৎ XX, কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে দুটির মধ্যে একটি X অপরটি Y ক্রোমোজোম অর্থাৎ XY। X এবং Y টাইপ ধরনের সেক্স-ক্রোমোজোমই আকৃতিতে সর্বা এবং রূপের মতো, তবে Y ক্রোমোজোম X ক্রোমোজোমের তুলনায় কিছুটা ছোট। নারীদের ডিহাশয়ে ডিহাশ তৈরি করার সময় ব্যবন বিভাজন ঘটে, তখন প্রতিটি ডিহাশ অন্যান্য ক্রোমোজোমের সাথে একটি করে X ক্রোমোজোম সাজ করে। অন্যদিকে, পুরুষে শুক্রাপু সৃষ্টির সময় অর্ধেক সংখ্যক শুক্রাপু একটি করে X ক্রোমোজোম এবং অবশিষ্ট অর্ধেক শুক্রাপু একটি

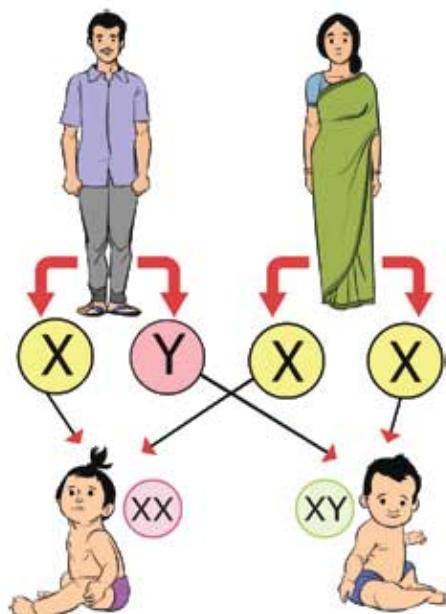
মেয়েদের ক্ষেত্রে
সেক্স ক্রোমোজোম



চিত্র 12.07: 22 জোড়া অটোজোম এবং
1 জোড়া সেক্স ক্রোমোজোম

ছেলেদের ক্ষেত্রে
সেক্স ক্রোমোজোম





ଚିତ୍ର ୧୨.୦୫: ମେଘ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଦିଯି ମାନୁଷର ସଂତାନର ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଧାରଣ ପ୍ରକିର୍ତ୍ତା

୨ୟ ମୁଖ୍ୟରେ ଶୁକ୍ଳାଶୁ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଧାରଣ ପ୍ରକିର୍ତ୍ତା

କରେ ଯ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଲାଭ କରେ । ଡିହାଶୁ ପୁରୁଷର X ବା Y ବହନକାରୀ ଯେକୋନୋ ଏକଟି ଶୁକ୍ଳାଶୁ ଦିଯେ ନିର୍ଭିତ ହତେ ପାରେ । ଗର୍ଭାସଂପଦକାଳେ କୋଣ ଧରନେର ଶୁକ୍ଳାଶୁ ମାତାର X ବହନକାରୀ ଡିହାଶୁର ସଙ୍ଗେ ମିଳିତ ହବେ ତାର ଉପର ନିର୍ଭର କରେ ଭବିଷ୍ୟତ ସଂତାନର ଲିଙ୍ଗ । ଯେହେତୁ ନିଷେକ କେବଳ ଏକଟି ଶୁକ୍ଳାଶୁ ଡିହାଶୁର ସଙ୍ଗେ ମିଳିତ ହୁଏ, ତାଇ ପିତାର X ଅର୍ଥବା Y ଶୁକ୍ଳାଶୁର କୋଣଟି ସାଧାରଣ୍ୟକାନ୍ତରେ ନିଷେକ ଘଟାବେ, ତାର ଉପର ନିର୍ଭର କରେ ସଂତାନର ଲିଙ୍ଗ । ଯदି X ବହନକାରୀ ଶୁକ୍ଳାଶୁ ନିଷେକ ଘଟାଇ, ତାହାରେ ଜୀବିଷ୍ଟ ହବେ XX, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂତାନ ହବେ କନ୍ୟା । ଆଜି ଯଦି Y ବହନକାରୀ ଶୁକ୍ଳାଶୁ ନିଷେକ ଅଂଶଶ୍ରହଣ କରେ, ସେହେତେ ଜୀବିଷ୍ଟ X ଏବଂ Y କ୍ରୋମୋଜୋମ ଥାକବେ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଦୁଟି ହବେ XY । କଲେ ସଂତାନ ହବେ ପୁଅ । ଯାନୁଷେର ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଧାରଣେ, ଅର୍ଥାତ୍ କନ୍ୟା ବା ପୁଅସଂତାନର ଜନ୍ୟ ହତ୍ୱାର ବ୍ୟାପାରେ ଯାଇସିର ଆଦୋ କୋଣେ ଭୂମିକା ନେଇ । କାରଣ ଯା ସବ ସମୟ କେବଳ X ବହନକାରୀ ଡିହାଶୁ ତୈରି କରେ । ଅନ୍ୟଦିକେ ପିତା X ଏବଂ Y ମୁଖ୍ୟରେ ଶୁକ୍ଳାଶୁ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଧାରଣେ ଭୂମିକା ରେଖେ ଥାକେ ।



ଏକକ କାଜ

କାଜ : କଥନ ସଂତାନ ହେଲେ ହବେ ଏବଂ କଥନ ସଂତାନ ଯେଇ ହବେ, ସେଟି ନିଚେର ଛକ ପୂରଣେ ମାଧ୍ୟମେ ନିର୍ଣ୍ୟ କର, XY (ହେଲେ) ଏବଂ XX (ଯେଇଁ) ।

ମାତ୍ରା ବାବା O'	X	Y
X		
X		



ଏକକ କାଜ

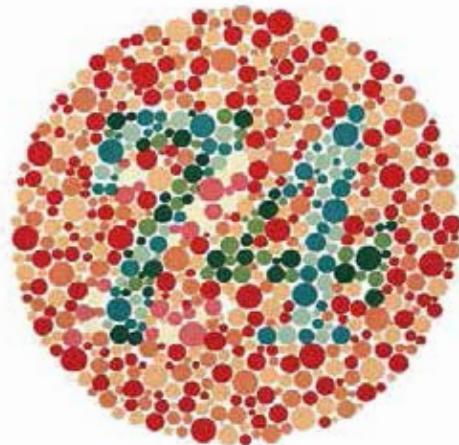
କାଜ : ପାତି, ବିବି ପୋକା ଏବଂ କୁମିରେର ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଧାରଣ ମାନୁଷର ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଧାରଣ ପ୍ରକିର୍ତ୍ତା ଥେକେ ଡିମ୍ । ତୋମରା ଏହି ପ୍ରାଣୀଶୂଳୋର ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଧାରଣ ପ୍ରକିର୍ତ୍ତା ଅନୁସଂଧାନ କରେ ତାର ଉପର ଏକଟି ନିବନ୍ଧ ଲିଖ ।

12.3 জেনেটিক ডিসঅর্ডার বা বংশগতি ব্যাধি/অস্বাভাবিকতা

কিছু জিনগত অসুখ আছে, যেগুলোতে মিউটেশন হয় সেক্স ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলোতে। এসব অসুখকে বলে সেক্স-লিংকড অসুখ (Sex-linked disorder)। যেহেতু Y ক্রোমোজোম খুবই ছোট আকৃতির এবং এতে জিনের সংখ্যা খুব কম, তাই বেশিরভাগ সেক্স-লিংকড অসুখ হয় X ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলোর মিউটেশনের কারণে। মেয়েদের যেহেতু দুটি X ক্রোমোজোম থাকে, সেহেতু একটি X ক্রোমোজোমে মিউটেশন থাকলেও আরেকটি X ক্রোমোজোম স্বাভাবিক থাকার কারণে রোগলক্ষণ প্রকাশ পায় না। সুতি X ক্রোমোজোমেই একই সাথে একই অসুখের মিউটেশন থাকার সম্ভাবনা খুব কম বলে মেয়েরা সাধারণ সেক্স-লিংকড রোগে আক্রান্ত হয় না, বড়জোর বাহক (carrier) হিসেবে কাজ করে (যে নিজে অসুখ নয় কিন্তু অসুখের জিন বহন করে, তাকে বাহক বলে)। পুরুষের যেহেতু X ক্রোমোজোম মাঝ একটি, তাই তারা সেক্স-লিংকড অসুখের বাহক হয় না, সেটিতে অসুখ-সৃষ্টিকারী মিউটেশন থাকলেই তাদের জিতের অসুখের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

(a) কালার ব্রাইডলেস বা বর্ণাঞ্চলতা

যখন কেউ কোনো রং সঠিকভাবে চিনতে পায় না, সেটি হচ্ছে কালার ব্রাইডলেস বা বর্ণাঞ্চলতা। রং চেনার জন্য আমাদের চোখের মাঝ কোষে রং শনাক্তকারী পিপামেন্ট থাকে। কালার ব্রাইড অবস্থায় গোপীদের চোখে মাঝ কোষের রং শনাক্তকারী পিপামেন্টের অভাব থাকে। যদি কারো একটি পিপামেন্ট না থাকে, তখন সে লাল আৰ সবুজ পার্থক্য করতে পায় না। এটা সর্বজনীন কালার ব্রাইড সমস্যা। একাধিক পিপামেন্ট না থাকার কারণে লাল এবং সবুজ রং ছাড়াও গোলী দীল এবং হলুদ রং পার্থক্য করতে পায় না। পুরুষদের বেলায় সাধারণত অতি 10 জনে 1 জনকে কালার ব্রাইড হতে দেখা যায়। তবে খুব কম নারীগুলি এই অসুখে জোগান।



চিত্র 12.09: লাল-সবুজ বর্ণাঞ্চল নির্ণয় করার জন্য ব্যবহৃত ইশিহরা (Ishihara) চার্ট থেকে লেখয়া একটি ছবি। এটি প্রয়োজন করার জন্য একজন কালার ব্রাইড মানুষ এখানে 21 সংখ্যাটি দেখবে, যেখানে সুস্থ বাবু দেখবে 74।

বংশগতি ছাড়াও কোনো কোনো প্রক্রিয়া হিসেবে চোখের রঙিন পিপামেন্ট নষ্ট হয়ে গোলী কালার ব্রাইড হতে পায়। এই ধরনের অসুখ নির্ণয়ে চোখের ডাক্তারের কাছে যাওয়া প্রয়।



একক কাজ

কাজ : 12.10 চিত্রে X' দিয়ে প্রিউট্যাইট X ক্রোমোজোম বোঝানো হয়েছে। বাহক মা (XX') এবং অসুস্থ বাবা (X'Y) মিলনে উৎপন্ন সম্ভানদের সূচি, অসুস্থ কিংবা বাহক হওয়ার সম্ভাব্য অনুপোত এন্ডকম:

অসুস্থ মেয়ে (X'X'): বাহক মেয়ে (XX'): অসুস্থ ছেলে (X'Y): স্মার্তবিক ছেলে (XY) = 1: 1: 1: 1

একই পদ্ধতিতে (ক) অসুস্থ বাবা (X'Y) এবং সুস্থ মা (XX) (খ) অসুস্থ বাবা (X'Y) এবং অসুস্থ মা (X'X') (গ) সুস্থ বাবা (XY) এবং বাহক মা (XX') (ঘ) সুস্থ বাবা (XY) এবং অসুস্থ মায়ের (X'X')

বেলার সম্ভানদের সূচি, অসুস্থ কিংবা বাহক হওয়ার সম্ভাব্য অনুপোত বের কর।

	মা			
	X'	X'X'	XX'	কন্যা সম্ভান
চ	X'	X'X'	XX'	
চ	Y	X'Y	XY	পুরুষ সম্ভান

চি. 12.10: সেক্স-পিকড অসুস্থ (যেমন: আল-সবুজ বর্ণস্থতা) কীভাবে সম্ভানে সংক্রান্ত হুব তা পানেট ক্রমারের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

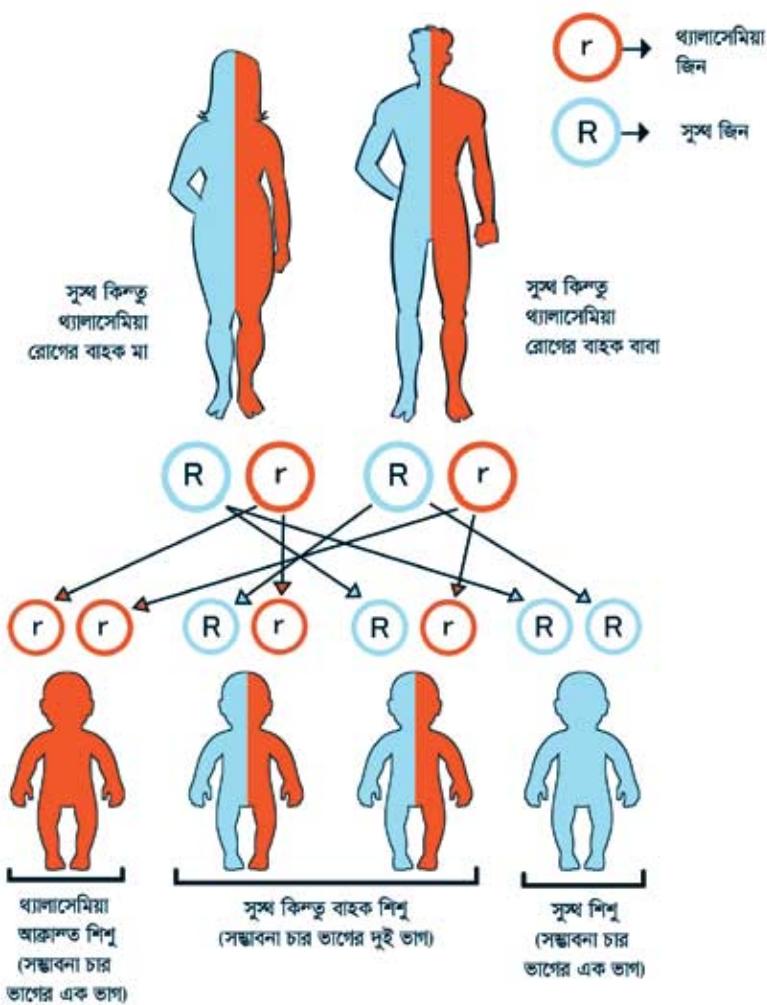
(b) থ্যালাসেমিয়া

থ্যালাসেমিয়া রক্তের লোহিত রক্ত কণিকার এক অস্থানাবিক অবস্থাজনিত রোগের নাম। এই রোগে লোহিত রক্ত কণিকাগুলো নষ্ট হয়। ফলে রোগী রক্তশূন্যতায় প্রোগে। এই রোগ বংশপ্রকাশের হুরে থাকে। থ্যালাসেমিয়া বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বংশবাহিত রক্তজনিত সমস্যা। থারণী করা হয়, দেশে প্রতিবছর 7000 শিশু থ্যালাসেমিয়া রোগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং বর্তমানে প্রায় এক লাখ রোগী আছে। এটি একটি অটোসোমাল গ্লিসিসিক ডিজ্জার্ডার, অর্ধাং বাবা ও মা উভয়েই এ রোগের বাহক বা রোগী হলে তা বেই তা সম্ভানে রোগশক্তি হিসেবে প্রকাশ পায়। চাচাতো-মায়াতো-থালাতো ভাইবোন বা অনুরূপ নিকট আঞ্চীয়য়ের মধ্যে বিয়ে হলে এ ধরনের রোগে আঙ্গুষ্ঠ সম্ভান জন্ম দেওয়ার আশঙ্কা বহুগুণ বেড়ে থাক।

লোহিত রক্তকোষ দুর্বলনের প্রোটিন দিয়ে তৈরি, Hb-গ্লোবিউলিন এবং G-গ্লোবিউলিন। থ্যালাসেমিয়া হয় লোহিত রক্তকোষে এ দুটি প্রোটিনের জিন নষ্ট থাকার কারণে, যার ফলে গ্লুটিপূর্ণ লোহিত রক্তকোষ উৎপন্ন হয়। দুর্বলনের জিনের সমস্যার জন্য দুর্বলনের থ্যালাসেমিয়া দেখা যায়, আলকা (G) থ্যালাসেমিয়া এবং বিটা (B) থ্যালাসেমিয়া। আলকা থ্যালাসেমিয়া রোগ তখনই হয়, যখন G গ্লোবিউলিন তৈরির জিন অনুপনিষিত থাকে কিংবা গ্লুটিপূর্ণ হয়। এই ধরনের রোগ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যাত্ত্বা, চীন ও আফ্রিকার অন্যস্থানের মাঝে বেশি দেখা থাক। একইভাবে বিটা (B) থ্যালাসেমিয়া তখনই হয়, যখন

(৩) গ্লোবিডলিন প্রোটিন উৎপাদন ব্যাহত হয়। বিটা থ্যালাসেমিয়াকে ‘ক্লিনির থ্যালাসেমিয়া’ও বলা হয়। এ ধরনের রোগ ভূমধ্যসাগরীয় এলাকাবাসীদের মাঝে বেশি দেখা গেছেও কিন্তু পরিমাপ আফ্রিকান, আমেরিকান, চীন ও এশিয়াবাসীদের ঘটেও দেখা যায়।

জিনের প্রাপ্তির উপর নির্ভর করেও থ্যালাসেমিয়াকে দুভাবে দেখা হয়, থ্যালাসেমিয়া যেজন এবং থ্যালাসেমিয়া মাইলর। থ্যালাসেমিয়া যেজনের বেলায় শিশু তার বাবা ও মা দুজনের কাছ থেকেই থ্যালাসেমিয়া জিন পেয়ে থাকে। থ্যালাসেমিয়া মাইলরের বেলায় শিশু থ্যালাসেমিয়া জিন তার বাবা অথবা তার মারের কাছ থেকে পেয়ে থাকে। এ ধরনের শিশুরা থ্যালাসেমিয়ার কোনো উপসর্গ দেখায় না। তবে থ্যালাসেমিয়া জিনের বাহক হিসেবে কাজ করে।



চিত্র 12.11: বাহক বাবা এবং বাহক মায়ের সম্মানসূর্যের ক্লিনির থ্যালাসেমিয়া সম্মান জয়ের সম্ভাবনা চার ভাগের এক ভাগ।

লক্ষণ

তীব্র থ্যালাসেমিয়ার কারণে জন্মের আগেই মায়ের পেটে শিশুর মৃত্যু হতে পারে। থ্যালাসেমিয়া মেজর আক্রান্ত শিশুরা জন্মের পর প্রথম বছরেই জটিল রক্তশূণ্যতা রোগে ভোগে।

চিকিৎসা

সাধারণত নির্দিষ্ট সময় পর পর রক্ত প্রদান এবং নির্দিষ্ট ঔষধ খাইয়ে থ্যালাসেমিয়ার চিকিৎসা দেওয়া হয়। রোগীদের লৌহসমৃদ্ধ ফল বা ঔষধ খেতে হয় না, কারণ তা শরীরে জমে গিয়ে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ক্ষতিসাধন করে। এছাড়া যকৃৎ নষ্ট হলে জিভিস, অঘ্যাশয় নষ্ট হলে ডায়াবেটিস ইত্যাদি নানা প্রকার রোগ ও রোগলক্ষণ দেখা দিতে পারে। থ্যালাসেমিয়া রোগীর 30 বছরের বেশি বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কম, যদি এসব সমস্যা একবার শুরু হয়।

12.4 জৈব বিবর্তন তত্ত্ব

বৈচিত্র্যময় এই পৃথিবীতে আমরা যেসব জীবের সঙ্গে পরিচিত, তাদের মধ্যে প্রায় তেরো লক্ষ প্রাণী-প্রজাতি এবং চার লাখের মতো উডিদ-প্রজাতিকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। একসময় মানুষের ধারণা ছিল, পৃথিবী অপরিবর্তিত, অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে পৃথিবীর যে আকার বা আয়তন ছিল, তার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। তারা ভাবতো, আদি জীবজগতের সঙ্গে বর্তমানকালের জীবজগতের তেমন কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে জেনোফেন (Xenophane) নামের একজন বিজ্ঞানী প্রথম কতগুলো জীবাশ্য (fossil) আবিষ্কার করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে জীবদেহের আকার অপরিবর্তনীয় নয়, অর্থাৎ অতীত এবং বর্তমান যুগের জীবদেহের গঠনে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (Aristotle) প্রমাণ করেন যে জীবজগতের বিভিন্ন জীবের ভিতর এক শ্রেণির জীব অন্য শ্রেণির জীব থেকে উন্নত এবং সেই জীবগুলো তাদের পূর্বপুরুষ থেকে উৎপত্তি লাভ করে বিবর্তনের (বা অভিব্যক্তি) মাধ্যমে ক্রমাগত পরিবর্তিত এবং রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। সাধারণত বিবর্তন একটি মন্ত্র এবং চলমান প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গঠনগতভাবে সরল জীবন থেকে ধীরে ধীরে জটিল জীবনের উৎপত্তি ঘটেছে। তবে খুব কম সময়ের মধ্যে বিবর্তন সংঘটিত হওয়ার নজিরও বর্তমান।

সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্ত অনুসারে, প্রায় সাড়ে চারশত কোটি বছর (সাড়ে চার বিলিওন) আগে সূর্য থেকে সৃষ্টি এই পৃথিবী একটি উন্নত গ্যাস-পিণ্ড ছিল। এই উন্নত গ্যাস-পিণ্ড ক্রমাগত তাপ বিকিরণ করায় এবং তার উত্তাপ করে যাওয়ায় ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পরে এই পিণ্ডটি বাইরের দিক থেকে ভিতরের দিকে ক্রমশ কঠিন হতে থাকে এবং উদ্ভূত জলীয় বাস্প থেকে মেঘের সৃষ্টি হয়। ঐরকম মেঘ থেকে বৃষ্টি হওয়ায় পৃথিবীর কঠিন বহিঃস্তরে জলভাগ অর্থাৎ সমুদ্রের আবির্ভাব ঘটে। এক সময়ে সমুদ্রের পানিতে প্রাণের আবির্ভাব হয় এবং সমুদ্রের পানিতে সৃষ্টি জীবকুলের ক্রমাগত

পরিবর্তনের ফলে বর্তমানের বৈচিত্র্যময় জীবজগতের সৃষ্টি হয়েছে।

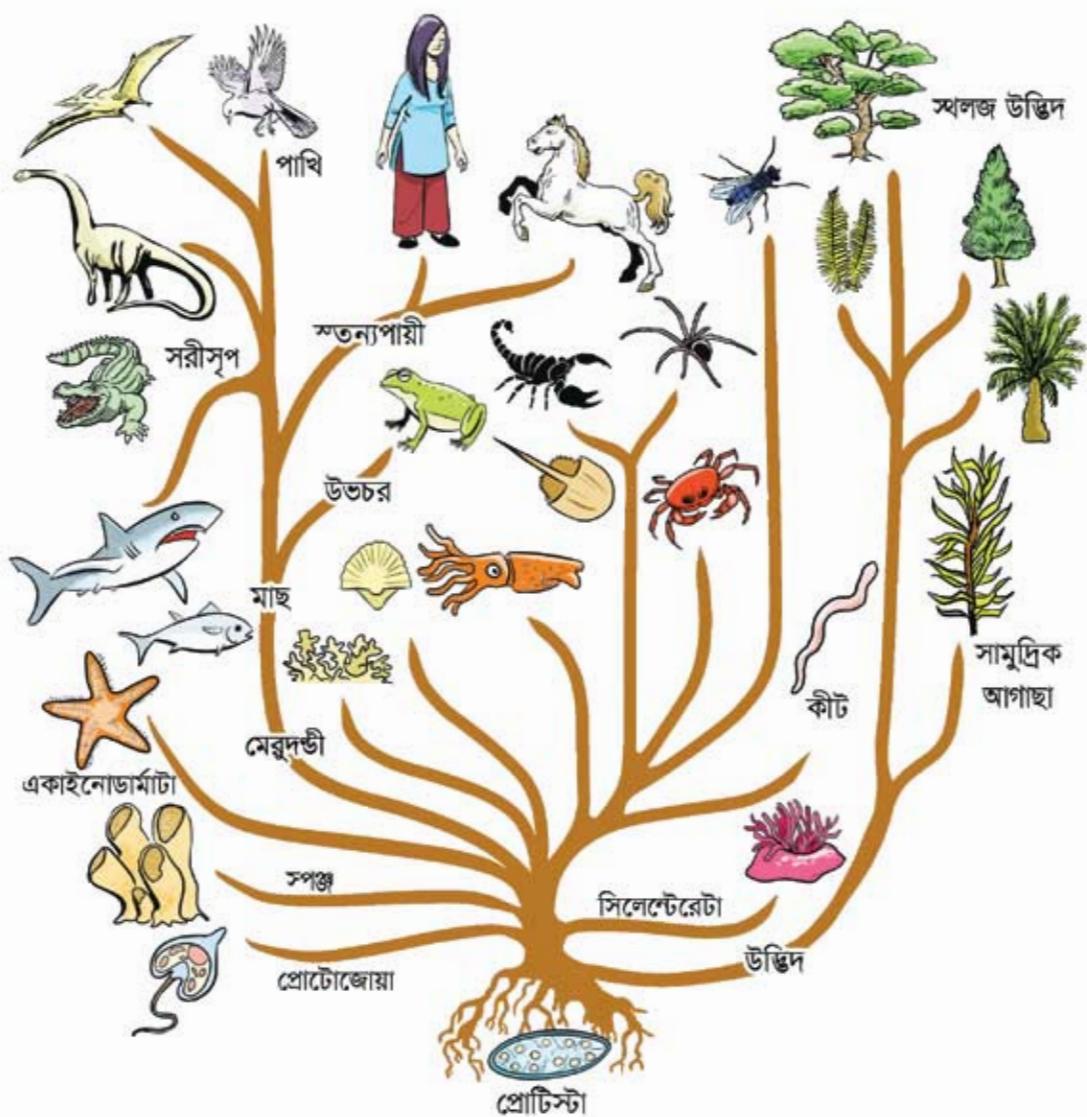
গভীর যুক্তিনির্ভর চিন্তাভাবনা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আধুনিক মানুষের ধারণা হয়েছে যে জীব সৃষ্টির মূলেই রয়েছে বিবর্তন। ল্যাটিন শব্দ ‘Evolveri’ থেকে বিবর্তন শব্দটি এসেছে। ইংরেজ দার্শনিক এবং শিক্ষাবিদ হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) প্রথম ইভোলিউশন কথাটি ব্যবহার করেন। এক সময় বলা হতো, যে ধীর, অবিরাম এবং চলমান পরিবর্তন দিয়ে কোনো সরলতর নিম্নশ্রেণির জীব থেকে জটিল এবং উন্নততর নতুন প্রজাতির বা জীবের উন্নত ঘটে, তাকে বিবর্তন বা অভিব্যক্তি বা ইভোলিউশন বলে। তবে বিবর্তন সব সময় ধীর গতিতে ঘটে না, পরিবেশের কারণে অনেক সময় দ্রুত ঘটতে দেখা গেছে। শুধু তা-ই নয়, বিবর্তনের কারণে জটিল জীব সরলতর রূপ নিয়েছে তারও উদাহরণ আছে। মেস্কিন কেভ ফিশ পানির উপরের স্তর থেকে সরে গিয়ে গভীর পানিতে অন্ধকার গুহায় বাস করতে শুরু করার কারণে দ্রষ্টব্যস্তি হারিয়েছে। কাজেই এখন বিবর্তন বা ইভোলিউশনের সংজ্ঞা জিনের অ্যালিলের মাধ্যমে দেওয়া হয় (একটি নির্দিষ্ট জিন একাধিকভাবে থাকতে পারে, তখন সেই জিনটির ভিন্ন ভিন্ন রূপকে তার অ্যালিল বলা হয়)। কার্টিস-বার্নস (1989) প্রদত্ত আধুনিক সংজ্ঞা অনুসারে, বিবর্তন হলো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে নির্দিষ্ট এলাকায় এক কিংবা কাছাকাছি প্রজাতির অ্যালিল ফ্রিকোয়েলির পরিবর্তন।

ধরা যাক, সুন্দরবনের সমস্ত বাঘের সবগুলো জিন নির্ণয় করে তার একটি তালিকা করা হলো, যেখানে কোন জিনের কোন অ্যালিল কতগুলো করে আছে, সেটিও হিসাব রাখা হয়েছে। বেশ কিছু বছর পরে প্রবর্তী কোনো প্রজন্মের সকল বাঘের সবগুলো জিন নির্ণয় করে আবার কোন অ্যালিল কতগুলো করে আছে, সেটিও হিসাব করা হলো। তারপর দুই প্রজন্মের জিনগুলো তুলনা করে যদি দেখা যায়, এক প্রজন্ম থেকে অপর প্রজন্মে কোনো জিনের কোনো অ্যালিলের সংখ্যার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে, তাহলে বলা যাবে, বাঘের এই পপুলেশনটিতে বিবর্তন ঘটেছে।

12.4.1 জীবনের আবির্ভাব

পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছিল সে সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ বর্তমানে প্রচলিত আছে। তবে জীবনের উৎপত্তি যে প্রথমে সমুদ্রের পানিতে হয়েছিল, এ সম্পর্কে কোনো দ্বিমত নেই। এ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা যে যুক্তি রেখেছেন, সেগুলো এরকম: প্রথমত, অধিকাংশ জীবকোষ এবং দেহস্থ রক্ত ও অন্যান্য তরলে নানারকম লবণের উপস্থিতি, যার সঙ্গে সমুদ্রের পানির খনিজ লবণের সাদৃশ্য রয়েছে। দ্বিতীয়, সমুদ্রের পানিতে এখনো অনেক সরল এবং এককোষী জীব বসবাস করে।

পৃথিবীতে কীভাবে জীব সৃষ্টি হয়েছিল, সে সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত অনুমান এরকম: প্রায় 260 কোটি বছর আগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে মিথেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড এবং জলীয় বাষ্প, নাইট্রোজেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ছিল; কিন্তু অক্সিজেন গ্যাস ছিল না। অহরহ আঘেয়গিরির অঞ্চলে পাতের ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঘটত এবং বজ্রপাতের ফলে ও অতিবেগুনি রশ্মির



চিত্র 12.12: বিবর্তন বহু শাখা-শাখায় একই সাথে ঘটে চলা অসংখ্য পরিবর্তনের একটি জটিল নেটওর্ক।

প্রভাবে এই বৌগ পদার্থগুলো মিলিত হবে অ্যামাইলো এসিড এবং নিউক্লিক এসিড উৎপন্ন করে। স্থাবন্নেটরিতে এই প্রক্রিয়াটি পরীক্ষা করে থমাশ করা হয়েছে। পরে অ্যামাইলো এসিড এবং নিউক্লিক এসিড মিলিত হওয়ায় নিউক্লিওপ্রোটিন অণুর সৃষ্টি হয়। নিউক্লিওপ্রোটিন অণুগুলো দ্রুতে নিজেদের প্রতিবৃপ্ত-গঠনের (replication) ক্ষমতা অর্জন করে এবং জীবনের সূক্ষ্মাত্মক ঘটায়। পৃথিবীর উৎপত্তি এবং তার ধারাবাহিকতায় জীবনের উৎপত্তির ঘটনাথৰাহকে বলে রাসায়নিক বিবর্তন বা অভিযুক্তি।

ধারণা করা হয়, প্রোটিন এবং নিউক্লিক এসিড সহযোগে সৃষ্টি হয় নিউক্লিওপ্রোটিন। এই নিউক্লিওপ্রোটিন থেকেই সৃষ্টি হয় প্রোটোভাইরাস এবং তা থেকে সৃষ্টি হয় ভাইরাস। ভাইরাস এমন একটা অবস্থা নির্দেশ করে, যা জীব এবং জড়ের মধ্যবর্তী অবস্থা।

এরপর সম্ভবত উত্তর হয় ব্যাকটেরিয়া এবং আরও পরে সৃষ্টি হয় প্রোটোজোয়া। ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লিয়াস আদি প্রকৃতির, তাই এদেরকে আদি কোষ বলা হয়। পরে প্রোটোজোয়াদের দেহে দেখা গেল সুগঠিত নিউক্লিয়াস। কিছু এককোষী জীবদেহে সৃষ্টি হলো ক্লোরোফিল, ফলে একদিকে যেমন খাদ্য সংশ্লেষ সম্ভব হলো, তেমনি খাদ্য সংশ্লেষের উপজাত (by product) হিসেবে অক্সিজেন সৃষ্টি হতে শুরু করল। তখন সবাত শুসনকারী জীবদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকল। উত্তর হলো এককোষী থেকে বহুকোষী জীব। এরপর একদিকে উত্তিদ ও অপরদিকে প্রাণী—দুটি ধারায় জীবের অভিব্যক্তি বা বিবর্তন শুরু হলো। জীবনের উত্তর তথা রাসায়নিক বিবর্তনের আরও কিছু সম্ভাব্য ব্যাখ্যা আছে, তবে উপরে উল্লিখিত ব্যাখ্যাটিই এখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকভাবে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। বিবর্তন প্রকৃতপক্ষে সরলরেখায় ঘটে না, অসংখ্য জটিল শাখা-প্রশাখায় প্রতিনিয়ত ঘটে চলে বিবর্তন, 12.12 চিত্রে তার একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে।

12.4.2 ডারউইনবাদ বা ডারউইনের মতবাদ

ব্রিটিশ প্রকৃতি বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন জীববিজ্ঞান তথা সমগ্র বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি বৈশ্লেষিক চিন্তাধারার সৃষ্টি করেন। বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন (Charles Robert Darwin, 1809-1882) ইংল্যান্ডের স্লাসবেরি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত গ্যালাপ্যাগোস দ্বীপপুঁজি পরিভ্রমণকালে তিনি ঐ অঞ্চলের উত্তিদ এবং প্রাণিকুলের বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য দেখে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে 1837 খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে প্রত্যাবর্তনের প্রায় 20 বছর পরে 1859 খ্রিস্টাব্দে ‘প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা প্রজাতির উত্তর’ (Origin of Species by Means of Natural Selection) নামে একটি বইয়ে তাঁর মতবাদটি প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, ডারউইনের তত্ত্বটি বিবর্তন তত্ত্ব নামে প্রচলিত হলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে বিবর্তনের আবিক্ষারক নন। এ অধ্যায়ের আলোচনায় আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে জৈব বিবর্তন যে প্রকৃতই ঘটে তা খ্রিস্টপূর্ব সময় থেকেই বিজ্ঞানীরা জানতেন। ডারউইনের সাফল্য ছিল, জৈব বিবর্তনের কারণ হিসেবে পর্যাপ্ত সংখ্যক বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে একটি প্রক্রিয়ার (mechanism) ধারণা প্রতিষ্ঠা করা যা, বিবর্তনের যাবতীয় বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারবে। জৈব বিবর্তনের কারণ হিসেবে প্রাকৃতিক নির্বাচনকে উল্লেখ করে আরও একজন সমসাময়িক ব্রিটিশ প্রকৃতি বিজ্ঞানী, আলফ্রেড ওয়ালেস (Alfred Russel Wallace, 1823-1913), একই সময়ে কিন্তু স্বাধীনভাবে অনুরূপ তত্ত্ব প্রণয়ন করেন। তবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে তাঁর চেয়ে ডারউইনের নামেই তত্ত্বটি অধিক প্রচলিত।

ডারউইনের দৃষ্টিতে প্রকৃতিতে সংঘটিত সাধারণ সত্যগুলো

(a) অত্যধিক হারে বংশবৃদ্ধি: ডারউইনের মতে, অত্যধিক হারে বংশবৃদ্ধি করাই জীবের সহজাত বৈশিষ্ট্য। এর ফলে জ্যামিতিক এবং গাণিতিক হারে জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ: একটি সরিষা গাছ থেকে বছরে প্রায় 730,000টি বীজ জন্মায়। এই 730,000 বীজ থেকে 730,000 সরিষা গাছের জন্ম হওয়া সম্ভব। একটি স্ত্রী স্যামন মাছ প্রজনন ঝাতুতে প্রায় 3 কোটি ডিম পাড়ে। ডারউইনের মতে, এক জোড়া হাতি থেকে উদ্ভূত সকল হাতি বেঁচে থাকলে 750 বছরে হাতির সংখ্যা হবে এক কোটি নবাহ লাখ।

(b) সীমিত খাদ্য ও বাসস্থান: ভূপৃষ্ঠের আয়তন সীমাবদ্ধ হওয়ায় জীবের বাসস্থান এবং খাদ্য সীমিত।

(c) অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম: জীবের জ্যামিতিক ও গাণিতিক হারে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায় এবং খাদ্য ও বাসস্থান সীমিত থাকায় জীবকে বেঁচে থাকার জন্য কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। ডারউইন এ ধরনের সংগ্রামকে ‘অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম’ বলে অভিহিত করেন। ডারউইন লক্ষ করেন যে জীবনে তিনটি পর্যায়ে এই সংগ্রাম করতে হয়। সেগুলো হচ্ছে:

(i) আন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম (interspecific struggle): উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ব্যাঙ কৌটপতঙ্গ খায়, অন্যদিকে সাপ ব্যাঙেদের খায়। আবার, ময়ুর সাপ এবং ব্যাঙ দুটোকেই খায়- এভাবে নিতান্ত জৈবিক কারণেই বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্পর্কের একটি নিষ্ঠুর জীবনসংগ্রাম গড়ে উঠে।

(ii) অন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম (intraspecific struggle): একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যদের খাদ্য এবং বাসস্থান একই রকমের হওয়ায় এদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে এরা নিজেদের মধ্যেই বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতা শুরু করে; উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে একটি দীপে তৃণভোজী প্রাণীর সংখ্যা বেড়ে গেল খাদ্য এবং বাসস্থান সীমিত থাকায় তারা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম শুরু করে। সবল প্রাণীগুলো দুর্বল প্রাণীদের প্রতিহত করে গ্রাসাচ্ছাদন করে। ফলে দুর্বল প্রাণীগুলো কিছুদিনের মধ্যেই অনাহারে মারা পড়ে।

(iii) পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম (struggle with environment): বন্যা, খরা, বাঢ়-বাঞ্ছা, বালিবাড়, ভূমিকম্পন, অগ্ন্যৎপাত— এ ধরনের প্রতিকূল পরিবেশ জীবের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে। সুতরাং জীবকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রতিনিয়ত এসব প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। যে প্রাণীগুলো এই পরিবেশে ঠিকে থাকতে পারে, তারা বেঁচে থাকে অন্যরা বিলুপ্ত হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে উত্তর এবং মধ্য আমেরিকার কোয়েল পাথি প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও তুষারপাতের ফলে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

(d) প্রকরণ বা জীবদেহে পরিবর্তন: চার্লস ডারউইনের মতে, পৃথিবীতে দুটি জীব কখনোই অবিকল একই ধরনের হয় না। যত কমই হোক এদের মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য থাকে। জীব দুটির মধ্যে যে

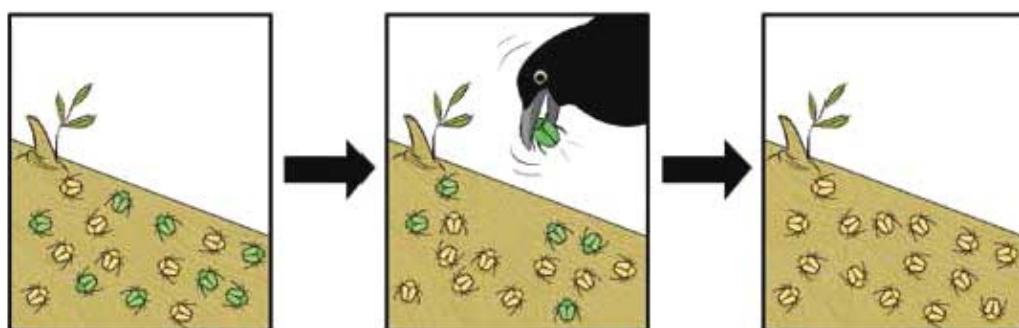
পার্থক্য দেখা যায়, তাকে প্রকরণ (variety) বা পরিবৃত্তি (mutation) বলে। অনুকূল প্রকরণ অস্তিত্বের জন্য জীবনসংগ্রামে একটি জীবকে সাহায্য করে।

(e) প্রাকৃতিক নির্বাচন: ডারউইন তত্ত্বের এই প্রতিপাদ্যটি সবচেয়ে বেশি পুরুষপূর্ণ। ‘অনুকূল (বা অভিযোগ্যমূলক) প্রকরণ সমর্পিত জীবেরা অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বেশি সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে, এই প্রক্রিয়াকে প্রাকৃতিক নির্বাচন বলে।’ অনুকূল প্রকরণ সমর্পিত জীবেরা প্রকৃতির দ্বারা নির্বাচিত হয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি সংখ্যা পেতে পারে এবং অত্যধিক হারে বংশবিস্তার করে। অপরদিকে, অনুকূল প্রকরণসম্পর্কে জীবেরা প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাল খাওয়াতে পারে না। ফলে ধীরে ধীরে অবস্থান হয়।

ডারউইনের মতবাদ অনুসারে পরিবর্তিত পরিবেশ যে জীবটি খাপ খাইয়ে নিতে পারে, তাকে “যোগ্য” আখ্যা দিয়ে অনেক সময় সহজ করে বলা হয়, বোল্ট জীবটি পরিবেশে প্রতিযোগিতার জয়ী হয়ে উঠে থাকবে।

(f) নতুন প্রজাতির উৎপত্তি: যেসব প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে সুবিধাজনক প্রকরণ দেখা যায়, প্রকৃতি তাদের নির্বাচন করে এবং তাদের লালন করে। সুবিধাজনক প্রকরণসমূহ প্রাণী এবং উদ্ভিদ পরিবেশের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে এবং আয়োগ্যদের তুলনায় বেশি হারে বংশবিস্তার করতে পারে। উত্তরাধিকার সূন্দর এন্দের বংশধরদের মধ্যে প্রকরণসমূহ যায়। এই বংশধরদের মধ্যে আবার তাদের সুবিধাজনক প্রকরণ বেশি থাকে, প্রকৃতি আবার তাদের নির্বাচন করে। এভাবে শুগ-শুগান্তর থেরে নির্বাচিত করে করে প্রকৃতি প্রাণী ও উদ্ভিদের নতুন প্রজাতি সৃষ্টি করে।

বর্তমানে বংশগতিবিদ, কোষতত্ত্ববিদ এবং প্রেশিভিলগণ নতুন প্রজাতির উৎপত্তির বিষয়ে বংশগতিবিদ্যা মতবাদের এবং বিবর্তন তত্ত্বের ভিত্তিতে বলেন, তিনটি ভিত্তি উপরে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হতে পারে:



চিত্র 12.13: দৃটি জীবের মধ্যে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা। সবুজ বিটল পরিবেশের সাথে খাল খাওয়াতে পারেনি বলে সহজে পাখিদের বেশি চোখে পড়ছে এবং তাদের খাদ্য হিসেবে নিয়শেষ হয়ে পিলোজে এবং বাদামি বিটল টিকে পিলোজে।

- (a) মূল প্রজাতির থেকে পৃথক হয়ে (isolation) যাওয়ার ফলে
- (b) সংকরায়ণের (hybridization) ফলে এবং
- (c) সংকরায়ণ প্রজাতিতে কোর বিভাজনের সময় ঘটনাক্রমে কোরে ক্লোমোজোম সংখ্যা বৃদ্ধির (Polyploidy) ফলে। এর ফলে নতুন জীবটির অভিযোজন ঘটবে এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা একটি নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হবে।

প্রজাতির টিকে ধাকার বিবর্তনের প্রক্রিয়া

বিবর্তনের মাধ্যমে নতুন প্রজাতির উত্তরাশে দেখা যায় অনেক প্রজাতি কাটের গর্তে দারিয়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে ডাইনোসরের কথা বলা যায়। দেখা গেছে সময়ের সাথে যে প্রজাতিটির টিকে ধাকার ক্ষমতা যত বেশি, সে বিবর্তনের আবর্তে তত বেশি দিন টিকে ধাকতে পারে। অর্থাৎ যে পরিবেশ, জীবনশৈবাহ ও জনসমিতির মানদণ্ডে বিবর্তনে যে যত বেশি খাপ খাওয়াতে পারবে, সেই প্রজাতিটি টিকে ধাকবে। বিবর্তনের পথে খাপ খাওয়ানোর এই প্রক্রিয়াকে অনেক ক্ষেত্রে অভিযোজন (adaptation) বলা হয়।

বিবর্তন যে শুধু প্রকৃতির কোলে ঘটে, তা নয়। পরেবশালীরে পরীক্ষামূলকভাবে বিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়েছে। এটিও বিবর্তনের বাস্তবতার প্রমাণ। বিবর্তনের বিপক্ষে কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। জীবজগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যতই সম্পূর্ণ হচ্ছে, বিবর্তনকে অঙ্গীকার করা ততই অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

অনুশীলনী



সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

1. RNA কী?
2. জিন কী ?
3. ক্লোমোজোমকে বংশগতির তৌক ডিভি বলা হয় কেন?
4. অটোজোম কী?
5. থ্যালাসেমিয়া বলতে কী বুঝায়?



মুচ্চনামূলক প্রশ্ন

১. DNA অনুলিপন কীভাবে হয় চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।



বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইটেরাসিল কোষোৱা পাওয়া যায়?

- | | |
|------------|------------|
| ক. ডি এন এ | খ. আর এন এ |
| প. জিন | ঘ. লোকাস |

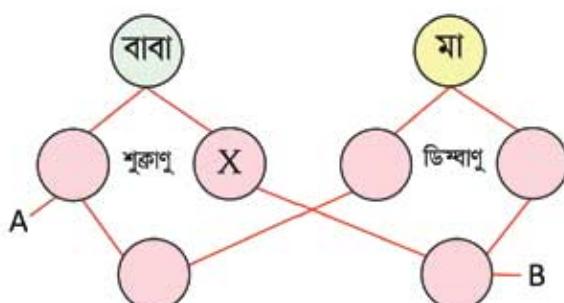
২. আর এন এ-তে থাকে—

১. রাইবোজ শর্করা
২. অজেব ফসফেট
৩. নাইট্রোজেলিটিড বেস

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| প. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের চিত্রের আলোকে ৩ ও ৪ নম্বর অংশের ফৈতর দাও



৩. উদ্বীগকে X অবস্থার ফোয়োজোমের সংখ্যা কয়টি থাকে?

- | | |
|---------|---------|
| ক. 46টি | খ. 44টি |
| প. 23টি | ঘ. 22টি |

४. उक्तीप्रक्रम A एवं B के कोन धरनेर शिळा निर्षारक क्रोमोजोम आहे?

- क. X XY
ग. Y XX

- ख. X XX
घ. Y XY



सूजनशील प्रश्न

१. सिकाते एकजल कृतक। तार दूषित कन्यासक्तान ग्रजेहे। वक्त कन्याटि देखते हुव्हा वावार मठो एवं हेट कन्याटिर चूल, गांडेर वर वावार मठो हलेख देखते घाऱ्येव मठो। सत्राति तार आरां एकटि कन्यासक्तान हउवाते से तार त्रीव उपर तीवय कूच। शायद आप्यातीव आधुन्ये से आनते पारे सक्कानेर शिळा निर्षारणे तार त्रीव कोनो घृमिका नेहि।

- क. बंधेपतिविद्या की?
ख. अनुलिपन बलाते की बुवाया?
ग. सिकातेर सन्तानसेर क्षेत्रे एवूप शारीरिक गठनगत तिळातार कारण व्याख्या करा।
घ. सिकातेर कूच हउवाटा अयोग्यिक केन? युक्तिशह विश्लेषण करा।

२. सोहळे टेलिडिश्नेर एकटि जालेले देखते पेल वे द्वाजिलेव एकटि शहरे गोवा विड्डालेर वेला हजेर। से देखल, एकई शाजाति हउवा संवेद वित्ती विड्डालेर आकार, वर, वर्ण तिऱ्या। परवर्ती शवदे एकदिन से देखे, वन्य परिवेशे विड्डालेर वेळे अंतार तिऱ्या। ए सकारें जालाते ढाईले तार वावा ताके विवर्जन व अडियोजल सकारें वारपा देल।

- क. सोकास की?
ख. अडियोजल बलाते की बुवाया?
ग. सोहळेले देखा थारीगुलोर तिळातार कारण व्याख्या करा।
घ. उक्तीप्रक्रम प्रथम परिवेशेर थारीके घनि वित्तीर परिवेशे हेडे देवडा हव तबे की घटवे— विश्लेषण करा।

অঙ্গোদ্ধৰণ অধ্যায়

জীবের পরিবেশ



জীবের চারপাশের অড় এবং জীবজ সবকিছু মিলেই জীবের পরিবেশ গঠিত হয়। আলো, বাতাস, ঘন্টা-বৃত্তি, মাটি, পানি যেমন একটি জীবের জীবনে পুরুষপূর্ণ, তেমনি তাকে দ্বিতীয় যে জীবজগৎ থাকে, তার ধৰ্মাবধি এই জীবের জীবনে সমান পুরুষপূর্ণ। একটি জীব তার জীবনধারণের বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব পদক্ষেপ নেয়, সেগুলো অবশ্যই একই পরিবেশে বসবাসকারী অন্য জীবের জীবনে ধৰ্মাব ফেলে। জীবজগতে খাদ্যসিক্ষণ বা খাদ্যশৃঙ্খল কিংবা খাদ্যজাল খুবই পুরুষপূর্ণ বিষয়, যেগুলোকে বাদ দিয়ে জীবের অস্তিত্বের কথা কল্পনা করা যায় না।



এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- বাস্তুতজ্ঞ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাস্তুতজ্ঞের উপাদানসমূহের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারব।
- খাদ্যশিকল ও খাদ্যজাতের ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাস্তুতজ্ঞে শক্তির প্রবাহ ও পৃষ্ঠি উপাদানের সম্পর্ক তুলনা করতে পারব।
- ট্রাফিক লেভেলের মধ্যে শক্তির সম্পর্ক তুলনা করতে পারব।
- শক্তি পিরামিডের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খাদ্যশিকল বা খাদ্যশূলক সীমিত রাখতে শক্তি পিরামিডের অভাব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জীববৈচিত্র্য এবং জীববৈচিত্র্যের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাস্তুতজ্ঞের স্থিতিশীলতা রক্ষার জীববৈচিত্র্যের অভাব মূল্যায়ন করতে পারব।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার বিভিন্ন জীবের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ও আন্তঃনির্ভরশীলতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবেশ সংরক্ষণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পরিবেশ সংরক্ষণের পুরুষ বিশ্লেষণ করতে পারব।
- একটি নির্বাচিত এলাকার উৎপাদক, খাদক, বিমোচক এবং তৌত পরিবেশের মধ্যে পারম্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারব।
- একটি নির্দিষ্ট পরিবেশের উপাদানসমূহ দৃষ্টিত হওয়ার কারণ নির্ণয় করতে পারব।
- বাস্তুতজ্ঞে শক্তির প্রবাহ, খাদ্যশিকল, খাদ্যজাতের প্রবাহচিত্র অঙ্কন করতে সক্ষম হব।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার বাস্তুতজ্ঞের উপাদানের অবদান উপলব্ধি করতে পারব এবং এর সহৃদক্ষণে সচেতন হব।

13.1 বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem)

পৃথিবীর সব জীব, জড় ও ভৌত অবস্থা— সবকিছু মিলেই আমাদের পরিবেশ। জীব সক্রিয়ভাবে জড়জগৎ থেকে তাদের প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে তার জীবন অতিবাহিত করে এবং বর্জ্য পদার্থ হিসেবে বা মৃত্যুর পর পরিবেশে মিশে গিয়ে সেসব গৃহীত উপাদান আবার জড় পরিবেশেই ফিরিয়ে দেয়। সবুজ উদ্ভিদ বায়ু থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং মাটি থেকে পানি সংগ্রহ করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তাদের প্রধান খাদ্য কার্বোহাইড্রেট (শর্করা) তৈরির সময় অক্সিজেন ত্যাগ করে। উদ্ভিদ এবং প্রাণী মিলিয়ে পুরো জীবজগতের শ্বসনের জন্য যতটুকু অক্সিজেন প্রয়োজন, তার একটি বড় অংশ আসে এই সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া থেকে। সবুজ-অসবুজ এই দুই ধরনের উদ্ভিদই মাটি বা পানি থেকে কিছু খনিজ লবণ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। তৃণভোজী প্রাণীরা নানাভাবে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ খেয়ে বাঁচে। বিভিন্ন স্তরের মাংসাশী প্রাণীরা তৃণভোজী বা অন্যান্য ক্ষুদ্রতর মাংসাশী প্রাণীদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। সকল প্রাণীর বর্জ্য পদার্থ পরিবেশেই মিশে যায়। তাছাড়া মৃত্যুর পর উদ্ভিদ আর প্রাণীর দেহ পচনক্রিয়ার মাধ্যমে আবার পরিবেশেই ফিরে যায়। এই পচানোর কাজটি করে ব্যাকটেরিয়াসহ কিছু অণুজীব। এভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য প্রাকৃতিক নিয়মেই বজায় থাকে।

প্রাকৃতিক পরিবেশে উদ্ভিদ এবং প্রাণী এই দুই ধরনের জীবের সাথে জড় পদার্থের মধ্যে যে শক্তি আর বস্তুর আদান-প্রদান হয়, তাকে বলা হয় মিথস্ক্রিয়া, আর এ ধরনের মিথস্ক্রিয়ায় আন্তঃসম্পর্ক ঘটে, পৃথিবীর এরকম যেকোনো অঞ্চলই হচ্ছে বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem)। সুতরাং বাস্তুতন্ত্র বলতে ভূপঠির এমন কোনো একককে বোঝায়, যেখানে জড়, খাদ্য উৎপাদনকারী সবুজ উদ্ভিদ, খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল কিছু প্রাণী এবং মৃত জীবদেহকে পরিবেশে মিশিয়ে দেওয়ার জন্য অণুজীব রয়েছে এবং এসব উপাদানের মধ্যে যথাযথ আন্তঃসম্পর্ক বর্তমান। জীবজগতের পুষ্টি এবং অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার বিভিন্ন উপাদানের উৎস হিসেবে মাটি, পানি ও বায়ুর প্রয়োজন হয়।

13.1.1 বাস্তুতন্ত্রের উপাদানসমূহ

জীব সম্পদায়, পরিবেশের জড় পদার্থ এবং ভৌত পরিবেশ মিলেই কোনো স্থানের বাস্তুতন্ত্র গড়ে ওঠে। এই তিনটি প্রধান উপাদানের প্রত্যেকটিতে রয়েছে আবার অনেক ধরনের ছোট ছোট উপাদান এবং জীব উপাদানগুলো সবচেয়ে বৈচিত্র্যময়।

(a) জড় উপাদান (Nonliving matters)

পরিবেশের জড় পদার্থগুলো জীব উপাদানের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করে, শ্বসনের জন্য অক্সিজেন যোগায় এবং বেশ কিছু পুষ্টি উপাদানও সরবরাহ করে। বাস্তুতন্ত্রের সকল জড় উপাদানকে আবার অজৈব এবং

জৈব এই দুভাগে ভাগ করা যায়।

(i) **অজৈব বস্তু (Inorganic matters):** পানি, বায়ু, ও মাটিতে অবস্থিত খনিজ পদার্থ অর্থাৎ যেসব পদার্থ কোনো জীবদেহ থেকে আসেনি, বরং জীবের উত্তরের আগেই পরিবেশে ছিল, সেগুলো বাস্তুতন্ত্রের অজৈব উপাদান। যেমন, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, লৌহ, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি।

(ii) **জৈব বস্তু (Organic matters):** উত্তিদ এবং প্রাণীর বর্জ্য পদার্থ বা এসব জীবের মৃতদেহ থেকে যেসব জড় বস্তু বাস্তুতন্ত্রে যোগ হয়, তাদের বলা হয় জৈব উপাদান। এগুলো সচরাচর হিউমাস নামে পরিচিত। হিউমাসের উপাদানের মধ্যে আছে ইউরিয়া, উত্তিদ এবং প্রাণীর বিভিন্ন কোষ, টিসু, অঙ্গ ইত্যাদি। জৈব বস্তু উত্তিদের জন্য বেশি পুষ্টিকর। তাই উত্তিদ চাষে বেশি করে জৈব সার দিতে হয়। বহু প্রাণীও হিউমাসসমূহ মাটি বেশি পছন্দ করে।

(b) ভৌত উপাদান (Physical components)

পরিবেশে সূর্যালোকের পরিমাণ, তাপমাত্রা, বায়ুতে জলীয় বাস্পের পরিমাণ, বায়ুর চাপ এবং বায়ুপ্রবাহ, ভূপৃষ্ঠ বা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে গভীরতা (মাটির নিচে বা পানির নিচে) এবং উচ্চতা ইত্যাদি বহু উপাদান বাস্তুতন্ত্রকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। এসব উপাদান মিলে গড়ে ওঠে কোনো অঞ্চলের আবহাওয়া ও জলবায়ু। এসবই হচ্ছে কোনো বাস্তুতন্ত্রের ভৌত উপাদান।

(c) জীবজ উপাদান (Living components)

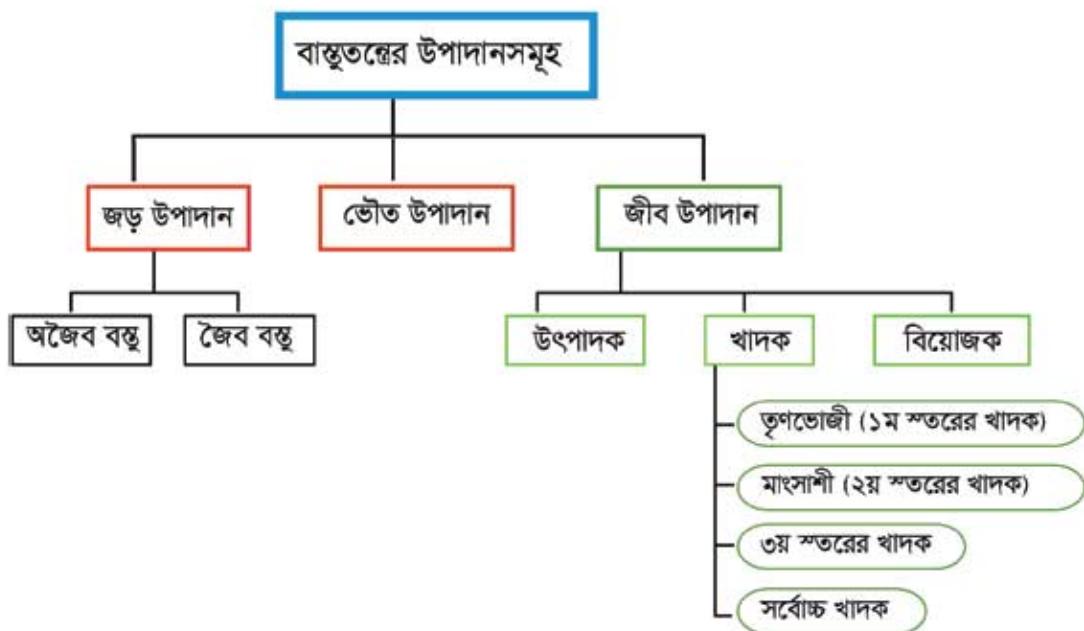
জীবকুল বাস্তুতন্ত্রের সক্রিয় উপাদান। এরাই তাদের কাজের মাধ্যমে পরিবেশে বিভিন্ন পরিবর্তন আনে। পরিবেশের জীবজ উপাদানগুলো প্রধানত তিন প্রকার— উৎপাদক, খাদক ও বিয়োজক।

(i) **উৎপাদক (producer):** সবুজ উত্তিদ সূর্যালোকের উপস্থিতিতে বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং মাটি থেকে পানি সংগ্রহ করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তাদের প্রধান খাদ্য কার্বোহাইড্রেট (শর্করা) তৈরি করে। এ সময় উপজাত হিসেবে উত্তিদ অক্সিজেন ত্যাগ করে। তাই সালোকসংশ্লেষণ হচ্ছে বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদন প্রক্রিয়া, উৎপাদক হলো সবুজ উত্তিদকুল। এই উৎপাদক উত্তিদগুলোকে অন্য কথায় বলা হয় স্বভোজী (Autotroph)। কারণ তারা নিজের খাবার নিজেরাই তৈরি করতে পারে, অন্য কোনো জীবের উপর খাদ্যের জন্য নির্ভর করতে হয় না।

(ii) **খাদক (Consumer):** কোনো প্রাণীই পরিবেশের জড় পদার্থ থেকে খাদ্য তৈরি করতে পারে না। তারা খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সবুজ উত্তিদের উপর নির্ভরশীল। তাই এদের বলা হয় পরভোজী জীব। যেসব প্রাণী সরাসরি উত্তিদ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে, তাদেরকে বলা হয় তৃণভোজী প্রাণী (herbivorous)। এদের অপর নাম প্রথম শ্রেণির খাদক। ঘাস ফড়িং, মুরগি, গরু, ছাগল, হরিণ ইত্যাদি প্রথম শ্রেণির খাদক।

যেসব প্রাণী তৃপ্তিজোজী প্রাণীদের খাদ্য হিসেবে শহুর করে তাদের বলা হব গৌণ খাদক বা বিভীষণ প্রেমির খাদক। এরা এক ধরনের মাংসাশী প্রাণী। ব্যাঞ্জ, শিয়াল, বাঘ ইত্যাদি বিভীষণ প্রেমির খাদক।

যেসব প্রাণী গৌণ খাদকদের খেয়ে বাঁচে তারাও মাংসাশী প্রাণী (carnivorous)। এদের বলা হাল তৃভীয় প্রেমির বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ খাদক। সাগ, ময়ূর, বাঘ ইত্যাদি এই প্রেমির খাদক। একটি বিশেষ প্রেমির খাদক জীবস্ত প্রাণীর চেয়ে মৃত প্রাণীর মাংস বা আবর্জনা খেতে বেশি পছন্দ করে। যেমন: কাক, শকুন, শিয়াল, হাঁসেনা ইত্যাদি। এদের নাম দেওয়া হয়েছে আবর্জনাত্মক বা ধাঙড় (scavenger)। কারণ এরা মৃতদেহ বা আবর্জনা খেয়ে পরিবেশ পরিষ্কার রাখে। উল্লেখ্য, কখনো কখনো বাস্তুতন্ত্রে অন্য প্রাণী দেখা যায়, যারা একাই বিভিন্ন স্তরের খাদক হিসেবে ভূমিকা রাখে। যেমন: মানুষ একই সাথে তৃপ্তিজোজী এবং মাংসাশী (omnivorous)।

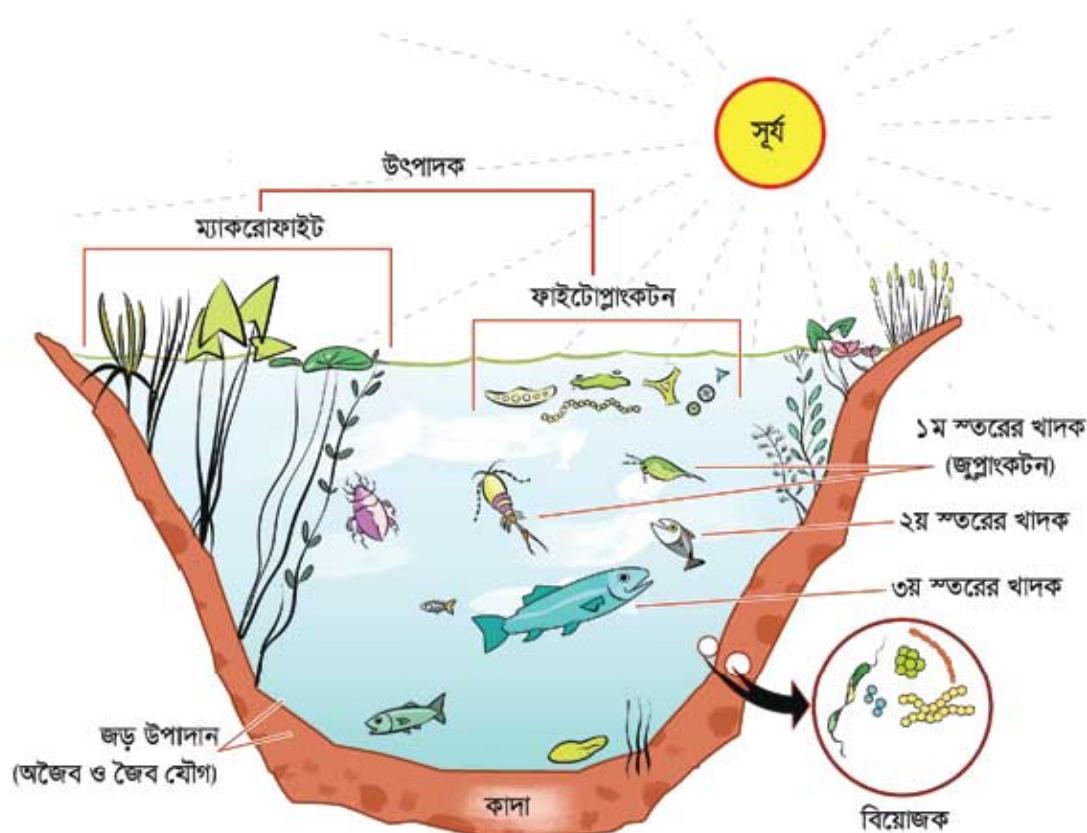


চিত্র 13.01: বাস্তুতন্ত্রের উপাদানসমূহ (কল আকারে)

(iii) বিয়োজক (Decomposer): ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ইত্যাদি অতিক্রম জীব বা অণুজীব উদ্ভিদ ও প্রাণীর বর্ণন পদার্থ এবং মৃতদেহ থেকে তাদের খাদ্য প্রাপ্ত করে। পরিণামে এসব বর্ণন বিয়োজিত হয়ে মাটি বা পানির সাথে মিশে যায়। এই মিশে যাওয়া উৎপাদন তখন উদ্ভিদের পক্ষে আবার খাদ্য উৎপাদন হিসেবে প্রাপ্ত করা সম্ভব হয়। তাই এই অণুজীবগুলোকে বলা হয় বিয়োজক বা পরিবর্তক।

13.2 পুকুরের বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem of a pond)

জলভাসের বাস্তুতন্ত্র কাছে থেকে ভালো করে দেখার জন্য সবচেয়ে উপযোগী হচ্ছে পুকুর। পুকুরে বসবাসরত জীব ও জড় পদার্থের নিবিড় সম্পর্ক ভালোভাবে বোধ যাব। জড় উপাদানগুলো হলো বিভিন্ন শ্রেণীর জৈব এবং অজৈব পদার্থ, পানি, সূর্যলোক, কার্বন ডাই-অক্সাইড, অক্সিজেন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ইত্যাদি। সঙ্গীব উপাদানগুলোর মধ্যে আছে উৎপাদক, প্রথম স্তরের খাদক, দ্বিতীয় স্তরের খাদক এবং বিভিন্ন রকম বিয়োজক।



চিত্র 13.02: একটি পুকুরের বাস্তুতন্ত্র

(এ) উৎপাদক: উৎপাদক হচ্ছে সালোকসংশ্লেষণকারী বিভিন্ন শ্রেণীর পৌষ্টির পানির উষ্ণিদ। পানিতে জাসমান স্ফুর্জ জীবদের প্ল্যাকটন বলে। ফাইটোপ্লাইকটন বা উষ্ণিদ প্ল্যাকটন সবুজ জলজ শৈবাল ও অন্যান্য জলজ উষ্ণিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে। তাই এদের উৎপাদক বলে।

(b) প্রথম স্তরের খাদক: নানা ধরনের ভাসমান ক্ষুদে পোকা, মশার শূককীট, অতিক্ষুদ্র প্রাণী, জুঘ্যাংকটন ছাড়াও বুই, কাতলা মাছও প্রথম স্তরের খাদক। ভাসমান ক্ষুদ্র প্রাণীদের জুঘ্যাংকটন বলে। এ খাদকগুলো নিজেরা খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না, তাই সরাসরি উৎপাদককে ভক্ষণ করে বেঁচে থাকে।

(c) দ্বিতীয় স্তরের খাদক: ছোট মাছ, কিছু জলজ পতঙ্গ, ব্যাঙ প্রভৃতি দ্বিতীয় স্তরের খাদক। এরা নিজে খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না এবং উৎপাদককেও খাদ্য হিসেবে সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না। এরা প্রথম স্তরের খাদকদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে।

(d) তৃতীয় স্তরের খাদক: যেসব খাদক ছোট মাছ, চিংড়ি ইত্যাদি দ্বিতীয় স্তরের খাদককে ভক্ষণ করে তাদের তৃতীয় স্তরের খাদক বলে। শোল, বোয়াল, ভেটকি প্রভৃতি বড় মাছ, বক ইত্যাদি হচ্ছে তৃতীয় স্তর বা সর্বোচ্চ খাদক।

(e) বিয়োজক: পুরুরের পানিতে বহু ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া মৃতজীবী হিসেবে বাস করে। এদের বিয়োজক বলে। এরা পানিতে ভাসমান বা পানির তলায় কাদার মধ্যে বাস করে। এরা জীবিত বা মৃত প্রাণীদের আক্রমণ করে এবং পচনে সাহায্য করে। ফলে উৎপাদকের ব্যবহার উপযোগী জৈব ও অজৈব রাসায়নিক পদার্থ পুনরায় সৃষ্টি হয়। এসব বিয়োজিত উপাদানগুলো আবার পুরুরের উৎপাদক শ্রেণির জীব ব্যবহার করে।

13.3 খাদ্যশিকল বা খাদ্যশৃঙ্খল (Food chain)

উৎপাদক হিসেবে সবুজ উড়িদ যেকোনো বাস্তুতন্ত্রের জীব উপাদানগুলোর মধ্যে সবার প্রথম কাজে নামে। তারা খাদ্য তৈরি না করলে তৃণভোজী প্রাণী এবং মাংসাশী প্রাণীরা খাদ্যসংকটে পড়ে মারা যেত। যখন খাদ্য শক্তি উৎপাদক থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের খাদকদের মধ্যে প্রবাহিত হয়, তখন সেই প্রবাহকে এক সাথে খাদ্যশিকল বা খাদ্যশৃঙ্খল বলা হয়।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় মাঠের সবুজ ঘাস হচ্ছে উৎপাদক। ঘাসফড়িং সে ঘাসের অংশবিশেষ খেয়ে বাঁচে। ব্যাঙ এই ঘাসফড়িংকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে, আর সাপ সেই ব্যাঙকে আস্ত গিলে খায়। যদি মনে করা হয়, সাপটি আকারে ছোট এবং আশপাশে বেশ বড় একটি গুঁইসাপ আছে। তাহলে সুযোগ পেলে এই গুঁইসাপ আবার সাপটিকে গিলে খাবে। সেক্ষেত্রে খাদ্যশিকলটিকে নিচের মতো করে লেখা যাবে:

ঘাস → ফড়িং → ব্যাঙ → সাপ → গুঁইসাপ

উৎপাদক প্রথমস্তরের খাদক দ্বিতীয়স্তরের খাদক তৃতীয়স্তরের খাদক সর্বোচ্চস্তরের খাদক

বিভিন্ন ধরনের বাস্তুতন্ত্রে খাদ্যশিকল বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন শিকারজীবী খাদ্যশিকল, পরজীবী খাদ্যশিকল এবং মৃতজীবী খাদ্যশিকল।

(a) **শিকারজীবী খাদ্যশিকল (Predator food chain):** যে খাদ্যশিকলে প্রথম স্তরের খাদক আকারে সবচেয়ে ছোট থাকে এবং পর্যায়ক্রমে উপরের খাদকেরা নিচের স্তরের খাদকগুলো শিকার করে থায়, সেরূপ শিকলকে বলা হয় শিকারজীবী খাদ্যশিকল। উপরে বর্ণিত খাদ্যশিকলটি একটি শিকারজীবী খাদ্যশিকল।

(b) **পরজীবী খাদ্যশিকল (Parasitic food chain):** পরজীবী উড্ডিদ ও প্রাণী অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেদের চেয়ে বড় আকারের পোষকদেহ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি পরজীবীর উপর আরেক ধরনের ক্ষুদ্রতর পরজীবী তার খাদ্যের জন্য নির্ভরশীল হয়। এ ক্ষেত্রে খাদ্যশিকলের প্রথম ধাপে সবসময় সবুজ উড্ডিদ না-ও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে শিকলটি অসম্পূর্ণ থাকে, যেমন:

মানুষ —————> মশা —————> ডেঙ্গু ভাইরাস।

উল্লেখ্য, এখানে মানবদেহের রন্ত শোষণকারী স্ত্রী এডিস মশা নিজে সেই রন্ত থেকে পুষ্টি লাভ করে না, কিন্তু তার গর্ভস্থ ডিমগুলোর বিকাশে কাজে লাগায়।

(c) **মৃতজীবী খাদ্যশিকল (Saprophytic food chain):** জীবের মৃতদেহ থেকে শুরু হয়ে যদি কোনো খাদ্যশূরু একাধিক খাদ্যস্তরে বিন্যস্ত হয়, তবে সেরূপ শিকলকে বলা হয় মৃতজীবী খাদ্য শিকল। যেমন:

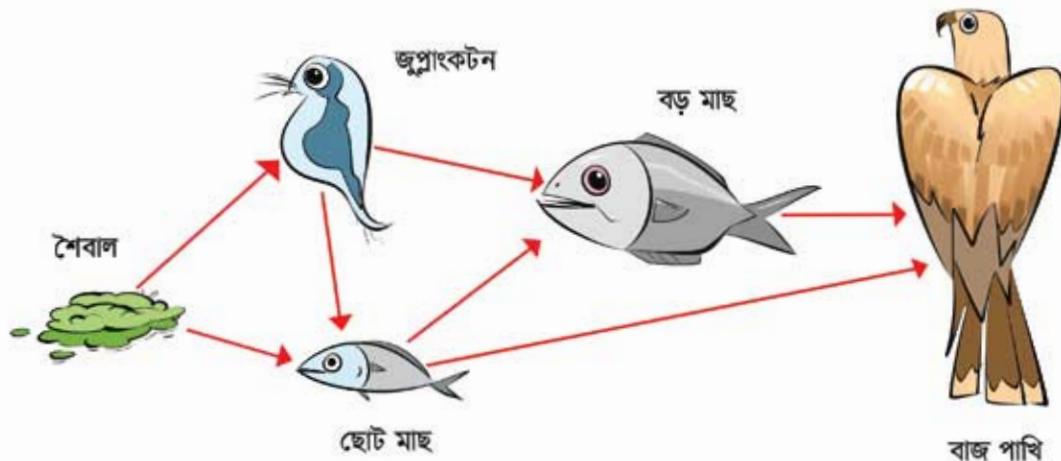
মৃতদেহ —————> ছত্রাক —————> কেঁচো।

বলা বাহুল্য, এই খাদ্যশিকলগুলো অসম্পূর্ণ এবং এ ধরনের শিকল বাস্তুতন্ত্রের যাবতীয় মিথস্ক্রিয়া বা আন্তঃসম্পর্কের অংশমাত্র তৈরি করে। পরজীবী ও মৃতজীবী খাদ্যশিকল সব সময়ই অসম্পূর্ণ থাকে। কারণ এখানে কোনো উৎপাদক নেই। এই উভয় প্রকার খাদ্যশিকল তাদের কার্যকারিতা বজায় রखার জন্য শিকারজীবী খাদ্যশিকলের প্রথম এক বা একাধিক স্তরের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং বাস্তুতন্ত্রের খাদ্যশিকল উৎপাদক সবুজ উড্ডিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার কার্যকারিতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

13.4 খাদ্যজাল (Food web)

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, বাস্তুতন্ত্রের খাদ্যশিকলে একই খাদক বিভিন্ন স্তরে স্থান পেতে পারে। এভাবে বেশ কয়েকটি খাদ্যশিকল একত্রিত হয়ে একটি জালের মতো গঠন তৈরি করে। একে খাদ্যজাল

বলে। স্থলজ ও জলজ উভয় পরিবেশের জন্য এই ঘটনা সত্য। পুকুরের বাস্তুতরের নিচের উদাহরণটি থেকে এ বিবরণটি আরও স্পষ্ট হবে।



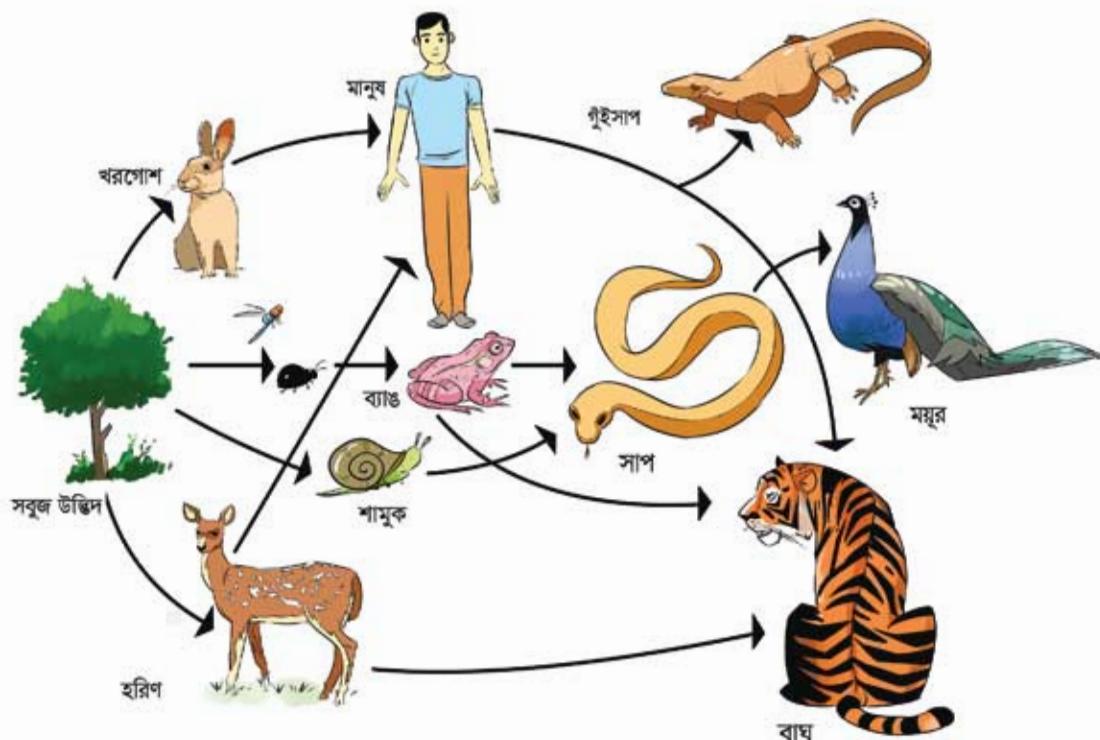
চিত্র 13.03: খাদ্যজাল

উপরের চিত্রে দেখা যান, উৎপাদক শৈবাল জুঘাংকটন এবং ছোট মাছকে সরাসরি খাদ্য সরবরাহ করে। জুঘাংকটনকে খাদ্য হিসেবে প্রস্তুত করে ছোট এবং বড় মাছ উভয়ই। বড় মাছ আবার ছোট মাছকে খায়। বাজ পাখি ছোট মাছ এবং বড় মাছের একই প্রজাতির একটু ছোট সদস্যদের সহজেই খেতে পারে। এখানে পাঁচটি বিভিন্নভাবে বেশ করেকটি খাদ্যশিক্ষণ তৈরি করে। এতাবে যে খাদ্যজাল তৈরি হয়েছে বিভিন্ন বাস্তুতরে এর চেয়েও জটিল খাদ্যজাল তৈরি হতে পারে।

উপরের খাদ্যজালে মোট পাঁচটি খাদ্যশিক্ষণ পাওয়া যায়।

- (a) শৈবাল → ছোট মাছ → বাজ পাখি।
- (b) শৈবাল → জুঘাংকটন → বড় মাছ → বাজ পাখি।
- (c) শৈবাল → ছোট মাছ → বড় মাছ → বাজ পাখি।
- (d) শৈবাল → জুঘাংকটন → ছোট মাছ → বড় মাছ → বাজ পাখি।
- (e) শৈবাল → জুঘাংকটন → ছোট মাছ → বাজ পাখি।

বনভূমির বাস্তুতজ্জের খাদ্যজাল হতে পারে নিম্নলিখিত:



চিত্র 13.04: বনভূমির একটি খাদ্যজাল

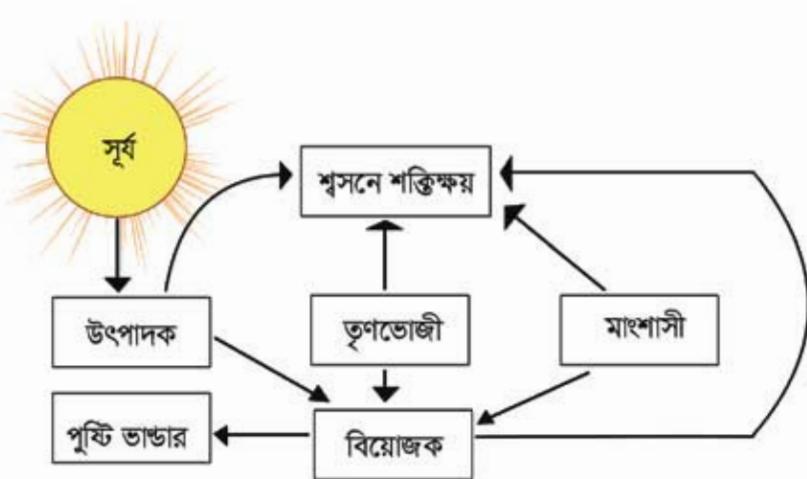


একক কাজ

কাজ : চিত্র 13.04 এ উল্লিখিত খাদ্যজালে যেসব খাদ্যশিকল আছে তা লেখ।

বাস্তুতজ্জে পুষ্টিধৰ্ম (Nutrient flow in ecosystems)

উদ্ভিদ অংশের বস্তু শ্রেণি করে সালোকসংক্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রস্তুত করে। উদ্ভিদ যে খাদ্য তৈরি করে, তার কিছু অংশ নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করে, অবশিষ্টাংশ উদ্ভিদ সেচেই জমা থাকে। ফৃশতোজী প্রাণী এসব উদ্ভিদ খায় এবং পর্যায়ক্রমে মাংসাশী প্রাণী এসব ফৃশতোজীদের খায়। এসব উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের মৃত্যুর পর বিভোজকগুলো এদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে অংশের বস্তুতে বৃপ্তিপ্রিত করে পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়। সবুজ উদ্ভিদ এসব অংশের বস্তু শ্রেণি করে এবং পুনরাবৃ খাদ্য প্রস্তুতে ব্যবহার করে থাকে। পুষ্টিধৰ্মের এসূপ চক্রাকারে প্রাচীনত ইতিহাস প্রক্রিয়াটিকে পুষ্টিধৰ্ম বলে। খাদ্যশূভ্যদের মাধ্যমে এসূপ পুষ্টির প্রবাহ বাস্তুতজ্জের একটি অন্যতম পুরুষপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।



চিত্র 13.05: পুষ্টিক্ষেত্র প্রবাহ এবং শক্তিপ্রবাহের সংক্ষিপ্ত চির

বাস্তুতর্থে শক্তির প্রবাহ (Energy flow in the ecosystem)

যেকোনো বাস্তুতর্থের শক্তির মূল উৎস সূর্য। সূর্য থেকে যে পরিমাণ আলো এবং তাপশক্তি পৃথিবীতে এসে পৌছায় তার বড়ভোল্ড ২% সালোকসংজ্ঞের প্রক্রিয়ায় সবুজ উদ্ভিদ ব্যবহার করে। বাস্তুতর্থের প্রবর্বতী ধারণাগুলোর জন্য প্রাথমিকভাবে শর্করাম আলো ও তাপশক্তি রাসায়নিক শক্তি হিসেবে মজুত করে। বিভিন্ন রূপের খাদ্যশিকদের মাধ্যমে উদ্ভিদে জমা হওয়া এই শক্তি বিভিন্ন খাদ্যসমগ্রে পৌছায়। শেষ পর্যন্ত বিয়োজকের কাজের ফলে সকল শক্তি আবার পরিবেশে ফিরে আসে।

তংত্রজী প্রাণীরা অর্ধাং বাস্তুতর্থের প্রথম স্তরের খাদকের সবুজ উদ্ভিদের পাতা, কাণ্ঠ, ফুল, ফল, বীজ বা মূল থেকে জীবন ধারণ করে। এভাবে সবুজ উদ্ভিদে উৎপাদিত রাসায়নিক শক্তি প্রথমে তংত্রজী প্রাণীতে পৌছায়। মাংশাসী প্রাণী যারা প্রথম স্তরের খাদকদের (তংত্রজী প্রাণীদের) থেকে বাঁচে, তারাই বিভিন্ন স্তরের খাদক। প্রথম স্তরের খাদক থেকে এভাবে রাসায়নিক শক্তি বিভিন্ন স্তরের খাদকের দেহে স্থানান্তরিত হয়। একইভাবে বিভিন্ন স্তরের খাদক থেকে রাসায়নিক শক্তি খাদ্য আকারে তৃতীয় স্তরের খাদকে পৌছায়। যদি তৃতীয় স্তরের খাদককে আরও উচ্চতর কোনো খাদক খাদ্য হিসেবে প্রছন্দ করে, তবে একই প্রক্রিয়া শক্তি সর্বোচ্চ স্তরের খাদকে পৌছায়।

মৃত্যুর পর সব জীবের শক্তি প্রহর প্রক্রিয়া থেকে যায়। তখন এই মৃতদেহে সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তি বিয়োজকের কাজের ফলে কেবলে জড় পদার্থ বা শক্তি আকারে আবার পরিবেশে ফিরে আসে। পরিবেশের বিভিন্ন জড় বস্তুর ঘর্ষে জমা হওয়া এই শক্তি তখন আবার উদ্ভিদের প্রথম উপর্যোগী হয়। আর এভাবে খাদ্যচক্রের মাধ্যমে বাস্তুতর্থে প্রাকৃতিক শক্তির প্রবাহ চলতে থাকে।

সব ধরনের খাদ্যশিকদের প্রতিটি স্তরে কিছু অপচয় হয়। উৎপাদক সবুজ উদ্ভিদ থেকে তংত্রজী প্রাণী

যতটা শক্তি গ্রহণ করে, তার শরীরে ততটা শক্তি জমা হয় না। আবার দ্বিতীয় স্তরে খাদক তৃণভোজী প্রাণীর দেহ থেকে যে পরিমাণ পুষ্টিদ্রব্য গ্রহণ করে, তার নিজের দেহে সে পরিমাণ পুষ্টি পৌঁছায় না, কিছুটা জড় পরিবেশে মুক্ত হয়। এভাবে এক জীব থেকে আরেক জীবে খাদ্যশক্তি স্থানান্তরের সময় বেশ কিছু শক্তি বাস্তুতন্ত্রের সাধারণ নিয়মেই এই তন্ত্রের বাইরে চলে যায়। এ কারণে খাদ্যশিকলে খাদ্যস্তরের সংখ্যা যত কমানো যায়, শক্তির অপচয় তত কম হয়।

ট্রফিক লেভেলের মধ্যে শক্তির সম্পর্ক

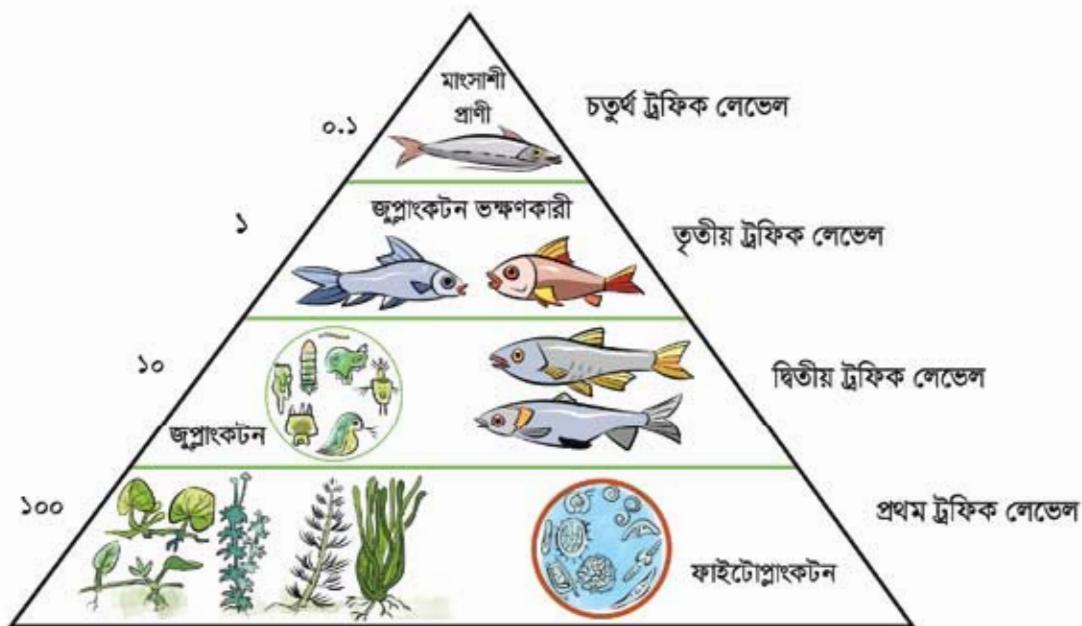
খাদ্যশিকলের প্রতিটি স্তরকে ট্রফিক লেভেল বলে। সে হিসেবে উৎপাদক, প্রথম স্তরের খাদক, দ্বিতীয় স্তরের খাদক এবং চূড়ান্ত স্তরের খাদক প্রত্যেকেই এক একটি ট্রফিক লেভেল। বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদক প্রথম বা সর্বনিম্ন ট্রফিক লেভেলের প্রতিনিধিত্ব করে। তৃণভোজী খাদক অর্থাৎ প্রথম স্তরের খাদক দ্বিতীয় ট্রফিক লেভেলের প্রতিনিধি। এভাবে নিম্ন স্তরের মাংসাশী প্রাণী তৃতীয় ট্রফিক লেভেল এবং উচ্চ পর্যায়ের মাংসাশী প্রাণী সর্বোচ্চ ট্রফিক লেভেলের প্রতিনিধিত্ব করে। কোনো খাদ্যশিকলের উৎপাদক বা সর্বনিম্ন ট্রফিক লেভেলে সূর্য থেকে যে শক্তি সংগৃহীত হয়, পরবর্তী প্রতিটি ট্রফিক লেভেলে তার কিছু অংশ তাপ হিসেবে বেরিয়ে যায়। এজন্য দেখা যায় যে উৎপাদক যে পরিমাণ শক্তি সূর্য থেকে সংগ্রহ করে তা দ্বিতীয় ট্রফিক লেভেলে এসে কমে যায়। তৃতীয় বা সর্বোচ্চ ট্রফিক লেভেলে এসে শক্তির পরিমাণ আরও কমে যায়। সাধারণত, যেকোনো বাস্তুতন্ত্রের কোনো একটি ট্রফিক লেভেলে যতটুকু শক্তি থাকে তার প্রায় 10% ঠিক উপরের ট্রফিক লেভেলে সঞ্চারিত হতে পারে। বাকি 90% তাপ হিসেবে পরিবেশে বিমুক্ত হয় কিংবা আংশিকভাবে অব্যবহৃত থেকে যায়।

শক্তি পিরামিডের ধারণা

সমতল ভূমির উপর অবস্থিত যে ত্রিমাত্রিক বস্তুর শীর্ষদেশ ক্রমশ সরু, তাকে পিরামিড (pyramid) বলে। কোনো একটি বাস্তুতন্ত্রে ট্রফিক লেভেলের গঠন একটি পিরামিড আকারে দেখানো যায়। খাদ্যশিকলে যুক্ত প্রতিটি পুষ্টিস্তরের শক্তি সংখ্যয় ও স্থানান্তরের বিন্যাস ছককে শক্তি পিরামিড বলে। পিরামিডের সবচেয়ে নিচে উৎপাদক স্তরের শক্তির পরিমাণ পরবর্তী ট্রফিক লেভেলগুলোর চেয়ে অনেক বেশি। উপরের ট্রফিক লেভেলের জীব নিচের ট্রফিক লেভেলের জীবদের চেয়ে শ্বসন এবং অন্যান্য কাজে ক্রমবর্ধমান হারে অধিক শক্তি তাপ হিসেবে হারায়। এজন্য উৎপাদক থাকে পিরামিডের ভূমিতে এবং চূড়ান্ত খাদক থাকে সবার উপরে।

খাদ্যশিকল সীমিত রাখতে শক্তি পিরামিডের প্রভাব

শক্তির এই প্রবাহ সব সময়েই একমুখী। এ শক্তিপ্রবাহকে কখনো বিপরীতমুখী করা যায় না। প্রতিটি ধাপে প্রায় 90% ভাগ শক্তি কমে যায় বা ব্যবহারযোগ্যতা হারায়। শক্তির এ ক্রমবর্ধমান ক্ষয় খাদ্যশিকলের আকারকে 4 বা 5টি ধাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। খাদ্যশিকল যত দীর্ঘ হবে, উর্ধ্বতম ট্রফিক লেভেলে শক্তির পরিমাণ ততই কমতে থাকবে এবং একপর্যায়ে এসে আর কোনো শক্তিই অবশিষ্ট থাকবে না।



চিত্র 13.06: শক্তির পিরামিড

13.5 জীববৈচিত্র্য (Biodiversity)

জড় ও জীব নিয়ে আমাদের পৃথিবীর পরিবেশ গঠিত। এখানে রয়েছে বহু জীবনের জীব এবং অজীব জীবনের জড় পদার্থের সমাহার। আমাদের এই পৃথিবীতে কত ধরনের জীব আছে? এর সঠিক হিসাব দেওয়া খুব কঠিন, তবে প্রজাতি (ধারের দৈহিক ও জনসংক্রান্ত চরিত্রিক বৈশিষ্ট্য পারম্পরিক সামৃদ্ধ্যসূচী এবং হারা একই পূর্বপুরুষ হতে উত্তৃত) ভার হিসেবে একে উপস্থাপন করা অনেকটা সহজতর। এখন পর্যন্ত প্রায় কেবল জল প্রাণী-প্রজাতি এবং চার জাতের মতো উক্তি-প্রজাতির বর্ণনা এবং নামকরণ পাওয়া যায়। প্রতিটি প্রজাতি ভার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং সেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দিয়ে ঘোষণা একটি প্রজাতি অন্যসব প্রজাতি থেকে ভিন্ন এবং শনাক্তকরণযোগ্য। বেমন কাঁচাল একটি প্রজাতি এবং এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য দিয়ে একে অন্যান্য প্রজাতি থেকে পৃথক করা সম্ভব। জীবদের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকার কারণেই জীবজগৎকে জল জল প্রজাতিতে বিভক্ত করা সম্ভব হয়েছে। আবার মানুষ একটি প্রজাতি। বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় সাতশ কোটি মানুষের বাস। এরা সবাই মুৰু একই জীবন নয়, কেৱল না কেৱল বৈশিষ্ট্যে এৱা পৰম্পৰা পৃথক। অর্থাৎ একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মধ্যেও বৈচিত্র্য থাকে। তাই সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায়, পৃথিবীতে বিচার্যান জীবগুলোর আচুর্য এবং ভিন্নতাই হলো জীববৈচিত্র্য (Biodiversity)।

13.5.1 জীববৈচিত্র্যের প্রকারভেদ

জীববৈচিত্র্যকে তিনি ভাগে ভাগ করা যায়, প্রজাতিগত বৈচিত্র্য (Species diversity), বংশগতীয় বৈচিত্র্য (Genetical diversity) এবং বাস্তুতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য (Ecosystem diversity)।

প্রজাতিগত বৈচিত্র্য: প্রজাতিগত বৈচিত্র্য বলতে সাধারণত পৃথিবীতে বিরাজমান জীবগুলোর মোট প্রজাতির সংখ্যাকেই বুঝায়। পৃথকযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কারণেই এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতি ভিন্নতর হয়। যেমন, বাঘের সাথে হরিণের আকার, স্বভাব, হিংস্রতা, সংখ্যা বৃদ্ধির ধরন ভিন্ন হয়ে থাকে। এক প্রজাতির সাথে অন্য প্রজাতির বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্নতাই প্রজাতিগত বৈচিত্র্য।

বংশগতীয় বৈচিত্র্য: একই প্রজাতিভুক্ত সদস্যগণের মধ্যেও অনেক বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। যেমন একই প্রজাতি কিন্তু তাদের গড়ন, আকার, রোগ-প্রতিরোধ এবং পরিবেশ প্রতিকূলতা সহ্য করার ক্ষমতা ভিন্ন। এই পার্থক্যগুলো তৈরি হয় তাদের জিন সংগঠনের সামান্য বৈচিত্র্যের কারণে। কারণ জিনের মাধ্যমেই জীবের বংশগত বৈশিষ্ট্য বংশানুকরণে সঞ্চালিত হয়। প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যের জন্য নির্দিষ্ট জিন থাকে। বিভিন্ন কারণে এই জিনের গঠন এবং বিন্যাসের পরিবর্তন হয়ে জীবের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয় এবং নতুন প্রজাতির উদ্ভব হতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় জীবের মধ্যে যে বৈচিত্র্য ঘটে, তাকেই বলা হয় বংশগতীয় বৈচিত্র্য।

বাস্তুতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য: একটি বাস্তুতন্ত্রের ভৌত উপাদান, রাসায়নিক উপাদান এবং জৈবিক উপাদানগুলোর মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন দেখা দিলে সেখানকার বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যে ব্যাপ্তি ঘটে। এসব পরিবর্তন অবশ্যই ধীর এবং ধারাবাহিক। এই পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য সেখানে বসবাসরত জীবের মধ্যেও পরিবর্তন সাধিত হয়। ফলে যে জীববৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়, তাকেই বলা হয় বাস্তুতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য। একটি ছোট পুকুরের বাস্তুতন্ত্রে যেসব উদ্ভিদ এবং প্রাণীর বসতি গড়ে উঠে তা নদীর বাস্তুতন্ত্র থেকে ভিন্নতর। বন, তৃণভূমি, হৃদ, নদী, জলাভূমি, পাহাড়, সাগর, মরুভূমি প্রভৃতি বাস্তুতন্ত্রে গড়ে উঠে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসমূহ এক একটি জীব সম্পদায়।

বাস্তুতন্ত্রের স্থিতিশীলতা রক্ষায় জীববৈচিত্র্যের প্রভাব

পরিবেশের উপাদানগুলো পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কযুক্ত। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্যই এই জটিল সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বিপুলসংখ্যক জীবের তৎপরতার মধ্য দিয়ে পরিবেশে এই ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিবেশের কেবল একটি বিশেষ প্রজাতির বিলুপ্তি বিরাট বিপর্যয় দেকে আনতে পারে। সে কারণে পরিবেশ স্থিতিশীল রাখার জন্য জীববৈচিত্র্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবেশের যেসব জীব বা প্রাণীকে এক সময় অপ্রয়োজনীয় এবং অবাঞ্ছিত মনে করা হতো, সময়ের বিবর্তনে দেখা গেছে সেগুলোই পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এক সময় যুক্তরাষ্ট্রের চেসাপিক উপকূলে ছিল অসংখ্য বিনুক। সেগুলো মাত্র তিন দিনে গোটা এলাকার পানি পরিশূল্প

করতে পারত। কিন্তু এখন সেই বিনুকের শতকরা ৭৭ ভাগ বিলুপ্ত হয়ে পেছে। ফলে অবশিষ্ট বিনুকেরা এখন এক বছরেও ঐ পানি আর পরিশূর্ঘ করতে পারে না। এ কারণে ঐ উপকূলের পানি ক্রমশই কর্দমাত্র হচ্ছে এবং পানিতে অঙ্গিজেনের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। একটি পূর্ণবয়স্ক ব্যাঙ একদিনে তার শহুলের সমগ্রগাম্যাপ পোকা-মাফড় খেয়ে কীটপতঙ্গে পারে। এই পোকা-মাফড় আমাদের ফসলের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। কিন্তু নানা ধরনের কীটনাশক ব্যবহারের ফলে ব্যাঙ খৎস হয়ে যাচ্ছে। পাখিদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে কীটপতঙ্গ। এর মধ্যে মানুষ এবং ফসলে জন্য ক্ষতিকর কীটপতঙ্গই বেশি। তাছাড়া পরাগায়নের ক্ষেত্রেও পাখির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পেঁচা, ইগল, চিল এবং বাঙপাখিকে আমদ্বা শিকারি থাকাতি বলে জানি। এরা ইন্দুর খেয়ে ইন্দুরের সংখ্যা নিরাপদে রাখে। মানুষের বসতবাড়িতে বসবাসকারী একজোড়া ইন্দুর বিনা বাধায় বৎস বিস্তার করলে বছর খেয়ে ইন্দুরের সংখ্যা দাঁড়াবে ৪৪০ দিনে। কিন্তু একটি পেঁচা দিনে ক্ষতিকে ডিনটি ইন্দুর খেয়ে হজম করতে পারে। শকুন, চিল এবং কাক ধ্রুতির জঙ্গল সাক না করলে গোপ জীবাশুলে পৃথিবী সয়লাব হয়ে যেত।

সে কারণে কোনো জীবকেই অপ্রয়োজনীয় বলা যায় না। পরিবেশ থেকে কোনো ধার্জাতি বিলুপ্ত হলে বাস্তুতঃপৰ স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই বাস্তুতঃপৰ স্থিতিশীলতা রক্ষায় জীববৈচিত্রের ভূমিকা কেউ অব্যাকার করতে পারবে না।



চিত্র 13.07: শকুন, চিল এবং কাক নিরাপদভাবে ধ্রুতির জঙ্গল পরিষ্কার করে।

13.5.2 বিভিন্ন জীবের মধ্যে প্রিপ্রিক্সিয়া, আন্তঃনির্ভরশীলতা ও পরিবেশের ভাবসাম্যতা

সাধারণত সবুজ উদ্ভিদকে স্বনির্ভর বলা হয়, কারণ তারা স্বতোজী (Autotrophic)। কিন্তু পরিবেশতাত্ত্বিক দিক থেকে চিন্তা করলে দেখা যায়, সবুজ পাহাড়পালাসহ কোনো জীবই স্বনির্ভর নয়। পাহাড়, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য জীবজন্ম একে অপরের ধারা প্রভাবিত এবং করবেশি নির্ভরশীল।

একটি সম্পূর্ণ উদ্ভিদ পর-পরাগায়নের জন্য (Cross pollination) কীটপতঙ্গের উপর এবং বীজ বিতরণের জন্য পশুপাখির উপর নির্ভরশীল। জীবকুল শুসনক্রিয়া দিয়ে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) গ্যাস ত্যাগ করে সবুজ উদ্ভিদকুল সালোকসংক্রেষণের জন্য তা ব্যবহার করে। আবার সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংক্রেষণ প্রক্রিয়ায় যে অঙ্গিজেন (O_2) গ্যাস ত্যাগ করে, শুসনের জন্য জীবকুল সেটি ব্যবহার করে। তাছাড়া ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক এবং বিভিন্ন শুকার জীবাশুল দিয়ে পাহাড়, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ

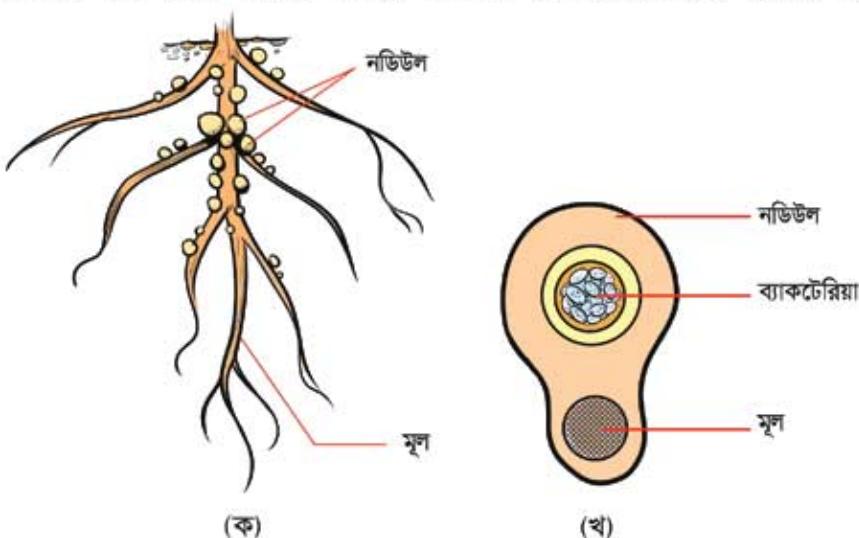
বিভিন্নভাবে প্রক্রিয়া হয়। এক কথায় বলা যায়, পারম্পরিক সহযোগ ও নির্ভরশীলতাই জীবনক্ষিয়া পরিচালনার চাবিকাঠি। কাজেই জীবজগতে বিভিন্ন প্রকার গোষ্ঠোলা এবং আণীদের মধ্যে বিদ্যমান জৈবিক সম্পর্কগুলোকে সহাবস্থান (Symbiosis) নামে আখ্যায়িত করা যায়। আর সক্ষর্কযুক্ত জীবগুলোকে সহবাসকারী বা সহবস্থানকারী (Symbionts) বলা হয়। এই সহবস্থানকারী জীবগুলোর মধ্যে যে ক্ষিয়া-বিক্রিয়া ঘটে তাকে যিখন্তক্রিয়া বলা হয়। উপরের আলোচনা থেকে এটিও পরিষ্কার হয়েছে যে যিখন্তক্রিয়ায় অংশগ্রহকারী জীবগুলো পদ্ধতির আন্তঃনির্ভরশীল, কেউই স্বয়ংসক্রূর্ণ নয়। পরিবেশবিজ্ঞানী ওডাম (Odum) বলেন যে এই আন্তঃনির্ভরশীল সম্পর্ক দুভাবে হতে পারে, যেমন:

- (a) ধনাচার আন্তঃক্রিয়া (Positive interactions) ঘূরা
- (b) ঋণাচার আন্তঃক্রিয়া (Negative interactions) ঘূরা।

(a) ধনাচার আন্তঃক্রিয়া (Positive interactions)

যে আন্তঃসম্পর্কে দুটি জীবের একটি অন্যটিকে সহায়তা করে, তাকে ধনাচার আন্তঃক্রিয়া বলে। এ ক্ষেত্রে সহযোগীবয়ের একটি বা উভয়ই উপরূপ হতে পারে। সাক্ষনক এ আন্তঃক্রিয়ার দুটি প্রধান ধরন হলো মিউচুরালিজম (Mutualism) ও কমেন্সেলিজম (Commensalism)।

(1) মিউচুরালিজম (Mutualism): সহযোগীদের উভয়ই একে অন্যের ঘূরা উপরূপ হয়। যেমন, মৌমাছি প্রজাতি, পোকামাকড় প্রজাতি ফুলের মধু আহরণের জন্য ফুলে ফুলে উড়ে বেঢ়ায় এবং বিনিয়মে ফুলের পরাগায়ন ঘটে। অনেক পাখি এবং বাদুড় কল খেয়ে বাঁচে এবং মলজ্যালের সাথে ফলের বীজও ভ্যাগ করে। এভাবে বীজের স্থানান্তর হয় এবং উড়িদের ক্ষিতাত্ত্ব ঘটে। এ বীজ



চিত্র 13.03: মিউচুরালিজম

(ক) শিম জাতীয় উড়িদের মূলে নেক্টার
(খ) শহবজেলে মূল ও নেক্টারের চিত্র

নতুন গাছ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। একটি শৈবাল এবং একটি ছাঁচাক সহায়স্থান করে শাইকেল গঠন করে। ছাঁচাক বাতাস থেকে জলীয় বাত্স সংগ্রহ এবং উভয়ের ব্যবহারের জন্য খনিজ লবণ সংগ্রহ করে। অপরদিকে শৈবাল তার ফ্রোরোক্সিলের মাধ্যমে নিজের জন্য এবং ছাঁচাকের জন্য শর্করাজাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে। রাইজেবিয়াম (*Rhizobium*) ব্যাকটেরিয়া শিমজাতীয় উদ্ভিদের (Leguminous plant) শিকড়ে অবস্থান করে গুটি (Nodule) তৈরি করে এবং বাইরীয় নাইট্রোজেনকে সেধানে সংবর্ধন করে। ব্যাকটেরিয়া এই নাইট্রোজেন সহযোগী শিম উদ্ভিদকে সরবরাহ করে এবং বিনিয়মে সহযোগী উদ্ভিদ থেকে শর্করাজাতীয় খাদ্য পেয়ে থাকে।

(ii) কমেন্সেলিজম (Commensalism): এ ক্ষেত্রে সহযোগীদের মধ্যে একজন মাত্র উপকৃত হয়। অন্য সহযোগী সদস্য উপকৃত না হলেও কখনো ক্ষতিপ্রস্ত হয় না। যেমন, রোহিণী উদ্ভিদ (apophyte) মূলের সাহায্যে নিজেকে মাটিতে আবস্থ করে এবং অন্য বড় উদ্ভিদকে আরোহণ করে উপরে উঠে। এরূপে অন্য বৃক্ষের উপর অসারিত হয়ে বেশি পরিমাণে আলো প্রাপ্ত করে। কাঠল সত্তা খাদ্যের জন্য আশ্রয়দানকারী উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে না এবং তার কোনো ক্ষতিশূন্য করে না। পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ (metabolion) বায়ু থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে, কিন্তু আশ্রয়দাতার কোনো ক্ষতি করে না। শৈবাল অন্য উদ্ভিদেদের শিতরে আশ্রয় নিয়ে বসবাস করে। কিন্তু আশ্রয়দাতার কোনো ক্ষতি করে না।



(a) রোহিণী উদ্ভিদ

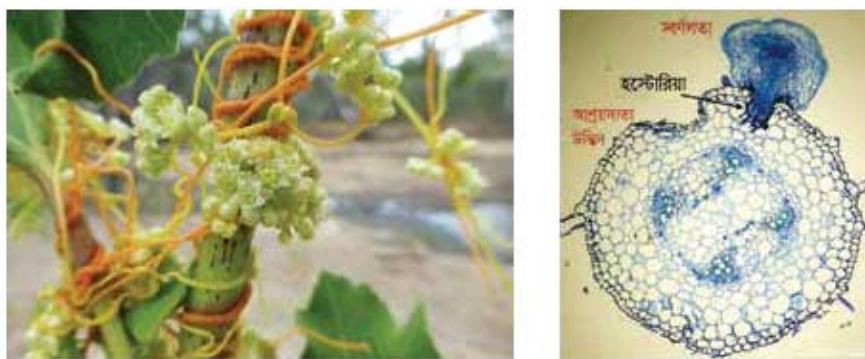
(b) পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ

চিত্র 13.09: (a), (b) কমেন্সেলিজম

(b) খণ্ডক আন্তঃক্রিয়া

এ ক্ষেত্রে জীববৃক্ষের একটি বা উভয়েই ক্ষতিপ্রস্ত হয়। খণ্ডক আন্তঃক্রিয়াকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়— শোষণ, প্রতিযোগিতা ও অ্যাক্টিবেজনসিস।

(i) শোষণ (Exploitation): এ ক্ষেত্রে একটি জীব অন্য জীবকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তার অধিকার থেকে বাধিত করে নিজের অধিকার খোগ করে। যেমন: স্বর্গসতা। স্বর্গসতা হলোরিয়া নামক চোবক আঙোর মাঝে আশ্রয়স্থান উদ্ভিদ থেকে তার খাল সংগ্রহ করে। কোকিল কখনো পরিণয় করে বাসা তৈরি করে না। কাফের বাসায় সে ডিম পাঢ়ে এবং কাফের ঘারাই তার ডিম ফেটায়।



চিত্র 13.10: শোষণ

(ক) স্বর্গসতা এবং শোষণ টুটিস (খ) সবজেস্টে শোষক পরতোজী সফর্ক

(ii) অতিযোগিতা (Competition): কোনো নির্দিষ্ট স্থানে আঙো, বাতাস, পানি ও খাদ্যের জন্য জীবগুলোর মধ্যে অতিযোগিতা হয়ে থাকে। এ অতিযোগিতায় সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীবসমূহ টিকে থাকে এবং অন্যরা বিভাজিত হয়ে থাকে। এটি ডারউইনীয় আন্তঃপ্রজাতিক ও অন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রামের আঙো উদাহরণ।

(iii) অ্যাটিবারোসিস (Antibiosis): একটি জীব কর্তৃক সৃষ্টি জৈব রাসায়নিক পদার্থের কারণে যদি অন্য জীবের বৃক্ষ এবং বিকাশ আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে বাধাপ্রাপ্ত হয় অথবা মৃত্যু ঘটে তখন সেই প্রক্রিয়াকে অ্যাটিবারোসিস বলে। অগুজীবজগতে এ ধরনের সফর্ক অনেক বেশি দেখা যায়। আলেক্সান্ডার ফ্লেমিংের (1881-1955) পেনিসিলিন অ্যাটিবারোটিক আবিষ্কারের পোছনে ছিল পেনিসিলিনায় ছাঁক কর্তৃক একই কালচার ফ্রেটে রাখা ব্যাকটেরিয়াগুলোর অ্যাটিবারোসিস।



চিত্র 13.11: অ্যাটিবারোসিস

উপরের আলোচনা থেকে এটি বোঝা যায় যে পরিবেশে বিদ্যমান বিভিন্ন জীবের মধ্যে প্রতিনিয়ত ক্রিয়া-বিক্রিয়া হচ্ছে এবং প্রত্যেকটি উপাদান পরস্পরের সাথে আন্তঃ সম্পর্কযুক্ত। এই সম্পর্ক দিয়ে কেউ লাভবান হচ্ছে আবার কেউ ক্ষতিগ্রস্তও হচ্ছে। আর এভাবেই তারা পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছে।

13.6 পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব ও পদ্ধতি

আমাদের পৃথিবী নামক গ্রহটিকে জীবের বাসযোগ্য করে রাখার জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ অপরিহার্য। এই পৃথিবীতে রয়েছে অসংখ্য জীব আর মাটি, পানি, বায়ুর মতো জীবনধারণের বিভিন্ন উপাদান। বর্তমান পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এ ধরনের বিভিন্ন চাহিদা মেটাতে গিয়ে এই সমস্ত প্রাকৃতিক উপাদান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সংকটজনক এই পরিস্থিতিতে পরিবেশসচেতন না হয়ে উঠলে বিপর্যয় আরও প্রকট আকার ধারণ করবে। আমাদের পরিবেশে ক্ষুদ্রতিক্ষুদ্র উড্ডিদ, কীটপতঙ্গ থেকে শুরু করে বৃহদাকৃতির প্রাণী বা উড্ডিদ কেউই অবাঞ্ছিত বা মূল্যহীন নয়। প্রকৃতির রাজ্যে সকল জীব এবং জড় পদার্থ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় একে অপরের সাথে বন্ধনে আবদ্ধ। লক্ষ লক্ষ প্রজাতির উড্ডিদ, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, মানুষ ইতাদি নিয়ে গড়ে উঠেছে জীববৈচিত্র্য, যার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে মানবজাতির কল্যাণ এবং অস্তিত্ব। অরণ্য, পাহাড়, জলাভূমি, সমুদ্র জীববৈচিত্র্যের অতীব প্রয়োজনীয় আধার। কাজেই পরিবেশ সুরক্ষিত থাকলে জীববৈচিত্র্য টিকে থাকবে। মনে রাখতে হবে, মানুষ ছাড়াই জীববৈচিত্র্য টিকে থাকতে পারবে কিন্তু জীববৈচিত্র্য না টিকলে মানুষ টিকে থাকতে পারবে না।

পরিবেশ সুরক্ষিত থাকলে মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো, যেমন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, ঔষধ, জ্বালানি, পানিসহ প্রয়োজনীয় উপকরণাদি পরিবেশ থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যাবে। পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিশেষ করে বনাঞ্চল ধ্বংস হলে বৃষ্টিপাতের হার কমে যায়, চাষাবাদের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। গ্রিনহাউস গ্যাস (CO_2 , CO , CH_4 , N_2O ইত্যাদি) বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তাপমাত্রা বেড়ে যায়, যাকে গ্রিনহাউস এফেক্ট (Green house effect) বলে। গ্রিনহাউস এফেক্টের কারণে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যাবে এবং উপকূল অঞ্চল তলিয়ে যাবে, আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে, বনাঞ্চল ধ্বংস হবে, বিভিন্ন রোগবালাইয়ের প্রভাবে ফসলের ক্ষতি হবে, মানুষের মধ্যে নতুন সব রোগের প্রকোপ দেখা দিবে, ঝড়-জলোচ্ছাসের তীব্রতা বেড়ে যাবে। পরিবেশ সুরক্ষিত থাকলে গ্রিনহাউস এফেক্ট থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। তাই এখন থেকেই পরিবেশ সংরক্ষণের সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

মানুষ বর্তমানে তার নিজের অস্তিত্ব রক্ষার্থে পরিবেশ সংরক্ষণের কথা জোরেশোরে বলা শুরু করেছে। সুস্থ পরিবেশ রক্ষার জন্য সমগ্র বিশ্বকে এগিয়ে আসতে হবে। পরিবেশ সংরক্ষণবিষয়ক আন্দোলন গড়ে তোলাও জরুরি। বৃক্ষরোপণকে শুধু মাস বা সপ্তাহে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রতিদিন যে গাছ কাটা হবে ঠিক তার দ্বিগুণ গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তবে ইচ্ছামতো গাছ লাগালেই চলবে না, যেখানে যে

ধরনের পাছ উপকুল বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় সহায়ক, সেখানে সে ধরনের পাছই লাগতে হবে। কোনো এলাকার শিল্পকার্যবানা, বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রভৃতি নির্মাণের পূর্বে সেই এলাকার পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব হতে পারে কি না তা বিবেচনা করতে হবে এবং বর্জের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করতে হবে। পরিকল্পিত নগরায়ন করতে হবে। নগরায়নের সাথে অবশ্যই বৃক্ষায়ন করতে হবে। জ্বালানি হিসেবে কাঠের পরিবর্তে সৌরশক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। মাআতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক মাটির গুণাগুণ নষ্ট করে, উপকারী জীবাণু, স্থলজ পোকামাকড় খুবসু করে, জলজ ও মাটির বাস্তুতন্ত্রকে নষ্ট করে। কাজেই জৈবসারের ব্যবহার বাড়াতে হবে। রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার কমাতে হবে। মাআতিরিক্ত জনসংখ্যা বিভিন্নভাবে পরিবেশের বিপর্যয় ঘটায়। জনসংখ্যা সীমিত রেখে সচেতন এবং শিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়ে তুলতে হবে। পরিবেশদূষণ রোধে পরিবেশের ক্ষতিকর প্রভাব সমর্কে গবেষণাত্মক বৃক্ষির প্রয়োজন। প্রচারযাত্যয়কে এ ব্যাপারে অঞ্চলীয় ভূমিকা পালন করতে হবে। কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি গ্রিনহাউস গ্যাসের উৎপাদন হ্রাস করতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চলে ভূমিক্য রোধ হবে। নদী বনন করে এবং আকৃতিক জলাধারগুলো সংরক্ষণ করে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ অব্যাহত রাখতে হবে। এতে জৈবগোষ্ঠী এবং জলাবন্ধন দূর হবে, পানির বাস্তুতন্ত্র স্বাভাবিক থাকবে।

পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ অভ্যাসক এবং সেই লক্ষ্যে যে সমস্ত উচ্চিদ ও থানী প্রকৃতি থেকে হারিয়ে যাবার উপরক্রম হয়েছে, তাদেরকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ করতে হবে। বাস্তুদূষণ, পানিদূষণ, মাটিদূষণ, শব্দদূষণ যাতে না হয়, সে রূপক্রম সব ব্যবস্থা অঙ্গ করতে হবে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিবেশনীতিকে যথোর্থভাবে অনুসরণ করতে হবে। প্রয়োজনে সরকার এবং নীতিনির্ধারক পর্যায়ে এ ব্যাপারে জোর দাবি উত্থাপন করতে হবে।



একক কাজ

কাজ : তোমার এলাকার পরিবেশগত উপাদানসমূহ দূষিত হওয়ার কারণগুলো কী কী তা নির্ণয় করে একটি অভিবেদন তৈরি কর।

ଅନୁଶୀଳନୀ



সংক্ষিপ্ত উভয় পথ

1. সিইবারেসিস কী? ব্যাখ্যা কর।
 2. প্লাঁকটন বলতে কী বোঝায়?
 3. পরজীবী আদশ্বসন কাকে বলে?
 4. অ্যানিবারেসিস কাকে বলে?
 5. মিউচ্যুলিজম কাকে বলে?



ବ୍ୟାଚନୀୟକ ପତ୍ର

୧. “ବିଜ୍ଞାନ ଜୀବେର ଯିଥିକ୍ଷିତା ଓ ଆନ୍ତରିକରଣଶିଳତାର ମଧ୍ୟମେ ପରିବେଶେର ଭାବସାମ୍ଯ ବଜାୟ ଥାଏକେ” । ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।



ବ୍ୟାନିରୀଚନ ପତ୍ର

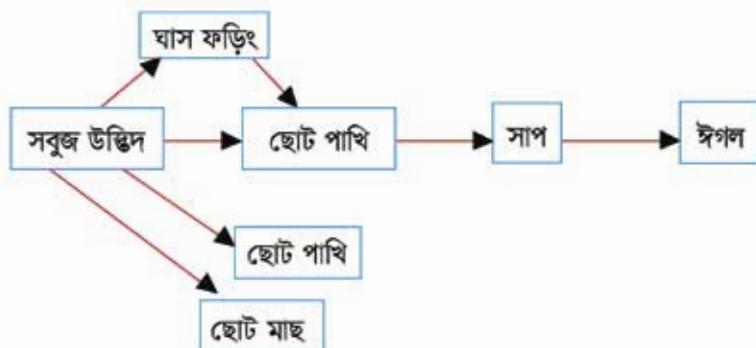
1. କୋନଟି ମୃତ୍ୟୁରୀବି ଆମାଶ୍ଵରଙ୍ଗଳ ?
 କ. ସାସ → ହରିଷ → ସାବ
 ଖ. ମୃତ୍ୟୁରୀବ → ବିମୋଜକ → ଅୟମିବା

- ### ৩. অন্যান্য প্রকার স্বাক্ষর

- i. সহযোগীদের মধ্যে একজন উপর্যুক্ত হয়
 - ii. সহযোগী সদস্য উপর্যুক্ত না হলেও ক্ষতিশীল হয় না
 - iii. সহযোগীদের উভয়ই উপর্যুক্ত হয়

निष्ठा कोनटि अंतिक?

- ক. i খ. i & ii গ. ii & iii ঘ. i, ii & iii



উপরের চিত্রের আলোকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

৩. উপরোক্ত চিত্রে কয়টি খাদ্যশূলিল আছে?

- ক. ১টি
- খ. ২টি
- গ. ৩টি
- ঘ. ৪টি

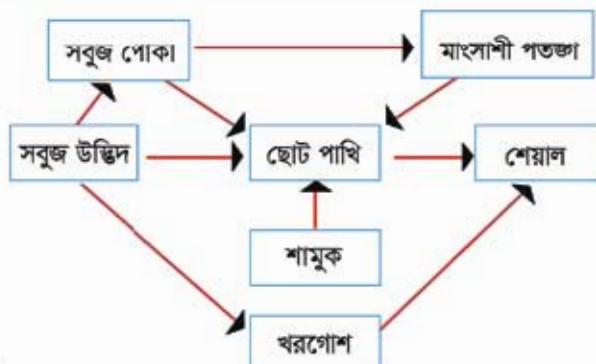
৪. উদ্বীপকের আলোকে বিজীৱ স্তরের খাদক কোনটি?

- ক. ছোট মাছ
- খ. সাপ
- গ. খরগোশ
- ঘ. ঘাসফড়ি



সূজনশীল প্রশ্ন

১.



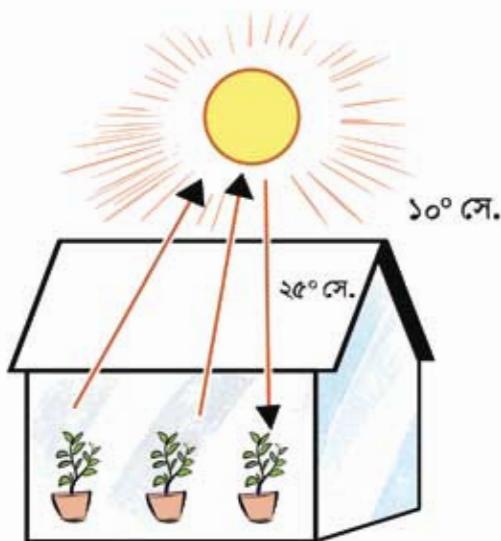
- ক. বিয়োজক কী?

- খ. খাদ্যশূল কী বৃক্ষিয়ে দেখ।

- গ. উপরের খাদ্যশূলের কোন খাদ্যশূলটিতে সবচেয়ে বেশি শক্তি থাব হয়? কারণ ব্যাখ্যা কর।

- ঘ. উপরোক্ত খাদ্যশূলে ছোট পাখির বিশুষ্টি ঘটলে বাস্তুতঙ্গের কী পরিপন্থি ঘটবে তা বিশ্লেষণ কর।

২.



- ক. জীববৈচিত্র্য কাকে বলে?
- খ. কয়েনসেপিজম কী বুঝিবে দেখ।
- গ. চিংড়ি তাপমাত্রা স্থিরতার কারণ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. চিংড়ি প্রক্রিয়াটির প্রতিক্রিয়া পরিবেশে কী প্রভাব বিস্তার করে বিশ্লেষণ কর।

চতুর্দশ অধ্যায়

জীবপ্রযুক্তি



বাংলাদেশের ছুটি জিলোয় প্রকল্প পাটের জীবন রক্ষণ উন্নয়ন করে উভাবন করেছে পাটের সমূল জাত রক্ষণ।

জীবপ্রযুক্তি বা বায়োটেকনোলজি (Biotechnology) জীববিজ্ঞানের একটি বর্ণিত (Applied) শাখা। বিশ্ব শতাব্দীর শুরু থেকেই বংশগতিবিদ্যা নানাভাবে বিকাশ লাভ করতে থাকে। নানা ভাবে সমৃদ্ধ হতে থাকে এবং ভাস্তার। বংশগতির একক বা জিলের উপাদানের প্রকৃতি, রাসায়নিক এবং অপূর্ব পর্যন্ত ও জৈবনিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলো আবিস্কৃত হওয়ার পর একটা জীবকোষ থেকে জিল আরেকটা জীবকোষে প্রতিস্থাপন করা যায়, সেটি নিয়ে জীববিজ্ঞানীরা পরেছেন শুরু করলেন। স্থাপিত হলো জীবপ্রযুক্তি (Biotechnology) নামে জীববিজ্ঞানের নতুন এক শাখা।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বাস্তব সমস্যা সমাধানে এবং মানুষের স্বাস্থ্য উন্নয়নে, উন্নততর ফসল সৃষ্টিতে, ফসলের মান এবং পরিমাণ বৃদ্ধিতে, পরিবেশ সংরক্ষণে এই প্রযুক্তি ব্যাপক সম্ভাবনার সার খুলে দিয়েছে। এই অধ্যায়ে আমরা এই প্রযুক্তি সমর্কে জানার চেষ্টা করব।



এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- জীবপ্রযুক্তির ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- টিসু কালচার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শস্য উৎপাদনে টিসু কালচারের ব্যবহার বর্ণনা করতে পারব।
- জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শস্য উৎপাদনে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ব্যবহার বর্ণনা করতে পারব।
- ইনসুলিন এবং হৃত্তোন উৎপাদনে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ব্যবহার বর্ণনা করতে পারব।
- জীবপ্রযুক্তির উপযোগিতা মূল্যায়ন করতে পারব।
- শপুর রোগ নিরাময়ে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ব্যবহার বর্ণনা করতে পারব।
- জীবপ্রযুক্তি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ব্যবহারের বিষয়ে পোস্টার অঙ্কন করতে পারব।
- আমাদের প্রতিদিনের জীবনে জীবপ্রযুক্তির অবদান উপলব্ধি করতে পারব।

14.1 জীবপ্রযুক্তি বা বায়োটেকনোলজি (Biotechnology)

জীবপ্রযুক্তি দুটি শব্দ Biology এবং Technology-এর সমন্বয়ে গঠিত। Biology শব্দের অর্থ জীব সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান এবং Technology শব্দের অর্থ প্রযুক্তি। অর্থাৎ Biology এবং Technology-এর আন্তঃসম্পর্কিত বিষয়ই হলো জীবপ্রযুক্তি। 1919 সালে হাঙ্গেরীয় প্রকৌশলী কার্ল এরেকি (Karl Ereky) প্রথম Biotechnology শব্দটি প্রবর্তন করেন। এই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে কোনো জীবকোষ, অণুজীব বা তার অংশবিশেষ ব্যবহার করে নতুন কোনো বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীবের (উক্তিদ বা প্রাণী বা অণুজীব) উত্তোলন বা সেই জীব থেকে প্রক্রিয়াজাত বা উপজাত দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়।

বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় জীবপ্রযুক্তি কোনো নতুন সংযোজন নয়। মানবসভ্যতার উষালগ্ন থেকেই জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগ শুরু হয়েছে। গাঁজন এবং চোলাইকরণের (Fermentation and brewing) মতো প্রযুক্তিজ্ঞান মানুষ প্রায় 8000 বছর আগেই রক্ষণ করেছে। 1863 সালে গ্রেগর জোহান মেডেল কৌলিতত্ত্ব বা জেনেটিক্স-এর সূত্রগুলো আবিষ্কারের পর থেকে জীবপ্রযুক্তি নতুনরূপে অগ্রযাত্রা শুরু করে। 1953 সালে Watson এবং Crick কর্তৃক ডিএনএ ডাবল হেলিক্স মডেল আবিষ্কারের ধারাবাহিকতায় আজকের আধুনিক জীবপ্রযুক্তির শুরু।

জীবপ্রযুক্তির অনেক পদ্ধতির মধ্যে বর্তমানে টিস্যু কালচার (Tissue culture) ও জিন প্রকৌশল (Genetic engineering) পদ্ধতি কৃষি উন্নয়ন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

14.2 টিস্যু কালচার

উক্তিদের বিভিন্ন অংশে টটিপটেন্ট (totipotent) স্টেম কোষ থাকায় এর প্রায় যেকোনো অংশ থেকে হুবহু আরেকটি পূর্ণাঙ্গ উক্তিদ জন্মানো সম্ভব, এটিই টিস্যুর কালচারের মূলনীতি। সাধারণত এক বা একাধিক ধরনের এক গুচ্ছ কোষসমষ্টিকে টিস্যু (Tissue) বা কলা বলা হয়। এই এক গুচ্ছ কোষ উৎপত্তিগতভাবে অভিন্ন এবং সম্মিলিতভাবে একই কাজ করে। একটি টিস্যুকে জীবাণুমুক্ত পুষ্টিবর্ধক কোনো মিডিয়ামে (Nutrient medium) বর্ধিতকরণ প্রক্রিয়াই হলো টিস্যু কালচার। টিস্যু কালচার উক্তিদবিজ্ঞানের একটি অপেক্ষাকৃত নতুন শাখা। উক্তিদ টিস্যু কালচারে উক্তিদের কোনো বিচ্ছিন্ন অংশ

বা অঙ্গবিশেষ (যেমন পরাগরেণু, শীর্ষ বা পার্শ্বমুকুল, পর্ব, মূলাংশ ইত্যাদি) কোনো নির্দিষ্ট পুষ্টিবর্ধক মিডিয়ামে জীবাণুমুক্ত অবস্থায় কালচার করা হয়। মিডিয়ামগুলোতে পুষ্টি এবং বর্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদান সরবরাহ করা হয়। টিস্যু কালচারের উদ্দেশ্যে উক্তিদের যে অংশ পৃথক করে নিয়ে ব্যবহার করা হয় তাকে ‘এক্সপ্ল্যান্ট (Explant)’ বলে।

14.2.1 টিস্যু কালচার প্রযুক্তির ধাপসমূহ

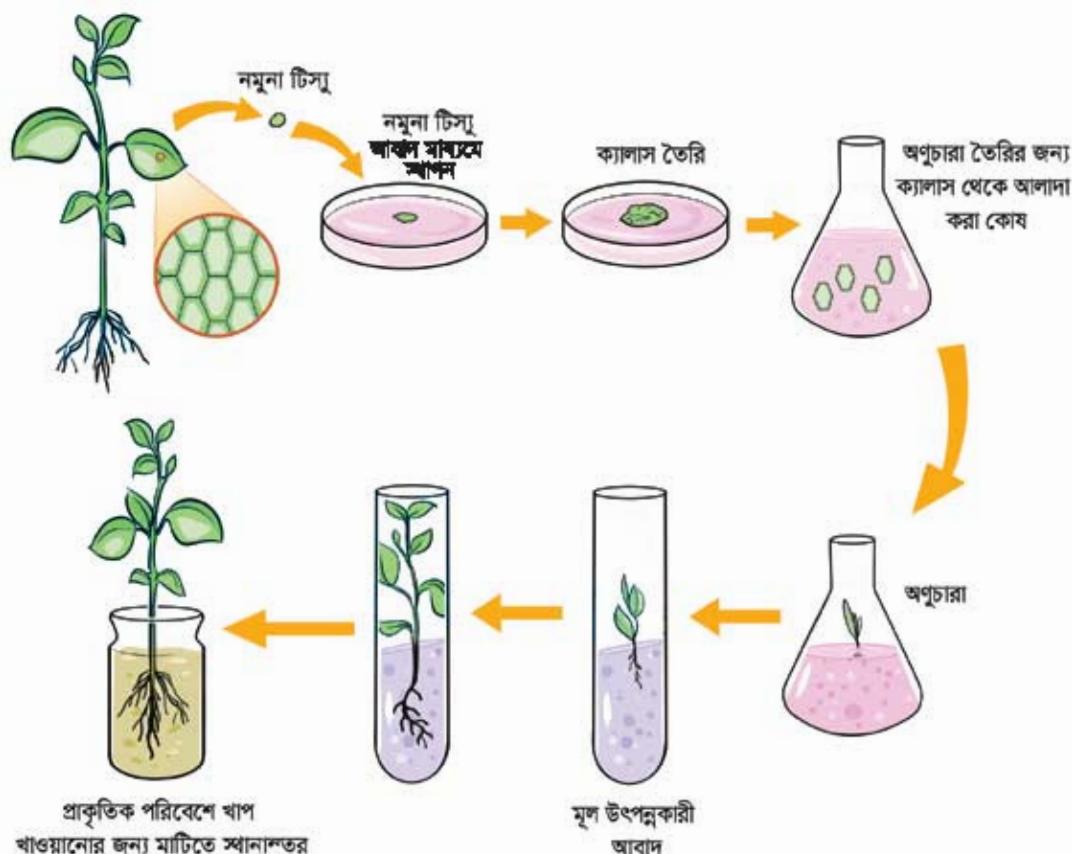
(a) মাতৃ উক্তিদ নির্বাচন: উন্নত গুণসম্পন্ন স্বাস্থ্যবান এবং রোগমুক্ত উক্তিদকে এক্সপ্ল্যান্টের জন্য নির্বাচন করা হয়।

(b) আবাদ মাধ্যম তৈরি: উক্তিদের বৃদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যকীয় খনিজ পুষ্টি, ভিটামিন, ফাইটোহরমোন, সুক্রোজ এবং প্রায় কঠিন মাধ্যম (Semi-solid medium) তৈরির জন্য জমাট বাঁধার উপাদান, যেমন অ্যাগার (Agar) সঠিক মাত্রায় মিশিয়ে আবাদ মাধ্যম তৈরি করা হয়।

(c) জীবাণুমুক্ত আবাদ প্রতিষ্ঠা: আবাদ মাধ্যমকে কাচের পাত্রে (টেস্টটিউব বা কনিক্যাল ফ্লাস্ক) নিয়ে তুলা বা প্লাস্টিকের ঢাকনা দিয়ে মুখ বন্ধ করা হয়। পরবর্তীতে অটোক্লেভ (Autoclave) যন্ত্রে 121° সে. তাপমাত্রায় রেখে, 15 lb/sq. inch চাপে 20 মি. রেখে জীবাণুমুক্ত করা হয়। তারপর কাচের পাত্রের মুখ পুনরায় বন্ধ করে নির্দিষ্ট আলো এবং তাপমাত্রা ($25+2^{\circ}$ সে.) সম্পন্ন নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বর্ধনের জন্য রাখা হয়। এই পর্যায়ে আবাদে স্থাপিত টিস্যুর বারবার বিভাজনের মাধ্যমে সরাসরি অগুচারা (Plantlets) তৈরি হয় বা ক্যালাস (Callus) বা অবয়বহীন টিস্যুমণ্ডে পরিণত হয়। এই টিস্যুমণ্ড থেকে পরবর্তী সময়ে পর্যায়ক্রমে একাধিক অগুচারা (Plantlets) উৎপন্ন হয়।

(d) মূল উৎপাদক মাধ্যমে স্থানান্তর: এ সমস্ত উৎপাদিত চারাগাছে যদি মূল উৎপন্ন না হয়, তবে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতা লাভের পর বিটপগুলো বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হয় এবং তাদেরকে পুনরায় মূল উৎপাদনকারী আবাদ মাধ্যমে স্থাপন করা হয়।

(e) প্রাকৃতিক পরিবেশে তথা মাঠপর্যায়ে স্থানান্তর: মূলযুক্ত চারাগুলোকে পানিতে ধূয়ে অ্যাগারমুক্ত অবস্থায় ল্যাবরেটরিতে মাটিভরা ছেট ছেট পাত্রে স্থানান্তর করা যায়। পাত্রে লাগানো চারাগুলো কক্ষের বাইরে রেখে মাঝে মাঝে বাইরের প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। পূর্ণাঙ্গ চারাগুলো সজীব এবং সবল হয়ে উঠলে সেগুলোকে এক পর্যায়ে প্রাকৃতিক পরিবেশে মাটিতে লাগানো হয়।



চিত্র 14.01: টিসু কালচার প্রক্রিয়ার ক্রমিক পর্যায়

14.2.2 টিসু কালচারের ব্যবহার

টিসু কালচার প্রযুক্তির কৌশলকে কাজে লাগিয়ে আজকাল উচ্চিদ প্রজননের ক্ষেত্রে ও উচ্চত জাত উদ্ভাবনে ব্যাপক সাহায্য প্রদান ক্ষেত্রে এবং এ ক্ষেত্রগুলোতে অপার সভাবনা দেখা দিয়েছে। এর মাধ্যমে উচ্চিদারণ থেকে কম সময়ের মধ্যে একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অসংখ্য চারা সৃষ্টি করা যায়। সহজেই রোগমুক্ত, বিশেষ করে ভাইরাসমৃক্ত চারা উৎপাদন করা যায়। খতুভিত্তির চারা উৎপাদনের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হওয়া যায়। অ্বলসময়ে কম জারুরীর মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক চারা উৎপাদনের সুবিধা ধারায় চারা উৎপাদনের সমস্তা এডানো যায়। বেসব উচ্চিদ বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে না, সেপ্টুলের চারাপ্রাপ্তি এবং স্বল্পব্যরে মুক্ত সতেজ অবস্থায় স্থানান্তর করা যায়। বিসৃষ্টপ্রায় উচ্চিদ উৎপাদন এবং সংরক্ষণ করতে

টিস্যু কালচার নিভরযোগ্য প্রযুক্তি হিসেবে স্বীকৃত। যেসব ভূগে শস্যকলা থাকে না, সেসব ভূগ কালচার করে সরাসরি উক্তিদি সৃষ্টি করা যায়। যে সকল উক্তিদে যৌনজনন অনুপস্থিত অথবা প্রাকৃতিকভাবে জননের হার কম, তাদের দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা যায়। নতুন প্রকৃতির উক্তিদি উক্তাবনে টিস্যু কালচার প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। ফরাসি বিজ্ঞানী George Morel (1964) প্রমাণ করে দেখান যে সিস্বিডিয়াম (Cymbidium) নামক অর্কিড প্রজাতির একটি মেরিস্টেম থেকে এক বছরে প্রায় 40 হাজার চারা পাওয়া সম্ভব। উল্লেখ্য, সাধারণ নিয়মে একটি সিস্বিডিয়াম উক্তিদি থেকে বছরে মাত্র অল্প কয়েকটি চারা উৎপন্ন হয়। থাইল্যান্ড টিস্যু কালচার পদ্ধতির মাধ্যমে এক বছরে 50 মিলিয়ন অণুচারা উৎপন্ন করে, যার অধিকাংশই অর্কিড। এই ফুল রপ্তানি করে থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশ প্রতিবছর কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। 1952 সালে মার্টিন নামক বিজ্ঞানী মেরিস্টেম কালচারের মাধ্যমে রোগমুক্ত ডালিয়া ও আলুগাছ উৎপন্ন করেন।

বর্তমানে মেরিস্টেম কালচারের মাধ্যমে কোনো কোনো ভাইরাস আক্রান্ত ফুল, ফল ও সবজি গাছকে (যেমন আলুর টিউবার) রোগমুক্ত করা টিস্যু কালচারের একটি নিয়মিত কর্মসূচিতে পরিণত হয়েছে। মালয়েশিয়ায় Oil Palm -এর বংশবৃদ্ধি টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়। টিস্যু কালচারের মাধ্যমে চন্দ্রমল্লিকার একটি অঙ্গজ টুকরা থেকে বছরে 88 কোটি চারা গাছ পাওয়া সম্ভব। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে জুই (Jasminum) সাপেনসান থেকে সুগন্ধি আতর বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত হচ্ছে। উড়োজাহাজ, রকেট প্রভৃতি ভারী ইঞ্জিন চলানোর জন্য এক রকমের তিমি মাছের (Sperm whale) তেলের প্রয়োজন হয়। এই তিমি মাছ ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। একমাত্র জোজোবা (jojoba) নামক গাছ হতে নিষ্কাশিত তেল বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু এই গাছ এক বিশেষ মরুভূমির পরিবেশ ছাড়া (যেমন Arizona, California) জন্মায় না এবং এদের বংশবৃদ্ধিও অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ। টিস্যু কালচারের মাধ্যমে এই গাছের দ্রুত বংশবৃদ্ধি করাই কেবল সম্ভব হয়নি, একে ভারতবর্ষের জলবায়ু উপযোগীও করে তোলা হয়েছে।

বাংলাদেশে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে ইতোমধ্যে অনেক সাফল্য অর্জিত হয়েছে, যেমন, বিভিন্ন প্রকার দেশি ও বিদেশি অর্কিডের চারা উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। রোগ প্রতিরোধী এবং অধিক উৎপাদনশীল কলার চারা, বেলের চারা, কাঁঠালের চারা উৎপাদন করা হয়েছে। চন্দ্রমল্লিকা, গ্লাডিওলাস, লিলি, কার্নেশান প্রভৃতি ফুল উৎপাদনকারী বৃক্ষের চারা উৎপাদন করা হয়েছে। বিভিন্ন ডালজাতীয় শস্য, বাদাম ও পাটের চারার উৎপাদন করা হয়েছে। টিস্যু কালচার প্রয়োগ করে আলুর রোগমুক্ত চারা এবং বীজ মাইক্রোটিউবার উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।

14.3 জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (Genetic engineering)

একটি জীব থেকে একটি নির্দিষ্ট জিন বহনকারী ডিএনএ খণ্ড পৃথক করে ভিন্ন একটি জীবে স্থানান্তরের কৌশল হচ্ছে জিন প্রকৌশল (Genetic engineering)। আরও সহজভাবে বলা যায়, কাঞ্চিত নতুন একটি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির জন্য কোনো জীবের ডিএনএর পরিবর্তন ঘটানোকে জিন প্রকৌশল বলে। এই জিন যে কৌশলগুলোর মাধ্যমে স্থানান্তর করা হয়, তাদের একট্রে রিকমিনেন্ট ডিএনএ কৌশল বলে। এই কৌশল অবলম্বন করে একটি ডিএনএ অণুর কাঞ্চিত অংশ কেটে আলাদা করে অন্য একটি ডিএনএ অনুতে প্রতিস্থাপন করার ফলে যে নতুন ডিএনএ অণুর সৃষ্টি হয়, তাকে রিকমিনেন্ট ডিএনএ বলে। রিকমিনেন্ট ডিএনএ তৈরির প্রক্রিয়াকে রিকমিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি বা জিন ক্লোনিং বলা হয়।

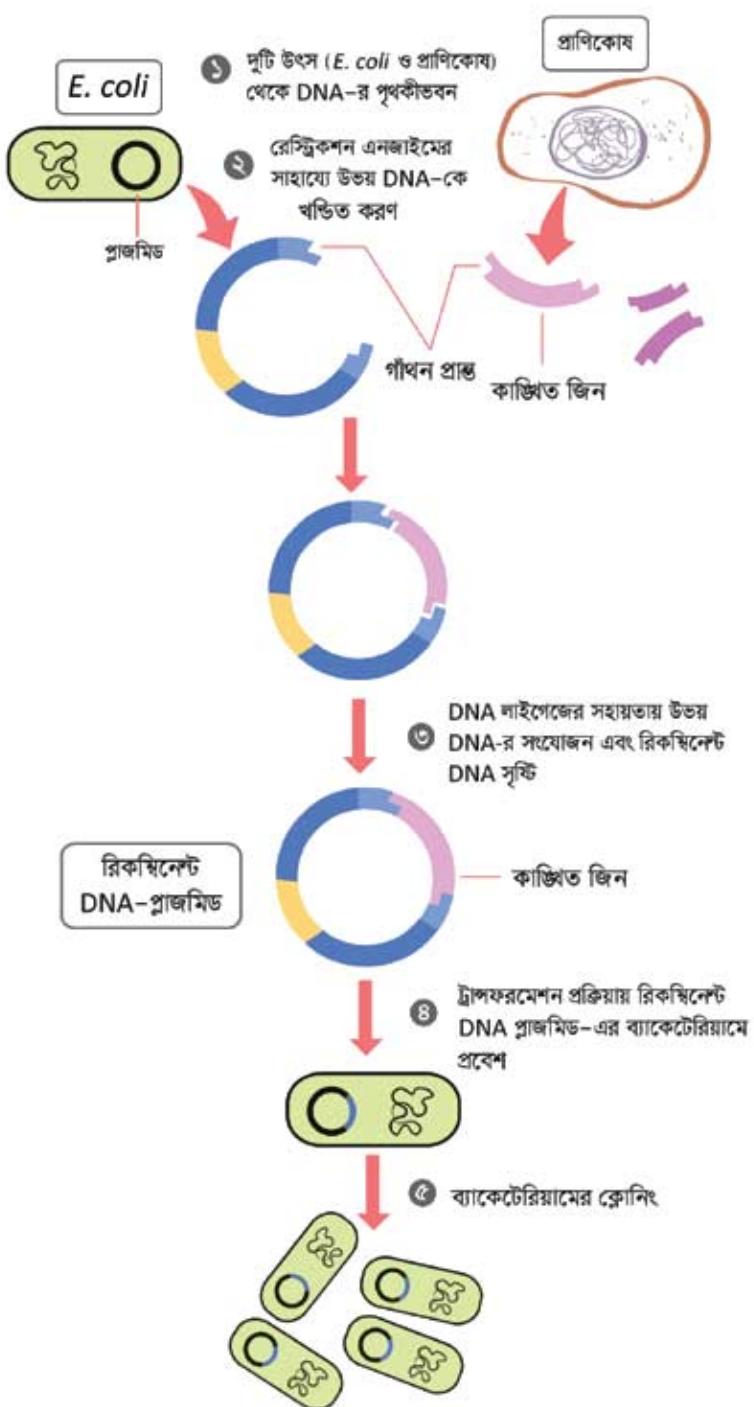
এই প্রযুক্তির মাধ্যমে DNA-এর কাঞ্চিত অংশ ব্যাকটেরিয়া থেকে মানুষে, উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে, প্রাণী থেকে উদ্ভিদে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছে। জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে উৎপন্ন নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীবের কোনো কোনোটিকে বলা হয় GMO (Genetically Modified Organism) আর কোনোটিকে বলে ট্রান্সজেনিক (Transgenic)।

জিএমও এবং ট্রান্সজেনিক জীব এক নয়। জীবের জিনে মিউটেশনের মাধ্যমে বা অন্য যেকোনো উপায়ে যেকোনো ধরনের পরিবর্তন ঘটলেই সেটিকে জেনেটিক মডিফিকেশন বলে। মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে অর্থাৎ জেনেটিক্সের নিয়ম আবিষ্কারের আগে থেকেই কৃত্রিম নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জেনেটিক্যালি মডিফায়েড কাঞ্চিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নতুন জাত উদ্ভাবন করে আসছে। প্রকৃতিতেও অনুরূপ প্রক্রিয়া চলছে লক্ষ-কোটি বছর ধরে, যার নাম জৈব বিবর্তন। জীবপ্রযুক্তির কল্যাণে এই জেনেটিক মডিফিকেশনের ব্যাপারটি আরও নিয়ন্ত্রিতভাবে এবং কম সময়ে করা সম্ভব। এভাবে যে জীব উৎপন্ন হয়, সেটি জিএমও বা জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম। আর ট্রান্সজেনিক জীব বলতে সেসব জীবকে বোঝায়, যাদের জিনোমে এমন এক বা একাধিক জিন চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা অন্য কোনো প্রজাতি থেকে নেওয়া।

14.3.1 জিএমও (GMO) বা রিকমিনেন্ট DNA প্রস্তুত করার ধাপসমূহ

মানুষের অন্ত্রে বসবাস করে একধরনের ব্যাকটেরিয়া, যার নাম *Escherichia coli*। এই ব্যাকটেরিয়ার উপর গবেষণা করে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধিকাংশ কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা রিকমিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি নিচে উল্লেখ করা ধাপগুলো (চিত্র 14.02) অবলম্বন করে সম্পন্ন করা হয়:

- (a) প্রথমে দাতা জীব থেকে কাঞ্চিত জিনসহ ডিএনএ অগুকে পৃথক করা হয়। এরপর এই জিনের বাহক বা ক্যারিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিড ডিএনএ পৃথক করা হয়। প্লাজমিড হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া কোষের ক্রামোজোমের বাইরে আরেকটি স্বতন্ত্র ডিএনএ অণু, যেটি বিভাজিত হতে পারে বা স্ববিভাজনে সক্ষম।
- (b) এ ধাপে প্লাজমিড ডিএনএ এবং দাতা ডিএনএকে এক বিশেষ ধরনের এনজাইম বা উৎসেচক দিয়ে খণ্ডিত করা হয়। দাতা ডিএনএ এর এসব খণ্ডের কোনো একটিতে কাঞ্চিত জিনটি থাকে।
- (c) এ ধাপে লাইগেজ নামক একধরনের এনজাইম দিয়ে দাতা ডিএনএকে প্লাজমিড ডিএনএ-এর কাটা প্রান্ত দুটোর মাঝখানে স্থাপন করা হয়। লাইগেজ এখানে আঠার মতো কাজ করে। এর ফলে নির্দিষ্ট জিনসহ রিকমিনেন্ট ডিএনএ প্লাজমিড তৈরি হয়। এই রিকমিনেন্ট প্লাজমিড এখন দাতা ডিএনএর খণ্ডিত অংশ বহন করে।
- (d) এখন এই রিকমিনেন্ট প্লাজমিডকে ব্যাকটেরিয়ার ভিতরে প্রবেশ করানো হয়। খণ্ডিত ডিএনএ গ্রাহক কোষে প্রবেশ করনোর পদ্ধতিকে ট্রান্সফরমেশন বলে। ট্রান্সফরমেশনের ফলে নতুন জিন নিয়ে যে ব্যাকটেরিয়া বা জীবের উভে ঘটে, তাকে ট্রান্সজেনিক জীব বলে।
- (e) এবার নির্দিষ্ট জিন বহনকারী রিকমিনেন্ট প্লাজমিড ধারণ করা ব্যাকটেরিয়াকে শনাক্ত করে আলাদা করা হয়। এরপর নির্দিষ্ট জিন বহনকারী ব্যাকটেরিয়াগুলোর ব্যাপক বংশবৃদ্ধি ঘটানো হয়। এই ব্যাকটেরিয়াগুলোর প্রত্যেকটিতে এখন একটি করে কাঞ্চিত জিন রয়েছে। এই পদ্ধতিতে জিন তৈরি করাকে বলা হয় জিন ক্লোনিং। জিনকে ব্যবহার করার জন্য প্লাজমিডকে আবার আলাদা করে নেওয়া হয়।
- আধুনিক জীবপ্রযুক্তি বা জিন কৌশলের মাধ্যমে জিন স্থানান্তরের প্রক্রিয়ায় কাঞ্চিত বৈশিষ্ট্য অল্প সময়ে সুচারুভাবে স্থানান্তর করা সম্ভব হয় বলে সংশ্লিষ্ট উভাবক বা উদ্যোগাগণের নিকট প্রচলিত প্রজননের তুলনায় এ প্রযুক্তি অধিক গুরুত্ব পাচ্ছে।



চিত্র 14.02: রিকমিনেট ডিএনএ থ্যুক্সি

নতুন ফসল উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রজননের তুলনায় জিন প্রকৌশল অনেক বেশি কার্যকরী, কারণ প্রচলিত প্রজনন প্রক্রিয়ায় জিন স্থানান্তর একই অথবা খুব নিকটবর্তী প্রজাতির মাঝে সীমাবদ্ধ, কিন্তু জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে নিকটবর্তী বা দূরবর্তী যেকোনো প্রজাতির মাঝে এক বা একাধিক জিন সরাসরি স্থানান্তর করা সম্ভব। প্রচলিত প্রজননে কাঞ্চিত ফলাফল অর্জন করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন। জিন প্রকৌশলের সাহায্যে খুব দুট কাঞ্চিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ, প্রাণী বা অগুজীব পাওয়া সম্ভব। প্রচলিত প্রজননে কাঞ্চিত জিনের সাথে অনাকাঞ্চিত জিনও স্থানান্তর হয়ে যেতে পারে এবং কাঞ্চিত জিনের স্থানান্তরও অনেক খানি অনিশ্চিত। জিন প্রকৌশলে অনাকাঞ্চিত জিন স্থানান্তরের সম্ভাবনা নেই এবং কাঞ্চিত জিন স্থানান্তরও নিশ্চিত। প্রচলিত প্রজনন কোনো রকম জীবনিরাপত্তা (Biosafety) নিয়ম পদ্ধতি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত নয় কিন্তু জিন প্রকৌশলের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত জীবনিরাপত্তা নিয়ম-নীতি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। প্রচলিত প্রজননে বিষাক্ততা (Toxicity) পরীক্ষা করা হয় না, কিন্তু জিন প্রকৌশলে বিষাক্ততা (Toxicity) পরীক্ষা করা হয়।

14.3.2 জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ব্যবহার

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা রিকমিনেন্ট DNA প্রযুক্তি হলো সর্বাধুনিক জীবপ্রযুক্তি। এই প্রযুক্তির মূল উদ্দেশ্য হলো নতুন ও উন্নত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীব সৃষ্টি, যা দিয়ে মানুষ সর্বোত্তমভাবে লাভবান হতে পারে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে ইতোমধ্যেই সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

(a) শস্য উন্নয়নে

এই প্রযুক্তির সাহায্যে ক্ষতিকর পোকামাকড় প্রতিরোধী ফসলের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

Bacillus thuringiensis (Bt) নামক ব্যাকটেরিয়ার জিন শস্যে প্রবেশ করানোর কারণে জেনেটিকভাবে পরিবর্তিত শস্যসমূহকে Bt Corn, Bt Cotton ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হচ্ছে। একইরকমভাবে বিটি ভুট্টা, বিটি ধান (চীনে) ইত্যাদি উদ্ভাবিত হয়েছে। এসব ফসল লেপিডোপটেরা (Lepidoptera) এবং কলিওপটেরা (Coleoptera) বর্গের অন্তর্ভুক্ত ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক্ষম।

এই প্রযুক্তির সাহায্যে ভাইরাস প্রতিরোধী ফসলের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। যেমন ভাইরাল কোট প্রোটিনে (Coat Protein) জিন স্থানান্তরের মাধ্যমে টমেটো মোজাইক ভাইরাস (ToMV), টোবাকো মোজাইক ভাইরাস (TMV) এবং টোবাকো মাইল্ড গ্রিন মোজাইক ভাইরাস (TMGMV) প্রতিরোধী

ফসলের জাত উত্তোলন করা হয়েছে। রিং স্পট ভাইরাস (PRSV) প্রতিরোধে সক্ষম পেঁপের জাত উত্তোলন করা হয়েছে। লেট ব্লাইট ছত্রাক প্রতিরোধী জিন স্থানান্তরের মাধ্যমে লেট ব্লাইট প্রতিরোধী গোল আলুর জাত উত্তোলনের লক্ষ্যে গবেষণা চলছে।

জিনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে আগাছানাশক রাসায়নিক পদার্থের বিরুদ্ধে সহনশীলতাসম্পন্ন (Herbicide tolerant) ভুট্টা, তুলা ইত্যাদি ফসলের জাত উত্তোলন করা হয়েছে।

এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া থেকে বিজ্ঞানীরা আগাছানাশক সহিষ্ণুও জিন টমেটোতে স্থানান্তর করে আগাছানাশক সহিষ্ণুও (Herbicide tolerant) টমেটোর জাত তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। একইভাবে সয়াবিন, ভুট্টা, তুলা, ক্যানোলা (Canola) ইত্যাদির আগাছা নাশক সহিষ্ণুও জাত উত্তোলন করা হয়েছে।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে একই উক্তিদে একাধিক বৈশিষ্ট্য (Trait) অনুপ্রবেশ করানো যায়। বাণিজ্যিকভাবে এখন এ ধরনের ট্রাঙ্জেনিক উক্তিদ সহজলভ্য হয়েছে। যেমন তুলা এবং ভুট্টার মধ্যে একই সাথে আগাছানাশক সহিষ্ণুও (Herbicide tolerant) এবং পোকামাকড় প্রতিরোধী (Insect resistant) বৈশিষ্ট্য অনুপ্রবেশ করানো হয়েছে।

জিনগত রূপান্তরের মাধ্যমে ফসলের পৃষ্ঠিমান উন্নয়ন করা হয়েছে। যেমন, ধানে ভিটামিন A তথা বিটাক্যারোটিন জিন স্থানান্তর করা হয়েছে। এই ধানের চাল থেকে প্রস্তুত ভাত থেলে আলাদা করে আর ভিটামিন A খেতে হবে না। ধানে লৌহ বা আয়রন যোগ করারও প্রচেষ্টা অব্যাহত হয়েছে। লবণাঙ্কতা এবং খরা সহনশীল জিন স্থানান্তরের মাধ্যমে জিনগত পরিবর্তন (Genetic modification) ঘটিয়ে বিভিন্ন ফসলের জাত উত্তোলনের চেষ্টা চলছে।

(b) প্রাণীর ক্ষেত্রে

গবাদিপশু যেমন, গরুর দুধে আমিষের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য Protein C জিন স্থানান্তর করা হয়েছে। তবে এটা এখনো গবেষণা পর্যায়ে আছে।

আকার বৃদ্ধি এবং মাংসের উৎপাদন বাড়ানোর উদ্দেশ্যে মানুষের বৃদ্ধির জন্য দায়ী হরমোনের জিন স্থানান্তর করে ভেড়ার জেনেটিক পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। ভেড়ার পশমের পরিমাণ ও গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য ব্যাকটেরিয়ার 2টি জিন, যথা CysE এবং CysM ভেড়ার জিনোমে স্থানান্তর করা হয়েছে।

(c) মৎস্য উন্নয়নে

মাগুর, কমন কার্প, লইট্টা ও তেলাপিয়া মাছে স্যামন মাছের দৈহিক বৃদ্ধি হরমোনের (Growth hormone) জিন স্থানান্তরের মাধ্যমে জেনেটিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় এসব মাছের আকার প্রায় 60 ভাগ বড় করা সম্ভব হয়েছে।

(d) চিকিৎসা ক্ষেত্রে

জেনেটিক পরিবর্তনের মাধ্যমে ইস্ট নামক ছানাক থেকে হেগাটোইচিস বি-ভাইরালের উন্নত (ইন্টারফেরন) তৈরি হচ্ছে।

মানবদেহের ইনসুলিন তৈরির জিন ব্যবহার করে জেনেটিকভাবে পরিবর্তিত E. coli ব্যাকটেরিয়া এবং ইস্ট থেকে বাণিজ্যিকভাবে ইনসুলিন তৈরি হচ্ছে, যা মানুষের বহুমুখ বা ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

জেনেটিকভাবে পরিবর্তিত E. coli ব্যাকটেরিয়া এবং ইস্ট থেকে মানববৃদ্ধির হরমোন (growth hormone) এবং গ্যানুলোসাইট ম্যাঙ্কোকাজ স্টিমুলোটিং ফ্যাক্টর (GM-CSF) কলোনি উকীপক উপাদান ইত্যাদি তৈরি করা হচ্ছে। এগুলো যথাক্রমে অস্বাভাবিক খাটো হণ্ডা রোগ (dwarfism), ভাইরাসজনিত রোগ, ক্যালোর, AIDS ইত্যাদির চিকিৎসায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

(e) পরিবেশ সুরক্ষার

পেট্রোলিয়াম ও কয়লাখনি এলাকা দূষণমুক্তকরণ, শিল্পক্ষেত্রে বর্জনশোধন, পর্যালিকাশন ইত্যাদি পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সহজ এবং সূচ করার উদ্দেশ্যে এই প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়। জিন প্রাকৌশলের উপর গবেষণা করে নতুন এক জাতের Pseudomonas ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে যা পরিবেশের তেল ও হাইড্রোকার্বনকে সূচ করে পরিবেশকে দূষণমুক্ত করতে সক্ষম।



একক কাজ

কাজ: জীবশিক্ষা ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যবহার বিষয়ে পোস্টাৰ অঙ্কন কর ও শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।



একক কাজ

কাজ: বাংলাদেশে জীবশিক্ষা ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার সুবোগ সম্পর্কিত প্রতিবেদন তৈরি কর ও শিক্ষকের নিকট অর্পণ দাও।

অনুশীলনী



সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- কীভাবে আবাদ মাধ্যম তৈরি করা হয়?
- চিসুকালচার বলতে কী বোঝা?
- একশ্যান্ট কী?
- জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কী?
- প্রাইভেজিন কী?



রচনামূলক প্রশ্ন

- উচ্চিদ প্রজনন ও উচ্চত জাত উদ্ভাবনে চিসুকালচার প্রযুক্তির সূমিকা উত্থাপ কর।
- শস্য উন্নয়নে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর সূমিকা আলোচনা কর।



বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- DNA কাটোর অন্ত বিশেষ এনজাইম কোনটি?

ক. লাইপেজ	খ. রেস্ট্রিকশন
গ. সেকটেজ	ঘ. লাইপেজ

২. জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগ হয়—

- i. গাঁজনে
- ii. টিস্যুকালচারে
- iii. ট্রান্সজেনিক জীব উৎপন্নে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

ইমতিয়াজ তার বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে খুবই ভালো জাতের একটি বেল গাছের সন্ধান পেল। সে হুবুহু একই বৈশিষ্ট্যের চারা উৎপাদনের জন্য গাছটির পার্শ্বমুকুল নিয়ে এলো এবং তার বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চিদিবিজ্ঞান ল্যাবে এর চারা তৈরি করল।

৩. ল্যাবে ইমতিয়াজের গৃহীত প্রক্রিয়াটি কী?

- ক. জিন স্থানান্তরকরণ খ. হরমোন প্রয়োগ
 গ. এনজাইমের ব্যবহার ঘ. টিস্যুকালচার

৪. ল্যাবে ইমতিয়াজের কার্যক্রমের ক্রমানুযায়ী ধাপগুলো কোনটি?

- ক. আবাদ মাধ্যম তৈরি → এক্সপ্লান্ট স্থাপন → অগুচারা উৎপাদন → মূল উৎপাদন
 → প্রাকৃতিক পরিবেশে স্থানান্তর
- খ. আবাদ মাধ্যম তৈরি → অগুচারা উৎপাদন → মূল উৎপাদন → এক্সপ্লান্ট স্থাপন
 → প্রাকৃতিক পরিবেশে স্থানান্তর
- গ. মাতৃউচ্চিদ নির্বাচন → আবাদ মাধ্যম তৈরি → এক্সপ্লান্ট স্থাপন → অগুচারা উৎপাদন
 → প্রাকৃতিক পরিবেশে স্থানান্তর
- ঘ. মাতৃউচ্চিদ নির্বাচন → আবাদ মাধ্যম তৈরি → ক্যালাস তৈরি → এক্সপ্লান্ট স্থাপন
 → প্রাকৃতিক পরিবেশে স্থানান্তর



সূজনশীল প্রশ্ন

১. জিন অকোষলী ড. হারদারের বাসানের মেরু গাছগুলোতে ঘূর মেরুর কলন হলেও গাছগুলো মুক্ত গ্রোগাক্ত হবে যারা বাইর। তিনি লক্ষ করলেন তার বাড়ির পাশের অঞ্চলে একজাতের মেরুগাছ রয়েছে যাতে খুব অকটা মেরু না হলেও গাছগুলো দীর্ঘমিল বেঁচে থাকে। এ মুক্ত মেরুর জাত থেকে তিনি অধিক কলনশীল গোণ প্রতিরোধী একটি জাত উৎপাদন করলেন। তিনি শ্বাসাদিক প্রক্রিয়ার এর চারা উৎপাদন না করে স্থানে বিশেষ প্রক্রিয়ার এর চারা তৈরি করলেন।

ক. জীব প্রযুক্তি কী?

খ. GMO বলতে কী বোঝায়?

গ. ঙ. ড. হারদারের মেরুগাছের জাত উৎপাদনের কৌশল ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ড. হারদারের বিশেষ প্রক্রিয়ার চারা তৈরি করার কারণ বিশ্লেষণ কর।

সমাপ্ত

২০২০

শিক্ষাবর্ষ

দাখিল

৯ম-১০ম জীববিজ্ঞান

‘শিক্ষার শেকড়ের স্বাদ তেতো হলেও এর ফল মিষ্টি’ – এরিস্টটল

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন কর

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য ‘৩৩৩’ কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টেল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য